বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 537. May, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৬ বর্ষ। ৫৩৭ সংখ্যা। { বৈশাখ ১৩১৫। মে, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আ: ম	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
শে: ৩০	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
বু	র	বু	র	বু	শু
†A	M	J	Jy	A	S
‡14	14	15	16	17	17
আ: বু	শু	সো	বু	শ	ম
শে: 30	31	30	31	31	30
বৃ	র	ম	শু	সো	বু
ম	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
বু	শু	ম	শু	ম	শু
বৃ	শ	বু	শ	বু	শ
শু	র	বৃ	র	বৃ	র
শ	সো	শু	সো	শু	সো
র	ম	শ	ম	শ	ম
সো	বু	র	বু	র	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু: এ:,	২৯	২৮	২৬	২৪	২১	২০
পূ:,	৩	৩,৩২	২৯	২৮	২৫	২৩
কৃ: এ:,	১৩	১৩	১০	৯	৬	৫
অ:,	১৭	১৭	১৪	১৩	১০	৯

আ:—আরম্ভ। শে:—শেষ।
শু: এ:-শুক্ল একাদশী, পূ:-পূর্ণিমা।
কৃ: এ:-কৃষ্ণ একাদশী, অ:-অমাবস্যা।

*‡ ২৯এ বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২৮এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার শুক্ল একাদশী। ৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ১৩ই বৈশাখ রবিবার ও ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী, ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সাল।
ফসলী ১৩১৫-১৬।
হিজরী ১৩২৬-২৭।
খৃষ্টাব্দ ১৯০৮-৯।
শকাব্দা ১৮৩০।
সংবৎ ১৯৬৫-৬৬।
মগী ১১৭০-৭১।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৭৯-৮০।

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

* বৈ বৈশাখ মঙ্গলবার আরম্ভ ও ৩০শে বুধবার শেষ। ১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

+ A এপ্রেল আরম্ভ বুধবার, শেষ ৩০শে বৃহস্পতিবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ মঙ্গল, ২রা বুধ ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি, ২রা শুক্র ইত্যাদি।

বৈশাখ মঙ্গল }
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি } ১ ৮ ১৫ ২২ ২৯

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আ: শ	সো	বু	বৃ	শ	র
শে: ৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
র	ম	বু	শু	শ	ম
O	N	D	J	F	M
17	16	16	14	13	14
আ: বৃ	র	ম	শু	সো	সো
শে: 31	30	31	31	28	31
শ	সো	বৃ	র	র	বু
শ	সো	বু	বৃ	শ	র
র	ম	বৃ	শু	র	সো
সো	বু	শু	শ	সো	ম
ম	বৃ	শ	র	ম	বু
বু	শু	র	সো	বু	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
শু	র	ম	বু	শু	শ

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু: এ:,	১৯	১৯	১৮	[illegible]	১৮	১৯
পূ:,	২৩	২২	২২	২৩	২২,২৩	২৩
কৃ: এ:,	৪	৪	৪	৫	৪	৫
অ:,	৯	৮	৮	৮	৮	৮

*‡ ১৯এ কার্ত্তিক বুধবার ও ১৯এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্ল একাদশী। ২৩এ কার্ত্তিক রবিবার ও ২২এ অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ণিমা, ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী, ৯ই কার্ত্তিক রবিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নববর্ষে

বামাবোধিনীর প্রার্থনা।

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পুনরায় বর্ষ-চক্র ঘুরিয়া আসিল। এই বিশাল সৃষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া, ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১ শে চৈত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবী সূর্য্য-মণ্ডলীর চতুর্দ্দিক্ একবার প্রদক্ষিণ করিল। পৃথিবী কত কাল হইতে এইরূপ ঘুরিতেছে এবং আরও কত কাল ঘুরিবে তাহার ঠিক নাই। এই পর্য্যটনের অন্ত নাই, একবার প্রদক্ষিণ শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইল। এই প্রদক্ষিণ আরম্ভের মহাদিন ১লা বৈশাখ। এই স্মরণীয় পবিত্র দিনই নব-বর্ষের সূচনা।

এই নববর্ষের আগমনে মানবমাত্রেরই অতীতের আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রেয়ঃসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। গত বর্ষে কি কি করিয়াছি এবং তাহার ফলাফলই বা কিরূপ দাঁড়াইল, ইহা নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া যিনি বর্ত্তমান জীবনকে শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, যিনি অতীতের লাভালাভ গণনা করিয়া নিজ জীবন-কারবারের হাল খাতা ঠিক করিতে পারেন, তিনি লাভবান্ হন। কাল অনন্ত, মানব আত্মাও অক্ষয়, অতএব গত বর্ষে বুদ্ধিদোষে অনেক ক্ষতি করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই। একান্ত ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্ব বর্ষের ক্ষতি পূরণ করিয়াও ভাবি-জীবনের জন্য অনেক সঞ্চয় করিতে পারা যায়। কোন বালক যদি আলস্যে বা কুসঙ্গে পড়িয়া নিজ পাঠাভ্যাসের এরূপ ক্ষতি করে যে, সে বর্ষান্তে প্রমোশন্ না পাইয়া ডিগ্রেড্ হয় এবং সেই ক্ষতি পূরণের জন্য সে প্রাণপণ করিয়া পাঠাভ্যাস করে, তবে আগামী বর্ষে সে বালক দুই ক্লাস বা তিন ক্লাস উপরে উঠিয়া যাইতে পারে। সাধনা যত গভীর,যত প্রগাঢ় ও যত বিপুল হইবে, সিদ্ধিলাভও তত নিকটবর্ত্তী হইবে।

"কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ"

ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় কালও টুক্ টুক্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এবং সেই সঙ্গে প্রতি পলকেই পরমায়ু পলে পলে ক্ষয় পাইতেছে। সময়ের যে অংশটুকু যাইতেছে, তাহা আর ফিরিবার নয়, এজন্য নিমেষার্দ্ধ সময়কেও বিফলে যাইতে দিবে না। একজন কবি বলিয়াছেন ;—

"আয়ুষঃ ক্ষণো একোপি ন লভ্যঃ স্বর্ণ-কোটীভিঃ।
স চেৎ বিফলতাং নীতঃ কা নু হানিস্ততোঽধিকা॥"

অর্থাৎ কোটি কোটি স্বর্ণ দিলেও আয়ুর একটী পলও ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সেই আয়ু যদি বিফলে যায়, তবে তদপেক্ষা ক্ষতির বিষয় আর কি আছে ?

এই অমূল্য নীতিবাক্যটী প্রত্যেকেরই

জীবনের ইষ্টমন্ত্র হওয়া উচিত। মানবের সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতির নিদান ভাবনাশুদ্ধি। মন শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত না হইলে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি না হইলে, মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অসিদ্ধ মানবের শান্তিলাভ কোথায়? এ জগতে একমাত্র সাধু মহাত্মারাই শ্রেয়ঃপথের প্রবর্ত্তয়িতা, শান্তিরাজ্যের নেতা। যাঁহার উপদেশে ও সহবাসে জড় জীবন চৈতন্যময় হয়, তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিও। অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যিনি অসাধুকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি চন্দনভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

এ জগতে পূতনা রাক্ষসীর ন্যায় বহুতর ছদ্মবেশী কপট ব্যক্তি সাধুবেশে বিচরণ করে। সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষণে সতর্ক হইতে হইবে। কাল অনন্ত। যদি ঐকান্তিকতা থাকে, তবে তুমি শতবার সিদ্ধিলাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়াও শেষে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে।

তোমার বিপদ্ যতই ঘনীভূত হউক, তোমার যতই প্রাণসঙ্কট মহাভয় উপস্থিত হউক, তুমি অটল ধৈর্য্য সহকারে বিচার করিয়া চলিলে তোমাকে অবসন্ন হইতে হইবে না। গতবর্ষে তোমার বড় বিপদ্ গিয়াছে. দিনগুলি বড় নিরানন্দে কাটিয়াছে, ইহা ভাবিয়া হতাশ বা অবসন্ন হইও না। সেই সর্ব্বসঙ্কটহারী দয়াময়কে একান্তভাবে স্মরণ কর, তাঁহার মঙ্গলময়ী বিভূতিগুলির নিরন্তর আলোচনা কর, সর্ব্বভূতেই সেই করুণাময়ের সত্তা হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অনুভব করিয়া সর্ব্বত্রই অদ্বৈত প্রেম নিবদ্ধ কর, তোমার বিপদ্ কাটিবেই।

"বিপদে ডোবে কি তার তরি?
শর্ম্ম বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম গতি মুক্তি যার হরি।"

হে অসীম করুণা-সিন্ধু হরি! আজ এই শুভ দিনে তোমার চরণে এই প্রার্থনা,—যিনি আমাদের জীবনপথের নেতা, যাঁহার করুণা এ দেশের ও এই ক্ষুদ্র জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত, যিনি বঙ্গমহিলাগণের শুভকামনায় অহরহ দেহের অস্থি, মজ্জা ক্ষয় করিয়াছেন, জীবনের সমস্ত সাধনাকে বঙ্গবামাকুলের উন্নতিকল্পে অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, আজি সেই বিশ্বহিতৈষী মহাত্মা সুরলোকে। হে দয়াময়! আজি এই নিরাশ্রয়া অনাথিনী বামাবোধিনীকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই পূজনীয় পিতৃদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহার প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমাদের দোষ ত্রুটি দূর হউক, আমরা যেন দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস পাইতে পারি। যাঁহাদের অনুগ্রহে আমি এতকাল জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছি, আজ তাঁহাদেরও সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

নববর্ষ আমাদের আশা, উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করুক এবং জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে শক্তি ও সিদ্ধি দান করুক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহিলা মহাসমিতি— শুনা যায়, আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় মহিলাবৃন্দের একটী মহা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। ভারতের নানাদেশীয় মহিলাগণ মিলিত হইয়া স্বদেশের উন্নতি সম্বন্ধে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

জৈন অনাথ-শিশু-আশ্রম—পঞ্জাবে হিসারের সহরে জৈনগণ ভারতের নানা স্থানের পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকা-দিগের ভরণ পোষণ ও উপযুক্ত শিক্ষার জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে ৫০০ বালকবালিকার থাকিবার স্থান করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নতি—আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ হীরালাল যাদা একপ্রকার নূতন তাঁতের উদ্ভাবন করিরাছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন শ্রীমন্ত ইন্দিরা রাজা লুম।

বোম্বাই পারেলের শ্রীযুক্ত পিরোশ শা বায়জোরজী গোধরাজ এক প্রকার নূতন লোহার সিন্ধুক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিদেশী শিল্পের মোহে উদ্ভাবনী শক্তি নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে ভারতবাসীর সেই ঘোর কাটিতেছে।

ভূগর্ভে গ্রাম—সম্প্রতি লাহোরে সালিমার বাগের নিকট রেলপথের ধারে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটী উপবিষ্টা স্ত্রী-লোকের মূর্ত্তি বাহির হয়, কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবামাত্রই চূর্ণ হইয়া যায়। পরে আরও মৃত্তিকা উত্তোলন করিবার পর তথায় ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ ও স্তম্ভ বাহির হয়। ইহা কোন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। ভূমিকম্প কিম্বা কোন আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপ্লবে ইহা মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল।

রমণীর সম্মান—হায়দ্রাবাদের শ্রীমতী হুমাউন মির্জ্জা নাম্নী জনৈক মহিলা "মুসির-ই-নিসবান" নামক একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মুসলমান্ লেখিকা-প্রণীত উপন্যাস হায়দ্রাবাদে ইহাই প্রথম। সেই জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত হায়দ্রাবাদের শ্রীমতী ওয়াকারের গৃহে তত্রত্য অনেকগুলি মহিলা সম্মিলিত হইয়া শ্রীমতী মির্জ্জাকে একটী রৌপ্য পদক উপহার দিয়াছেন। এই সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী ওয়াকার ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

স্বার্থত্যাগ—রাজলক্ষ্মী বাই নাম্নী ঢাকার জনৈক বারবনিতা তত্রত্য জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেশের কল্যাণার্থে দান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

স্বদেশভক্ত লিয়াকৎহোসেন—স্বদেশভক্ত মৌলবী লিয়াকৎহোসেন জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত শুক্রবার কলিকাতার পান্তীর মাঠে তাঁহার প্রতি

সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। মৌলবী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সভাস্থলে "লিয়াকৎহোসেন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারবিভাগের গোলযোগ—তারবিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের গুরুতর পরিশ্রমের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট বেতনবৃদ্ধির আবেদন করেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আবেদনে আদৌ কর্ণপাত না করায় অনেক সিগ্‌নালার ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে। ফলে সংবাদাদি প্রেরণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে এবং প্রত্যেক আফিসে অনেক সংবাদ পড়িয়া থাকিতেছে।

মদ্যপান-নিবারণী সভা—পুনার মদ্যপান-নিবারণী সভা সহরে মদ্যপান নিবারণের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন। তথাকার যুবকেরা মদের দোকানের সম্মুখ দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন এবং সহরের যে সকল লোকের বাটীতে মদের দোকান আছে, তাঁহারা দোকানদারদিগকে দোকান উঠাইয়া লইবার জন্য নোটীস দিয়াছেন।

বড়লাট-কন্যার বিবাহ—বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কন্যা লেডী রুবী ইলিয়টের সহিত ভাইকাউণ্ট এরিংটনের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহে ভারতের সম্রাট্ সাম্রাজ্ঞী ও অনেক লর্ড প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস*।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নারদ, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, হরিদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি অলৌকিক ভক্তচরিত্রে দেখা যায়,—তাঁহাদের নিকটে ভগবান্ ও ভগবানের নাম একই পদার্থ। নামের সঙ্গে ভগবান্‌কে তাঁহারা একীভূত করিয়াছেন, ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়াছেন। ইহার যাথার্থ্য আমরা অনেক সময় অনুভব করি। প্রিয়তম ব্যক্তির নাম করিলেই সে ব্যক্তি সম্মুখে প্রতিভাত হয়। সে অভীষ্ট পদার্থ পরলোকগত হইলেও, ঐ নামের আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়। পরলোকগত মাতাপিতার নাম যখনি করি, তখনি কি সেই প্রাণারাম মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হয় না? আন্তরিক ভাবসূত্রে নাম ও নামী নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বাক্যের সঙ্গে অর্থের ন্যায়, নামের সঙ্গে নামীর সম্বন্ধ অক্ষয় ও অচ্ছেদ্য। গভীর চিন্তাশীল অদ্বিতীয় পণ্ডিত কারলাইল্ ফরাসিবিপ্লবের ইতিহাস

---

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভ্রমক্রমে তুলসীদাসের কারারোধ সাজাহানের সময়ে লিখিত হইয়াছে। উহা আকবরের সময় ঘটিয়াছিল।

লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন;—"কোনও ব্যক্তি বা কোনও বস্তুর নামটী মনে হইলেই, সেই ব্যক্তির বা সেই বস্তুটীর আকৃতি, প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। তখন আমরা সেই পদার্থটীকে বিশেষরূপে জানিতে পারি। সেই পদার্থটী তখন আমাদের নিজের হয়। "Any approximation to the right name has value: were the right name itself once here, the thing is known henceforth; the thing is then ours." (Carlyle's History of the French Revolution, Vol. III. Book V., Chapter 1.)

ভক্তমাত্রেই নাম ও নামীর অভেদ স্বীকার করেন। নাম ও নামীর পরস্পর এ সম্বন্ধ না থাকিলে চৈতন্য, হরিদাস, নিত্যানন্দ, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তেরা নামের প্রভাবে জগৎ মাতাইতে পারিতেন না, ফাঁকা শব্দে পাখী মরে না। তুলসী বলিতেছেন;—

"রামনাম সব ধর্ম্মময়, জানত তুলসীদাস।
যথা ভূমি বশ বীজ মে,নখত নিবাস অকাস॥
রামনামরতি রামগতি, রামনাম বিশ্বাস।
সুমিরত শুভ মঙ্গল কুশল, চঁহু দিশি তুলসীদাস॥
রামনাম পরতাপতে প্রীতিপ্রতীতিভরোস।
সো তুলসী সুমিরত সকল, সগুণ সুমঙ্গল কোষ॥"

অর্থাৎ—রামনামই সর্ব্বধর্ম্মের সার, এ কথা তুলসী জানিয়াছে। যেমন বীজের সঙ্গে ভূমি এবং নক্ষত্রের সঙ্গে আকাশ, তেমনি নামের সঙ্গে ভগবান্ সম্বন্ধ। রাম-নাম আমার মতি, গতি ও রতি; রাম-নাম আমার প্রতীতি ও ভরসা; রাম-নাম সর্ব্ব গুণের ও সর্ব্ব মঙ্গলের আধার। তুলসী রামনামে তন্ময় হইয়া চতুর্দ্দিক্ পুণ্যময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় দেখিতেছে।

ভগবানে যাহার এমন বিশ্বাস, এমন প্রেম, এত দৃঢ়তা, এত আনন্দ না হয়, এই মর্ম্মবিদারী, রক্তাক্ত ভীষণ সংসারে তাহার শান্তি কোথায়?

তুলসীদাস প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সায়ংকালে স্বরচিত নব নব স্তোত্রে ইষ্টদেবের স্তব করিতেন। স্তোত্রগুলি প্রেমভক্তির মাধুর্য্যে পরিপ্লুত। তাঁহার একটী প্রভাতী স্তোত্র উপহার দিতেছি;—

(স্থান—অযোধ্যা; উষাকাল)

"জাগিয়ে রঘুনাথকুঁবর! পক্ষী বন বোলে।
(ধুয়া)
চন্দ্রকিরণ শীতল ভঈ চকঈ পিয় মিলন গঈ,
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন, পল্লব দ্রুম ডোলে। ১।
প্রাত ভানু প্রকট ভয়ো রজনীকো তিমির গয়ো,
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জ গান, কমলনদল খোলে। ২।
ব্রহ্মাদিক ধরত ধ্যান, সুর নর-মুনি করত গান,
জাগনকী বের ভঈ, নয়নপলক খোলে। ৩।
তুলসীদাস অতি অনংদ, নিরখিকৈ মুখার-বিন্দ,
দীননকো দেত দান, ভূষণ বহু মোলে॥"

(অনুবাদ) ;—(১)

জাগ দয়াময় ! রঘুবংশের গৌরব !
বিপিনে বিহঙ্গকুল করে কলরব।
প্রভাহীন বিমলিন চন্দ্রমা গগনে,
চলিয়াছে চক্রবাকী প্রিয়-সম্মিলনে।
লতাগ্র পল্লবরাজি করি' আন্দোলন,
সুরভি শীতল মন্দ বহিছে পবন।
নিশার তিমিররাশি করিয়া হরণ,
উদিল গগনতলে তরুণ তপন।
ফুটিছে কমলকুল, গুঞ্জে অলিগণ,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধেয়ানে মগন।
প্রভাতী মঙ্গলগীতি গায় সুর-নর,
জাগিবার বেলা হৈল উঠ রঘুবর!
হে নাথ ! হেরিলে তুঁহু ও মুখকমল,
তুলসী পরমানন্দে হইবে বিহ্বল।
উঠি প্রভু ! শ্রীঅঙ্গের অমূল্য ভূষণ
খুলিয়া দরিদ্রগণে কর বিতরণ। (২)

এই সকল স্তোত্র পড়িলে জ্ঞান হয়, তুলসীদাস সেই ত্রেতাযুগের মনুষ্য, রামের সমকালীন, তাঁহারি অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর। তিনি যেন আপন ইষ্টদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যিনি ধ্যানযোগে তন্ময়, বাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট তিরোহিত, অন্য পদার্থ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধ্যেয় বস্তুটী তাঁহারি অভিমত রূপ ধারণপূর্ব্বক ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার নয়ন ও মনকে সন্তর্পিত করে। এ সত্য আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখনি ৺পিতা-মাতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাই, তখনি তাঁহারা ঠিক্ সেই রূপে ও বেশে আমার সম্মুখীন হন। তাঁহারা বিপদে অভয় দান করেন, হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, অমৃতায়মান বাক্যে সান্ত্বনা দান করেন। আমি যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, তাঁহারাও অন্তর্হিত হন। ধ্যাতা ও ধ্যেয় এ উভয়ের এ নিগূঢ় সম্বন্ধের মধ্যে বিশ্বপতির অলক্ষ্য ও অচিন্তনীয় সত্তা নিহিত রহিয়াছে।

সম্প্রতি আমার বাটীতে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোনও দুরাত্মা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের গলায় ছুরি মারিয়াছিল। ঐ আঘাতে তাহার প্রাণরক্ষার আশা কেহই করেন নাই। পুত্রটীকে তৎক্ষণাৎ হাঁস-পাতালে পাঠান হয়। আমি বাটী আসিয়া ঐ ঘটনা শুনিয়াই বজ্রাহতের ন্যায় সংজ্ঞা-শূন্য হই। সংজ্ঞালাভ করিয়াই গলদশ্রু-লোচনে আমার স্বর্গীয় মাতা-পিতাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার ঐ পুত্রটী আমার ৺মাতা-পিতার বুকের হাড় ছিল। আমার সে মর্ম্মভেদী প্রার্থনা তাঁহারা শুনিলেন। উভয়েই আমার সম্মুখে উপস্থিত ! কোনও কথা বলিলেন না, কেবল হাত তুলিয়া অভয় দান করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। আমার পুত্রটী স্বল্প সময়েই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

(১) মূলের মাধুর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হইল না। হিন্দি ও সংস্কৃত পদ্যে যেরূপ স্বল্পাক্ষরে ভাব প্রকাশ করা যায়, বঙ্গভাষায় তাহা সম্ভব নহে।

(২) ভারতবর্ষে পূর্ব্বে নৃপতিগণের নিয়ম ছিল,—তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়াই নিজ অঙ্গের বহুমূল্য বসন, ভূষণ সমস্ত উন্মোচন করিয়া দীনদরিদ্রগণকে দান করিয়া, নব বসন ভূষণ পরিধান করিতেন।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে যাঁহারা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা বলেন—"পরলোকগত আত্মীয়েরা অনেক সময় আমাদের নিকটেই থাকেন, সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, এবং নানা বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। এ কেবল মুখের কথা নহে, ফটোগ্রাফ্ ছায়াচিত্রে এ বিষয় নানা স্থানে নানা ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল, স্কট্লণ্ডের গ্লাস্‌গো নগরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল;—এক ব্যক্তি, কোনও অপরিচিত ফটোগ্রাফ শিল্পীর কার্য্যালয়ে নিজের ছবি তোলাইতে গিয়াছিল। প্রথম বার সেই লোকের প্রতিমূর্ত্তি কাচের উপর যেরূপ প্রতিফলিত হইল, শিল্পী সবিস্ময়ে তাহা দেখিয়া, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার কারণ এই যে,—যে লোকের ছবি গৃহীত হইতেছিল, তাহার মুখছবির পার্শ্বে অন্য এক স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি উঠিয়াছিল। শিল্পী তিন চারি বার তাহার ছবি তুলিল, তিন চারি বারই ঐরূপ হইল। অবশেষে শিল্পী সেই যুগলমূর্ত্তি সম্বলিত কাচখানি সেই লোককে দেখাইল। লোকটী দেখিল যে, তাহার মৃতা পত্নীর ছবি সেই কাচে উঠিয়াছে। অল্প দিন হইল বঙ্গদেশের পাবনা জেলায় ঠিক্ ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

জাপানবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে;—"পরলোকগত আত্মীয়েরা ভৌতিক দেহে সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে থাকেন, এবং আমাদের হিতসাধন করেন।" জাপান-রণতরীর নেতা মহাবীর টোগো বলেন;—"আমি কেবল ৺ পিতৃপুরুষগণের সহায়তায় রুষের বিপুল রণপোতসমূহকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

চেতন, অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্মের অংশ বা শক্তিকলা নিহিত আছে।

"দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে
বিভূতিষু॥"
(কালিদাস)

—হে ব্রহ্ম! তুমি দ্রব ও পরমাণু-সমষ্টির সংশ্লেষে কঠিন; তুমিই স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম; তুমিই লঘু, তুমিই গুরু; তুমিই ব্যক্ত (কার্য্য), তুমিই অব্যক্ত (কারণ); তোমার বিভূতি অনন্ত।

ব্রহ্মের ঐ শক্তিকলা বা অংশ থাকাতেই, সমস্ত পদার্থই একটী সজাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতাসূত্রে আবদ্ধ। ঐ সজাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতা দ্বারাই পদার্থে পদার্থে এবং পদার্থে ও ব্রহ্মে পরস্পর আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। পদার্থমধ্যে যদি ব্রহ্মশক্তি না থাকিত, তবে এক পদার্থ অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারিত না; কেননা, পদার্থের নিজের এমন কোনও শক্তি বা গুণ নাই যে, সে অপরকে আকর্ষণ করিতে পারে। অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মশক্তিকে শিক্ষা-ভ্যাসাদি সাধনা দ্বারা যিনি যত প্রসারিত করিতে পারেন, তাঁহার আকর্ষণশক্তি ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাঁহা দ্বারা অত্যদ্ভুত, অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"

ব্রহ্মই যাঁহার ধ্যান-জ্ঞান, ব্রহ্মই যাঁহার ব্রত-সাধনা, ব্রহ্মই যাঁহার জপ-তপ-আরাধনা; যিনি ব্রহ্মেই সুপ্ত, ব্রহ্মেই জাগরিত, ব্রহ্মেই শয়িত, ব্রহ্মেই উপবিষ্ট, ব্রহ্মেই চলিত, ব্রহ্মেই অবস্থিত; যাঁহার কায়মনোবাক্য, সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত; যাঁহার প্রতি লোমকূপ, প্রতি নিশ্বাস হইতে ব্রহ্মভাব উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তিনি পার্থিব দেহ ধারণ করিয়াও ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তখন তাঁহার শক্তি ও কার্য্যকলাপ সকলি অলৌকিক। এজন্য, সিদ্ধপুরুষগণের কার্য্যকলাপ, লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক বুদ্ধি বা বিচারশক্তি দ্বারা বিচার্য্য নহে। যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের এবং ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষের অসাধ্য নহে।

এই ঐশী শক্তি বা ব্রহ্মভাব লাভের একমাত্র উপায়—সদ্‌গুরু সাধুর সহবাস। মন্বাদি ব্রহ্মদর্শী মহর্ষিরা সদ্‌গুরুকে "ব্রহ্ম-মূর্ত্তি," এবং সদ্‌গুরু-সহবাসে শিষ্যের যে অবস্থান্তর হয়, তাহাকে "ব্রহ্মজন্ম" বলিয়াছেন। তাঁহারা ঐ ব্রহ্মজন্মকেই অজর ও অমর জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মলিন অঙ্গার যেমন অগ্নিসংযোগে অগ্নিময় হয়, জড়বুদ্ধিও তেমনি সদ্‌গুরু-সহবাসে চৈতন্যময় হয়। এ বিষয়ে তুলসীদাসের নিম্নলিখিত গাথাটী অতুলনীয়।

"অঙ্গারঃ শতধৌতোঽপি মলিনত্বং ন
মুঞ্চতি"।

—এই নীতিবাক্যের খণ্ডন করিয়া তুলসী কহিলেন;—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে
জ্ঞান করে উপদেশ্;
তঁও কয়লাকি ময়লা ছোটে
যও আগ করে পরবেশ্।"

অর্থাৎ, সদ্‌গুরুর জ্ঞানোপদেশে শিষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত মলিনতা তিরোহিত হয়, যেমন অঙ্গারমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিলে, অঙ্গারের মলিনতা নষ্ট হয়। তুলসীর আধ্যাত্মিক মহোন্নতির মূল—কাশীধামে সদ্‌গুরু সাধুর সঙ্গলাভ। এজন্য সাধুসঙ্গ-মহিমা তিনি স্বীয় কাব্যে ও গাথায় সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অশোক ও অমর ব্রহ্মভাব লাভ করা মাদৃশ হীনমতি দুর্ব্বল মানবের পক্ষে অসম্ভব, ইহা ভাবিয়া তুলসী একদিন হতাশ ও অবসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে শ্রমণার উপাখ্যান শুনাইলেন। তুলসী সতৃষ্ণহৃদয়ে তাহা শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিষাদ, অবসাদ সকলি দূর হইল, বদনে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দেখা দিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, কপোল বহিয়া দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি নতশীর্ষে সেই শবরকন্যার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিলেন। আশায় ও আশ্বাসে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল। অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রমণার কথা এইরূপ কীর্ত্তিত আছে (১);

(১) শ্রমণার কথা বাল্মীকি রামায়ণে সংক্ষেপে আছে। পদ্মপুরাণোক্ত রামায়ণে ও অধ্যাত্ম-

শ্রমণা শবরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। তিনি শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা, নিরাশ্রয়া। এ সংসারে যাহার কেহই নাই, ভগবান্‌ই তাঁহার আশ্রয়, এ কথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সদ্‌গুরু ও সাধুসঙ্গ বিনা সে নিধি মিলেনা। সদ্‌গুরুলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অস্পৃশ্য জাতি দেখিলে সকলেই দূরে পলায়ন করে। শবরী সাধুসঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্তার ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কৃপা করিল না। যেখানে ইষ্টবস্তুর জন্য হৃদয়ে সান্নিপাতিক তৃষ্ণা, সেখানে তাহার একটা উপায় হইবেই। অবশেষে পরম কারুণিক ভগবান্ মতঙ্গ মুনি কৃপা করিয়া শবরীকে আশ্রয় দিলেন। মহর্ষি শুভক্ষণে শ্রমণাকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার প্রতি অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। শ্রমণা অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে ঋষিগণের সেবা করিতেন এবং হৃদয়ে অনুক্ষণ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। শবরীর সেবা, ভক্তি ও দীনতা দর্শনে আশ্রমবাসী ঋষিমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে সেই আশ্রমের ঋষিরা ধরাধাম পরিহার করিয়া, তপঃপ্রভাবলব্ধ অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। একাকিনী শবরী সেই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র তখন পিতৃসত্যপালনার্থে বনবাসী। দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহার প্রাণাধিকা জানকীকে হরণ করিয়াছে। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। ভীষণমূর্ত্তি কবন্ধ রাক্ষস রামহস্তে নিহত হইয়া শাপমুক্ত হইল এবং পূর্ব্বদেহ গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিল। সে প্রস্থানকালে রামকে বলিয়া গেল,—আপনি মতঙ্গাশ্রমে শীঘ্র গমন করুন, তথায় সিদ্ধশবরী শ্রমণা তন্ময়ভাবে আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে আপনার দর্শনে মুক্তিলাভ করিবে, এবং আপনাকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিবে।

রাম ও লক্ষ্মণ মতঙ্গাশ্রমে গমন করিলেন। চিরারাধিত ইষ্টদেবতাকে আসিতে দেখিয়া শবরীর আনন্দসাগর উচ্ছলিত হইল, তিনি উন্মত্তার ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন। হর্ষাবেগে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; তাঁহার হৃদয় ও কণ্ঠ স্ফীত ও বিকম্পিত করিয়া ঘন ঘন আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। শবরী সংজ্ঞালাভ করিয়া, পুলকিত দেহে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে রাম ও লক্ষ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া, তাঁহাদিগকে আসনে বসাইলেন, এবং তাঁহাদের পাদপূত সেই সলিলে নিজের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বারংবার তাঁহাদের চরণপূজা করিলেন। শবরী সুদীর্ঘকাল উক্ত তপোবনে বাস করত,

রামায়ণে সবিস্তর লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ঐ দুই মূল হইতে গ্রহণ করিয়া তুলসীদাস উহা স্বকৃত রামায়ণে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

(২) শবরজাতি চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতির অন্তর্গত।

নিজে চাখিয়া চাখিয়া, যে ফলটী নিজের মিষ্ট লাগিত, তাহা অতি যত্নে ইষ্টদেবের জন্য রাখিয়া দিতেন। এক্ষণে চিন্তামণি-ধনকে সম্মুখে পাইয়া, চিরসঞ্চিত সেই সমস্ত ফল আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। আমি চণ্ডালকন্যা, আমার উচ্ছিষ্ট ফল ইষ্টদেবতাকে কিরূপে দিব, এ তর্ক তদীয় হৃদয়ে আদৌ উদয় হইল না। রাম ও লক্ষ্মণ পরম আদরে সেই সকল ফল ভোজন করিয়া অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়,—ঐ সকল ফল বহু-কালাবধি সঞ্চিত হইলেও, অণুমাত্র বিকৃত হয় নাই। এ জগতে সর্ব্বোপরি প্রেমরূপ একটী দিব্য উপাদান আছে, যাহার সহিত মিশ্রিত হইলে, কস্মিন্‌কালেও কোনও পদার্থ বিকৃত হয় না।

রাম ও লক্ষ্মণ শবরীর আতিথ্যলাভে পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিলে, শবরী কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে কহিলেন, হে দয়াময়! আমার পরমগুরু, পরম কারু-ণিক মতঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রস্থানকালে আমাকে আদেশ করিয়াছেন,—"সনাতন পরমাত্মা দশরথ-গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুষ্কৃতিগণের সংহার ও সুকৃতি-গণের রক্ষার জন্য, তিনি এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিবেন। তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তদীয় আগ-মন প্রতীক্ষা কর। তিনি এস্থানে যাবৎ না আসেন, তাবৎ নিজ দেহ রক্ষা কর। তুমি তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া নিজ দেহ দগ্ধ করিলেই অক্ষয় অমৃতধামে গমন করিবে।" আমি সেই গুরুগণের আদেশে, আপনার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আজি গুরুবাক্য সফল হইল। হে ভগবন্! আপনার সাক্ষাৎ দর্শন আমার গুরুগণের ভাগ্যেও ঘটে নাই, মাদৃশী অধমার ভাগ্যে কিরূপে ঘটিল? আপনার স্বরূপ অপ্রমেয়, আপনি বাক্যমনের অতীত; আমি অবলা, মূঢ়া, হীনজাতি; আপনার দাস, দাসানু-দাস, তাহার দাস, ইত্যাদিক্রমে নিম্ন নিম্ন শত সহস্র দাসপরম্পরার নিম্নতম দাসেরও দাসীত্বে আমার অধিকার নাই। আপনার সাক্ষাৎকারলাভের সম্ভাবনা কোথায়? হে দেবদেব! আমি স্তব করিতে জানি না, কৃপা করুন, ক্ষমা করুন। হে প্রাণময় প্রাণপুরুষ! হে অন্তঃসাক্ষিন্ অন্তঃপুরুষ! আমি ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, আপনি এ অধমার মনের কথা সকলি জানিতেছেন। এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রমণা বিহ্বলা ও বিচেতনা হইয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন।

কৃপাসাগর ভগবান্ রামচন্দ্র, শবরীকে সস্নেহে তুলিয়া কহিতে লাগিলেন;— "বৎসে! স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব, জাতি-নাম-আশ্রমাদির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, এ সকল আমার নিকট গণনীয় নহে। একমাত্র ভক্তিই আমার প্রীতির কারণ। যাহারা ভক্তিবিমুখ, তাহারা সহস্র যজ্ঞ করুক, দান করুক, তপস্যা করুক, বেদাধ্যয়নাদি করুক; কিছুতেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

অতএব, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে সংক্ষেপে-ভক্তিসাধনের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—"নববিধ ভক্তিসাধনের প্রথম সোপান—সাধুসঙ্গ। দ্বিতীয় সোপান—ভগবৎকথালাপ। তৃতীয় সোপান—ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন। চতুর্থ সোপান—ঈশ্বরজ্ঞানে অকৈতব শ্রদ্ধার সহিত সদ্‌গুরুর উপাসনা। যমনিয়মাদি অবলম্বন পূর্ব্বক সতত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই পঞ্চম সোপান। ঈশ্বরপূজায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই ষষ্ঠ সোপান। শুদ্ধভাবে ভগবানের মন্ত্রোপাসনা সপ্তম সোপান। ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরাধিক ভক্তি ও পূজা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বরবুদ্ধি, শমাদিসহকারে বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য, ইহাই অষ্টম সোপান। নবম সোপান—তত্ত্ববিবেক। এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ শেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যে যোনিতে, যে অবস্থায়, যে মুহূর্ত্তে জীবের এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মিবে, সে সেই মুহূর্ত্তেই মুক্তিলাভ করিবে; সে সর্ব্বদুঃখের অতীত হইয়া, অশোক, অভয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবে। হে বৎসে! তোমার ভক্তিগুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।" অনন্তর শবরী রামচন্দ্রের চরণে বার'বার বিলুণ্ঠিত হইয়া, রামমূর্ত্তি হেরিতে হেরিতে অগ্নিকুণ্ডে দেহ দগ্ধ করিয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন। রামকে বলিয়া গেলেন,—"হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অগোচর কিছুই নাই। তথাপি মা জানকীর সন্ধান বলিতেছি;—তিনি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় অবরুদ্ধা আছেন। আপনি ঋষ্যমূকে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

ভগবান্ রাম, শ্রমণাকে যে নয়টী সাধনের কথা বলিলেন, মোক্ষমার্গের এ নয়টী সাধন বা সোপান পরস্পর এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে, প্রথম সোপানে উঠিলেই দ্বিতীয়টীতে উঠা সহজ হয়। সাধক ক্রমশঃ যতই উর্দ্ধগামী হইবে, ততই তাহার উত্থানের শক্তি ও বেগ বাড়িতে থাকিবে। পঞ্চম সাধনে যম-নিয়মাদির কথা আছে। যম-নিয়মাদি রাজযোগের আটটী অঙ্গ। যথা;—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি। ইন্দ্রিয় সকলের বহির্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া, অহিংসা, সত্যবাক্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রকৃতিস্থ করাকে 'যম' বলে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক, শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, আস্তিক্য, গুরুভক্তি, গুরূপদেশ-শুশ্রূষা, শ্রবণ, মনন, মীমাংসা, দান, হোম, পূজা প্রভৃতির অনুশীলনকে 'নিয়ম' বলে। 'আসন' পঞ্চবিধ, যথা;—(১) পদ্মাসন, (২) স্বস্তিকাসন, (৩) ভদ্রাসন; (৪) বজ্রাসন, (৫) বীরাসন। প্রত্যেক আসনের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে। অধিকারীর ভেদে আসন পৃথক্ পৃথক্। আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসপ্রণালী

নিয়ন্ত্রিত এবং শ্বাসরোধশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং দূষিত বায়ু প্রভৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দেহ রোগশূন্য হয়। ধ্যেয় বিষয়ে মনোনিবেশশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা, যোগীরা পান-ভোজন না করিয়াও বহুকাল জীবিত থাকেন। পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর কথা অনেকে শুনিয়াছেন। পঞ্জাবকেশরী রণ-জিৎ সিংহের আদেশে হরিদাসকে ৪১ দিন ভূগর্ভে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। পশ্চাৎ তাঁহাকে তুলিয়া দেখা গেল, তিনি নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার দেহের বা জীবনের কোনও হানি হয় নাই।

প্রাণায়ামের তিনটী প্রক্রিয়া যথা ;—পূরণ, কুম্ভক ও রেচন। নাসারন্ধ্র দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহ পূর্ণ করাকে 'পূরণ' বলে। সেই বায়ুকে দেহমধ্যে রোধ করিয়া রাখাকে 'কুম্ভক' বলে। অল্পে অল্পে সেই বায়ুকে নিঃসারণ করাকে 'রেচন' বলে। প্রাণা-য়ামে বহু অসাধ্য রোগের শান্তি হয়। অগ্নিসংযোগে যেমন স্বর্ণাদি ধাতু মল-নির্ম্মুক্ত হয়, প্রাণায়াম দ্বারা তেমনি সমস্ত দেহধাতু মলনির্ম্মুক্ত হয়। শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করিয়া ধ্যেয় বস্তুতে মনকে সংলগ্ন করাকে 'প্রত্যাহার' বলে। অদ্বিতীয় বস্তু পর-ব্রহ্মে মনকে ধারণ (দৃঢ় নিবদ্ধ) করিয়া রাখাকে 'ধারণা' বলে। সমস্ত চিন্তা-প্রবাহকে একীভূত করিয়া সেই অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থে নিবেশিত করাকে 'ধ্যান' বলে। আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত করিয়া, 'সোঽহং' ভাবে অবস্থানকে 'সমাধি' বলে।

"ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসো-ধৃতিঃ।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণি স্থিতিঃ॥"

ভাবনা বা ভাবশুদ্ধিই সর্ব্বসিদ্ধির মূল। সদ্‌গুরু সাধু মহাত্মার সঙ্গে ও উপদেশে, মানবের চিন্তাপ্রবাহ আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার মানসিক বৃত্তিগুলি উর্দ্ধমুখী হইতে থাকে। যেমন স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা নাই, তেমনি চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন কাহারও স্বরূপতত্ত্ব গ্রহণে ক্ষমতা নাই। সকলি সাধকের নিজের অনুশীলনসাপেক্ষ। সদ্‌গুরু বা সাধুসঙ্গ প্রথম উদ্দীপক ও পথপ্রদর্শক। চিত্তপ্রসাদ লাভের জন্য যোগশাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ;—

(১) মৈত্রী, (২) করুণা, (৩) মুদিতা, (৪) উপেক্ষা। (১) মৈত্রী,—সর্ব্বভূতে মিত্রতা, অর্থাৎ শত্রু, মিত্র সমভাবে সকলেরি হিতকামনা। সর্ব্বভূতে এই মৈত্রীর পূর্ণ-বিকাসের নাম সমতা। সমতাই ভগবানের প্রকৃত আরাধনা; "সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"। মহাভারত মোক্ষধর্ম্মে সমতার এইরূপ লক্ষণ আছে ;—

"যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাস্যাপি যস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম॥"

এক ব্যক্তি আমার দক্ষিণ বাহুতে স্নিগ্ধ

সুরভি চন্দন লেপন করিতেছে, অপর ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বাম বাহু ছেদন করিতেছে, ঐ উভয়েই আমার সমান প্রীতিপাত্র। (২) করুণা,—দুঃখিত প্রাণিমাত্রেরই দুঃখমোচনের জন্য হৃদয়ের ঐকান্তিক যত্ন। (৩) মুদিতা,—সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন। (৪) উপেক্ষা—পাপকার্য্যে অনুমোদন না করা এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা না করা। এই চারিটী ভাবনা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ জন্মে। চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে, দুঃস্বপ্ন, আবেগ, মলিনতা সকলি দূরীভূত হয়; চিত্ত নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় ধ্যেয় পদার্থে প্রদীপ্ত ভাবে জাগ্রত হইয়া থাকে।

"লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা স্বপ্নে সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যমানো ন
কম্পতে॥"

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম)

একান্তভাবে এই চারিটী ভাবনার অভ্যাস দ্বারা অন্তরাত্মা নির্ম্মল হইয়া এক শান্তিময়ী আনন্দময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সাধক সেই অবস্থায় উপনীত হইলে, সমস্ত রাজসিক ও তামসিক বিকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, বিশোকা জ্যোতিষ্মতী অবস্থাকে ধারণ করে, এই অবস্থাকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাব বলে।

কৃপাসাগর হরি, আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-যাতনায় প্রপীড়িত মানবগণের সম্মুখেই অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। মোহতিমিরে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া, আমরা সে অমূল্য পদার্থ দেখিতে পাইনা। তামসাচ্ছন্ন গৃহে দীপালোক প্রবেশ মাত্র যেমন সমস্ত অন্ধকার হরণ করে, সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করিয়া দেয়, সাধুসঙ্গ বা গুরূপদেশ তেমনি মোহাবরণ হরণ পূর্ব্বক সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিয়া তত্ত্বদর্শনের সহায় হয়। তুলসী বলিতেছেন;—

"বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ।
রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥
সতসংগতি মুদ-মঙ্গল-মূলা।
সোঈ ফলসিধি সব-সাধন-ফুলা॥"

—সৎসঙ্গ বিনা মানবের বিবেকদৃষ্টি খোলে না, ভগবৎকৃপাও সৎসঙ্গ বিনা লাভ করা যায় না। আনন্দ-মঙ্গলরূপ বৃক্ষের মূল—সৎসঙ্গ; জপ-তপ-দান-যজ্ঞ প্রভৃতি সাধন সকল এই বৃক্ষের পুষ্প, এবং মোক্ষ ইহার ফল।

সেশ্বর-সাংখ্য-প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণের মতানুবর্ত্তীরা বলিয়া থাকেন;—

"পরমেশ্বরঃ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈ—রপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়—মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ সংসারাঙ্গারে তপ্যমানানাং প্রাণভৃতামনুগ্রাহকশ্চ।"

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

—ঈশ্বর, ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-বাসনাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়াও, স্বেচ্ছাক্রমে নির্ম্মাণ-শরীর (রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্টাদির রূপ) ধারণ করিয়া, লোকসমাজে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সংসাররূপ অঙ্গারে দহ্যমান জীবগণের প্রতি কৃপা-

প্রদর্শনই ঈশ্বরের ঐরূপ মূর্ত্তিপরিগ্রহের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আমরা করুণাময়ের কৃপাসাগরেই ডুবিয়া আছি, ঘোর বিষয়-বিকারে আচ্ছন্ন হইয়াই সে অমৃতের আস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছি। তুচ্ছ রাজ্য-লোভাদি ভোগতৃষ্ণায় উন্মত্ত হইয়া, ঈশ্বরের এ সুন্দর পবিত্র বিশ্ব-রাজ্যকে পাপময় শোণিতপঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছি। ভ্রাতা হইয়া ভ্রাতৃশোণিত পান করিতেছি। কত অল্প সময়ে কত অধিক প্রাণীর প্রাণসংহার করা যায়, ইহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া নিজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-গরিমার চূড়ান্ত উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছি। অহো! ইহাই মানব-দানবের পূর্ণ সভ্যতা!!!

যে জীবন বিশ্বপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রলয়েও তাহার বিলয় নাই। বিশ্বপ্রেমিকের জীবন, নিত্য সত্য মঙ্গলময়ের অঙ্গীভূত, এজন্য তাহা নিত্য সত্য ও মঙ্গলময়। বিশুদ্ধ হৃদয়ই প্রেমরাজ্যের পবিত্র সিংহাসন। বিশুদ্ধ হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন ;-

"তীর্থানাং গুরুবস্তীর্থং চোক্ষাণাং হৃদয়ং শুচি।
দৃশ্যানাং পরমং জ্ঞানং সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥"

—সদ্‌গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ, এবং সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর নাই।

তুলসীদাসের জীবনে দেখ! প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত কামনা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, লাভালাভ প্রভৃতি সকলি একটী অসার অনিত্য ক্ষুদ্র পদার্থ ভার্য্যারূপ আধারে সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নগামিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহার চিন্তাপ্রবাহ ঐ ভার্য্যার দিকেই বহিতেছিল; আর কোনও জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। সে সময় তিনি কামানলের জ্বলন্ত চুল্লী-স্বরূপ। পদে পদে তাঁহার বিরহসন্তাপ, আবেগ, উৎকণ্ঠা; পদে পদে ঈর্ষ্যা, উন্মাদ, প্রমাদ, বিষাদ, অবসাদ প্রভৃতির ভীষণ আবর্ত্তে তিনি বিক্ষোভিত ও বিঘূর্ণিত। সে অবস্থায় মানবের শান্তি কোথায়? সেই পরিচ্ছন্ন মোহময় আধার ছাড়িয়া, তুলসীর হৃদয় যখন প্রেমময়ের সম্মিলনে দ্রবীভূত হইয়া, অনন্ত বিশ্বে সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি এক অপূর্ব্ব শান্তিরাজ্যে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার জীবন, অক্ষয় অমৃতময় অবিকারী ভূমানন্দে পরিণত হইল।

তুলসীর জীবনে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যে, সে সকল ঘটনা মানবীয় শক্তির সম্পূর্ণ অতীত। অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। অসাধ্যসাধন মানব-শক্তির বহির্ভূত এ কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু যে মানবশক্তি ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, সে মানবশক্তি দ্বারা সকলি সম্ভব। বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে,—মন্বাদি প্রজাপতিগণ এক একটী বিশ্বকাণ্ডের

প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এ কথায় অবিশ্বাস করি কেন? তাঁহারা যদি ঈশ্বরের ভূতসর্জ্জনী শক্তি দ্বারা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা ভূতসর্জ্জনে অশক্ত হইবেন কেন? দেখিতেছি, একখানি মলিন অঙ্গারের (কয়লার) দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু সেই অঙ্গার যখন অগ্নিসংযোগে অগ্নিময় হয়, তখন কি তাহার দাহিকা শক্তি হয় না? তখন অগ্নিতে ও সেই অগ্নিময় অঙ্গারে ভেদ কি? "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (ক্রমশঃ)

প্রণয়ে প্রমাদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষ স্বার্থের দাস। নরঘাতী দস্যু হইতে গৃহবিরাগী সন্ন্যাসী হইতে এ মর্ত্ত্য জগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্বার্থের পূজা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কেহ অধিক, কেহ অল্প। মানুষের এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে স্বার্থই প্রধান পরিচালক। আশা তাহার সহচরী। স্বার্থ তমোগুণান্বিত; স্বার্থের কুহকে যে একবার মুগ্ধ হয় তাহার হিতাহিত পরাপর জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়, সে সেই প্রিয় বস্তুর পরিতুষ্টি সাধনার্থ নিজ হস্তে নিজ পদে কুঠারাঘাত করিতেও দ্বিধা জ্ঞান করে না। শাবন্ত বাবুও স্বার্থের সেই তামসী মায়ায় অন্ধ হইয়া প্রসন্ন বদনে নিজ দেশ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক দূর দেশে এক পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক একজন অপরিচিতের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, আমাদের ঘরে বিবাহযোগ্য একটী সুন্দরী কন্যা আছে বটে কিন্তু, আপনি বলিতেছেন যে, আপনার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, হঠাৎ আমি সে কথায় বিশ্বাস স্থাপনা করিতে পারিতেছিনা, এই একটী প্রতিবন্ধক।

শাবন্ত—আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। বাতজ্বরে ছয় মাস ভুগিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি ইঞ্জিনীয়ারী চাকুরি করি। আমার হাতে কিছু টাকাও জমিয়াছে। আমি একজন বিশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সন্তান।

এইরূপ নানা কথা বার্ত্তার পর অপরিচিত ব্যক্তিটীর আত্মীয় কন্যার সঙ্গে শাবন্ত বাবুর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

শাবন্ত বাবুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া পরম সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে বছর চারি অতীত হইল। একদিন শুক্লা পূর্ণিমার প্রদোষকালে মুক্ত চুলে স্বামীর কাছে উপবেশন করিয়া হাসিতে হাসিতে স্ত্রী কহিলেন, দেখ, তুমি সর্ব্বদা আমাকে এত ব্যস্ত রাখ যে, আমি চুলটা বাঁধিতেও অবসর পাই না।

স্বামী—কেন চুল বেঁধে দরকার কি? কামিনীকেশ গুচ্ছকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া অযথা বিকৃত করিয়া ফল কি?

স্ত্রী—তোমার চোখে আমি এতই সুন্দর?

স্বামী—শুধু আমার চোখে কেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোকেও ত তোমাকে সুন্দরী বলিয়া থাকে। বাস্তবিকই তুমি বড় সুন্দর ডুবুটি!

একটী বেলফুলের মালা সাম্‌নে পড়িয়াছিল, ডুবুটী সেই মালাটী দেখিতে দেখিতে কহিলেন, দেখ, তোমার প্রথমা স্ত্রীও দেখিতে খুব সুন্দরী ছিলেন, না?

স্বামী—ওঃ কিছু না।

স্ত্রী—তবুত।

স্বামী—সে আকৃতি, প্রকৃতিতে ঠিক পেত্নির মত ছিল।

স্ত্রী—তাকে নিয়ে তুমি কতদিন সংসার করেছিলে?

স্বামী—ওঃ খুব অল্প দিন।

স্ত্রী—তার জন্য তোমার এখন কষ্ট হয় না?

স্বামী—না, না, কিছু না। তাকে আমি ভালও বাসি নাই, তার জন্য আমার কষ্টও হয় না।

স্ত্রী—আচ্ছা আমি মর্‌লে তুমি আবার বিয়ে কর্‌বে?

স্বামী—না না কখ্যনো না, তুমি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না যে, আমি কি? আমার প্রেম সাগরের মত গভীর, আকাশের মত উচ্চ, পর্ব্বতের মত অচল। তুমি যে মুহূর্ত্তে মর্‌বে, আমার প্রাণও সেই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাবে।

স্ত্রী—সত্যি?

স্বামী—সত্যি ডুবুটী! সত্যি। আমার প্রাণ তোমার নিকট বিক্রয় করেছি, তোমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তোমার তাই,—বলিয়া স্ত্রী স্বামীর বক্ষে হেলিয়া পড়িলেন।

স্বামী—এখন একটী সন্তানের মুখ দেখিলেই আমি বাঁচিতাম।

স্ত্রী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া লজ্জায় ও আনন্দে ভ্রমরভরস্পন্দিতা মাধবী লতাটীর ন্যায় মৃদু মন্দ কম্পিত হইতে লাগিলেন।

স্বামী—তোমাকে আমি অনেক রকম গহনা দিয়েছি, কিন্তু তুমি নিরলঙ্কারেই সুন্দর।

স্ত্রী স্বামীর বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন, সেই জন্যইত আমি গহনা পরিনা।

স্বামী—পর বা না পর গহনাগুলি তোমার একটা সম্পত্তি।

স্ত্রী—ওঃ দুর্গা! গহনা সম্পত্তির আবার কে আশা করে। স্ত্রীলোকের স্বামীই প্রধান সহায় ও সম্পত্তি।

স্বামী—সে কথা যাক্, এখন একটা পান দাও।

স্ত্রী এক রেকাব সন্দেশ আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, তারপর এক ডিবা পান দিলেন।

স্বামী কিছু খাইয়া কিছু স্ত্রীর জন্য

রাখিয়া দিলেন; স্ত্রী লজ্জানম্র বদনে কহিলেন, ও কি? রোজ রোজ তোমার ঐ এক ঢঙ্।

স্বামী—প্রসাদ খাও।

স্ত্রী—ভাত, তরকারীতেই রোজ প্রসাদ খাই, আবার এ সন্দেশগুলি কেন; খাও তুমিই ও গুলি খাও। তখন স্বামী আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া স্ত্রীকে সন্দেশগুলি খাওয়াইলেন, স্ত্রী অনিচ্ছা, ইচ্ছা, সুখ, ও অভিমান মিশ্রিত মনে সন্দেশগুলি খাইলেন।

এই ভাবে দিন চলিল, স্ত্রী ভাবিলেন, আমার স্বামী আমাকে যেমন ভাল বাসেন এমন কোন স্বামীই বাসিতে জানেন না। স্বামী ভাবিলেন, আমার প্রাণে যেমন ভালবাসা এমন ভালবাসা অন্য কাহারো প্রাণে নাই।

শাবন্ত বাবু বদ্‌লি হইয়া বহু দেশ দেশান্তর বেড়াইলেন, বহু টাকা উপার্জ্জন করিলেন। সহধর্ম্মিণী স্ত্রীলোকের কণ্ঠ-মালার ন্যায় অনুদিন অনুক্ষণ কণ্ঠে দুলিতে লাগিলেন, এই ভাবে দুবুটী কুড়ি পঁচিশ বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সন্তানবতী করিলেন না।

আজ বৈশাখ মাসের শুক্লা পূর্ণিমার সায়ং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। চারিদিকে ফুলের বাগান। সাম্‌নে নিম্ব বৃক্ষ, পশ্চাতে অশ্বত্থ গাছ। এদিক্ সেদিকে রসাল তরু-নিচয় ফুল, ফলে শোভমান। পরিষ্কার জোছনা। সুবাসিত বায়ু। পিক-ঝঙ্কার-মুখরিত নৈশ. প্রকৃতি। শাবন্ত বাবু মাঝখানে একটী মাদুরে শয়ন করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার স্ত্রী মলিন বদনে, মলিন বসনে, স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী সন্দিগ্ধমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমার এ বেশ কেন দুবুটী!

স্ত্রী—একটী কথা শুনিতেছি।

ভয়ে স্বামীর মুখ শুখাইল তিনি ভীত হইয়া কহিলেন, কি?

স্ত্রী—আমার অগোচরে তুমি নাকি আবার বিবাহ করিয়াছ? এই বুড়া বয়সে।

স্বামী—কোথায় শুনিলে?

স্ত্রী—এই দশ জনের মুখে। কুকথা বাতাসের আগে ধায়।

স্বামী—না, ও সব মিথ্যা কথা।

স্ত্রীও তাহাই বুঝিলেন। তিনি জানি-তেন স্বামীর উপর সন্দেহ করিলে ধর্ম্মের হানি আছে।

শাবন্ত এখন প্রাচীন হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীরও বয়স হইয়াছে। অতএব তাঁহারা এখন বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া, কখনো ধর্ম্ম চর্চ্চা, কখনো ধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখনও আহারাদির পর অল্প বিশ্রাম করিয়া দুই-জনে গীতা পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

এখনো রাত্রি দুপ্রহর অতীত হয় নাই, ফুলের উপরে, ফলের উপরে, পাতার উপরে, গাছের উপরে, ভূমির উপরে, নদী-তটে, ও লহরীতে পূর্ণিমার জোছনা মধুরিমা বিকীর্ণ করিতেছিল। অদূরে আম্র-

বনে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া কোকিল-কাকলী উত্থিত হইতেছিল। সুরভি বায়ু মৃদু নিনাদ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল। শাবন্ত ও তাঁহার স্ত্রী পরিষ্কার একটী মাদুরে উপবিষ্ট। বিশদ জোছনালোকেও তাঁহারা দীপ জ্বালিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। সহসা একটী মানুষের ছায়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পতিত হইল। তাঁহারা দুইজন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে অবগুণ্ঠন ছিল, তিনি তাহা মুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

শাবন্ত একবারমাত্র স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া রহিলেন। আর একটীবার মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী আগন্তকা স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, মা! তুমি কে?

স্ত্রীলোকটী হাত নাড়িয়া কহিলেন, তুমি আমাকে মা বলিও না, তোমার আমি সতীন, আমি তোমার স্বামীর প্রথমা স্ত্রী। আমার নাম জবা কুমারী। তুমি যাহা যাহা শুনিয়াছ সে সমুদয়ই মিথ্যা ও প্রতারণা, আমি আকৃতিতেও পেত্নী না, প্রকৃতিতেও পেত্নী না। স্বামী আমাকে লইয়া খুব অল্প দিনও সংসার করেন নাই, খুব বেশী দিনই সংসার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি আমাকে খুবই ভাল বাসিতেন। আমি মরি নাই, এই দেখ এখনও বাঁচিয়া আছি। অর্থাভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছি। স্বামীকে বড়ই ভাল-বাসিতাম। স্বামীর মনে কষ্ট হইবে ও তাঁহার সুখের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এত-দিন তোমাদের কাছে আসি নাই। আজ আসিলাম স্বামীর পদধূলি লইতে ও তোমাকে সাবধান করিতে, কারণ এ মন্দভাগিনীর দুঃখময় জীবনের শীঘ্রই অবসান হইবে।

ইদানীং আমার কোন জিনিসেরই অভাব ছিল না। কেবল প্রথম যৌবন ও সন্তানের অভাব হইয়াছিল। এই দুই য়ের অভাব তোমাতেও অনুভব করিতেছি। সাবধান ভগ্নি! সাবধান, দেখিও আমার মত দুর্দ্দশায় পড়িতে না হয়। একদিন এ ভালবাসায় আমিও ভুলিয়াছিলাম। আজ আমার দুর্দ্দশা অবলোকন কর। জবা বিদ্যুতের মত স্বামীর পদতলে পতিত হইলেন ও স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

দুবুটী অল্পক্ষণ হতভম্বের মত রহি-লেন। পরে স্বামীর অধোবদনের দিকে চাহিলেন। তাঁহার তখনকার মনোভাব বর্ণনা করা সুকঠিন। তখন তিনি স্বামীকে সত্যবাদী দেবতা ভাবিতেছিলেন, অথবা মিথ্যাবাদী পিশাচ ভাবিতেছিলেন, জবাকে সত্যবাদিনী দেবী অথবা মিথ্যা-বাদিনী পিশাচী ভাবিতেছিলেন, তাহা আমি নির্ণয় করিবনা, বিশুদ্ধচরিত্রা পাঠিকাগণ ইহা নির্ণয় করিয়া লইবেন।

স্বামী অধোবদনেই রহিলেন, তাঁহার আর মুখ তুলিবার সাহস হইল না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া স্ত্রী কহিলেন, দেখ, আমার যখন বিবাহ হয় তখন তোমার প্রথমা স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে এইরূপ বলিয়াছিলে।

স্বামী—এরূপ না বলিলে তোমার আত্মীয়েরা আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন কি ?

স্ত্রী—আমার নিকটেও এইরূপ বলেছিলে।

স্বামী—নইলে নিরুদ্বেগে সংসার করিতে পারিতাম কি ?

স্ত্রী—তুমি যে বলেছিলে রূপে গুণে পেত্নীর মত। কিন্তু তাঁহাকেত রূপে গুণে দেবীর মত দেখিলাম।

স্বামী—তোমার চিত্তরঞ্জনের জন্য ও সব বলেছিলেম।

স্ত্রী—কেন তুমি এরূপ করিয়াছিলে ?

স্বামী—তাহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায়।

স্বামীর কথাগুলি স্ত্রীর বুকে আসিয়া শেলের মত বিদ্ধ হইল। স্ত্রী বিমর্ষ হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

স্বামী তখন স্ত্রীর নিকটে বসিয়া বাতাস দিয়া মধুর কথা কহিয়া স্ত্রীকে শান্ত করিলেন। স্ত্রীও পতিভক্তি বশতঃ পূর্ব্ববৎ সরল মনে গৃহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। এবং এই বলিয়া মনকে বুঝাইলেন—

"পতি করে নানা দোষ, পতি করে নানা দোষ;
তা বলে কি পতিপ্রতি সতী করে রোষ"।

ক্রমশঃ।

গীতার ব্যাখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কর্ম্মযোগ।

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি প্রকৃত যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্মই তাহার অবলম্বন। আত্মার প্রসাদ, প্রগাঢ় ও অটল শান্তিলাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। যে ব্যক্তির এই যোগসিদ্ধি লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সে মানব ধন্য। ইহাই কর্ম্মযোগের পরিসমাপ্তির অবস্থা—যোগসিদ্ধ সেই মানবের আত্মার ভাব এই—

নিষ্কম্প নিবাত স্থলে—দেউটীর মত,
আত্মায় বিশ্বাসদীপ জ্বলে অবিরত।
জ্ঞান কি বিজ্ঞানে তৃপ্ত নহে সেই মন।
ধূলি ও কাঞ্চন করে সমান গণন॥

কবিও এই ভাবেই তন্ময় হইয়া গাহিয়াছেন—

"আছে কি সুখ জীবনে প্রাণ সখা বিনে॥
কর ধন মান সমর্পণ দীননাথের শ্রীচরণে॥"

এইরূপ শান্ত সমাহিত কর্ম্মযোগীর অবস্থাই মানবের আরাধ্য—এই ভাবে বিশ্ব সেবাব্রতে অনুক্ষণ সমস্ত শক্তি নিয়োগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা ও ভগবানের

প্রিয় কার্য্য কি হইতে পারে? পার্থ কর-পুটে বলিলেন,—ভগবন্! মানবচিত্ত দুঃখ-বিপদাঘাতে পবনতাড়িত সাগরের ন্যায় সততই যে উদ্বেলিত ও চঞ্চলভাব ধারণ করে, তাহা প্রশমনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া এ অভাজনকে কৃতার্থ করুন। এই প্রকার উদ্বেলিত আত্মা কি সত্যই বায়ুতাড়িত জলদখণ্ডের ন্যায় উভয় লোক ভ্রষ্ট হইবে? ভগবান্ বলিলেন—

ইহপর লোকে আত্মা নহে বিনাশিত।
আমার কৃপায় আত্মা সদা সুরক্ষিত॥

পাপী তাপীর বন্ধু ভগবান্ কি আশাবাণী শুনাইয়া অভাজন সন্তানকে অকূলে রক্ষা করেন। তমসাচ্ছন্ন জগতে আশালোক দেখাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে বলীয়ান্ করেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ!

ওই মোক্ষ পথ জেনো বিধাতা-প্রসাদ।
কেন শোক মোহে ম্লান কেন অবসাদ!
ও আনন্দ লোকে সেই নিত্য লভে স্থান।
কিবা জ্ঞানী আর কিবা দুষ্টমতি জন॥

—শুধু এই দুইটী পংক্তি দ্বারা পাপী-তাপীর একমাত্র পরিত্রাতা, মহান্ ও পরিপূর্ণ কৃপাসিন্ধু যে অভয়বাণী পাপীর কর্ণে শুনাইতেছেন, কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ আশার কথা শুনাইতে সমর্থ তাহা জানিনা।

সকল ভূতেতে আমি—আমা মাঝে ভূত।
সর্ব্বত্র আমার সত্তা জীবে অনুভূত॥
সুখে দুঃখে স্থির যেই শ্রেষ্ঠ যোগী হন্,
ধরার পরীক্ষা গণে ধূলার সমান॥

পার্থ করপুটে বলিলেন,—"ভগবন্! সকল যোগের লক্ষ্য সেই পরমগতি পরব্রহ্ম ভুবনেশ্বরের প্রকৃতি কিরূপ?" ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ভূমি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি ও মন আমার প্রকৃতি। ইহারা "অপরা প্রকৃতি" নামে অভিহিত, জীবভূত অন্য যে পরা প্রকৃতি আছে, তাহা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে—

সকলের শ্রেষ্ঠ আমি জানিও ভারত!
আমাসূত্রে বিশ্ব গাঁথা মণিহার মত॥

অর্থাৎ নানা বর্ণবিশিষ্ট মণি যেমন সূত্রে গ্রথিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করে, হে কৌন্তেয়! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমা সূত্রে গ্রথিত হইয়া মণিহারতুল্য শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশপূর্ব্বক ভাবুকের নয়ন মন বিমোহিত করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

আমরা কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪) আমাদের কৃষির খুব দুরবস্থা, কিন্তু শিল্পের] অবস্থা বোধ হয় তাহা হইতেও মন্দ। বিদেশী প্রতিযোগিতায় কৃষির আজও বিলয় হয় নাই, কিন্তু শিল্প একরূপ বিলুপ্ত বলিলে চলে। প্রাত্যহিক ব্যবহারের অধিকাংশ জিনিষ এখন বিদেশ

হইতে আমদানি হয়। আজ পল্লিগ্রামে খুব দরিদ্র চাষার ঘরেও বিদেশী দেশালাই, বিদেশী বস্ত্র, এবং বিদেশী এনামেলের দুই চারিটা তৈজস পাত্র দেখিতে পাইবে। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কৃষি শিল্পাদির উন্নতির জন্য এবং নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া আনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবল বিদ্যা শিখাইয়া আনিলে কি হইবে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট দেশের কতকগুলি কৃতবিদ্য লোককে বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিখাইয়া আনেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের কয়জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া চোর ডাকাতের বিচারে ব্যাপৃত হইলেন। ইঁহাদের দুই একজন কৃষিবিভাগে কাজ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শুনিতে পাই তাঁহারা আর ঐ বিভাগে থাকিবেন না। আর এক কথা। গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ দেশের কি কাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সেই জন্য বলি, লোক শিখাইয়া আনিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত কাজ দেওয়া চাই। তাহা করিতে হইলে যৌথ কারবার ও কল কারখানা স্থাপন দরকার।

যৌথ কারবার করিতে আমরা আজও শিখি নাই, এবং যতদিন না শিখিব তত দিন আমাদের অবস্থোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বিশ্বাস চাই এবং পাওাদের মধ্যে বিশেষ সাধুতা চাই। আমরা স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ। আমাদের বিশ্বাস অকর্ষণ করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। পাওারা বিশেষ সতর্কতার সহিত না চলিলে বিষম বিভ্রাট ঘটিবে। সকলেই জানেন ব্যবসা করিতে গেলে টাকার আবশ্যক। অনেক ব্যবসায়ে এত টাকার আবশ্যক যে দুই এক জন তাহা যোগাইতে পারেন না বা ভরসা করেন না। অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। কাজেই যৌথ কারবারের কতকগুলি দোষসত্বেও ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রধান দেশে উহা খুব প্রচলিত। যাঁহারা যৌথ কারবারে টাকা খাটাইবেন তাঁহাদের এক কথা মনে রাখা চাই। বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত কাজ করিলেও ব্যবসায়ে কখনও কখনও, বিশেষতঃ নূতন নূতন, অকৃতকার্য্য হইতে হয়। সেই জন্য তাঁহাদের কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য এটুকু যাঁরা করিতে চান না, তাঁহাদের কোন যৌথ কারবারে হাত না দেওয়াই ভাল। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" ইহা কোন কালে সম্ভবপর হয় নাই এবং হইবে না।

আজ কাল কলকারখানার প্রাদুর্ভাব সভ্য জগতে বড় বেশী। মানুষের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষ এখন কলে প্রস্তুত হয়। কলে জিনিষ প্রস্তুত হইলে বড় কম খরচে হয়, এবং সেই জন্য উহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যায়। কাজেই আমা-

দের মধ্যে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে পাটের কল আজ কাল অনেক হইয়াছে ; কিন্তু ইহার কয়টী দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত ? কলিকাতা অঞ্চলে অনেকগুলি তেলের কল দেখিতে পাওয়া যায় যাহা আমাদের নিজেদের। দেশে আর যে সব কল কারখানা আছে তাহাদের অধিকাংশের সত্ত্বাধিকারী সাহেব। সম্প্রতি বঙ্গলক্ষ্মী মিল আমরা কিনিয়াছি, দুই একটী সাবান প্রভৃতির কারখানা খুলিয়াছি, এবং দুই চারিটা জিনিষ তৈয়ারির জন্য কল কারখানা খুলিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু দেশে যখন ৫।৭ কোটী লোকের বাস, তখন কতগুলি বঙ্গলক্ষ্মী মিল খুলিলে তবে আমরা দেশের লোকের লজ্জা নিবারণ করিতে সক্ষম হইব ? কাপড়ের কল ছাড়া আরও কত কল আবশ্যক। অন্য দেশে যে সব জিনিষ কলে হয়, আমাদের দেশে তাহা তৈয়ারি করিতে হইলে বোধ হয় কল ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দেশালাই প্রস্তুত করিতে হইলে কল চাই ; লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে কল চাই ; আরও অনেক বিষয়ে কলের আবশ্যকতা আছে। পুথি বাড়িয়া যায় বেশী বলিবার দরকার নাই।

অর্থাগমের ও উন্নতির অনেক পথ বিদেশীয়েরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বাঙ্গালার কোন কোন অংশে পাথুরিয়া কয়লা প্রচুর। অধিকাংশ খনি কিন্তু সাহেবদের হাতে। বাঙ্গালীর চা বাগান কয়টা আছে ? এই সব ব্যবসায়ে দেশের মুটে মজুর ও অন্য শ্রমজীবী অনেক খাটে বটে, কিন্তু ইহাদের পরিচালন বিদেশীয়েরা করেন এবং লাভ সব বিদেশে চলিয়া যায়। আর এক কথা। দেশের বহির্বাণিজ্যও একরূপ বিদেশীয়দের একচেটিয়া। বাঙ্গালী সওদাগর কয় জন আছেন ? কয়খান জাহাজের অধিকারী বাঙ্গালী ? যাহা হউক, এ সব লইয়া বেশী বাক্যব্যয় নিরর্থক। এখন আমাদের দরকার চেষ্টা করা। চেষ্টার পথে যে নানা বাধা বিঘ্ন আছে তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার কেহ নাই। একরূপ আমরা অকূল পাথারে। খুব দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত কাজ না করিলে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারিব না। অবস্থা বড় সঙ্গিন্। কিন্তু হাল ছাড়িলে চলে কৈ ? তাহা হইলে রসাতল ছাড়া আমাদের আর গম্য স্থান নাই।

কলকারখানার একটা প্রধান দোষ এখানে উল্লেখ যোগ্য। যেখানে কল সেইখানে উহাতে কাজ করিবার জন্য অনেক নর নারীর একত্র সমবায় ঘটিয়া থাকে। ইহার এক অবশ্যম্ভাবী ফল মানব চরিত্রের অবনতি। পাটের কলে যে সব লোক কাজ করে তাহাদের নৈতিক অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে হইবে না। তাহাদের দৈহিক অবস্থাও সাধারণতঃ

ভাল নয়। কলকারখানার এই মহা-দোষ উপলব্ধি করিয়া অনেক মনীষী ব্যক্তি ইহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, যে সব জিনিষ লোকে আপন আপন গ্রামে বসিয়া পরিজনবর্গের সাহায্যে তৈয়ারি করিয়া লাভবান্ হইতে পারে, সমাজের মঙ্গলার্থে সেই সব জিনিষ প্রস্তুত করণের জন্য কলের প্রচলন যত কম হয় ভাল। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব প্রমুখ কতকগুলি চিন্তাশীল লোক বলেন যে, উৎকর্ষিত তাঁতের ব্যবহার প্রচলিত হইলে দেশের তাঁতী প্রভৃতিরা এখনও হাতে কাপড় বুনিয়া বেশ দশ টাকা উপায় করিতে পারে। তাহাদিগকে অবশ্য চিরাগত প্রথা পরিত্যাগ এবং নূতন উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু একটু বুদ্ধি চালনা করিয়া কাজ করিলে কাপড় বোনা ব্যবসায়ে তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। কথাটা ঠিক্ কি না, সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক, এবং ঠিক্ হইলে গ্রহণ করা উচিত। কল-কারখানার বিষময় ফল যদি কতক পরি-মাণেও আমরা পরিহার করিতে পারি, তাহা হইলে লাভ বড় কম হইবে না। তাঁহারা আর এক কথা বলেন, শিল্পের অবনতি হওয়া দেশের বড় দুর্ভাগ্য। যে সব কাজ হাতে হয়, তাহাতে শিল্প চাতুর্য্য বেশ দেখান যায়, এবং হাতে বোনা কাপড়, গালিচা, শাল প্রভৃতি শিল্পচাতু-র্য্যের ও সৌন্দর্য্যের জন্য ভারত চিরকাল জগতে বিখ্যাত। হাতে বোনা ব্যবসা যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে যে শিল্প-চাতুর্য্য আমাদের এক প্রধান গৌরবের কারণ, এবং যাহা একরূপ লুপ্তপ্রায়, তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ হইবে। কথাটা বড় গুরুতর। এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। এইটুকু বলিতে চাই যে, সমাজনেতৃগণের এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিষয়টা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের মধ্যে একটী নেতৃদল গঠিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত নেতা না থাকিলে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বড় কাজের ত কথাই নাই। যেমন দেশে খাটিবার লোকের প্রয়োজন, ভাবিবার ও পরিচালন করিবার লোকেরও সেইরূপ প্রয়োজন। নেতা হইতে গেলে অনেকগুলি গুণ থাকা চাই। লোক-আকর্ষণী শক্তি না থাকিলে নেতা হওয়া যায় না, এবং উৎকৃষ্ট গুণই লোক আকর্ষণ করে। মানসিক গুণের মধ্যে কল্পনাশক্তি, পরিণামদর্শিতা, বিচারশক্তি প্রভৃতি থাকা চাই। কিন্তু একজন অধিনায়কের নৈতিক গুণ থাকা বড় বেশী আবশ্যক। 'সাহস, উদারতা, সহানুভূতি, সত্যপ্রিয়তা, হৃদয়ের কোমলতা, একাগ্রতা, নিস্বার্থতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত না হইলে অধিনায়ক হইতে সক্ষম হওয়া যায় না। কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ যদি এই সব গুণ-সম্পন্ন হন্, তাহা হইলে লোকের মন সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যে

পরিমাণে দেশে এইরূপ লোক জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে নেতার অভাব দূর হইবে। অতএব সকল দেশভক্ত পিতামাতার চেষ্টা করা উচিত, যতদূর তাঁহাদের আয়ত্তাধীন, ততদূর তাঁহাদের ঐ সব গুণ সম্পন্ন হয়। সকলেই জানেন সাধিলেই সিদ্ধি। এইরূপ কতকগুলি লোক দেশে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইবেন

(ক্রমশঃ)

বর্ষ বিদায়।

Another year, another year
The unceasing rush of time
sweeps on,
Overwhelmed in its surges
disappear,
Man's hopes and fears for ever
gone.

পুরাণ চলিলে,　　নবীনে ডাকিলে,
অভ্যর্থনা শুনি এই।
বছর চলিলে,　　অশ্রু যে বহালে,
বন্ধু তোমা ভাবি তাই॥
অনেক সয়েছি,　　অনেক লভেছি,
সাক্ষী ছিলে তুমি ভাই!
ভগ্ন প্রাণে বল,　　আঁধারে সম্বল,
হয়েছিলে ভুলি নাই॥
ভূত সিন্ধু জলে,　　ডুবিতে চলিলে,
উঠিল কালের ঢেউ।
বিচূর্ণ পরাণ,　　অবিশ্বাসে ম্লান,
ভুলিতে কি পারে কেউ?
শুধু আঁখি ঝরে,　　শুধুই আঁধারে,
নিশি দিন মগ্ন রই।
সমুখে—আনন্দ-পূরিত,　রাজ্য সুবিস্তৃত,
আছে তাহা ভাবি কই?
নিশা পোহাইলে,　　ও নিশান তুলে,
ও পারে যাইব সবাই।
ক্ষণেকের তরে,　　না কাঁপিব ডরে,
অমরার যাত্রী হই।
হবে অশ্রু দূর,　　শুধু সুমধুর,
দুন্দুভি বাজিবে কাণে।
অবশ পরাণ,　　লভিবে চেতন,
পাইয়ে বাঞ্ছিত জনে॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

সংসার গহন।

এই মহা ইন্দ্রজালময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিত্য নানা সুখ ও দুঃখের ঘটনাদ্বারায় মনুষ্যগণ পরিচালিত হইতেছেন, এবং সুখ অপেক্ষা দুঃখই সমধিক। তন্মধ্যে সকল দুঃখ যাতনা অপেক্ষা জীবগণ মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করেন। অথচ

কোন কষ্ট হইলেই আমরা তৎক্ষণাৎ অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত মৃত্যু কামনা করি; ও যখন সেই মহাকাল উপনীত হইয়া আমাদের জীবনের প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর প্রিয়তমজনকে হরণ করে, তখন কালকূট ভরা ভুজঙ্গের দংশন অপেক্ষা অধিক জ্বালা অনুভব করি; সে দুরারোগ্য, অনারোগ্য বেদনা অবর্ণনীয়। উহার কোন ঔষধ নাই, কোন প্রতীকার নাই, কেবল একমাত্র জ্ঞানবারি সিঞ্চিত হইলেই সে শিখা নির্ব্বাণ হয়।

উক্ত পরমজ্ঞান জগতে আয়াসসাধ্য। যখন মানবের মায়াতরু ঝরিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের আশা নষ্ট করিয়া দেয়, তৎকালে জীবের অন্তর্দ্দশা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই প্রেমময় সুখাবাস সংসার, ঘোর গহনস্বরূপ জ্ঞান হয়, কিন্তু তৎকালে নিরুপায়ের উপায় চক্ষে দেখিতে পাই না। শোক মোহাচ্ছন্ন হৃদয়, তমোময় নভোমণ্ডলের ন্যায় অন্ধকারব্যাপ্ত হইয়া থাকে, আর সেই ঘন ঘটাচ্ছন্ন নীরদরাশি ভেদ করিয়া কেবল প্রবল বারিধারা পতন হয়। যদিও মানবের শোকাশ্রু সেই দুর্ব্বিসহ যাতনার আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে, তথাপি তাহাতে উপকার হয় না; তৎকালে একমাত্র ভগবৎকৃপা আমাদের ক্ষুব্ধচিত্তকে সংযত করিতে সক্ষম হয়। এস্থলে একটী প্রাচীন কথা বিবৃত করিব। যৎকালে অন্ধনৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রপৌত্রাদি নিধনে মহাশোকান্বিত হইয়া চিত্তবিকার প্রাপ্ত হয়েন, তৎকালে সুধার্ম্মিক বিদুর মহর্ষিগণ কথিত বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—

মহারাজ শ্রবণ করুন! এই সংসার ভীষণ গহনস্বরূপ, তাহার একটী উপমা দিতেছি।

একদা এক ব্রাহ্মণ পথভ্রান্ত হইয়া ভীষণ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল এক বনে গিয়া পড়েন। ক্রমেই বিজন অরণ্য ভ্রমণে তাঁহার নিতান্ত ত্রাস জন্মিল, অবশেষে প্রাণসংশয় চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া বহির্গমনের শত উপায় করিয়াও নিস্ফল হইলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে এক রমণীর সন্নিধানে আসিয়া পড়িলেন। সে উঁহাকে দেখিবামাত্র ভুজপাশে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিল। ঐ ভীষণা নারীর বাগুরা দ্বারা সমগ্র কানন পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। তথায় উন্নত শৈলাকৃতি মহানাগগণ ফণা বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কোনক্রমে উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া মহাভীত-অন্তঃকরণে বেগে ছুটিতে লাগিলেন। চারিদিকে শ্বাপদগণবেষ্টিত কণ্টকিত বনপথ অতিক্রম করিতে গিয়া এক কূপ মধ্যে নিপতিত হইলেন। কিন্তু একবারে সলিল মধ্যে পতিত না হইয়া পনস ফলের ন্যায় তন্মধ্যস্থিত বল্লীমধ্যে উর্দ্ধে পদ ও নিম্নে মস্তক হইয়া আবদ্ধ হইলেন। উক্ত কূপের মুখবন্ধ পট্টোপরি, ছয় মুখ, দ্বাদশ চরণধারী একটী হস্তী দণ্ডায়মান ছিল। সেই হস্তী বৃক্ষলতাদিতে সমাবৃত হইয়া গমন করিতেছিল, এবং সেই পাদপে নানাবিধ ভয়াবহ মধুকর সকল প্রশাখা

সমুদয় অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে নিবাস করিয়া, মধু সঞ্চয় করত অবস্থিতি করিতেছিল। সেই মকরন্দ পানে বালকও আকৃষ্ট হয়। সুমিষ্ট মধুপানে ভ্রমরেরা উন্মত্ত হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতেছে। ব্রাহ্মণ বিপাকে পড়িয়া শতধা ক্ষরিত মধুপানে প্রয়াসী হইলেন। সেই মধুপানে তাঁহার তৃষ্ণা নিবারিত হইলনা বরং ক্রমেই অতৃপ্তি বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু অনিচ্ছা হইলনা। যেহেতু ক্ষুধার্ত্ত পিপাসার্ত্ত প্রাণের আর কোন উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন দুইটী মূষিক সেই বৃক্ষকে অনবরত ছিন্ন করিতেছিল।

এরূপ দুর্গম বনে ভয়াল জন্তুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, ভীষণা রমণী কর্ত্তৃক আক্রান্ত, পরে নাগ ও কুঞ্জর হইতে মহাভয়প্রাপ্ত, মূষিকগণ হইতে ও মধুকর দ্বারা ক্ষিপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ অতীব শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন।

এই আখ্যান শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য এরূপ মহৎ দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যেও ব্রাহ্মণের মধুপানের অনুরাগ কেন জন্মিল? কি জন্য বা তাহার এতাদৃশ ধর্ম্মসঙ্কট অবস্থা ঘটিল। এই সমুদায় না জানিলে আমার মন শান্ত হইতেছেনা।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষবিদ্ পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মনুষ্য সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুযায়ী ফল ভোগ করে। এই যে দুর্গম বনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, উহাই মহাসংসারস্বরূপ, সেইজন্য সংসার গহন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বনস্থিত ব্যালগণ ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই বনে যে ঘোররূপা কামিনী অধিষ্ঠান করেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই শক্তি ও রূপবিনাশিনী জরা বলিয়া থাকেন। বনমধ্যে যে কূপ উহাই মানবগণের দেহ, এবং ঐ যে মহানাগ তিনি দেহবিনাশী মহাকাল-স্বরূপ। কূপমধ্যে যে বল্লরী সংলগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ঝুলিতেছিলেন, তাহাই শরীরিগণের জীবিতাশা। আর কূপের মুখবন্ধস্থলে যে হস্তী, তাহাই সংবৎসরস্বরূপ, তাহার ছয়মুখ ষড়্‌ঋতু, দ্বাদশপদ বার মাস বলিয়া জানিবে। যে সমস্ত মূষিক ও সর্পগণ পাদপকে নষ্ট করিতেছে, উহা দিবারাত্রি স্বরূপ, এবং যাহাদিগকে মধুকর বলা হইয়াছে, উহা কাম নামে অভিহিত।

ধীরগণ এইরূপে সংসারচক্রের পরিবর্ত্তন জ্ঞান করেন, যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা সংসার চক্রের পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হন।

নিদারুণ পুত্রশোকাতুরা কুরুকুলপতির কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা জন্মিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিষম মোহ আসিয়া অতীতের চিত্র প্রাণে জাগাইয়া দিল। এই জীবন পরীক্ষায় যে ব্যক্তি জয়ী হইতে পারে, সেই মুক্ত ও শুদ্ধ।

শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।*

১। অপামার্গ (আপাঙ্) মূল /০ এক আনা পরিমাণ শীতল জলসহ বাটিয়া সেবন করিলে বিসূচী (কলেরা) নিবারিত হয়।

২। জায়ফল ।॰ সিকি তোলা অর্থাৎ ।০ চারি আনা, কর্পূর সিকি তোলা, যোয়ান সিকি তোলা, মটকুড়ার (আটসেওড়ার) পাতা (কীটদষ্ট না হয়) ১টী (উহার শির ফেলিয়া লইতে হইবে) শঠীর স্বরসে শিলে মর্দ্দন করিয়া ৩টী বটিকা করিবে। প্রত্যেক দাস্তের পর শীতল জলসহ ১ বটিকা সেবন করিবে। পিপাসায় শীতল জল সেবন করিতে দিবে। বিসূচী রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায় বিফল হইতে দেখা যায় না।

৩। কৃমি ও অম্লশূলে ফুল খড়ি ৪ চারি তোলা, শ্বেত চন্দন চূর্ণ ৪ চারি তোলা এক সঙ্গে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এক এক বটিকা সকাল ও সন্ধ্যায় পালিতামাঁদার (তেপালিতার) পাতার রস ও মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। অরহর পাতার রস ২ দুই তোলা পরিমাণ প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেবন করিলে পাণ্ডু (নেবা) দূরীভূত হয়। বেশী দিন সেবন করিলে মূত্রাধিক্য রোগ নিবারণ হয়। পাণ্ডুরোগে ৩।৪ দিন মাত্র ব্যবহার করিতে হয়।

৫। কয়েৎ বেলের শাঁস ২॥০ আড়াই তোলা, হিরাকস চূর্ণ ৶০ দুই আনা, আদা মধু ১ এক তোলা, এক সঙ্গে অবলেহ করিলে প্রবল হিক্কা নিবারণ হয়।

৬। কুচো মৎস্য (পূর্ব্ব বঙ্গে ইহাকে 'ঘনে' মাছ বলে) পানমরীচের ডগা ৫।৬টী, এক সঙ্গে ঝোল করিয়া খাইলে এক দিবসেই খোস পাঁচড়া দূরীভূত হইবে। (পানমরীচকে পূর্ব্ব বঙ্গে বিনকাটালী বলে)।

৭। অল্প পরিসর টাকে আকন্দপুষ্প ঘর্ষণ করিলে ৫।৭ দিবসের মধ্যে পুনর্ব্বার কেশ উৎপন্ন হইবে।

* পাঁচন ও মুষ্টিযোগ প্রকরণে যে সকল ঔষধের কথা লিখিত হইতেছে, তাহা পড়িয়া ও সেইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়াছেন। হঠাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে কোন রোগ উপস্থিত হইলে এবং তৎকালে চিকিৎসার উপায় না থাকিলে গৃহস্থেরা এই পাঁচন ও মুষ্টিযোগ দ্বারা মহোপকার লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। গৃহস্থ মাত্রেরই এই সকল ঔষধের কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ, শাস্ত্রজ্ঞ, বহুদর্শী, নির্ম্মলচরিত্র শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই সকল অনায়াসলভ্য অমূল্য ঔষধের বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছি, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ। কেহ সুপ্রবীণ, বিশুদ্ধ চিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাইতে অনুরোধ করি। তাঁহার ঠিকানা ১২।১।১ নং বেণিয়াটোলা লেন, পোঃ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতের সীমান্তে মোমিনদিগের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। আমীরের প্রজা আফ্রিদিরা ইহার মধ্যে থাকাতে অনেকে আমীরকে ইহাতে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন।

২। মধ্যে জনরব উঠিয়াছিল কাবুলের আমীরকে কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে, এক্ষণে সে সংবাদ অলীক এবং দুষ্টলোকের রটনা বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে। আমীর মহোদয় সঙ্কটাপন্ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

৩। জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য দুইটী যুবক মজঃফরপুরে তাঁহার গাড়ীভ্রমে অপর একটী সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া দুইটী নিরপরাধা স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ করিয়াছে। যুবকদ্বয়ের একটী আত্মহত্যা করিয়াছে, অপরটী বিচারাধীন।

৪। কলিকাতায় কয়েকটী যুবক কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রাণনাশের জন্য একটী বোমার কারখানা খুলিয়া বোমা প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারাধীন আছে এবং অম্লানমুখে অকুতোভয়ে নিজ নিজ দুষ্কার্য্য স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের সাহস ও দৃঢ়তা আশ্চর্য্য! এই দৃঢ়তা ও সাহস সৎপথে নিযোজিত হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।

৫। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সার ক্যাম্বেল ব্যানারমান্ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। স্বয়ং রাজা, প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী এবং বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সমাধিকার্য্যে উপস্থিত ছিলেন।

৬। কুমারী আরেণ্ডেল ও এনিবেসাণ্ট প্রমুখ কতকগুলি রমণীর উদ্যোগে কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় নামে হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কাশীধামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তত্রত্য কমিশনার-পত্নী শ্রীমতী লভেট বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। তত্রত্য কলেক্টর-পত্নী শ্রীমতী র‍্যাভিচি, শ্রীমতী আনিবেশান্ত ও অনেকগুলি থিয়সফিষ্ট ইংরাজ মহিলা এবং কাশীধামস্থ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বঙ্গমহিলা এবং হিন্দুস্থানী ও কাশ্মীরি রমণীগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কুমারী আরেণ্ডেল স্বয়ং দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন ও মধ্যে মধ্যে বিলাত হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় বালিকারাই অবৈতনিক ভাবে শিক্ষালাভ করে। তাহাদের পুস্তকাদি শিল্পোকরণ, চিত্রোকরণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়; অপরন্তু প্রত্যেক বালিকা বৎসরে যত শিল্প প্রস্তুত করে ও চিত্রাঙ্কন করে তৎসমুদায়ও পারি-

তোষিকের সঙ্গে প্রদত্ত হয়। বারাণসী-ধামে হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য এই ইংরাজ রমণীর অকাতর পরিশ্রম, অশেষ যত্ন ও বহুল অর্থব্যয় অতীব প্রশংসনীয়। কুমারী আরেণ্ডল কুমারী পামর ও আরও কয়েকটী ইংরাজ মহিলার অকৃত্রিম যত্ন ও চেষ্টার ফলে বালিকারা শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন।

যোগ্যতানুসারে প্রায় শতাধিক বালিকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। কুমারী আরেণ্ডেলের ইচ্ছা তিনি তত্রত্য হিন্দুবিধবাদিগের নিমিত্ত একটী ট্রেণীংস্কুল সংস্থাপন করেন। ভগবান্ তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

মনোজবা। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী প্রণীত। ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

আমি এই কবিতা পুস্তকখানি অতি সাবধানে পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি যেমন সরল ও সুন্দর তেমনই মধুর ও সুখপাঠ্য। ইদানীং অধিকাংশ লেখক-লেখিকা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের ভাষা ও ভাব অম্লানচিত্তে আপন আপন পুস্তকে সন্নিবেশ করেন, কেহবা অনুকরণ করিয়া থাকেন। মনোজবার সে দোষ নাই। মনোজবা স্বভাবকাননের সুন্দর পুষ্প, ভক্তিচন্দনে লিপ্ত এবং ভক্তিভাজন ৺ পিতৃদেব চরণে অর্পিত। এই পুস্তকে ৮৮ টী কবিতা, তন্মধ্যে নয়টী পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি প্রতিষ্ঠার, দুইটী মাতৃ এবং পাঁচটী ভ্রাতৃ-স্নেহের মধুরতায় রচিত। দেবী ভারতীর নিকট প্রার্থনায় তিনটী, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের প্রতি দুইটী এবং শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে একটী লিখিত হইয়াছে। এই সমস্তগুলি পাঠ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব হয়। আবার 'শিখাও আমারে,' 'নিদর্শন,' 'কেন কাঁদি,' 'অন্বেষণ,' 'বিশ্বেশ্বর,' 'কৃষকবালা,' 'ভুলিতে কি পারি,' 'মরণ,' 'একাদশী,' আকুলতা,' 'শিশুর হাসি,' 'অবোধ ছেলে,' 'মধুময়,' 'একটী শিশুর প্রতি,' 'রমার চন্দ্রপূজা,' 'জাগ্রত স্বপন,' 'বিবাহ,' 'অতৃপ্তি,' 'পুণ্য,' 'প্রসাদ,' 'বিষাদের ছায়া,' 'নববর্ষের গতস্মৃতি,' 'নদীতীরে বিধবা,' 'মালতী কুটি,' 'বাসরে সমাধি,' 'একটী শিশুর প্রতি,' 'বিজয়াসম্ভাষণ,' 'প্রতিদান,' 'কেহ নহে একা,' 'হস্তাক্ষর,' এই কয়েকটী কবিতা উচ্চশ্রেণীর কবির যোগ্য। যেখানে যেটী ভাল লাগিয়াছে, সে সমস্ত উদ্ধৃত হওয়া সহজ নহে সম্ভবও নহে।

গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সদ্ভাবপূর্ণ। বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ইহা পড়িতে পারিবে এবং পড়িয়া প্রীতিলাভ করিবে। মনোজবার দোষের মাত্রা অল্প, গুণের ভাগ অনেক অধিক।

এইরূপ ছোট ছোট কবিতা লিখিয়াও লেখিকা, কৃষকবালা, রমার চন্দ্রপূজা,

বাসরে সমাধি প্রভৃতি কবিতায় যেরূপ কল্পনা এবং চরিত্র অঙ্কন নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, কালে তিনি কাব্যরচনায় সমর্থ হইবেন। ভরসা করি পাঠকগণ গ্রন্থখানি আদর ও স্নেহের-চক্ষে দেখিবেন। গ্রন্থকর্ত্রী মনোজবা প্রণয়ণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি নিরাময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মা।

বামারচনা।

নববর্ষ।

আবার আসিল ফিরে নূতন বরষ,—
লতা পাতা বৃক্ষ হেরি সকলি সরস;
রঙ্গে স্রোতস্বিনী ধায় নরে বিভু গুণ গায়
নবীন প্রকৃতি পরে নূতন হরষ!

২

নব শশী উদিত গো নব নীলাকাশে,
নব তারা চন্দ্রে বেড়ে নব ভাবে হাসে;
নব বর্ষ স্পর্শ পেয়ে প্রকৃতি এসেছে ধেয়ে,
প্রস্ফুট কমল নব সরোবরে ভাসে।

৩

নব শাখে বসি পাখী নব ভাবে গায়,
নবীন কুসুমরাজি পরাণ মাতায়,
নব স্রোতস্বিনী আজি নবীন সাজেতে সাজি
নবীন আশায় আলো নরমুখে ভায়।

৪

নবীন আকাশ আজি নব সূর্য্য নব শশী,
নবীন তারকাদল ছড়াইছে সুধারাশি,
নবীন কুসুমচয় নবীন মলয় বয়,
নবীন সৌরভ আজি ছড়ায় মলয় হাসি।

স্বর্গের সুরভি লয়ে নবীন পবন
নব ভাবে করে আজি স্নেহ সঞ্চারণ!
নব ভাবে তরুপরে বিহগ কাকলী ধরে
নব স্রোতে ছুটে হৃদে প্রীতি-প্রস্রবণ!

৬

গগন পরেছে আজি নূতন তারার মালা,
সাজায়েছে দিগঙ্গনা নব ভাবে নব ডালা।
বসুমতী নববেশে নবীন সুহাসি হেসে
নববর্ষে বরিতে গো সাজায় নূতন থালা!

৭

সকলি নূতন আজি নূতন আপনি ধরা,
নবীন সাজেতে সাজি প্রকৃতি যে
মনোহরা;—

৮

নবীন মানব প্রাণ—পুরাতন আজি ম্লান
শুধু মোর হৃদি কেন পুরাণেতে আছে ভরা!
দয়াময়! এ মিনতি—শান্তি বারি সেচি নব
নবীন করহ প্রাণ দাও প্রেম দাও জ্ঞান;—
জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ভরি একতার হার পরি
হাসুক ভারত পুনঃ হে বিভো! গৌরব তব।

শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী।

নববর্ষে প্রার্থনা।

অন্তরের শোক দুঃখ,অন্তরে ফেলিয়া রাখি,
আজি এই নব বর্ষে তব পাশে ভিক্ষা চাই।
সাধিয়া তোমার কর্ম্ম যেন তবপাশে যাই।
সংসারের শোকে তাপে যেন গো না ট'লে চিত।
হেরি এই বিভীষিকা প্রভু গো! না হই ভীত।
এ জগৎ মোর'পর করুক যা অত্যাচার,
তাহাতে যাতনা যেন কভু নাহি পাই আর।
তোমার প্রেমেতে যেন সদাই মগন থাকি।
ক্ষুদ্র এই হিয়াখানি তোমার করুণা পেয়ে,
যেন নাথ! ক্রমে ক্রমে মিশায় অনন্তে যেয়ে
হৃদয়ের মাঝে মোর ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী মত,
বাসনার ঢেউ যাহা উঠিতেছে অবিরত,
তোমার অমৃত নামে যেন সব হয় লয়।
কৃপা করি এ বাসনা পূর মোর দয়াময়!

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

বর্ষ-সঙ্গীত।

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
জাগিতেছে অতীতের কথা,
পুরাতন স্মৃতি মনোহর
অতীতের সকরুণ গাথা।
একে একে পড়েছে ঝরিয়া
সুখের সুন্দর ফুল গুলি,
একে একে শুখায়েছে কত
আশার সুন্দরতর কলি।
আহা!
সুখ যায় স্মৃতি কেন রহে
দুঃখ দিতে দুর্ব্বল মানবে,
আশা কলি ফুটিবেনা যদি
মনোহর হয় কেন তবে?
নব বর্ষ আর নব নও
তুমি মম এবে পুরাতন,
বারে বারে এক(ই) অভিনয়
কে তোমারে শিখাল এমন?

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, ও
শ্রীসুকুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 538. June, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৩৮ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। জুন, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উপাধি লাভ—ভারত-সচিব জন্ মর্লি, ভাইকাউণ্ট মর্লি অব ব্লাকবরণ উপাধি গ্রহণ করিয়া লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

ক্ষমা—পোর্টুগালের রাজাকে হত্যা করার অপরাধে অনেকগুলি লোক ধৃত হইয়াছিল। নূতন রাজা হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, কলিকাতা সেণ্টজেবিয়ারস্ কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফো গত ১০ই মে দার্জ্জিলিংএ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

অল্ ইণ্ডিয়া মোসলেম্ লীগ্—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিঃ আমীর আলির সভাপতিত্বে বিলাতে উক্ত ভারতীয় মুসলমান সমিতির একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন ইহার অভিপ্রায় না হইয়া সম্মিলিত ভারতের উন্নতিসাধনই এই সভার উদ্দেশ্য।

পুনার মাদকনিবারিণী সভা—পুনার মাদকনিবারিণী সভার উদ্যোগে তত্রত্য কতিপয় যুবক মাদক সেবন নিবারণের জন্য মদের দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া মদ্যপায়ীদিগকে মদ্যপানে বিরত করিবার চেষ্টার অপরাধে তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দণ্ডিত হয়। এ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকারের সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের পক্ষ হইতে লাটসাহেবের নিকট ডিপুটেশন পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ এ পরীক্ষায় এ বৎসর ১০৫৮ জন ছাত্র পাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৯৩, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭১ ও তৃতীয় বিভাগে ৪৯৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত বালিকাগুলি গুণানুসারে বি, এ, এফ, এ ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

পাস কোর্স।

রমা ভট্টাচার্য্য — বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিভা গুই
বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়
বনলতা দে — প্রাইভেট
সুষমা মৈত্র
নীরোদবাসিনী সোম

এফ্ এ পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

সত্যপ্রিয়া ঘোষ—বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত— " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

শিশির কুমারী গুহ—বেথুন কলেজ।
মার্গারেট লাবণ্যলতা লভ—প্রাইভেট
বাসন্তী মামগাইন—বেথুন কলেজ।
বিভা রায়— " "
শৈলবালা সমদ্দার— " "
মৃণালিনী সরকার— " "

তৃতীয় বিভাগ।

কিরণ কুমারী বসু—বেথুন কলেজ।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল।

১ম বিভাগ।

নির্ম্মলা রায় — বেথুন কলেজ।
সুশীলা সেন — এডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।

২য় বিভাগ।

স্নেহনলিনী বসু — বেথুন কলেজ।
অমলা দাস — " "
স্বর্ণপ্রভা দত্ত — " "
প্রীতিবালা ঘোষাল — " "
লীলালতিকা মুখার্জি — " "
ললিতা রায় — " "
শৈলজা চৌধুরী — এডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।
কনসিডিনী এনাই — লোরেটো হাউস।
সেওদাত অহজিন — " "
বিদ্যুৎপ্রভা দত্ত — নর্ম্মাল স্কুল।
মাধুরী বালা ঘোষ — ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।
সোফিয়া হোরাজি সোম — " "
স্নেহলতা মল্লিক — এ, গার্লস এচ্ ময়মনসিংহ।

তৃতীয় বিভাগ।

ললিতা বসু — প্রাইভেট।
ইন্দুপ্রভা ভট্টাচার্য্য — ডায়োশিশন মিসন।
সুশীলাবালা বাগচী — " "
সুরমা বিশ্বাস — " "
সুষমা বিশ্বাস — " "
সরোজিনী দত্ত — শিক্ষয়িত্রী ক্যাল এচ্।
কমলা দে — চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল।
শৈলজা দে — শিলচর গবর্নমেণ্ট স্কুল।
জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ — বাঁকিপুর ফিমেল স্কুল।
প্রেমপ্রভা নিয়োগী — বেথুন কলেজ।
চেম্বার্স সিরিল — লোরেটো হাউস।
সরসীবালা চাটুর্জী — নর্ম্মাল স্কুল।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।
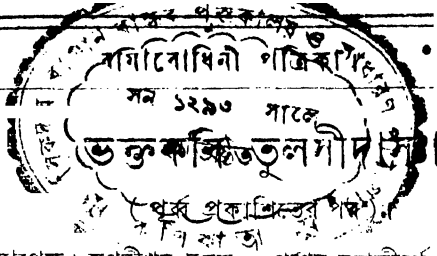
সকলি সাধনাসাপেক্ষ। জগদীশ্বর মনুষ্য-মধ্যে এমন সকল উপাদান দান করিয়াছেন যে, সাধনাদ্বারা যে সকল অদ্ভুত উৎকর্ষ ও অদ্ভুত শক্তি লাভ করে (১)। তুলসীর কঠোর সাধনার বিষয় ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। তিনি অশ্রান্ত অভ্যাস-বলে বাত-বর্ষা, শীতাতপ, আহার নিদ্রা, শ্রান্তি, অবসাদ, সুখ-দুঃখ সকলি জয় করিয়াছিলেন। দুরারোহ হিমগিরি হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার গতি অপ্রতিহত ছিল। নানা-বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য, তিনি পদব্রজে সুদুর্গম স্থান সকলে অনায়াসে গমন করিতেন। গন্তব্য স্থান যত দূরে থাকুক, তথায় না পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেন না। চিত্রকূট, কাশীধাম ও অযোধ্যা এই তিনটী স্থান তাঁহার প্রিয়তম সাধনাক্ষেত্র। চিত্রকূটে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তুলসীদাসের তিরোধানের পর হইতে ঐ চিত্রকূট রামভক্ত যোগী, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব-গণের মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। সীতা-রাম-হনুমান্-মূর্ত্তির সঙ্গে অসংখ্য তুলসীমূর্ত্তি চিত্রকূটের গাত্রে গাত্রে, গুহায় গুহায় বিরাজমান। তথায় তুলসীর নামে স্থাপিত অসংখ্য মঠ বিদ্যমান। প্রত্যহ বহুতর সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রেরা ঐ সকল মঠে আহার ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে।

তুলসীদাস পরোপকারের সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। তাঁহার প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কি উচ্চ, কি নীচ, রাজা, প্রজা, সকলেই নতশীর্ষে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। তিনি স্বয়ং নিঃস্পৃহ হইলেও, লোকের বিপদমোচন বা অন্যবিধ সংকার্য্যের জন্য সময়ে সময়ে ধনিগণকে অনুরোধ করিতেন। কাশীধামে টোডরমল নামে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। বড় বড় চারিখানি গ্রাম তাঁহার অধিকার-ভুক্ত ছিল। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সদাশয় ও পরোপকারী। কোনও দুরাত্মা খড়্গাঘাতে তাঁহার প্রাণসংহার করে। তুলসী এই সংবাদ পাইয়া কহিলেন ;—

"চার গাংবকো ঠাকুরো, মনকো মহা-
মহীপ
তুলসী যা কলিকালমেং, অথয়ে টোডর-
দীপ ॥"

অর্থাৎ—টোডর, চারি গ্রামের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনোরাজ্যের

(১) কাশীর সুবিখ্যাত যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে অনেকে দেখিয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার কয়েকটী অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কয়েক বৎসর হইল, তিনি তিরোধান করিয়াছেন। কাশীতে বাঙ্গালা-ভাষায় ও হিন্দিভাষায় তাঁহার জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকেরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।

মহিমান্বিত রাজা ছিলেন। আজি এই তামসযুগে টোডররূপদীপটী নির্ব্বাণ হইল?

টোডরের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই পুত্র কাঁধাইরাম ও আনন্দরাম পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তুলসীর আজ্ঞামাত্র তাঁহারা ভ্রাতৃবিরোধ ছাড়িয়া পরম প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে কাশী-অঞ্চলে খানখানা নামে এক মহাপ্রভাব ব্যক্তি ছিলেন। খানখানা ধনশালী মুসলমান। আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি মহাকবি। এক দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তুলসীর শরণাপন্ন হইল। তুলসী নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া সেই দরিদ্রকে দিয়া খানখানার নিকট প্রেরণ করিলেন, শ্লোকার্দ্ধ যথা ;—

"সুরতিয় নরতিয় নাগতিয়, সব চাহত
অসহোয়।

—অর্থাৎ সুরলোকের, নরলোকের ও নাগলোকের সকল নারীই পতিসহবাস কামনা করে।

খানখানা ঐ শ্লোকার্দ্ধ পড়িয়া সেই দরিদ্রের কন্যাবিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন, এবং তুলসীর সেই শ্লোকার্দ্ধ এইরূপে পূরণ করিয়া তুলসীর নিকট পাঠাইলেন ;—

"গর্ভ লিয়ে হুলসী ফিরে, সোংসুত হোয়॥"

অর্থাৎ—"তাহারা মহোল্লাসে এই জন্য পতি কামনা করে যে,—আমাদের গর্ভে যেন তুলসীর ন্যায় সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে।"

কথা সত্য ; "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি"— একটী কুলচন্দ্র সুসন্তান দ্বারা সমস্ত মানব-সমাজ আলোকিত হয়।

একদা কোনও পণ্ডিত, নায়কনায়িকা-ঘটিত অশ্লীলরসের একখানি কাব্য সংস্কৃত-ভাষায় রচনা করিয়া তুলসীকে উপহার দিয়া কহিলেন ;—গোঁসাইজি! আপনি পণ্ডিত হইয়া অগ্রাহ্য প্রাকৃতভাষায় (দেশী হিন্দিভাষায়) গ্রন্থ লেখেন কেন? তুলসী তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ এই দোঁহা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন ;—

"মণিভাজন বিষ পারঈ, পুরণ অমী নিহারী।
কা ছাড়িয়, কা সংগ্রহিয়, কহহু বিবেক
বিচারি॥
কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাংচ।
কাম জো আবৈ কামরী, কা লে করৈ
কমাচ॥"

অর্থাৎ—বিষপূর্ণ মণিময় পাত্র এবং অমৃতপূর্ণ মৃণ্ময় পাত্র, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রাহ্য এবং কোন্‌টী অগ্রাহ্য, তাহা বিবেকশক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখা উচিত। দেশীভাষাই কি, আর সংস্কৃত-ভাষাই কি, বিশুদ্ধ প্রেমপদার্থ চাই। যদি কম্বলে শীত নিবারণ হয়, তবে সোণার জামায় কি প্রয়োজন? (১)।

(১) তুলসীর রামায়ণাদি কাব্য, দোঁহাবলী ও অন্যান্য প্রবন্ধসকল যদি হিন্দিভাষায় রচিত না হইয়া সংস্কৃতভাষায় রচিত হইত, তবে ভারতের অধিকাংশ লোকই ঐ সকলের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিত। দেশীভাষায় রচিত বলিয়াই সর্ব্ব-সাধারণে উহার পাঠে ও অর্থগ্রহণে সমর্থ। গৃহে, হাটে, মাটে, পথে, ঘাটে, দোকানে, ইতর, ভদ্র

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,—অযোধ্যা, কাশী ও চিত্রকূট তুলসীর প্রিয়তম স্থান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পান্থশালা, অতিথিশালা, মঠমন্দিরাদি নানাস্থানে বিকীর্ণ হইলেও, ঐ তিন স্থান তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্থান। যাত্রীরা কাশীধামে গিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটী স্থান পরম তীর্থজ্ঞানে দর্শন করিয়া থাকে। ১ম,—অসীর নিকট 'তুলসী ঘাট', তথায় মন্দিরমধ্যে তুলসীর স্থাপিত হনুমান্-মূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরের বহির্গাত্রে একটী মন্ত্র খোদিত আছে, উহা 'বীসাযন্ত্র' নামে খ্যাত। কথিত আছে, তুলসীদাস স্বহস্তে ঐ মন্ত্র খোদিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, ঐ বীসাযন্ত্রের মন্ত্রাক্ষরগুলি ভূর্জ্জাদি পত্রে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া, তাহা কবচ বা মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে শিশুগণের অসাধ্য রোগের শান্তি হয়। ঐ মন্দিরের পার্শ্বেই তুলসী-গুফা। তুলসী অন্তিমকালে ঐ গুফায় ছিলেন। ২য়,—শ্রীমুকুন্দরায়ের বাগিচার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, গোপালমন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ; উহা তুলসীর বৈটকখানা ছিল। ঐ গৃহ সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, কেবল প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সকলে জানালার ফাঁক দিয়া ঐ গৃহের অভ্যন্তর দেখিয়া থাকে। কথিত আছে,—তিনি ঐ গৃহে বসিয়া "বিনয়-পত্রিকা"নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ৩য়,—'প্রহ্লাদঘাট'। ৪র্থ,—'সঙ্কটমোচন' নামক বিখ্যাত হনুমান্-মূর্ত্তি; ইহা অসীনালার উপর স্থাপিত। লোকে সঙ্কটে পড়িয়া ঐ মূর্ত্তির পূজা করে এবং ঐ স্থানে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে। কথিত আছে,—গঙ্গারামজী নামে এক জ্যোতিষী একদা কাশীরাজের নিকট বহু অর্থ পাইয়া তুলসীর চরণে অর্পণ করেন। তুলসীর আজ্ঞায় তিনি সেই অর্থে অসীর উপর বারটী হনুমান্-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন; তন্মধ্যে এক্ষণে একটী মাত্র বিদ্যমান। অসীর ঘাটে মহাসমারোহে তুলসীর রাম-লীলা মহোৎসব হইত। উক্ত রামলীলার "লঙ্কা" নামক স্থানটী অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ঐস্থানে কৃষ্ণলীলা মহোৎসবও করিতেন, উহাও অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

অসীঘাট তুলসীর প্রিয় বাসস্থান ছিল। ঐ স্থান অতি রমণীয়, জনতাশূন্য ও পরিষ্কৃত। ঐ স্থানে কাশীনরেশের উদ্যান, বৈটকখানা বাটী ও ভূগর্ভে বিশাল হোম-শালা নির্ম্মিত আছে। ঐ স্থানের গঙ্গা-জল স্বচ্ছ কাচের ন্যায় নির্ম্মল ও মধুর।

অনেকেই দৈনিক কার্য্যাবসানে সন্ধ্যার পর সমবেত হইয়া, তুলসীর গ্রন্থসকল ভক্তিভাবে পাঠ ও শ্রবণ করে। ইহা দ্বারা তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে, সাংসারিক কর্ত্তব্যবিষয়েও তাহারা অশেষ জ্ঞানলাভ করে। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়নে ও মর্ম্মগ্রহণে কয় জন সমর্থ? তুলসী সংস্কৃতভাষায় যে কয়েকটী স্তোত্র ও মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, তিনি বিশুদ্ধ ও সুললিত সংস্কৃত পদাবলীর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কেবল সর্ব্বসাধারণের হিতার্থেই দেশীভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জ্ঞান হয় যেন তুলসী-হৃদয়ের শান্তি ও পবিত্রতা ঐ স্থানে জীবন্তভাবে বিদ্যমান। কাশীর এক প্রান্ত বরুণানদী, অপর প্রান্ত অসীনদী। ঐ দুই নদীর নামে কাশীর নাম 'বারাণসী' হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দুই নদী শুষ্কপ্রায়। একদা তুলসীদাস অযোধ্যাপুরী ধ্যান করিতে করিতে অসীঘাটে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ডুবিয়া জলমধ্য দিয়াই তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে উঠিলেন, উহা গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থান। তিনি উঠিয়া তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কোন্ ঘাট? এ স্থানের ও এ স্থানের রাজার নাম কি? লোকেরা কহিল,—ইহা অযোধ্যার রামঘাট, এস্থানের রাজার নাম রামসিংহ এবং এ নগরের নাম রামপুর। বারংবার রামনাম শ্রবণ করিয়া তুলসীর প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। লোকেরা কহিল,—এ স্থানে আসিলে রাজাকে কর দিতে হয়। তুলসী কাতরভাবে কহিলেন, আমি দরিদ্র, অর্থ কোথা পাইব?

এদিকে তুলসীর আগমনবার্ত্তা নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাজা রামসিংহ তুলসীপ্রভুর শুভাগমন শ্রবণে পুলকিত হইয়া স্বয়ং পদব্রজে আসিয়া তদীয় চরণে পতিত হইলেন। রাজা করযোড়ে কহিলেন,—প্রভো! যদি কৃপা করিয়া এ দাসকে পদধূলি দিলেন, তবে এ শরণাগতকে আপনার শিষ্য করুন। আপনার শুভাগমন উপলক্ষ্যে আজি নগরের সমস্ত দীন-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে অন্নবস্ত্র দান করা হউক। অনন্তর তুলসীর সম্মতিক্রমে রাজা তাঁহার নিকট যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, নগরে মহোৎসব হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দেশের সমস্ত অধিবাসী রামভক্ত হইল। রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গুরুদেবের চরণপাদুকা (খড়ম) স্থাপন করিলেন। তিনি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ঐ গুরুপাদুকা পূজা করিয়াছিলেন

হরিপ্রাণা মীরাবাই (১) সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ

---

(১) মীরাবাই মন্তানামক দেশের রাজকন্যা, উদয়পুরের মহারাণার পত্নী। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অহেতুকী ভক্তি ছিল। তাঁহার স্বামী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত। কৃষ্ণভক্তা মীরার উপর তদীয় স্বামী ও শ্বশ্রূ ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মীরা অম্লান মুখে সকলি সহ্য করিতে লাগিলেন, কিছুতেই সাধনা হইতে বিচলিতা হইলেন না। শ্বশ্রূ মীরার সংহারের জন্য তদীয় চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিলেন। কথিত আছে, স্বীয় চরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিবার জন্য মীরা পতিদত্ত বিষপানেও মরেন নাই। মহারাণা কুপিত হইয়া মীরাকে খড়্গাঘাত করিলেন; কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল, মীরা অক্ষতদেহে রহিলেন। শেষে মহারাণা মীরাকে ধর্ম্মসাধনাবিষয়ে স্বাধীনতা দান করায়, মীরা নানা তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উচ্ছলিত প্রেমপূর্ণ ভগবৎসঙ্গীতে পশুপক্ষীরাও মুগ্ধ হইত। কথিত আছে,—আকবর বাদসাহ নিজ সঙ্গীতাচার্য্য তানসানের সহিত বৃন্দাবনে গিয়া মীরার সঙ্গীতশ্রবণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। উদয়পুরে ও অন্যান্য স্থানে মীরার প্রতিষ্ঠিত মঠমন্দিরাদি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এইরূপ প্রবাদ যে, মীরা স্বীয়

করিয়া, হরিভজনেই নিযুক্তা থাকিতেন ইহাতে তাঁহার স্বামী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মীরা অতিমাত্র নিগৃহীতা হইয়া, তুলসীদাসকে পত্র লিখিয়া মর্ম্মবেদনা জানাইলেন। লিখিলেন যে,—আমার স্বামী প্রভৃতি পরমাত্মীয়েরাই আমার সাধনাপথে গুরুতর বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। এখন আমি কি করি? তুলসীদাস তদুত্তরে মীরাকে নিম্নলিখিত ভজনগাথা লিখিয়া পাঠান ;—

জিনকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
জয়ে তিহৈ কোটি বৈরীসম যগুপি
পরমসনেহী
তজো পিতা প্রহ্লাদ বিভীষণ ভরত বংধু
মহতারী।
গুরু বলি তজো কং ব্রজবনিতা ভয়ে
সব মংগলকারী॥
নাতে নেহ রামকো মানিয়া সুহৃদ
সুসেব্য জহাংলৌং।
অংজন কৌন আংখ জো ফুটৈ বহুতৈ—
কহৌং কহাং লৌং॥
তুলসি সোই সব ভাংতি আপনো পূজ্য
প্রাণতে প্যারো।
জাতে হোয় সনেহ রামসোং সোঈ মত
হমারো॥"

এই ভজনগাথার অর্থ এই যে,—"যাঁহাদের ভগবানে প্রীতি নাই, তাঁহারা তোমার পরম স্নেহবান্ আত্মীয় হইলেও, কোটি-শত্রু-সম পরিত্যাজ্য। দেখ!—প্রহ্লাদ হরিভক্তিবিমুখ পিতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিভীষণ রামবৈরী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভরত রামদ্বেষিণী জননীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিরাজ হরিবিরোধী গুরুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন (১)। কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকারা পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানেই প্রেম নিবন্ধ করা চাই। যাহাতে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সেই অঞ্জনই সেবনীয়; যদ্দ্বারা জ্ঞান-নেত্র বিনষ্ট হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য্য। সার কথা এই যে,—যাঁহার উপদেশে ঈশ্বরে পরানুরক্তি জন্মে, তিনিই আমার পূজ্য ও প্রাণাধিক প্রিয়তম!"

তুলসীর এই কথাগুলি ভগবৎসাধনার পক্ষে সার সত্য। 'বেত্থান্তরস্পর্শশূন্য' না হইলে, অর্থাৎ মনকে সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ভগবানে সংলগ্ন

ভৌতিক দেহের তিরোধান জন্য স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সমীপে পাষাণভেদী কাতরস্বরে প্রার্থনা করায়, ঐ মূর্ত্তি মুখব্যাদন করিলেন, এবং মীরা ঝম্প দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার স্মরণার্থে উদয়পুরে মীরার ও তদীয় ইষ্ট দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং অদ্যাপি ঐ দুই মূর্ত্তির পূজা যথাবিধি হইয়া থাকে। তুলসীর ন্যায় মীরারও রচিত হিন্দি ভজনগাথা সকল প্রসিদ্ধ। মীরা তুলসীদাসকে ইষ্টগুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

(১) বলিরাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বামনরূপী হরিকে অঙ্গীকৃত ত্রিপাদভূমিদানে নিষেধ করেন ও বাধা উৎপাদন করেন, কিন্তু বলিরাজ গুরুর সে নিষেধ মানেন নাই।

করিতে না পারিলে, ভগবৎসাধনা হয় না, সে ব্রহ্মানন্দ-ভোগে অধিকার জন্মে না।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ! ॥"

"তুমিই মাতা, তুমিই পিতা ; ভাই, বন্ধু আত্মীয়, স্বজন তুমিই ; আমার বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়-বিভব সকলি তুমি। হে দেবদেব ! তুমি আমার সকলি।"

এইরূপে সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের এক-টানা স্রোত সেই প্রেমসাগরের দিকে প্রবর্ত্তিত হইলে, তবে ভগবৎসাধনা হয়। সর্ব্বত্যাগিনী গোপবালারা এইরূপ সাধনা করিয়াছিল। তাহাদের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, সকলি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। শুকদেব-সদৃশ মদীয় ৺ পিতৃদেবের একটী গান এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটী এই—

(উদ্ধবের প্রতি গোপিকাদের উক্তি।)

("মোরা) কৃষ্ণসুখে সুখী ব্রজাঙ্গনা।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ না করি সাধনা।
শুন ওরে উদ্ধব ! আমরা গোপিকা সব
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-রস করিহে কামনা !"

হে উদ্ধব ! তিনি আমাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি অন্তঃসাক্ষী, সকলি জানেন, তথাপি তাঁহাকে বলিও,—তাঁহার এ দাসীরা তাঁহার সুখেই সুখী। তিনি স্বয়ং উপযাচক হইয়া আমাদের হাতে হাতে চতুর্ব্বর্গ দান করিলেও, আমরা তাহা লই না। আমা-দের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তাঁহারি প্রীতি। আমরা সেই মধুদ্রুমের মাধুর্য্য-রসেরই ভিখারিণী। আমাদের পাপের ফল ও পুণ্যের ফল—তাঁহার বিরহ ও সম্মিলন।

কয়েকটী গোপবালার এইরূপে মোক্ষ-লাভ হইয়াছিল ;—

"তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা।
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপ-
কন্যকা ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

ভোগেই কর্ম্মফলের ক্ষয় হয়। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"—বিনা ভোগে শতকোটি কল্পেও কর্ম্মফলের ক্ষয় হয় না। পাপ পুণ্য নির্ম্মূল না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নহে। ফলের একটু বীজ অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা আবার অঙ্কুরিত এবং ক্রমে পল্লবিত ও ফলিত হয়। এজন্য বীজের ধ্বংস করা চাই। কয়েকটী গোপিকার কৃষ্ণবিরহ-সন্তাপ এত সুতীব্র হইয়াছিল যে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত পাপফল দগ্ধ হইয়া গেল। আবার কৃষ্ণচিন্তাজনিত আনন্দ তাহাদের হৃদয়ে এত বিপুল, এত গভীর ও এত প্রগাঢ় যে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত পুণ্যফল নিঃশেষিত হইল। তাহারা কান্তভাবে ধ্যান করিলেও সেই পরম-ব্রহ্মকেই ধ্যান করিতেছিল। সেই অবস্থায় যখন তাহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গেল, তখনি তাহারা মুক্তিলাভ

করিল। সাধনা যত গভীর হয়, সিদ্ধিও তত সন্নিহিত হয়। হৃদয়ে সে প্রেম-হুতাশন প্রজ্বলিত হইলে, দাবানলে তৃণ-রাশির ন্যায় অশেষ বাসনারাশি ভস্মীভূত হয়। ভক্তবৎসল নারায়ণ স্বয়ং প্রহ্লাদের সমীপে আবির্ভূত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে, প্রহ্লাদ বলিলেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিংতস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)।

—সন্নিপাত-বিকারের তৃষ্ণার মতন,
বিষয়ে যেরূপ তৃষ্ণা করে মূঢ়গণ,
সেইরূপ তৃষ্ণা মোর যেন দয়াময়!
হরি হে! তোমারি পদে চিরকাল রয়।
সহস্র সহস্র যোনি করিব ভ্রমণ,
হে নাথ! তাহাতে কষ্ট না করি গণন;
কিন্তু হরি! যে যোনিতে পড়িব যখন,
তোমাতে একান্তভাবে থাকে যেন মন।
অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্,
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান;
হস্তেই তাহার মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামে তার কিবা প্রয়োজন?

অহহ! প্রহ্লাদ! তুমিই ভগবান্‌কে ডাকিতে জান, এবং সেই প্রাণারামের নিকট কোন বস্তু চাহিতে হয়, তাহাও জান। আমরা সমুদ্রের বহিশ্চর, শফরান্বেষী মৎস্যরঙ্ক (১)। রত্নাকরের গভীর গর্ভে কি রত্ন নিহিত আছে, কিরূপে জানিব? সাধনা চাই। যদি বলি,—সে সাধনা কি সহজ কথা, সে যে অসাধ্য সাধন। সাধ্য কি অসাধ্য, তাহাই বা দেখিলাম কৈ? "পরিবার পরিবার" "অর্থ অর্থ" করিয়া যাহা করিলাম, তাহা যদি ঈশ্বরসাধনায় নিয়োজিত করিতাম, আজি শেষবয়সে এ দারুণ যাতনায় চিৎকার ছাড়িতে হইত না। কার্ডিন্যাল উল্‌জি, ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনিরির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একান্তভাবে অবিশ্রান্ত রাজসেবায় প্রাণ-পাত করিয়াছিলেন। শেষে সেই রাজাই যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বৃদ্ধ উল্‌জি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"If I had served God as diligently as I have served the king, He would not have given me over in my grey hairs."—যেরূপ একান্তভাবে আমি রাজসেবা করিলাম, সেইরূপে যদি ঈশ্বরসেবা করিতাম, এ বৃদ্ধ দশায় ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিতেন না।

অবিবেকী মানবের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়াই দয়ার্দ্রহৃদয় মহাত্মারা অশেষ প্রকারে মানবের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্যাণপ্রদ উপদেশে অনাস্থা করিয়াই আমরা যাতনা-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতেছি। আমাদের

(১) 'মৎস্যরঙ্ক'—মাছরাঙা পাখী। 'শফরান্বেষী'—যে চুণাপুঁটি খুঁজিয়া বেড়ায়। মাছরাঙা জলের উপর চুণাপুঁটি ধরিয়া বেড়ায়।

পরিণামকে ঘোর বিভীষিকাময় করিতেছি। একজন ঋষি বলিতেছেন ;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং ;
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতো শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

—পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্বপ্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গসুখের কারণ,
প্রাণপণে যে না করে তাহার সাধন,
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ দুঃখানল দহে অনিবার।

একদা এক বৈশ্য তুলসীদাসকে কহিল ;—ঠাকুর! আমি রঘুনাথজীর দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের উপায় করুন। তুলসী কহিলেন,—ভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শনলাভ সহজ নহে, উহা কোটিজন্মসাধনার ফল। বৈশ্য কিছুতেই ছাড়িল না, বলিল,—দয়া করিয়া এখনি কোনও উপায় করুন। তুলসী তদীয় ভক্তি পরীক্ষার্থে কহিলেন,—তুমি এক কাজ কর, একটী বড়ষা আনিয়া উহা উর্দ্ধমুখ করিয়া এস্থানে প্রোথিত কর, এবং তুমি এই বৃক্ষে উঠিয়া, বড়ষার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের উপর বেগে ঝম্প দিয়া পড়। ইহাতে রামদর্শন হইলেও হইতে পারে। বৈশ্য ঐ কথা শুনিয়া শীহরিয়া উঠিল, কহিল,—ঠাকুর! বড়ষার আগায় ঝাপ দিয়া পড়িলে আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, আমি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইব, কাজ নাই আমার রামদর্শনে, ইহা বলিয়া বৈশ্য প্রস্থান করিল। অন্যান্য লোকবৃন্দের সহিত এক ক্ষত্রিয় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঐ তামাসা দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে না। তিনি তুলসীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নিজহস্তস্থিত বড়ষা সেই স্থানে পুতিলেন এবং বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, "জয় রাম" শব্দে সেই বড়ষার অগ্রভাগে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অহো! বিধাতার ইচ্ছা অচিন্তনীয়! কে যেন আসিয়া তাঁহাকে শূন্যে ধরিয়া রাখিল। বড়ষার অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষস্পর্শ করিল না। তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন,—সম্মুখে এক অপরূপ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-মূর্ত্তি! দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে ও ভক্তিভরে বিহ্বল হইয়া তুলসীর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

মাদৃশ জড়বুদ্ধি লোকে মনে করিতে পারে,—ইহাও কি সম্ভব? সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রে ঝম্প দিয়াও অক্ষত রহিল! কিন্তু এরূপ অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনা শত শত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কাশীর তৈলঙ্গস্বামীকে একজন খাদ্যের সঙ্গে সুতীব্র বিষ ভোজন করাইয়াছিল, তিনি অম্লানমুখে বিষ

ভোজন করিয়া অবিকৃত রহিলেন। তাঁহার আত্মা তখন পরমাত্মার ধ্যানে তন্ময়, এজন্য তাঁহাতে বিষশক্তি ব্যর্থ হইল। ইহার গূঢ়তত্ব প্রহ্লাদ-চরিত্রে বিবৃত আছে। যখন প্রহ্লাদের প্রাণ-সংহারের জন্য জল, অগ্নি, বিষ, বায়ু প্রভৃতি অশেষ প্রকার বধোপায় নিষ্ফল হইল, হিরণ্যকশিপু আর কোনও বধোপায় খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তিনি প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে
বিচেষ্টিতম্।
এতন্মন্ত্রাদিজনিতম্ উতাহো সহজং তব॥"

—প্রহ্লাদ তোমার আশ্চর্য্য প্রভাব! তোমার এ সকল কি ব্যাপার? একি তোমার স্বাভাবিক শক্তি? অথবা মন্ত্রাদি-শক্তি?

প্রহ্লাদ পিতৃচরণে প্রণত হইয়া কহিলেন;—

"ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত! নবা নৈসর্গিকং
মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি।"

—হে পিতঃ! ইহা মন্ত্রাদিশক্তিও নহে, আমার স্বাভাবিক শক্তিও নহে। সেই অবিকারী নারায়ণ যাহার যাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহার তাহার এ শক্তি সামান্য ব্যাপার।

সেই ক্ষত্রিয়যুবা সাধুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছিলেন, ভক্তবৎসল তখনি আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।—"রাখেন হরি, মারে কে?"

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

কাশ্মীরে যাইবার যে সকল পথ আছে তাহার মধ্যে রাওলপিণ্ডি হইতে শকট যাইবার উপযোগী যে পথ বিতস্তার (ঝিলমনদী) তীর দিয়া গিয়াছে, সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুবিধাজনক। অন্যান্য পথ বড় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। খাদ্যদ্রব্য ও থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। কোন-প্রকার শকটই চলে না, অত্যন্ত চড়াই ও উৎরাই। কেবল ডাণ্ডি বা ঘোটকে যাওয়া চলে। জম্বু হইতে শ্রীনগরের পথ সর্ব্বাপেক্ষা সোজা ও কম; মধ্যে মধ্যে মহারাজের বিশ্রামাগার আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু মহারাজের অনুমতি ব্যতীত বিশ্রামাগার পথিকদিগের জন্য উন্মুক্ত হয় না—এবং তিনি বন্দোবস্ত না করিয়া দিলে যান, বাহন, খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই মিলে না।

কিন্তু রাওলপিণ্ডি হইতে যে পথ গিয়াছে, তাহাতে সকল রকম যান বাহন চলে। চড়াই ও উৎরাই বেশী নাই। পথে

পান্থশালা, বিশ্রামাগার, ডাকবাঙ্গালা আছে। সর্ব্বদা লোকের যাতয়াতের জন্য কোনও বিপদের আশঙ্কাই নাই

রাওলপিণ্ডি হইতে গাড়ি ঠিক্ করিতে হয়। ধনজিভাই নামক একজন পার্শি বণিক্ সরকারি ডাক লইয়া যাইবার জন্য কাশ্মীররাজ্য হইতে অনুমতি পাইয়াছে, সেইজন্য কাশ্মীররাজ্যের ভিতর গাড়ির ঘোড়া বদল করিবার আড্ডা ও ঘোড়া রাখিবার অধিকার আছে। শীঘ্র ঘোড়া বদল হয় বলিয়া তাহার গাড়িই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র পৌছে। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর ২০০ মাইল, এই পথ ধনজিভাইএর গাড়িতে আড়াই দিনে পৌছিয়া দেয়। টঙ্গা, ল্যাণ্ডো, ভিক্‌টোরিয়া, একা প্রভৃতি সকল রকম যানই পাওয়া যায়। টঙ্গার ভাড়া ১২০৲ টাকা করিয়া, ইহাতে চালক ব্যতীত তিনজন মাত্র আরোহী যাইতে পারে। দুই একটী ট্রংক, একটী ছোট বিছানা, টিফিন বাক্স সহজেই টঙ্গায় যাইতে পারে—ইহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে একা-করাই সুবিধা। একার ভাড়া ২০ হইতে ২৫৲ টাকার মধ্যে। কাশ্মীরে পৌছিতে সাড়ে তিন দিন লাগে।

ধনজিভাইএর আড্ডা ব্যতীত আরও কয়েকটী গাড়ির আড্ডা রাওলপিণ্ডিতে আছে। ইহাদেরও সকল রকমের গাড়ি কাশ্মীরে যাতায়াত করে, ভাড়াও কম। কিন্তু কাশ্মীররাজ্যের ভিতর ইহাদের ঘোড়া বদল করিবার অনুমতি নাই। কাজেই একটী জুড়িতে সমস্ত পথ, থামিয়া থামিয়া লইয়া যায়, সেই জন্য তাহাদের গাড়ি শ্রীনগর পৌছিতে ৫ দিন লাগে। এই সকল গাড়িওয়ালাদিগের মধ্যে 'Eclipse Carrying Co.' সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও স্বত্বাধিকারী বাবু লাল্‌তা প্রসাদ অতি ভদ্রলোক।

যাহা হউক, আমরা ধনজিভাইএর আড্ডায় যাইয়া টঙ্গার বন্দোবস্ত করিলাম। স্থির হইল যে অতি প্রত্যূষে—এমনকি একটু রাত্রি থাকিতে আমরা রাওলপিণ্ডি হইতে যাত্রা করিব; তাহা হইলে মরি শৈলে পৌছিতে বেলা ১১টা হইবে। তথায় রাওলপিণ্ডির বন্ধুর একটী মিত্র কমিসরিয়েটে কর্ম্ম করেন—তাঁহার বাটীতে স্নানাহার সমাপন করিয়া বেলা ২টা নাগাইদ পুনরায় রওনা হইব।

এখানে বলা আবশ্যক, রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিতে হইলে মরি-শৈল পার হইয়া যাইতে হয়। এই পাহাড়টী উচ্চে নিতান্ত কম নহে—সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ৭০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপর একটী ক্ষুদ্র সহর স্থাপিত হইয়াছে।

রাওলপিণ্ডি হইতে মরি ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে রাওলপিণ্ডি ও তৎ-সন্নিকটস্থ শ্বেতাঙ্গেরা এই শৈলাবাসে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। বাঙ্গালার যেমন দার্জ্জিলিং, রাওলপিণ্ডি জেলার তেমনি মরি। মরিতে প্রথমতঃ ঐ দেশস্থ গোরা সৈন্যগণের জন্যই গবর্ণমেণ্ট সেনানিবাস প্রস্তুত করেন, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ আসিয়া আবাস

নির্ম্মাণ করাতে একটু সহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে ধনজিভাইএর ঘোড়া বদ্‌লাইবার একটী আড্ডা আছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী সাধারণের বিশ্রামাগার আছে।

পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা রাত্রি ৪টার সময় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, অস্তগমনোন্মুখ সুধাংশুর ক্ষীণ রশ্মিজাল নিদ্রাকুলিত রাওলপিণ্ডির বক্ষে সুধাবর্ষণ করিতেছে। আমাদের টঙ্গা শৃঙ্গধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। ক্রমে পরিচিত লোকালয়, বাজার ছাড়াইয়া মরির রাস্তায় পড়িল। রাস্তার দুইধারে সারি সারি শিশুগাছ যেন প্রহরীর স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রাওন নদী উত্তীর্ণ হইলাম, বরাকু ডাক বাঙ্গালা ছাড়াইয়া গেলাম, রাত্রি প্রভাত হইল, উষার অরুণালোকে দেখিলাম যে, টঙ্গা ক্রমে উচ্চে উঠিতেছে, দূরে গিরি-শৃঙ্গ সকল প্রতিভাত হইতেছে। এখন বেশ প্রতিভাত হইতেছে। এখন বেশ প্রভাত হইয়াছে—টঙ্গা এখন প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চে পার্ব্বতীয় পথ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিরি-শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল—ট্রেট্ ডাকবাঙ্গালা ছাড়াইলাম, —চড়াই ক্রমশঃ বেশী হইতে লাগিল—৩মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হইতে লাগিল, একটী ক্ষুদ্র অরণ্য অতিক্রম করিলাম, ৩২।।০ মাইলের নিকট মরির প্রসিদ্ধ ভাঁটিখানা দেখিলাম। তাহার পর "সনিব্যাঙ্ক" নামক হোটেল ছাড়াইয়া টঙ্গা মরি সহরের রাস্তায় প্রবেশ করিল। প্রায় তিন মাইল যাইবার পর ধনজিভাইএর আড্ডায় টঙ্গা পৌঁছিল। তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। আমরা সেখানে টঙ্গা ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর বাটীর অনুসন্ধানে চলিলাম। চৌরাস্তায় বন্ধুর ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে—পরিচয়ের পর বন্ধুর বাটীতে গেলাম। অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইলাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত যে কি রকম করিয়া আমাদের আপ্যায়িত করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ক্ষণেক বিশ্রামের পর স্নানাহার সম্পন্ন করা গেল। গৃহস্বামী ছাড়িবার পাত্র নহেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করা গেল। বেলা ২টার সময় বিদায় লইয়া টঙ্গা-আফিসে আসিলাম—আসিবার সময় মনটা বড় কাতর হইয়াছিল। সেই দুই ঘণ্টার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল, সে আদর, সে যত্ন ভুলিব না —শিশুদিগের সে মিষ্ট অভ্যর্থনা চিরদিন মনে থাকিবে। আসিবার সময় যখন মনে হইল যে, ইহার পর আর বঙ্গবাসীর আশ্রয় মিলিবে না—আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের রীতিনীতির সহিত পরিচয়ের এই শেষ স্থান পার হইলাম, ইহার পর যে দেশ দিয়া যাইব, যে গ্রামে বা নগরে আশ্রয় লইব—সে স্থানের লোক হয়ত আমার আচারব্যবহারে হাসিবে, হয়ত আমার রীতি নীতি, ভাব-ভঙ্গী তাহারা বাতুলতা বলিয়া মনে করিবে। আজ পর্য্যন্ত

স্বদেশবাসীর আশ্রয়ে ছিলাম—রাত্রি প্রভাতে বিভিন্ন রাজ্যে বিদেশীর অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতে হইবে। যাহা হউক, বেলা প্রায় ২॥০ টার সময় পুনরায় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। টঙ্গা দ্রুত-বেগে মরি অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া নামিতে লাগিল। এখন হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল—কোহালা ডাক্‌বাঙ্গালা পর্য্যন্ত একেবারে ঢালু। রাস্তার একদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বত, অপর দিকে ভীতিপ্রদ খাদ। মরি হইতে কোহালা সাড়ে সাতাস মাইল, ইহার মধ্যে কোন বিশ্রামভবন নাই। কাশ্মীর হইতে ফিরিবার সময় ইহার অভাব বড়ই অনুভূত হয়। কোহালা ব্রিটিশরাজ্যের শেষ সীমা। একদিকে মরিশৈল, অপর দিকে কাশ্মীররাজ্যের ভূধরমালা—মধ্যে মধ্যে বিতস্তার সলিলপ্রবাহ শ্বেত রেখার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। নামিতে নামিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নদীর অপর তীরের শৈলশ্রেণীর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যস্থ কৃষকদিগের কুটীর হইতে একটী একটী করিয়া দীপ সন্ধ্যাতারার ন্যায় ফুটিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ যে বিতস্তা, শীর্ণতোয়া এবং অস্পষ্ট রেখাবৎ দেখা যাইতেছিল, এখন তাহার কলনাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং উদীয়মান চন্দ্রালোকে তাহার সফেন বিপুল প্রবাহ হিমালয়ের যশোধারার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)।

পাগল মন।

হাসিছে প্রকৃতি,
হাসিছে জগত,
আমি কেন তবে
হাসিব না।
ভাসিছে জগত
সুখ-সরোবরে,
আমি কেন তবে
ভাসিব না॥

২

ছিল একদিন
আমার(ও) ধরায়,
হেসেছি কতই
পরাণ খুলে।
বিষাদ অশান্তি
যেত দূরে ভাসি,
পারেনিত কভু
ছুঁইতে ভুলে॥

৩

(আজ) কোথা সেই হাসি,
কোথা সেই খেলা,
কোথা সে আমার
শান্তি অমল।
অশান্তি-কালিমা

ভরা এ হৃদয়
ধড় জ্বালাময়
তীব্র গরল ॥

৪

গাহিতেছে পাখী
খুলিয়া পরাণ
আপন আনন্দে
আপনা হারা।
আমিও গেয়েছি
ওই পাখী মত
ঢালিয়া কতই
সুধার ধারা ॥

৫

খেলিতেছে শিশু
নির্ম্মল আনন্দে
জগত সংসার
সকলি ভুলে।
আমিও খেলেছি
ওই শিশু মত
সরল পরাণে
হৃদয় খুলে ॥

৬

কত নর নারী
কত সাধ আশা
নিমেষে নিমেষে
উথলে বুকে।
আমিও অমনি
কত সুখ-ছবি
কল্পনার সাথে
এঁকেছি সুখে ॥

৭

সুখ বাল্যকাল,
মধুর কৈশোর,
সুখের যৌবনে
কতনা ছবি!
(আজ) হতাশ নিরাশ,
হারায়ে সকল,
দুখের এ গানে
হয়েছি কবি ॥

৮

উৎসবের বাঁশী,
মধুর রাগিণী,
আর ত বাজে না
আমার পুরে।
শরৎ বসন্ত,
মলয় পবন,
আমারে ফেলিয়া
গিয়াছে দূরে ॥

৯

কুহেলিকা মাখা
জীবন আমার
একটু হেথায়
না আসে আলো।
হাসেনা চাঁদিমা,
হাসে না তপন,
চিরদিন সম
আঁধার কালো ॥

১০

আঁধারে রয়েছি
আঁধারে চলেছি
আঁধারেই ফিরি
হারাই পথ।

সঙ্গী সাথী নাই
একেলা একেলা
এমন করিয়া
রহিব কত ॥

১১

(তাই) হাসিরাশি হেরি,
হাসিবারে যাই,
আগেই নয়নে
আসেরে ধারা।
হাসিছে জগত,
প্রাণিবৃন্দ হাসে,
তুই কেন মন!
পাগল পারা ॥

প্রণয়ে প্রমাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দশজনে বলে, কোনও দূরদেশে গিয়া তুমি নাকি আবার বিবাহ করিয়া আসিয়াছ। এই বলিয়া জুবুটী ঠাকুরাণী কথা আরম্ভ করিলেন।

স্বামী কহিলেন হাঁ করিয়াছি।

স্ত্রী তখন আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়া কহিলেন,কি আবার বিবাহ করে এসেছ?

স্বামী—হাঁ বিয়ে করে এসেছি।

স্ত্রী—কেন?

স্বামী—তোমার সন্তান হয় নাই বলিয়া

স্ত্রী—আর?

স্বামী—আর কিছু না।

স্ত্রী—আর প্রথম যৌবন গিয়েছে বলিয়া জবা ঠাকুরাণী ত একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

স্বামী সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। স্ত্রী আবার কহিলেন, কোথায়?

স্বামী—বহুদূর। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি, এ অনুতাপে আমি মরিব। এই বলিয়া স্বামী কাঁদিতে লাগিলেন।

বিশুদ্ধচরিত্রা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মুখে কাতর বাণী শুনিয়া উপস্থিত সুখ, দুঃখ সব ভুলিয়া গেলেন। বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষুজল মুছাইয়া কহিলেন, কাঁদিও না,তুমিত আর সৃষ্টিছাড়া কাজ কর নাই।

স্বামী—আমি তোমার মলিন মুখ দেখিতে পারিব না।

"না, তোমার তাহা দেখিতে হইবে না, এই আমি হাসিতেছি" বলিয়া সাধ্বী স্ত্রী হাসিতে লাগিলেন।

স্বামী—দেখ ছয় মাস চাকুরী করি, ছয় মাস বসিয়া থাকি, এইরূপ গোলমালে টাকা পয়সার সংস্থান করিতে পারি নাই। একটা বাড়ীও করা হয় নাই। এই সব কারণে মন বড় খারাপ হইয়াছে।

স্ত্রী কহিলেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার অসুখ কিসের?

স্বামী—টাকার অভাব তুমি কিরূপে নিবারণ করিবে ?

কেন আমার গহনাগুলি লও, কলিকাতায় একটী বাড়ী কর। যখন তোমার কাজ থাকিবে না, তখন সেই বাড়ীতে তুসতীনে গিয়া বাস করব। যখন তোমার কাজ থাকে না, তখন আমি পিত্রালয়ে বাস করি, কিন্তু সতীন্ লইয়া ত তাহা পারিব না। একটা বাড়ী করিতেই হইবে, এই বলিয়া ভুবুটী ঠাকুরাণী গহনার বাক্স আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, স্বামী দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ত্রীর গহনাগুলি গ্রহণ করিলেন।

শাবন্ত ইঞ্জীনিয়ারী করিয়া অনেকগুলি জিনিস পত্র কিনিয়াছিলেন। এক দিন ভুবুটী ঠাকুরাণী স্বামীকে কহিলেন, বাড়ী ঘর নাই, তোমার জিনিসগুলি লইয়া আমার বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বামী কহিলেন,"—আচ্ছা।"

পর দিন বৈকালে ভুবুটী ঠাকুরাণী বেড়াইতে গিয়েছিলেন, কতিপয় প্রতিবাসী স্ত্রীলোক গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার সমুদয় জিনিসপত্র লইয়া চম্পট দিতেছেন।

স্ত্রী যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে আসিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসিনীর কথাই সত্য। ব্যাপার যে কি, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না, গরুর গাড়ীর উপর হইতে জিনিসপত্রগুলি নামাইয়া রাখিলেন। স্বামীও কিছু কহিলেন না, ধুতি চাদর পরিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; আর গৃহে ফিরিলেন না। স্ত্রী ভাবিলেন, স্বামী বাড়ী করিতেই কলিকাতা গিয়াছেন, তিনি তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। পিত্রালয়েই রহিলেন, কিন্তু এক বৎসর স্বামীর কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। অতঃপর শুনা গেল, শাবন্ত বাবু নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া আসাম চলিয়া গিয়াছেন। সেইখানে তাঁহার কাজও হইয়াছে।

স্বামী বাড়ী করেন নাই; তাহার গহনাগুলিও ফেরত দেন নাই; নবপরিণীতা পত্নীসহ বহুদূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, এই ভয়ানক কুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ভুবুটী ঠাকুরাণী প্রথমে শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিলেন, তাহার পর তাহার ভাগিনাকে সঙ্গে করিয়া আসামে চলিলেন।

বাসন্তী উষা চলিয়া গেল, প্রীতিময়ী প্রভাতীর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ফুল ফুটিয়া উঠিল। কোকিলের কলনাদে ঝলকে ঝলকে মধু বর্ষণ হইতে লাগিল, বালারুণ তখনও জ্যোতি বিকিরণ করে নাই, সমীরণ তখনও বরফের মতন শীতল। এই সময় ভুবুটী ঠাকুরাণী স্বামীর সংসারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্বামী শয্যায় শুইয়া তখনো নাসিকা গর্জ্জন করিতেছিলেন, পার্শ্বে বালিকা স্ত্রী নিদ্রায় অভিভূতা। মামীকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভাগিনা দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মামা! মামা! বলিয়া ডাকিলেন। শাবন্ত বাবু জাগ্রত হইয়া বলিলেন, কেও ?

ভাগিনা। আজ্ঞে আমি।

মামা। কেও, রশ্মি?

ভাগিনা। আজ্ঞা।

মামা উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, সব ভাল ত?

ভাগিনা—মামীমা এসেছেন।

আঁ, আঁ আঁ তোমার মামীমা কে? কে? বলিতে বলিতে মামামহাশয় একেবারে বসিয়া পড়িলেন। ভাগিনা বলিলেন,—চিনিতে পারিতেছেন না?

সেই সময় শাবন্তবাবুর নববিবাহিতা স্ত্রী শয্যা হইতে উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর দিকে বার বার চাহিতে ছিলেন। স্বামী সে ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার মনোভাব গোপন করিয়া ফেলিলেন, ও তাড়াতাড়ি বালিকা স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমার দিদি এসেছেন স্থল!

স্থলপদ্ম—আপনি যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন বলিয়াছিলেন আপনার মধ্যমা স্ত্রী কুৎসিতা, কুরূপা, চিররুগ্না ও চলৎশক্তিহীনা।

স্বামী—ওঃ! সে তোমার চিত্তরঞ্জনের জন্য।

এই কথার পরই ডুবুটী ঠাকুরাণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর কথা, সতীনের কথা, দুই শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

স্বামী—একি? এত দূরের পথ একজন বালকের সঙ্গে আসিয়াছ, তোমার কি ইজ্জতের ভয়ও নাই?

ডুবুটী—আছে বইকি, তবে পেটের দায়ে সবই করিতে হয়। যখন গহনাগুলি লইয়া পলাইয়েছিলে, তখন এই ক্ষুৎপিপাসিতার ইজ্জত কে রক্ষা করিয়াছিল?

স্বামী—সে কথা এখন থাক, এখন যাও, ঐ সাম্‌নে একটা দিঘী আছে, সেইখানে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া এস। বেলা হইলে লোক জমিবে। ডুবুটী ঠাকুরাণী তাহাই করিলেন।

এই অবসরে তাহার স্বামী লোহার বাক্সটা সরাইয়া ফেলিলেন। ডুবুটী ঠাকুরাণীর ভাগিনা এ সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সেই লোহার বাক্সে তাঁহার গহনা ছিল। তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে কহিলেন। স্বামীও রাগিয়া কুঁদিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ আমার যা খুসী করব, তোমার তাতে দরকার কি?

ডুবুটী—লোহার বাক্সের কথায় আমার দরকার নাই সত্য, কিন্তু আমার গহনা গুলির কথায় ত আমার দরকার আছে। সেগুলি কোথায় রেখেছ আমি শুনিতে চাই।

(ক্রমশঃ)।

আমরা কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(৬) দেশের কতকগুলি কাজ করিবার জন্য একটী সম্প্রদায় গঠিত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। এই সম্প্রদায় নেতৃবর্গদ্বারা চালিত হইবে। গ্রামে গ্রামে দুই একজন, নগরে নগরে বিশ, পঁচিশ জন এই দলের লোক থাকা চাই। ইঁহাদের প্রধান কাজ হইবে লোকশিক্ষা। ইঁহাদিগকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইতে হইবে, এবং দেশের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সকল ধর্ম্ম এবং সকল জাতির প্রতি ইঁহাদের সমভাব হওয়া চাই।

মৃত মহাপ্রাণ নফরচন্দ্র কুণ্ডু এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। ইঁহাদের ভরণপোষণের ভার দেশকে লইতে হইবে, কারণ নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ভাবিতে হইলে সাধারণের কাজে ইঁহারা মন ও বেশী সময় দিতে পারিবেন না। এ কাজের জন্য প্রচুর অর্থ চাই ; পুর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল কাজই অর্থ সাপেক্ষ। অর্থ আমাদিগকে যোগাইতে হইবে। না পারি কাজ হইবে না। তবে রোম নগর এক দিনে গঠিত হয় নাই। আমাদের শক্তি অনুসারে অল্প মাত্রায় কাজ আরম্ভ করা হউক। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। যে সব লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, অবস্থানুসারে তাঁহাদের অনেককেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভাবনা যদি ভাবিতে হয়, বিলাস-দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য পালনে ইঁহারা সক্ষম হইবেন না। সাধারণতঃ এই নিয়ম হওয়া চাই, অবস্থা-ভেদে ইহার ব্যতিক্রম হইতে যে না পারিবে এরূপ নয়। উপরে বলিয়াছি, ইঁহাদের কাজ হইবে প্রধাণতঃ লোক-শিক্ষা। শিক্ষার মানে অবশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা। দেশের সকল ভাল কাজে ইঁহাদিগকে অগ্রগামী হইতে হইবে, এবং দেশের লোককে চরিত্রের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতে হইবে। চিরজীবনই যে ইঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে হইবে তাহা নহে। একটী নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করার পর সকলের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার অধিকার থাকিবে। দেশে অনেক বিধবা রমণী আছেন। তাঁহাদিগকে কি এই সম্প্রদায়ের এক শাখাভুক্ত করিয়া দেশের অনেক কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে না? আমাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর বড় অভাব। প্রতি গ্রামের দুই চারিটী বিধবাকে শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করাইতে পারিলে দেশের যে কি মঙ্গল হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় কাজটা সম্ভবপর কি বলিতে পারি না,

কিন্তু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? একাগ্র যত্ন ও চেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিধবাদের উপযুক্ত আরও অনেক কাজ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না।

(৭) সমাজসংস্কার। সমাজে অনেকগুলি কদর্য্য প্রথা আছে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের উচ্ছেদসাধনা করিতে না পারিলে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। বামাবোধিনীর কলেবরের পক্ষে প্রবন্ধ খুব বড়ই হইয়াছে, এবং সমাজসংস্কার বড় বিশাল প্রশ্ন। এ স্থানে এ প্রশ্নের আলোচনা হওয়া অসম্ভব; এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই মাত্র। আমরা নিশ্চেষ্ট এবং এই নিশ্চেষ্টতা সজীব; আমরা রক্ষণশীল, এবং এই রক্ষণশীলতা অন্ধ। এখন আমাদিগকে এই সজীব নিশ্চেষ্টতাকে নির্জীব করিতে হইবে, এই অন্ধ রক্ষণশীলতাকে চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে। যে সব প্রথা আমাদের উন্নতির প্রতিকূল, একতার প্রতিকূল, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে; নতুবা আমাদের বিনাশ নিশ্চিত। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব মাত্র। হিন্দুর মুসলমানের প্রতি যে ঘৃণা, তাহা দূর করিবার সময় কি আসে নাই? বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে একত্র মিলা মিশা যত কম, হিন্দুস্থানের আর কোথাও তত নয় বলিয়া মনে হয়। হিন্দুর ঘরে কুকুর প্রবেশ করিলে যে সব জিনিষ নষ্ট হয় না, মুসলমান প্রবেশ করিলে তাহা নষ্ট হয়। ইহা কি ঠিক? ইহা কি আত্মদ্রোহিতা নয়? মুসলমানকে বলি হিন্দুকে কি তোমার পর ভাবা উচিত, পর ভাবিলে কি চলিতে পারে? তাহাকে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করিলে, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিলে কি তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না? তোমার কর্ত্তব্য পালনে দোষ পড়িবে না? হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মভেদ ও কিয়ৎপরিমাণে আচারভেদ আছে বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইতে পারে না? তারপর হিন্দুসমাজের নিম্নতর স্তরের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। উচ্চতর স্তরের হিন্দুর নিম্নতর স্তরের হিন্দুর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যদি সমাজ ছারখার করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে নিম্নতর জাতির প্রতি এ নিষ্ঠুর ব্যবহার পরিহারের সময় আসে নাই কি? এই অত্যাচার ও উৎপীড়নে তারা যদি হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হইবে কি? অনেক জাতি আছে, যাহাদের লোকেরা বেশ শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হইলেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসেন না; যাহাদের লোকেরা খুব নিষ্ঠাবান্ হইলেও তাহাদের জল স্পর্শ করেন না। জিজ্ঞাসা করি,—এরূপ আর কতদিন চলিবে? সময় ও শিক্ষার গুণে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ

ক্রমে প্রবল হইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যদি ইহাকে উৎসাহ না দিয়া অবজ্ঞা করেন. ক্ষতি বেশী হইবে তাঁহাদেরই এবং সমাজের বিশেষ অপকার হইবে। আর এক দিকে দেখুন। সমাজের এক জাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ হয় না। রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বারেন্দ্রশ্রেণীর বাড়ী বিবাহ করিতে পারেন না। দক্ষিণরাঢ়ীর কায়স্থ উত্তররাঢ়ীর কায়স্থের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে পারেন না। অন্যান্য জাতির ভিতরও এরূপ। এক শ্রেণীর ভিতরেও সকলের সঙ্গে সকলের কুটুম্বিতা হইতে পারে না। ইহাতে কি সমাজের অনিষ্ট হইতেছে না? এ দুষ্ট প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা সকল বুদ্ধিমান্, দেশহিতৈষী ব্যক্তির করা উচিত। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা কায়স্থ সমাজে এই প্রথা উঠাইবার কিয়ৎ পরিমাণে চেষ্টা হইতেছে। ক্রমে ক্রমে বাল্যবিবাহ উঠান দরকার নয় কি? কিন্তু অনেক শিক্ষা ও জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিকেও আপন আপন শিশু পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে দেখিতে পাই। বাল্যবিবাহের অত্যাচারে আমরা ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি, বালকবালিকার শরীর উৎসন্ন যাইতেছে, রুগ্ন ও নির্জীব সন্তান উৎপন্ন হইতেছে, মানসিক বল ও তেজের, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের উদ্রেক হইতেছে না, তবু কয়জনকে এই কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায়? এবং ইহার উচ্ছেদসাধন না হইলে আমাদের বিশেষ ভরসা কিছু আছে কি? সমাজসংস্কার সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলিতে চাহি না। আমার মনের ভাব সহজে অনুমিত হইবে।

(৮)

বঙ্গীয় হিন্দুমহিলাকে দুই এক কথা বলিয়া আজ ক্ষান্ত হইব। সে দিন এক ইংরাজী কাগজে দেখিলাম,—স্বদেশী বস্ত্র প্রচারে তাঁহারা প্রধান সহায় হইয়াছেন। তাঁহাদের ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও অনেক পুরুষসিংহকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গ মহিলার এ কথা গৌরবের কথা নয়! এখন আর কে বলিবে যে তাঁহারা অবলা? তাঁহারা খুব প্রবলা। তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে,—তাঁহারা সমাজের কল্যাণ সাধন ব্রত গ্রহণ করুন এবং সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হউন। কবির কথা ঠিক।

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

দেশের শিশুদিগের হৃদয়ে যদি উচ্চ ও উদার ভাবের বীজ বপন করিতে হয়, তাঁহারা ছাড়া তাহা কে করিতে সক্ষম? দেশের পুরুষদিগকে যদি সৎকাজে ব্রতী করিতে হয়, তাঁহারা না করিলে তাহা আর কে করিবে? মুসলমান ও নিম্নতর জাতির প্রতি ব্যবহারের মূলে তাঁহারা। উহার ছোঁয়া জিনিষ গ্রহণ করিলে উহাকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হইবে এই

সব ভাবের প্রাবল্যের প্রধান হেতু তাঁহারা। সকল দিক্‌ ভাবিয়া এ সম্বন্ধে যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা একটু উদারতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে যে কি কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যবিবাহের মূলেও অনেকটা তাঁহারা। শিশু পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহারা জিদ করেন বলিয়াই বাল্যবিবাহের সংখ্যা বিশেষরূপ কমিয়া যাইতেছে না। মহিলারা যদি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, কোন পুরুষের ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবার সাহস কুলাইবে? করজোড়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা সমাজসংস্কার-ব্রত গ্রহণ করুন, আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন অন্তর্হিত হইবে।

"বন্দে মাতরম্।"

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত বাল্যলীলা।

এই মহাপুরুষের কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা ১৩১৩ সালের বামাবোধিনীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এবারে তাঁহার অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত এবং বাল্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জব্বলপুরে ঠগী আপিসে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তথায় স্বকৃত ভবনে সপরিবারে বাস করিতেন। হরচন্দ্রের প্রথম কন্যা ভবতারিণীর জন্মের পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণ এবং কন্যা নিস্তারিণী জন্মগ্রহণ করেন। এই সন্তানত্রয়ের জন্মের পরে ১৪ বৎসর কাল হরচন্দ্রের আর সন্তান সন্ততি হয় নাই।

হরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহেশ চন্দ্র অল্প বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করেন। আর সন্তান হইল না বলিয়া, হর চন্দ্র ও তদীয় পত্নী চন্দ্রমণি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময় হর চন্দ্রের সেই সন্ন্যাসী ভ্রাতা মহেশ চন্দ্র আসিয়া দেখা দেন, এবং ভ্রাতৃবধূ চন্দ্রমণিকে একটী মাদুলী দিয়া বলেন, "ইহা ধারণ করিলে আবার সন্তান হইবে।

এই ঔষধ ধারণের অনতি বিলম্বে চন্দ্রমণির সন্তানের লক্ষণ হইল। দশ মাস দশদিন অতীত হইলে একদিন চন্দ্রমণির প্রসববেদনা উপস্থিত জানিয়া, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধাত্রী ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার সেই সন্ন্যাসী ভ্রাতা বগলে একটী কাল পাঁটা, হস্তে একখানি ছুরিকাসহ বনমধ্য হইতে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং বলিলেন,"— ধাত্রী ডাকিতে

হইবে না।”তখন তিনি পাঁঠাটী বাম হস্তে শূন্যে ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তস্থ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার একাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে প্রসূতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সন্ন্যাসী মহেশ চন্দ্র নব প্রসূত সন্তান বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং স্বহস্তে তাহার নাড়ী কাটিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সাত মাস অতীত হইল। সন্তানের অন্নপ্রাশন দিবার জন্য হরচন্দ্র আয়োজন করিলেন এবং অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসী ভ্রাতা মহেশচন্দ্র পুনঃ দেখা দিলেন, এবং শিশুর অন্নপ্রাশন কার্য্য শেষ করিয়া উহার নাম কালীচরণ রাখিলেন। মহেশ চন্দ্র এবার যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “এই ছেলেকে তোমরা কোনরূপ কষ্ট দিওনা; কষ্ট দিলে তোমরা ইহাকে রাখিতে পারিবে না।”

কালীচরণের পঞ্চম বর্ষ বয়সে হরচন্দ্র তাহার হাতে খড়ি দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণের প্রতি শিশুর বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। একদিন শিক্ষাদান কালে তিনি কালীচরণকে একটী চপটাঘাত করেন। এই সামান্য প্রহারে কালীচরণ অবিরাম কান্দিতে লাগিলেন। কান্না কিছুতেই থামেনা। পিতা মাতা চিন্তাকুল হইলেন। এমন সময় সন্ন্যাসী মহেশচন্দ্র পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইলেন এবং রোরুদ্যমান শিশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কালীচরণের ক্রন্দন থামিল। সন্ন্যাসী রোষভরে বলিলেন,—“তোমরাএই অমূল্য রত্নকে না চিনিয়া ইহাকে কষ্ট দিতেছ, অতএব ইহাকে রাখিতে পারিবে না”। এই বলিয়া তিনি কালীচরণকে মাতৃক্রোড়ে অর্পণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রমণি অনেক অনুনয় বিনয়ের সহিত তাহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু মহেশচন্দ্র ফিরিলেন না।

কালীচরণ এগার বর্ষে পদার্পণ করিলেন। হিন্দু প্রথানুসারে উহার উপনয়নের দিন স্থির হইল। কালীচরণকে কালীঘাটে লইয়া দীক্ষা দেওয়া হইল। উপনয়নের দিন “ইহাকে তোমরা রাখিতে পারিবে না.” সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যৎ বাণী মনে হওয়ায় সকলে মায়ের মন্দিরাভ্যন্তরে কুণ্ডলী করিয়া তন্মধ্যে কালীচরণকে রাখিয়া মন্দিরের দরজা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করতঃ রাত্রিযাপন করিলেন। সকলের মনে ভয় ছিল, পাছে কালীচরণ এই রাত্রে দণ্ডী হইয়া বাহির হইয়া যান। এই রাত্রি নিরাপদে প্রভাত হওয়ায় সকলেরই সাহস হইল কালীচরণ সংসারত্যাগী হইবেন না। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণীর ভয় কাটিয়া গেল।

কালীচরণ অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্নান আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করিতেন এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে দেব দেবীর বন্দনাদি শুনাইতেন। কালীচরণ মধুরভাষী ছিলেন বলিয়া চন্দ্রমণি কালী চরণের নিকট রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ শুনিতেন।

কিছুকাল পরে কালীচরণের পিতার মৃত্যু হইল। তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবীচরণ পশ্চিমাঞ্চলে জব্বলপুরে পৈতৃক আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। কালীচরণ কলিকাতায় বাসা করিয়া বিধবা ভগিনী ও ভ্রাতৃপুত্র সহ বাস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অধ্যায়নে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

প্রগাঢ় যত্ন ও অসামান্য অধ্যবসায় প্রভাবে কালীচরণ অচিরে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অতুলনীয় স্মরণশক্তি ছিল। কোন নূতন পুস্তক পাইলে তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল কালীচরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিলেন, ইহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সরলতা সত্যপরায়ণতা ও উদারতাগুণে কালীচরণ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীদিগের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কালীচরণ যে বিধবা ভগ্নী ও ভ্রাতৃপুত্র সহ কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তাহারা একে একে কালগ্রাসে পতিত হইল। কালীচরণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি কলিকাতায় মিশন হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট ইংরাজিতে "হৃদয়বিদারক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রিয় দাদা,

সম্প্রতি আমাদের যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আপনার গোচরার্থে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আমাদের প্রিয়তম বিধবা ভগ্নী মায়াপাশ ছিন্ন করতঃ পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আশার আধার প্রিয়তম আত্মজ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ায় আপনার হৃদয়ে অতুল আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু দাদা, আপনার হরিষে বিষাদ জন্মাইয়া আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। না জানি এই পত্র পাঠে আপনার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে! যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনিবার্য্য, ভাবিলে বা আর্ত্তনাদ করিলে কোনও ফল হইবে না।"

অনেক দিন পরে কালীচরণের পত্র পাইয়া অগ্রজ ব্যগ্রচিত্তে সহর্ষে পত্র উন্মুক্ত করিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে নয়নজলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল, এবং কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ক্ষণেক পরে উন্মত্ত প্রায় হইয়া এক কাটারী হস্তে "কেলেকে কাটিব" বলিয়া বেগে ধাবিত হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী চাকর ছুটিল।

রেল ষ্টেসনের সকলেই তাঁহাকে চিনিত ও সম্মান করিত। ষ্টেসন মাষ্টার ভৃত্যের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার টিকিট দিয়া ভৃত্য সহ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া তিনি উন্মত্ত ভাবে কালীচরণের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা মিশন

হাউস অভিমুখে চলিলেন। মিশন হাউসের* নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি কালীচরণের দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র কালীচরণ দ্বিতল হইতে অবতরণ করিলেন এবং মিশনহাউশের আঙ্গিনায় ভ্রাতৃদ্বয় গলাগলি করিয়া কান্দিতে কান্দিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিশন হাউসের ভদ্রবৃন্দ কালীচরণ ও তাহার ভ্রাতাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিলেন।

জ্যেষ্ঠ বলিলেন, কালী! ভগ্নী ও পুত্র শোক আমি সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তুই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিলি! এই অসহনীয় বিচ্ছেদশোক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। কালী তোর বিচ্ছেদে আমার এই অবস্থা, বৃদ্ধা মাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। ভাই! ফিরিয়া বাড়ী চল, তুই বল, আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হই নাই।”

কালীচরণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দাদা, যেমন স্থির জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে, সমস্ত জলরাশি আলোড়িত হয়, তদ্রূপ আমার প্রশান্ত হৃদয় ভগ্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকাঘাতে তরঙ্গিত হওয়ায়, আমি বিচলিত হইয়া সংসারত্যাগের বাসনা করিয়াছিলাম এবং কিরূপে সংসার বন্ধন ছিন্ন করতঃ পরিণামে অনন্ত জীবন পাইব, সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছিলাম। পরিশেষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে আত্ম সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি। আমার জন্য আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না; ফিরিয়া ঘরে যাউন। আমি আপনার সেই ভ্রাতৃবৎসল স্নেহের ভ্রাতাই আছি। ইহজগতে পূর্ব্ববৎ প্রেমবন্ধনে উভয়ে আবদ্ধ থাকিব। কেবল-মাত্র পরিণামের মুক্তিমার্গ স্বতন্ত্র গৃহীত হইল।

জ্যেষ্ঠ অনেক কান্দিলেন, কালীচরণকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিফলকাম হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ভগ্ন হৃদয়ে মিশন হাউস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্ব ঘটনাবলি যুগপৎ দেবীচরণের মনে পড়িয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, উঃ! সন্ন্যাসী খুল্লতাতের ভবিষ্যৎ বাণী—

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বাতুলের ন্যায় প্রকাশ্যে বলিলেন,—

শ্যামা মার বরপুত্র তুমি দেব-দূত,
জন্ম নিলে অবনীতে হয়ে নরসুত।
ভ্রাতৃভাবে অতি যত্নে রেখেছিনু তোকে,
তোমা হারা হয়ে এবে ডুবিলাম শোকে।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

---

* মিশন হাউস—১৯ নং ডফ ষ্ট্রীট অধুনা যে স্থানে (United Free Chnrch Girls' School) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত।

গীতার ব্যাখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

লও জীব চিরকাল আমার শরণ;
দূরে যাবে ভব-ভয় পাবে পরিত্রাণ।

এই দুইটী পংক্তিই গীতার মূল মন্ত্র ও চরম শিক্ষা। এই মন্ত্রটী ভারতনারী নিবিষ্ট ভাবে ও ভক্তিবিপ্লুত হৃদয়ে জপ করিলে বুঝিতে সক্ষম হইবেন, এই পৃথিবীতে ধন জন এ সকল অস্থায়ী। ব্রহ্মকৃপাই জীবের একমাত্র সহায় ও সম্বল। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারি অনন্ত কৌশলের ক্রীড়াভূমি। মোহাচ্ছন্ন মানবকে প্রকৃতি সহস্রবার অসংখ্য সঙ্কেতে সেই ভবের কাণ্ডারীর শরণ লইতে মনকে উত্তেজিত করে। ভক্তের অতি সামান্য উপহারও ভগবান্ প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন।

আমি সহজে মিলিত হই, পাপীর সনে
যদি ডাকে একবার কাতর প্রাণে।
অহঙ্কারী পাপী যারা
আমার দেখা পায়না তারা।
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।

ভগবান্ এই উক্তি দ্বারা পাপীকে অভয় দিয়া থাকেন। প্রভু অধম সন্তানকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। জগাই মাধাই তাহার দৃষ্টান্ত। আমরা যতই হীন হইনা কেন, তাঁহার সুশীতল অভয়বাণী ঘোর বিপদসাগরেও ভক্ত মানবের জীবনতরণী সুপথে চালিত করে। ঘোর পাপের আবর্জ্জনায় যখন লুণ্ঠিত হইয়া ও অকূল সলিলে ডুবিয়া প্রাণ মৃত হয়, তখন কাহার অনন্ত শক্তি পাপীকে সংসারের কর্দ্দম ধৌত করিয়া স্বর্গের পথে চলিতে বলীয়ান্ করেন, সহস্র পাপে জীবন কলঙ্কিত হউক না কেন, আমরা অভূতপূর্ব্ব চেতনা লাভ করিয়া ধন্য হই ইহাই ঈশ্বরের বাণী।

গীতা পাঠের উপকারিতা ভারত নারীগণের মনে উদ্দীপ্ত করিবার আশায় আমি সংক্ষেপে গীতার কিঞ্চিৎ বাখ্যা করিলাম। ভারতনারী পুরাকাল হইতে ধর্ম্মপ্রবণহৃদয়া বলিয়া বিখ্যাত আছেন, জ্ঞান সভ্যতার আলোকে সেই গুণ বিসর্জ্জন না করিয়া বর্দ্ধিত করিতে প্রাণ মনের সহিত যত্নশীলা হউন, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

আর্য্যদিগের রন্ধন-শালা ও ভোজনস্থানাদি।

যৎকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের রন্ধন বিদ্যার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তৎকালের আলোচ্য রন্ধন-নিয়ম সমুদায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই যে, রন্ধনগৃহাদি নির্ম্মাণ, ভোজনস্থান নির্দ্দেশ ও পাকপাত্রের নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহাদের অনেকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম

ছিল। ভবনস্থ স্থানসমূহের মধ্যে রন্ধন-গৃহ নির্ম্মাণেরও একটী দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ বিশেষতঃ নৃপতিগণ এই নিয়ম পালন বিষয়ে যথোচিত যত্ন করিতেন। কোন্‌দিকে কোন্ গৃহ নির্ম্মাণের বিধি ছিল, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায়;—

"প্রাচ্যাং দিশি স্নানগৃহমাগ্নেয্যাং
পচনালয়ম্।
"শয়নং যাম্যদিগ্‌ভাগে নৈঋ্ত্যাং
শস্ত্রমন্দিরম্।
প্রতীচ্যাং ভোজন-গৃহং বায়ভাগে সভাগৃহম্।"
(ইত্যাদি, মুহূর্ত্তচিন্তামণিটীকায়াং
কশ্যপবচনম্।)

অনুবাদ। পূর্ব্বদিকে স্নানগৃহ, অগ্নি-কোণে রন্ধন শালা, যাম্যদিগ্‌ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে শয়ন গৃহ, নৈঋতকোণে অস্ত্রালয়, পশ্চিমদিকে ভোজনগৃহ, ও বায়ুকোণে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

উল্লিখিত শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে, পাকশালা ও ভোজনশালা এক ছিল না, অর্থাৎ যে গৃহে রন্ধন করা হইত, সেই গৃহে বসিয়া ভোজন করিবার নিয়ম ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও অনেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ভবনে এই নিয়ম প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। একই গৃহে রন্ধন ও ভোজন হইলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পিপীলিকাদি কর্ত্তৃক নীত হইয়া তৎসংস্পর্শে খাদ্যবস্তুর পবিত্রভাব নষ্ট হইতে পারে। রন্ধন গৃহটী সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য। রন্ধনগৃহে একেই অগ্নির উত্তাপাদি বর্ত্তমান থাকে, ইহার উপর আবার ভোজনার্থে তথায় বহুলোক সমাগত হইলে তাহাতে উত্তাপাধিক্য ও নিশ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ু দুষ্ট হইতে পারে। যেখানে স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করেন, সেখানে তাঁহাদিগের স্বাধীন ভাবে থাকিবার নিয়মই ভাল। হয়ত, কখনও কার্য্যব্যগ্রতা প্রযুক্ত মহিলাদিগের অসাবধানতা ঘটায়, লজ্জাশীলতারও ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এ জন্যও পাকগৃহ এবং ভোজনগৃহ পৃথক্ থাকা ভাল। বোধ হয় এবম্বিধ আরও অনেক যুক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারগণ রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ পৃথক্ রাখিবার জন্য সাধ্যপক্ষে সকলকে যত্ন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লিগ্রামে সাধারণ গৃহস্থের ভবনে যদিও রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ প্রায় পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাপি সেই স্থানের পবিত্রতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে। অশিক্ষিত গৃহস্থেরও সংস্কার আছে, রন্ধনগৃহে অবশ্য একাধিক জানালা রাখা চাই। আবার পাকশালার যেখানে রন্ধন হয়, সেই স্থানটি মৃত্তিকাদি দ্বারা মেজে অপেক্ষা একটু উচ্চভাবে নির্ম্মাণ করা হয়। সেই দিকে জলের কলসী রাখিবার জন্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ পীঠ শৃঙ্খলতার সহিত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ উহা সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং উহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক।

উক্ত নিয়মে রন্ধনগৃহের রন্ধনস্থান পৃথক্ থাকাতে বোধ হয় যে, পাক স্থান ও ভোজনস্থান একই গৃহে হইলেও যেন উক্তরূপ বিধিবিশেষ দ্বারা তুইটী পৃথক্ গৃহের অনুরূপ রক্ষিত হয়। যাঁহাদের অবস্থা ভাল নহে, এজন্য নগরে দুই তিনটীমাত্র কুঠুরি করিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গৃহের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরা রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ পৃথক্ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া; সাধ্যপক্ষে উক্ত উভয় গৃহ যথাসম্ভব পৃথক্ রাখাই ভাল।

(ক্রমশঃ)।

বিধবা-বিবাহ

বহুদিনের বহু পুরাতন কথা আজি আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কেননা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা বালিকা কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে হিন্দু সমাজ-সমুদ্রে যে স্রোতঃ ছুটিয়াছে, তাহাতে অন্য নূতন বিষয় অবতারণা অপেক্ষা "বিধবা-বিবাহ"-রূপ পুরাতন বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজনটা অত্যন্ত অধিক দেখিতেছি।

হিন্দুসমাজে স্থিতিশীল এবং উন্নতিশীল এই দুই সম্প্রদায় আছেন। উভয় পক্ষই সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সমাজের মঙ্গলসাধনই উভয় পক্ষের প্রাণগত কামনা। তবে উভয় পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। যাহা আছে তাহাই থাকুক; নূতন রীতি নীতি সংস্পর্শে সমাজ বিশৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বিপ্লব হইবে, অতএব যাহা কিছু ত্রুটি, যাহা কিছু ভ্রম, যাহা কিছু দোষ তাহা সংশোধন না করিয়া পুরাতন জীর্ণ রোগের মত নীরবে বহন করাই কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনায় পুরাতন প্রথা সকল রক্ষা করা, এবং নূতন প্রথা হইতে সমাজকে বিযুক্ত রাখা ইহাই স্থিতিশীল দলের কার্য্য। আর সমাজের যাহা অহিতকর, তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন এবং যাহা কল্যাণকর তাহার গ্রহণ ও প্রচলন, সর্ব্বতোভাবে জীর্ণ সংস্কার করা—ইহাই উন্নতিশীল দলের কার্য্য। এই দুই সম্প্রদায়েই এদেশের কৃতবিদ্য, প্রাজ্ঞ, মনস্বী ও সহৃদয় মহাশয়গণ আছেন; সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য ও মঙ্গল নিহিত আছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমি এই সকল মহাত্মাগণের চরণ বন্দনা করিয়া, নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও ইঁহাদিগের বল ভরসার আশ্রয় লইয়া, যাহা বলিবার তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্য—সেবাব্রতে আমার গুরু তুল্য, আমার পথ-প্রদর্শক, তাঁহাদের উজ্জ্বল আলোকে আমি নিজের সমস্ত অন্ধকারটা মিলাইয়া দিতে পারিব, এই রকম আশা করিতেছি।

আর্য্য ভারতে ঋষিগণই সমাজের শিক্ষক

ও পরিচালক ছিলেন। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ সমূহকে শাস্ত্র বলা হয়। হিন্দু জাতিকে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিতে হয়। জন্ম মৃত্যু বিবাহাদি সংস্কার হইতে দৈনিক কার্য্যও শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করা হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে যে ঋষিগণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের নিয়ন্তা স্বরূপ, সেই শাস্ত্রকার ঋষিগণের প্রকৃতি ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাঁহারা যে কি প্রকার বিরাট পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের জনহিতৈষণা যে কি প্রকার সার্ব্বভৌমিকী ছিল, তাহা আজি শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বঙ্গভূমির কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শন" পত্রে যাহা লিপিবদ্ধ করেন, আমরা তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদিগের ধর্ম্ম মানব ধর্ম্ম; মানবের ক্রমোন্নতি লাভেই তাহা আত্মতৃপ্ত হইয়া সাফল্য লাভ করে। সে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইলে পরকে আপন করিতে হয়, ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হয়; নরনারীর কল্যাণকামনায় আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইতে হয়। বাহুবলে প্রাচ্য সভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে না। তাহা পাশব ধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ব্রাহ্মণ (ঋষিগণ) মানব ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনায় দীর্ঘ তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন উদার নীতির উপদেশ বিতরণ করিতেন, তখন জনসমাজ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইতে পারিত।"

এই সকল মহামহিম ঋষিগণ প্রদত্ত উপদেশানুসারে চলিতে পারাই জীবনের সার্থকতা। যাহা হউক, ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণ (ঋষিগণ) মানবজীবনের ক্রমোন্নতি লাভের যে সকল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া, পুরাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু হইয়া ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র 'অথাতোঽধিকারঃ।' অথ—অতঃপর—অতঃ—এইজন্য—অধিকার—বিচার, অধিকার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীর নরনারীকে একই প্রকার উপদেশে শিক্ষা দান করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড রুষসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই রুষিয়া যাত্রা করিবেন। রুষিয়ার উপস্থিত অরাজকতা স্মরণ করিয়া তত্রস্থ লোকেরা তাঁহার রুষ গমন যাহাতে রাজকার্য্য কিম্বা সাধারণ না হয় তজ্জন্য আবেদন করিয়াছেন।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ

৩। বি এ পরীক্ষায় ে ল ছাত্র এবৎসর উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহাদের যাহাতে আগামী বর্ষের নূতন নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা দিতে না হয়, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য একটী বিশেষ পরীক্ষা করিবেন। এই সময়ের মধ্যে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রস্তুত হইবার জন্য অনুরোধ।

৩। জাপান হইতে কৃষিবিভাগের দুই জন কর্ম্মচারী ভারতে আগমন করিয়াছেন এবং সিমলায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা ভারতে কৃষি, রেলপথ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবেন।

সাধুদৃষ্টান্ত। এবার দোলযাত্রায় কাশীধামের ছাত্রেরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছিল, যে, এবার হইতে হোলি মহোৎসবে লোকের উপর ময়লা নিক্ষেপ করা এবং অশ্লীল গান বা তামাসা করা প্রভৃতি কুপ্রথা একেবারে রহিত করিতে হইবে। তাহারা কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছিল। এই সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহারা অপরকেও ঐ কুপ্রথা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। তাহারা শুধু গুলাল, চন্দন ও গোলাপনিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং অশ্লীলগানের পরিবর্ত্তে, সুন্দর সুন্দর ঈশ্বরস্তোত্র, পুণ্যশ্লোকগণের গুণানুকীর্ত্তন গান করিয়াছিল।

পাতিয়ালার নবীন মহারাজ, নিজ শুভ বিহাহ উৎসবে বারবনিতার নৃত্য ও সুরাপান প্রভৃতি কুপ্রথা নিষেধ করিয়াছেন। ঈশ্বর নবীন মহারাজকে দীর্ঘজীবী করুন।

আশ্চর্য্য সৎসাহস।—২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৭ টার সময় শ্রীরামপুরে ১৪ বৎসরের একটী বালিকা সঙ্গিনীদের সঙ্গে বাটীর নিকট খেলা করিতে করিতে অসাবধানতা বশতঃ কূপমধ্যে পতিত হয়। সেই দুর্ঘটনায় তাহার সঙ্গীনীরা, মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সেই গভীর কূপে নামিতে কাহারও সাহস হইল না। তাহাদের চিৎকারে মন্মথনাথ রায় চৌধুরী নামক এক যুবা তথায় উপস্থিত হইল, এবং ব্যাপার শুনিয়াই কূপের মধ্যে নামিয়া দেখিল, ঐ বালিকা বিশেষ আঘাত পায় নাই। সে বালিকাকে বলিল, তুমি দৃঢ়রূপে আমার কোমর জড়াইয়া ধর, এই বলিয়া সে বালিকাকে লইয়া অতি সাবধানে কূপের এক একটী পাঠ আশ্রয় করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভারে যেই একটী পাট খসিয়া পড়ে অমনি যুবক বিদ্যুতের বেগে অপর পাট ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। এইরূপে সেই বীর যুবক, বালিকাকে লইয়া নিরাপদে উঠিল। সেই বালিকার বিধবা মাতা শোকে সংজ্ঞাশূন্যা ছিলেন। তিনি যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। ঈশ্বর ঐ ধর্ম্মবীর যুবককে চিরকুশলে রাখুন। ঐ যুবককে যথোচিত পুরস্কৃত করা সাধারণের কর্ত্তব্য।

বামারচনা।

নব বর্ষের নব সূর্য্য দর্শনে।

নব দেহ নব কলেবর,
উঠ দেব কাশ্যপকুমার!
লোহিতাঙ্গ নবীন জীবন
মহাদ্যুতি জগত আধার!

ঝলমলি রতন কুণ্ডলে
পুষ্পহার পর ঐ গলে।
সাজ দেব! বিশ্ব বিমোহন
জাগাও এ বিশ্ব কুতুহলে!

যোড় করে অদিতিনন্দিনী
দাঁড়াইয়ে তোমার চরণে,
সাজাইতে চরণ দুখানি
কত ফুল তুলেছে, যতনে।

গাহিতেছে বিহঙ্গ মঙ্গল,
উঠাইয়া চৈতন্য লহরী,
ছুটাছুটী করিছে কেবল,
পূর্ব্বদিকে তোমায় নেহারি।

দেখে তোমা পালাইল তম,
যায় সরে রাক্ষসী রজনী।
ঐ দেখ পেয়েছে সরম
তারাসহ শশী গরবিণী।

নব ভাব নব তেজে পূরি,
নরলোক নব আয়ু লয়ে,
জেগে দেখে তোমার মাধুরী
কর্ম্মভাব হৃদয়ে পূরিয়ে।

শ্যামাঙ্গিনী বিটপী নিচয়,
ফুল ফলে অবনত মুখে
ছড়াইয়া তোমার কিরণে
কত মধু ধরিয়াছে বুকে।

রেখেগেছে দেবতা সকল,
পূর্ণ করি সহস্র কলসী
সারি সারি শিশিরের জল
স্নান হেতু তোমাকে সম্ভাষি।

ঐ দেখ সপ্তাশ্ববাহন,
সপ্ত অশ্ব হয়েছে যোজিত
লয়েছেন অরুণ আসন
রথোপরি হয়ে সুসজ্জিত।

কমলিনী নিদ্রা পরিহরি,
উঠিয়াছে সকলের আগে,
দেখিবারে ওরূপ মাধুরী
হাসিমুখ নব অনুরাগে।

পতিব্রতা পতিশয্যা ছাড়ি
সসম্ভ্রমে উঠেছে সকলে,
স্বামী অগ্রে, নব আশাধরি
গৃহ কর্ম্ম করিবেক বলি।

ঋষিকুল গায় বেদ গান,
তব স্তবে পরিতুষ্ট মন।
করিতেছে কত অর্ঘ্যদান
তব পদে সাত্বিক ব্রাহ্মণ।

তুমি ওহে! আরোগ্যের পতি,
বল, সেবা, পুষ্টি, তুষ্টি সার,
উদয়াস্তে তোমারি মূরতি
কালরূপে হেরি অনিবার।

মহাকাল, মহাদ্যুতি, তুমি,
জ্যোতিঃপতি তেজের আধার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্বস্থানগামী
ক্ষুধা তৃষ্ণা তোমাতে বিস্তার।

তুমি সত্য, তুমি যম, কাল,
সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের পতি,
গতি মুক্তি তুমি, সর্ব্বকাল,
দিনক্ষণ কলাকাষ্ঠা গতি।

ভীতা আমি, দাও তেজ মোরে,
সর্ব্বব্যাপী ওহে তেজময়!
বলহীনা কি করিতে পারে,
তুমি মোরে দাও গো অভয়।

মরি আজ দুর্ভিক্ষ-প্লাবনে,
স্বামী, পুত্র, যায় কোথা ভাসি;
ভীতা সদা দুর্জ্জয় তাড়নে,
দীননাথ! রক্ষা কর আসি।

শ্রীমতী লীলাবতী জ্যোতিষী

নব বৈশাখে।

নব বৈশাখের নবীন আহ্বানে,
জাগ জাগ অয়ি মাতঃ বসুন্ধরা!
প্রেমের আঁচলে মুছাও নয়ন,
বহিতেছে যেথা সদা খরধারা।

শুষ্ক ছিন্ন পত্র ধূলি অবসান,
লুপ্ত হলো হায় পুরাতন খানি;
সারা বর্ষ ভরে ছিল শোভামান
সংসারে অশেষ প্রীতি প্রদানি।

হের নব তরু মুঞ্জরিল শাখা,
তরুণ মুকুল বিকাশিল শোভা।
প্রকৃতির প্রাণ নব সুখে মাখা,
প্রকাশিল ফিরে সুকোমল বিভা।

ঝরে গেল ঐ ফুটিল আবার,
উজল আলোক গভীর আঁধার।
অমানিশা পরে পূর্ণিমার হার,
নীলিম বক্ষে ফুটিল বাহার।

ঝরে গেলে উড়ে পুড়ে হয় ছাই,
ব্যথা জ্বালা সেথা চিহ্নমাত্র একা।
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সে তুলনা নাই,
কোথায় প্রলেপ বল সুধা মাখা।

কুলিশ আঘাতে দগধ যে ভূমি,
হে বৈশাখ! তব চরণ পরশে।
সেথা কি কুসুম জাগাইবে চুমি,
মুমূর্ষু পরাণ রহে যে অবশে।

বজ্রদাহনের বিষম উত্তাপ,
হয় কি শীতল জীমূত বর্ষণে।
গভীর যাতনা শোক মনস্তাপ,
ঘুচেনাক হায় সংসারঘর্ষণে।

জড় অচেতন ধরিত্রীর কোলে,
বর্ষে বর্ষে লভে অপহৃত ধন।
শুধুই মানব দুষ্কৃতির ফলে,
রহেগো বঞ্চিত জনম মতন।

মনোজবা রচয়িত্রী।

২৯১৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 539. July, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৩৯ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৫। জুলাই, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিস্ফোরক বিধি—কলিকাতার পুলিস কমিসনর আদেশ করিয়াছেন, অতঃপর কোন ডাক্তারখানায় নাইট্রিক এসিড, সলফিউরিক এসিড, পিক্রিক এসিড, পিক্রেটস্, নাইট্রল বেনজল, ক্লোরেট অব পটাস, গ্লিসারিন ও এসিটোন নামক অষ্ট প্রকার বিস্ফোরকের উপাদান বিক্রয় করিলে ক্রেতার নাম ধাম ও দ্রব্যের পরিমাণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

সাধু সঙ্কল্প—কলিকাতার উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের অধিবেশন সময়ে স্থিরীকৃত হয় যে, উক্ত সভা কর্ত্তৃক উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের শিক্ষার জন্য বৎসরে ৫০০০৲ টাকা ও দরিদ্র বিধবা প্রভৃতির ভরণপোষণের জন্য বৎসরে ২০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে। উক্ত সমাজ সমুদ্র-যাত্রার অনুকূলে এবং বাল্যবিবাহ ও পণগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজা, কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু রায়, শৌরীন্দ্রমোহন সিংহ, তারকনাথ ঘোষ, প্রভৃতি মহোদয়গণ শিক্ষা ও দানের জন্য অর্থ সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

জৈনদিগের প্রতিবাদ—জৈনগণ সভা করিয়া পরেশনাথ পাহাড়ে ইংরাজদিগের স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদে কোন ফল না হওয়ায় সম্প্রতি ভারতের নানা প্রদেশে জৈনগণ সভা করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, যদি পরেশনাথ পাহাড়ে স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ প্রস্তাব রদ করা না হয়, তাহা হইলে জৈনেরা বিলাতি দ্রব্যের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন।

রমণীর অধিকার—বিলাতের রমণীগণ পুরুষদিগের সমান অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন এবং তজ্জন্য অনেক নির্য্যাতন এবং কারাদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। সম্প্রতি ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড জর্জের স্ত্রী লর্ড অন্‌শ্লোর স্ত্রী, লর্ড বেলফোরের স্ত্রী, আলফ্রেড লিটলটনের স্ত্রী, লেডী হেন্‌রী সমারসেট প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীগণের নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার জমীদারপত্নী, মহাজনপত্নী, শিল্পীর পত্নী, শ্রমজীবিপত্নী টেম্‌স নদীতীরে সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে নিশান উড়াইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে এলবার্ট হলে গমন করেন।

সংবাদপত্র আইন ও বোমা আইন—শিমলা শৈলে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে একই দিনে সংবাদপত্র ও স্ফোটনশীল দ্রব্য সম্বন্ধে দুইটী আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। এই আইন কোন সুপরিচালিত পত্রের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইতে পারিবে না. কেবল যে সকল পত্র হত্যা প্রভৃতি করিতে লোকদিগকে উত্তেজিত করে, তাহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

সাহায্য প্রার্থনা—শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মুক্তির জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা জন্মভূমির সেবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার মুক্তির জন্য যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহা ৬নং কলেজ ষ্ট্রীটে উক্ত শ্রীমতী কিম্বা এটর্ণী মেসর্স ম্যানুয়েল আগরওয়ালার নিকট ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্ ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিধবা-বিবাহ—গত সপ্তাহে কলিকাতার ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের দিয়াশলাইএর কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত ঢাকার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নাগ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

দিরামের প্রাণদণ্ড—মজঃফরপুরের বোমানিক্ষেপকারী ক্ষুদিরাম বসুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জজ বাহাদুর তাহাকে হাইকোর্টে আপিল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

জীবতত্ত্ব বিষয়ে আর একটী গূঢ় কথা প্রহ্লাদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, তাহা এই;—

“অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনস্তথা।
তস্য পাপাগমস্তাত! হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।

তদ্‌বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্॥
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্॥
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্ব্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)।

—যে জীব, অন্যের প্রতি পাপাচরণ অর্থাৎ অন্যকে দুঃখ দিব, অথবা নিজের প্রতি পাপাচরণ অর্থাৎ আপনাকে দুঃখ দিব,—এ কথা মনে জ্ঞানেও চিন্তা না করে, তাহার দুঃখোৎপত্তির কারণ না থাকায়, তাহার দুঃখোৎপত্তি হয় না।

—যে জীব, কার্য্যে, মনে বা বাক্যে পরপীড়াচরণ করে, সেই পরপীড়াচরণরূপ বীজ হইতে তাহার নিজের প্রভূত দুঃখরূপ অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

—হে পিতঃ! আমি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াচরণ করি না। কেন না, ঈশ্বরকে আমি সর্ব্বভূত-মধ্যে এবং আত্মমধ্যে দর্শন করিতেছি—আমার চিত্ত যখন সর্ব্বত্রই কল্যাণময়, তখন আমার শারীরিক, মানসিক বা ভূতজনিত (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখ কোথা হইতে আসিবে?

পরদ্রোহস্পর্শশূন্য, সর্ব্বভূতকল্যাণময়, নির্ব্বিকার বুদ্ধ, চৈতন্য, হরিদাস, তুলসীদাস, প্রভৃতি মহাত্মাগণ কতবার সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হইয়াছিলেন। হিংস্রজন্তুরা তাঁহাদের অনিষ্ট করে নাই। কেন না, তাঁহারা নির্ব্বিকার; তাঁহাদের স্বভাবে হিংস্রজীবের সজাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতা ছিল না। সমধর্ম্মিতা না থাকিলে, একটী জীব অপরের প্রতি (শত্রুভাবেই হউক বা মিত্রভাবেই হউক) আকৃষ্ট হয় না, উদাসীনভাবেই থাকে। সর্পেরা বৃক্ষ প্রস্তরাদি দংশন করেনা, কেন না, জঙ্গমের ধর্ম্ম স্থাবরে প্রকটভাবে নাই (১)। অনেকে সমীপা-গত কালসর্প দেখিয়া, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিবৎ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন। সর্প আস্তে আস্তে তাঁহাদের কোলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দংশন করে নাই (২)। অনেক

(১) মনু প্রভৃতি প্রাচীনতম শাস্ত্রকারেরা বলেন ;—বৃক্ষলতাদি স্থাবর পদার্থেও সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতনা আছে। সেই সংজ্ঞা তমোগুণ-প্রভাবে প্রচ্ছন্ন। উত্তাপ ও জলসেকাদি দ্বারা তাহা লক্ষ্য করা যায়। উত্তাপে উহারা সঙ্কুচিত এবং জলসেকে প্রফুল্ল হয়। উহারা যে সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তাহা ঐ সঙ্কোচ ও বিকাসাদি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। এ তত্ত্ব আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নবাবিষ্কার নহে।

"গুচ্ছগুল্মং তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গুচ্ছ, বল্লী, প্রতান, তৃণ প্রভৃতি স্থাবরাদি মধ্যে সংজ্ঞা আছে। উহাদেরও সুখ-দুঃখ-বোধ আছে। উহাদের মধ্যে সেই সংজ্ঞা বিচিত্র তমোগুণপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে একটী তৃণেরও হিংসা করিতে নাই।

(২) খ্যাতনামা ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতা ৺পণ্ডিত বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়

সময় দেখা গিয়াছে,—অক্রবাণ শিশু কালসর্প লইয়া খেলা করিয়াছে, কালসর্প শিশুর অঙ্গে জড়াইয়াছে, অথচ দংশন করে নাই। কেন না, শিশুর স্বভাব নির্ব্বিকার। ভাবশুদ্ধিই সর্ব্বত্র সমতা ও নির্ব্বিকারতার মূল। ভাবশুদ্ধি বিনা সকল সাধনা বিফল হয়। তুলসীদাস বলিয়াছেন ;—"প্রেম চাহিয়ে সাঁচ" –
অর্থাৎ খাঁটি প্রেম চাই। প্রেমময় হৃদয়েই প্রেমময় হরির অধিষ্ঠান।

"ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ভাবোহি কারণম্॥"

—কাষ্ঠে, পাষাণে বা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে দেবতা নাই। ভক্তের ভাবময় হৃদয়েই দেবতার অধিষ্ঠান। সাধক কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যে দেবতা দর্শন করেন, তাহার কারণ, তত্তৎকালে সাধকের ভাবময় হৃদয় ঐ সকল মূর্ত্তি মধ্যে প্রতিফলিত হয়। স্বচ্ছ দর্পণ মধ্যে প্রতিফলিত নিজ প্রতিবিম্বের ন্যায়, সাধক ঐ সকল মূর্ত্তি মধ্যে নিজেরই দেবভাবযুক্ত হৃদয় দর্শন করেন। এ সত্য অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। শ্রীক্ষেত্রে গিয়া কেহ জাজ্বল্যমান জগন্নাথ দর্শন করেন, কেহ বা জগন্নাথের পরিবর্ত্তে পূতিকামঞ্চ (পুঁইমাচা) দর্শন করেন। যাহার যেরূপ ভাবনা, সে তাহাই দেখে। আমি ৺গয়াধামে গিয়া স্বর্গীয় পিতামাতার পিণ্ডদানের সময়, গদাধরপাদপদ্মে তাঁহাদের জ্বলন্তমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম। এরূপ ঘটনা অনেকের ঘটিয়া থাকে।

মিষ্টাদির স্বাদগ্রহবিষয়ে আস্বাদ্য ও আস্বাদক উভয়েরই গুণ ও পরস্পর সংযোগ চাই। রসনার স্বাদগ্রাহিতা সত্ত্বেও, যদি আস্বাদ্য বস্তুতে কোনও রস না থাকে, তবে স্বাদগ্রহ হয় না। আবার, আস্বাদ্য বস্তুতে রস থাকিলেও, যদি তাহাতে রসনাযোগ না হয়, তবে স্বাদগ্রহ হয় না। সেইরূপ, ধ্যাতা ও ধ্যেয় উভয়েরই গুণ ও পরস্পর সংযোগ চাই। যদি বল, কাষ্ঠ প্রস্তরাদি মূর্ত্তিতে তো প্রকৃত দেবত্ব নাই, তবে তদ্দর্শনে লোকের ভাবোদ্রেক হয় কেন? এ বিষয়ে আমার এইরূপ বিশ্বাস, যে, জড়তীর্থাদিতে ও দেব-বিগ্রহাদিতে দেবত্ব না থাকিলেও, সে সকলের এক অনির্ব্বচনীয় উদ্দীপনী শক্তি আছে। যুগ-যুগান্তর হইতে কোটি কোটি ভক্তের প্রেমোচ্ছলিত স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা ও প্রাণের উচ্ছ্বাস, ঐ সকল তীর্থে ও মূর্ত্তিতে গাঢ়ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে। ঐ সকল স্থানের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সমস্ত পদার্থই ভক্তবৃন্দের পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাসে ভাবময় হইয়া আছে। যত ভক্তের হৃৎ-কণ্ঠ ভেদ করিয়া যতগুলি শব্দ বাহির হইয়াছে, ফনোগ্রাফ-যন্ত্রে শব্দরেখার ন্যায়, ঐ স্থানের আকাশপটে

নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া কালসর্প হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

(ইথারে-Ether) সেই সেই শব্দ তত্তগুলি তরঙ্গ বা রেখা (Impression) অঙ্কিত করিয়াছে। শব্দ নিত্য, শব্দের ধ্বংস নাই। ঐ সকল ভাবাত্মক শব্দ দর্শকের হৃদয়ে অব্যক্তভাবে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করে। অতএব তীর্থ বা দেব-মূর্ত্তির স্থানে গমন করিলে এবং ঐ সকল দর্শন করিলে, লোকহৃদয়ে যে দেবভাব জাগ্রত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। সর্ব্ব-ভূতেই তো সেই বিশ্বান্তরাত্মা গূঢ়ভাবে রহিয়াছেন। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিশেষ কেবল উদ্বোধক মাত্র।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)।

ঋষিকল্প ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বৈদ্যনাথে অবস্থানকালে আমাকে বলিয়া-ছিলেন,—"ভাই! বৈদ্যনাথমন্দির ও উহার চতুষ্পার্শ্ব, বহুকালাবধি কোটি কোটি ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসে মজ্‌গুল্ হইয়া আছে। আমি অপৌত্তলিক হিন্দু; কিন্তু ঐ স্থানে গমনমাত্র কি এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে ঢলিয়া পড়ি! তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না।

ভাবশুদ্ধি বিনা সকল সাধনাই নিষ্ফল হয়। ভাবশুদ্ধি স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শে লৌহও সুবর্ণ হয়। বিষও অমৃত হয়। আবার দূষিতভাবে গ্রহণ করিলে অমৃতও বিষ হইয়া যায়। একটী প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘটনাটী এই;—আমার কোনও আত্মীয়ার একমাত্র কন্যা। ঐ কন্যাই তাঁহার সর্ব্বস্বধন। ঐ কন্যা, একটী মৃতশিশু প্রসবের পর, ভীষণ জ্বরবিকারে ও অন্যান্য অসাধ্য রোগে মুমূর্ষু-শয্যায় পতিতা। বড় বড় সাহেব ডাক্তার তাহার চিকিৎ-সায় নিযুক্ত। ডাক্তার দুইপ্রকার ঔষধ দিয়াছেন; একটী ভক্ষণের ও অপরটী মালিসের জন্য। মালিসের ঔষধ বিষাক্ত; তাহা ভক্ষণ করিলে মৃত্যু অবধারিত। কন্যার মাতা, কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য ভগবানে তন্ময় হইয়া আরোগ্য কামনা করিতেছিলেন। ঔষধসেবনের সময়ে তিনি ভ্রমক্রমে সেই বিষাক্ত মালিসের ঔষধ সমস্তটুকু কন্যাকে সেবন করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা সংজ্ঞাশূন্য হইল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আসিল, দেখিল;—কন্যাটীর শেষ দশা, পার্শ্বে মালিসের খালি সিসিটী পড়িয়া আছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, প্রসূতির ভুলেই এ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া, প্রসূতি মর্ম্মভেদী করুণস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হে দয়াময়! হে নারায়ণ! তুমি জানিতেছ অমৃত ভাবিয়াই আমি বিষ দিয়াছি। আমার কন্যা মরিলে, আমিও প্রাণত্যাগ করিব। প্রসূতির পাষাণভেদী কাতরতায় সকলেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে। ডাক্তারেরা রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন, হঠাৎ রোগিণী

অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিল। তাহার নাড়ীতে স্পন্দন ও দেহে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দেখিয়া সকলে অবাক্! তাহাকে আর কোনও ঔষধ দেওয়া হয় নাই। কন্যাটী জীবন পাইল।

যখন আধ্যাত্মিক সমস্ত উৎকর্ষ ভাবশুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন ভাবনার বা ধ্যানের মূলবস্তুটী কিরূপ পবিত্র ও কত উচ্চ হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া জানান যায় না। আদর্শ যত উৎকৃষ্ট হইবে, তদনুসরণের ফলও তত উৎকৃষ্ট হইবে। নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই, সগুণ ও সাকারের ধ্যান প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা গুরুর নিকট ইষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সাধনার দুইটী প্রধান অঙ্গ - জপ ও ধ্যান।—"জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।" দীক্ষিত শিষ্য জপ করিতে করিতে শ্রান্তিবোধ করিলে, ধ্যান করিবে, এবং ধ্যান করিতে করিতে শ্রমবোধ করিলে পুনরায় জপ করিবে। তন্ত্রাদিশাস্ত্রে শিব, কালী, সীতা, রাম, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর ধ্যান দৃষ্ট হয়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে,—কতকগুলি বীভৎসরুচি তান্ত্রিক স্বরচিত তন্ত্রে এরূপ কুৎসিত কথা লিখিয়াছেন যে, তদনুসরণে লোকের অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী (১) কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত মদ্য-মাংস-মৈথুনের ভিতর গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব দর্শন করেন, এবং ঐ সকল বীভৎস কাণ্ডের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু উহাদ্বারা লোকসমাজের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। মনুষ্য হউক বা কীট পতঙ্গ হউক, তন্মনা হইয়া যে যেরূপ ভাবনা করিবে, সে ঠিক্ সেই ভাবাপন্ন ও সেই অবস্থাপন্ন হইবে।

বিশ্বাসের একাগ্রতা, মনের তন্ময়তা জন্মিলে, মনুষ্য সুতীক্ষ্ণ বিষের শক্তিকেও পরাজয় করিতে পারে, নানা অসাধ্য রোগ হইতেও পরিত্রাণ পাইতে পারে। আবার, বিপরীত দিকে সেইরূপ একাগ্রতা জন্মিলে, মনুষ্য নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্ট ও শ্রুত অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল ঘটনা জানা থাকিলে, সময়ে সাবধান হইয়া অনেকে মহোপকার লাভ করিবেন বলিয়া এ স্থলে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গবাসী আফিসের কর্ম্মচারী শ্রীমান্ উমেশ চন্দ্র দত্ত আমার নিকট এই ঘটনাটী বলিয়াছেন;—"আমার আত্মীয়া রাত্রিকালে নিদ্রিতা ছিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমার পায়ে বুঝি কি কামাড়াইল। আমরা সকলে উঠিয়া, শয্যা ও ঘরের চারিদিক তন্ন

(১) সে সকল অশ্লীল কাণ্ড, বোধ করি, সুরামত্ত ইতর জাতীয় ব্যক্তি, সুরামত্তা বেশ্যার মনেও করিতে অক্ষম।

তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে সর্প বা বৃশ্চিক বা অন্য কোনও জীব খুঁজিয়া পাইলাম না। ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর মসৃণ কোটা ঘর, কোনও স্থানে ছিদ্র বা গর্ত্ত ছিল না। তাঁহার পায়ে দংশনের কোনও চিহ্নও আমরা দেখিলাম না। নিকটস্থ দুই একজন ওঝা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, সর্পাঘাত নহে। আমরাও দেখিলাম যে, তাঁহার শরীয়ে বিষের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই। তখন আমরা সকলে মনে করিলাম যে, ডেও পিঁপড়া তাঁহার পায়ের মাংস চিমটিয়া লইয়াছিল। আমার আত্মীয়াও সেইরূপ মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলেন।

(ক্রমশঃ)

হারানিধি।

গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইয়াছে। বাটী যাইবার জন্য পিতার জরুরী পত্র আসিয়াছে। কারণ আমার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। আমার যাইবার প্রতীক্ষা মাত্র; তাই আজ মেসের বন্ধু বান্ধবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বেলা সাত ঘটিকার সময় নৌকারোহণে বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হরদিয়া জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে আমার নিবাস, এ অঞ্চলে তখনও রেল খুলে নাই। আমরা নৌকারোহণে যাতায়াত করিতাম, কিন্তু বিশেষ কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। প্রাতঃকালে যাত্রা করিলে, সন্ধ্যার সময় বাটী পৌছান যাইত। আমি মনের আনন্দে নদীর চারিধারের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কোথাও বা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রাখাল বালকেরা গরুগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে এবং মনের আনন্দে কেহ বা গীত গাহিতেছে, কেহ বা মুড়ি খাইতেছে। কোথাও বা গ্রাম্য বধূরা অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, বারিপূর্ণ কলসী কক্ষে থমকে থমকে হেলিতে দুলিতে গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে। দূর কাননের অন্তরাল হইতে দু একটা কোকিল এক এক বার কুহু ধ্বনিতে হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। নানা বর্ণের পক্ষী সকল কলরব করিতে করিতে নদীর উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে।

মাঝিরা সব সারি গাহিয়া চলিয়াছে, এবং ক্ষিপ্র হস্তে ক্ষেপণী চালনা করিতেছে। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল; মার্ত্তণ্ডদেবের সে প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, নৌকার ছত্রীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠে মনোনিবেশ করিলাম। পুস্তক পড়িতে পড়িতে কখন যে নিদ্রা-

দেবীর কোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছি, তাহা স্মরণ নাই। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা। যতই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই যেন আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেছি। কতক্ষণে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী এবং প্রিয়তম সহোদরকে দেখিব যতই ভাবি, ততই যেন আনন্দে আমি অধীর হইয়া পড়ি; কিন্তু আমার এ ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিল। সহসা পশ্চিম গগনে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘ ফুলিয়া ফুলিয়া, ক্রমশঃ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঘন ঘোর আঁধারে সমস্ত জগৎ যেন কি বিকট ভাব ধারণ করিল। নদীর চঞ্চল লহরীমালা মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া গেল। বৃক্ষের পত্রটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ। সহসা ভীষণ বেগে বায়ু প্রধাবিত হইল। প্রকাণ্ড গাছ পালা আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। মেঘের কোলে সৌদামিনী ঘন ঘন হাসিতে লাগিল। গভীর নিনাদে মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল। নদীর তরঙ্গমালা রঙ্গে ভঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রকৃতি প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন জগৎসংহারে উদ্যত। তখন আমার প্রাণের ভাব কি প্রকার তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা কি আর পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে হইবে? "আল্লার নাম নাও আমার যতক্ষণ জ্ঞান আছে, তোমার কোন ভয় নাই।" আমি মাঝির এ আশ্বাসবাক্যে মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না। সেই একমাত্র বিপদে চিন্ময় চিদানন্দ শ্রীমধুসূদনের নাম আবেগভরে জপ করিতে লাগিলাম। এক একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমার তরঙ্গখানি ডুবাইবার চেষ্টা করিল। সুনিপুণ মাঝির সুকৌশলে চালনায় ও একমাত্র দয়াময়ের কৃপায় সেই প্রলয়ের মধ্যে আমার নৌকাখানি ডুবু ডুবু হইয়াও ডুবিল না। কিন্তু সহসা আমি যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম, আমাদের চারি পাঁচ হস্ত দূরে একখানি তরণী প্রবল ঝটিকাঘাতে মগ্নপ্রায়। কর্ণধার কোনমতে নৌকা সামলাইতে পারিতেছে না। আর রক্ষা নাই, গেল—গেল—একটা হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের সহিত তরীখানি অতল জলে নিমগ্ন হইল।

যখন আমার চক্ষের উপর এই ভয়াবহ দৃশ্য ঘটিল, তখন আমি নীরব নিশ্চল —বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ক্ষণেকের নিমিত্ত আমার নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। যখন চক্ষু চাহিলাম, সেই জলমগ্ন নৌকার কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, কেবল উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিয়া পড়িয়া উল্লম্ফন করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণে বিদ্যুৎ সাহায্যে দেখিলাম, আমার নৌকার অতি নিকটে কি যেন একটা পদার্থ ভাসিয়া উঠিল। তখন নিজের প্রাণের

মায়া পরিত্যাগ করিয়া, ঝম্প প্রদানের উদ্‌যোগ করিলাম। কর্ণধার "কি কর বাবু? কি কর বাবু?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া সেই পদার্থটা অতিকষ্টে ধরিয়া ফেলিলাম। দাঁড়ি মাঝিরা আমার এই কাণ্ড দেখিয়া, হতবুদ্ধি না হইয়া বরং আমার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। অতি কষ্টে আমাকে ও সেই পদার্থটীকে কৌশল পূর্ব্বক নৌকার উপর তুলিয়া লইল। তখন ঝটিকার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। আমি ক্ষণ-প্রভার ক্ষণিক আলোকসাহায্যে দেখিলাম, যাহার উদ্ধারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছিলাম, সে একটী দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। বালিকা অঘোর অচৈতন্য; কিন্তু অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। শুশ্রূষা করিলে বাঁচিতে পারে এই আশায় আশান্বিত হইয়া, উদরস্থ জল যে কৌশলে বাহির করিতে হয় সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলাম। অনেকটা জল বহির্গত হইয়া গেল। কৌশলপূর্ব্বক তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া, একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিলাম এবং বালিকার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি সযত্নে স্বহস্তে মুছাইয়া দিলাম। আ মরি মরি! বালিকার কি নয়ন মুগ্ধকর রূপরাশি! যেন কতকগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের সমষ্টি। আকর্ণ বিস্ফারিত নয়ন দুটী নিমীলিত; মুখখানি যেন প্রভাত-কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। পাঠকগণ, আমার প্রবৃত্তি বোধ হয় বড়ই চটিয়াছেন। তাঁহারা হয়ত বলিতেছেন, এ লোকটা কে গো? বালিকাটী মরিতে বসিয়াছে, কোথায় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে, না লোকটা কিনা রূপ বর্ণনা করিতে বসিল। পাঠকবর্গ! সত্যই আমার বড় অন্যায় হইয়াছে, আমার এই প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি আর তার রূপের কথা বলিব না।

তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বালিকাকে অল্প অল্প তাপ দিতে দিতে তাহার সেই হিমানীতুল্য শীতল গাত্র অল্প অল্প উষ্ণ হইল। এদিকে প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির আর সে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। নীলাকাশে শশধর অসংখ্য তারকাহারে বিভূষিত হইয়া মধুর হাসি হাসিয়া, জল, স্থল, কানন প্লাবিত করিতেছে। স্নিগ্ধ সমীরণ ফুল পরিমল বহিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। মধুর কূজনে বিহঙ্গকুল কানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ফুলকুল হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে সোহাগে ঢলিয়া পড়িতেছে। তরঙ্গিণী নক্ষত্রমালা বুকে ধরিয়া মৃদু মন্দ বেগে বহিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি এখন শান্তিময়ী।

ক্রমে ক্রমে তরী আসিয়া গোপালপুরের ঘাটে পৌঁছিল। বালিকার কিন্তু সেই একই ভাব—অঘোর অচৈতন্য। সে রাত্রে আর বাটী যাওয়া হইল না। মাঝিকে বিশেষ পুরস্কৃত করিব বলিয়া,

তাহার নৌকাতে সে রজনী সেই ঘাটে অবস্থান করিলাম। কেন জানিনা একবারও নয়ন মুদ্রিত না করিয়া, বালিকার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। যে মুহূর্ত্তে সেই প্রথম দেখা—সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত হইতে তড়িৎশক্তি সহযোগে কি যেন কি একটা ভাব আমার হৃদয়কমলকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এ জীবনে এ ভাবটী এই নূতন—কিন্তু এটা কি তা তখন বুঝিতে পারিলাম না।

রাত্রি প্রভাত হইল। গগনের পূর্ব্ব দ্বার খুলিয়া, নবোঢ়া বধূর ন্যায় ধীরে ধীরে হাস্যমুখী ঊষাসতী দেখা দিল। বিহঙ্গকুল মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়া দিননাথের আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করিতে লাগিল। প্রভাত সমীর নাচিয়া নাচিয়া নদী বক্ষে ঊর্ম্মি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কখন বা কুসুমবালার অধর চুমিয়া চুপি চুপি পলায়ন করিতেছে; কখন বা নৌকার ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া সেই অচৈতন্য বালিকার গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত অলকারাশি লইয়া খেলা করিতেছে। সেই শীতল সমীরণ স্পর্শে বালিকা একবার নয়ন উন্মীলিত করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই কোমল কমল আঁখি দুটী নিমীলিত হইল। আমার হৃদয়ে এবার আশার সঞ্চার হইল। তাহার সেই অনাঘ্রাত-ফুল্লনলিনীতুল্য মুখের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে বালিকা আবার চাহিল। এবার তাহার দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হইল। বালিকা বিস্মিত নয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া, বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "আমি কোথায়?" আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "তুমি উত্তমস্থানে আছ, কোন ভয় নাই।"

বালিকা কিছুক্ষণ যেন কি ভাবিল, পুনরায় মধুর স্বরে বলিল, "আমার মা আমার বাবা কোথায়?" বালিকার কথার ভাবে বুঝিলাম, সেই নৌকায় তাহার পিতা মাতা ছিলেন। কিন্তু এখন আমি কি বলি, তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যদি তাহার পিতা মাতার কোন সন্ধান পাই নাই বলি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে সত্য কথাই বলিব স্থির করিলাম। আমি তাহাকে যে প্রকারে উদ্ধার করিয়াছি, সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলাম, "তোমার পিতা মাতা বোধ হয় তোমার ন্যায় অপর কোন লোকের সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছেন।" বালিকা কিন্তু আর কোন কথা বলিল না। নীরবে তাহার দুইটী গোলাপী গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। আমি তাহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে কাহার কন্যা, বা কোথায় নিবাস, এবং কোথায় বা যাইতেছিল, সাহস করিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বালিকা

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। নবোদিত তরুণ অরুণকিরণ, চঞ্চল নদীবক্ষে পড়িয়া যে শোভা বিস্তার করিতেছিল বালিকা তাহাই নৌকার গবাক্ষপথে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। অনেক পরে বলিলাম, "তুমি আমার সহিত আমাদের বাটী চল, তাহার পর যথাসাধ্য তোমার পিতা মাতার অনুসন্ধান করিব।" বালিকা আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম.—"তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব! একটা কিছু বলিয়া ত সম্বোধন করিতে হইবে।" বালিকা লজ্জাবনত মুখে বলিল, "উমা বলিয়া ডাকিবেন।" আমি তাহার সেই ব্রীড়াবিজড়িত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাহার পর একখানি শিবিকা আনাইয়া, উমাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া, মাঝিকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া শিবিকার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম।

বহির্ব্বাটীতে তখন পিতা ছিলেন না, আমি শিবিকাসহ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই মাতাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া, স্নেহমাখা মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা অমিয়! এতক্ষণ পরে এলি? কাল তোর আসিবার কথা ছিল। কিন্তু কাল যে দুর্যোগ গেছে, আমি পাগলের মত একবার ঘর, একবার বার করিতেছি, আমাতে আর আমি ছিলাম না। তা যা হোক, তোর কোন বিপদ হয় নাই ত? তোর সঙ্গে আবার পাল্কী কেন?"

আমি তখন কল্যকার ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিলাম। মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এমন পাগল ছেলে ত কখন দেখিনি. ভাগ্যে মা জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন তাই রক্ষে।" তাহার পর শিবিকার দ্বার খুলিয়া উমার হস্ত সযত্নে ধরিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমিও পিতামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় কোহালায় পৌঁছিলাম। এখানে রাস্তা বেশ প্রশস্ত। রাস্তা হইতে প্রায় ৮।১০ ফিট নিম্নেই বিতস্তা প্রবলবেগে ছুটিতেছে। রাস্তার বাম পার্শ্বে পাহাড়ের গাত্রে কয়েকখানি আটা, ঘৃত, লবণ, মোটা চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র দোকান। দোকানঘরগুলি কাঠের দোতালা। নিম্নে দোকান, উপরে যাত্রী এবং দোকানদারদিগের থাকিবার ঘর; ইহাই কোহালার বাজার।

রাস্তার একদিকে কতকগুলি গো-শকট রহিয়াছে, নিরীহ গরুগুলি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে রোমন্থন করিতেছে। তিন চারিখানি টঙ্গা ও খোলা রহিয়াছে দেখিলাম।

বাজার হইতে অনেক উচ্চে এবং সেই পাহাড়েরই একটী সানুদেশে ডাক্‌বাঙ্গলা অবস্থিত। নিচে টঙ্গা খুলিয়া দিয়া রাত্রি যাপনোদ্দেশে ডাক্‌বাঙ্গলায় যাইলাম। সেখানে যাইয়া দেখি সমস্ত ঘরেই শ্বেতাঙ্গ বিরাজ করিতেছে। সম্মুখের হলে সান্ধ্য ভোজন চলিতেছে, কাঁটাচামচের এবং প্লেটের ঠন্‌ঠন্ শব্দ হইতেছে, সাদা পাগ্‌ড়ি মাথায় চাপরাসিরা হন্‌হন্ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আমরা দেখিলাম মহা বিপদ! দুই চারিবার চাপরাসী, চাপরাসী, বলিয়া ডাকিলাম, কে কার কথা শুনে? তখন তাহারা ডিনার রূপ মহাসমরে সহায়তা করিতেছে, সুতরাং শুনিয়াও শুনিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে,যখন দেখিল এক হ্যাটধারী তাহাদিগকে ডাকিতেছে, তখন এক জন আসিয়া, "সাহেবের কি হুকুম" জিজ্ঞাসা করিল।

আমি বলিলাম, "কামরা খালি হ্যায়"? চাপরাসী নিকটে আসিয়া দেখিল, কালা আদ্‌মী,সিংহ চর্ম্মাবৃত শৃগাল,তখন সগর্ব্বে, —"নেহি হ্যায়, সাহেব লোক্ সব্ লে লিয়া"—এই কথা বলিয়া কালা আদমির প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় আমার বন্ধু অগ্রসর হইয়া কহিল,—"চাপরাসীজি, কুছ্ বক্‌সিস্ মিল্ যায়ে গা, একঠো কাম্‌রাকো বন্দোবস্ত্ কর্ দেও। এত্‌না রাত্‌মে কাঁহা যায়গা"।

চাপরাসী পুঙ্গব তখন বক্‌সিসের কথা শুনিয়া একটু নরম হইয়া কহিল,—"কেয়া করেগা হুজুর, কামরা তো হ্যায় নেহি, একঠো তাঁবু থা, উহ্ এক পার্সি সাহেব লে লিয়া; আপ্‌লোক্ বারান্দা পর রহেঙ্গে?"

আমি ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! এই হিমে, জঙ্গলের মধ্যে বারান্দায় থাকিব কি করিয়া? ইহা অপেক্ষা বাজারের অপরিষ্কার গৃহে থাকা ভাল। তখন আমি বলিলাম,"বারান্দা পর,সুবিস্তা নহি হোগা" বলিয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন চাপরাসী বলিল, "আচ্ছা থোড়া ঠারিয়ে—হাম্ আবি আতা হ্যায়।"

পাঁচ সাত মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া চাপরাসী বলিল, "হুজুর বহুৎ মুস্কিল্‌সে একঠো কামরা আপ্‌লোগন্‌কো লিয়ে বন্দোবস্ত্ কিয়া—এক সাহেব রাৎমে পৌছ্‌নে কো বাত হ্যায়, উহ অভি আয়া নহি—উস্ কাম্‌রামে আপ্‌লোক শো যাইয়ে। আউর হামরা উপর মেহেরবাণি করকে বক্‌সিস্‌ঠো—"

"আচ্ছা হো যায়গা" বলিয়া কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, ঘরটি অতি ক্ষুদ্র, একখানি খাটিয়া পাতা আছে,একটি ছোট আল্‌না, দেওয়ালে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প টাঙ্গানো। ঘরের পার্শ্বেই একটি গোসলখানা। চাপরাসি আর দুই খানা খাটিয়া আনিয়া দিল, কিন্তু উহা

বিছাইবার স্থান দেখিলাম না, বরং যে চারপাই খানি পাতা ছিল, তাহাও বাহির করিয়া দিয়া—সতরঞ্চি বিছাইয়া বিছানা করিয়া খাবারের হাঁড়িটি খুলিয়া জলযোগের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় চাপরাসী পুঙ্গব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুছ খানা লে আয়েগা ? আমরা বলিলাম, "নেহি"। তখন সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে জন্তু বিশেষ ভাবিয়া চলিয়া গেল। জলযোগ সমাপ্ত করিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় পাইলাম বলিয়া, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে যাইয়া দেখি যে ইতিমধ্যেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুটি তাঁহার বিশালবপু দ্বারা মহীরাবণের ন্যায় সেই প্রকোষ্ঠের বার আনা ভাগ দখল করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে অপর বন্ধুটি শয়ন করিলেন, আমি অতি কষ্টে যে স্থান টুকু ছিল তাহাতে শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার অপর বন্ধুটি শয্যা স্পর্শ করিবামাত্র যে ভয়ঙ্কর নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে চক্ষু বুজিতে পারিলাম না, নিদ্রা ত দূরের কথা। যাহা হউক, আমি ত সে রাত্রি কোনরূপে সেই কোলাহল মধ্যে যাপন করিলাম। কিন্তু আমার ভৃত্য বেচারার দুর্দ্দশা আমাপেক্ষাও শোচনীয়। সেই হিমে সে বাহিরেও শয়ন করিতে পারিল না; প্রকোষ্ঠ মধ্যে তাহার প্রভুই শয়নের স্থান পায় না, সে ত দূরের কথা। অবশেষে সে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্রতর গোসলখানার আসবাববিশেষ সরাইয়া সে রজনী যাপন করিল।

(ক্রমশঃ)।
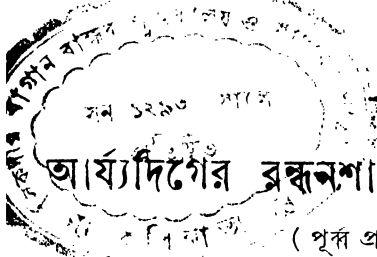
আর্য্যদিগের রন্ধনশালা ও ভোজনস্থানাদি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রন্ধনগৃহ কিরূপ হওয়া উচিত ও ভোজনদ্রব্যাদি কিরূপে রাখিতে হয়, ও রাজগণের জন্য রাজচিকিৎসকগণকে পক্ক অন্নের কিরূপে বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আর্য্যঋষিগণের সংক্ষিপ্তোপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;

আপ্তান্বিতমসংকীর্ণং শুচিকার্য্যং মহানসম্।
তত্রাপ্তৈর্গুণসম্পন্নমন্নং ভক্ষ্যং সুসংস্কৃতম্।
শুচৌ দেশে সুসংগুপ্তং সমুপস্থাপয়েদ্ভিষক্॥
বিষঘ্নৈরগদৈঃ স্পৃষ্টং প্রোক্ষিতং ব্যজনোদকৈঃ।
সিদ্ধৈর্মন্ত্রৈর্হতবিষং সিদ্ধমন্নং নিবেদয়েৎ॥

(সুশ্রুতসংহিতা)

অনুবাদ। রন্ধনগৃহটী বিশ্বস্তজনসমন্বিত (অর্থাৎ যাহারা শত্রুগণের উৎকোচবশীভূত হইয়া ও গোপনে বিষপ্রয়োগ দ্বারা অন্ন দূষিত না করে, বা সহসা কোন কারণাধীন দোষযুক্ত অন্ন আহার করিতে না দেয়, এইরূপ জ্ঞানী আত্মীয়াদি বিশ্বস্ত

লোক যেখানে থাকেন, এইরূপ), অসং-কীর্ণ (ক্ষুদ্র না হয়, বায়ু গমনাগমনের পথ রোধক না হয় বা গবাক্ষাদিবর্জ্জিত না হয় এইরূপ) ও শুচি (যাহা উত্তম রূপে মার্জ্জনলেপনাদি করা হইয়াছে, যেখানে আবর্জ্জনা নাই, যেখানে অন্ত্যজজাতি বা কুক্কুর বিড়ালাদি প্রাণী দৃষ্টিদোষ বা স্পর্শদ্বারা খাদ্যে দোষ না ঘটাইতে পারে, ইত্যাদি প্রকারের পবিত্র সে স্থান হওয়া উচিত।) বিশ্বস্ত লোকসকল কর্ত্তৃক গুণসম্পন্ন যেরূপ ভাবে যে পদার্থ দ্বারা রন্ধন নিষ্পন্ন হইলে ভাল হয় সেইরূপ), সুসংস্কৃত (অর্দ্ধপক্ক ও অতিরিক্ত পক্ক না হয় অর্থাৎ পাকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথানিয়মে সংস্কার বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ ভক্ষ্যোপযোগী দ্রব্য পবিত্র স্থানে সুসংগোপনে রাখিবে অর্থাৎ ঢাকিয়া রাখিবে, যেন দূষিত পদার্থ পড়িয়া বা কুকুর বিড়ালাদি স্পর্শ করিয়া দোষ না ঘটায়। রাজচিকিৎসকগণ রাজাদিগের জন্য স্থাপিত এইরূপ অন্নে বিষঘ্ন ঔষধ স্পর্শ করাইবেন এবং বিষনাশক জলে ব্যজন ক্ষালিত করিয়া তদ্দ্বারা অন্ন বীজন করিবেন এবং সিদ্ধ মন্ত্র (বিষনাশক অবশ্য ফলপ্রদ ও বহু সাধনাসিদ্ধ মন্ত্র) সকল পাঠ করিবেন। এইরূপ করিলে অন্নের দোষ নষ্ট হয়। এইরূপ অন্নই রাজাকে নিবেদন করিবে।

উল্লিখিত প্রকারে বিশুদ্ধ রন্ধনশালায় বিশুদ্ধভাবে পক্ক ও রক্ষিত অন্ন কিরূপ স্থানে বসিয়া কিরূপে আহার করিবে তাহার নিয়ম এই ;—

উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ।
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত শুচিঃ পীঠমবস্থিতঃ॥
(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।

অনুবাদ। যে স্থান গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত হইয়াছে এবং যে স্থান পবিত্র, এইরূপ আহারোপযোগী স্থানে পবিত্র হইয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পীঠ অর্থাৎ পিঁড়া প্রভৃতি আসনের উপর পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া অন্ন আহার করিবে।

আহারাদি সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম অন্য প্রবন্ধে কিছু বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। শাস্ত্র পাঠ করিলে বোধ হয় যে রন্ধনগৃহ অপেক্ষা ভোজনস্থান যেন আরও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। এই জন্যও বোধ হয় রন্ধনগৃহ ও ভোজনস্থান পৃথক্ হওয়ার নিয়ম ছিল। কিরূপ পবিত্র স্থানে বসিয়া ভোজন করা ভাল, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে ;—

দেবালয়ে যাবতীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে চ শঙ্করি!
ব্রাহ্মণানাং সমাজে তু ভুক্ত্বা ক্রতুফলং লভেৎ॥
(মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। হে শঙ্করি! দেবালয়, তীর্থস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র ও ব্রাহ্মণদিগের সমাজ এই কয় স্থানে ভোজন করিলে যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

উল্লিখিত তীর্থ ক্ষেত্রাদিতে জনসমাকীর্ণ স্থানেও আহার করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র আহার করিতে হইলে বিজন অর্থাৎ পরিবেশকাদি অল্প জনাকীর্ণ স্থানে বসিয়া

আহার করাই নিয়ম। ভাবপ্রকাশ নামক চিকিৎসাগ্রন্থে ও বহু পুরাণে গোপনে আহার করিতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা হইল না। কুক্কুরাদি ও অন্ত্যজ জাতির দৃষ্টিদোষ নিবারণের জন্য আর্য্যগণ গোপনে আহার করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রবাসগমনকালে পথিমধ্যে কখন কখন ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত মাত্র।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

গৌরী

ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি বঙ্গীয় শাক্ত কবিগণের দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী বলিয়া প্রতিপন্ন। তাঁহারা জগৎসৃষ্টির আদিতে শক্তিরূপা মহামায়ার জন্ম, পতিনিন্দা শ্রবণে দক্ষযজ্ঞে তাঁহার তনুত্যাগ, পত্নীবিয়োগবিধুর মহাদেবের বৈরাগ্য, তদনন্তর হিমাদ্রিশিখরে মেনকাগর্ভে এবং গিরিরাজের ঔরসে মহাশক্তির পুনরাবির্ভাব, তাঁহার বাললীলা, এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পঞ্চতপাদি কঠোর তপস্যা, তদ্দ্বারা শিবসাক্ষাৎকার লাভ, উভয়ের বিবাহ, সংসারধর্ম্ম পালন, এবং ভক্তগণের সাধনানুযায়ী তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধিবিধায়িনী বর্ণনা দ্বারা নরলোকে শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ-প্রথিত মূল উপাখ্যান যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনে অবশ্য সকলে পৃথক্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কে কিরূপ ভাবে আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, গৌরীচরিতে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

প্রাচীন বলিয়া কবিগণের মধ্যে আমরা প্রধানতঃ চারিজন মহাকবি উপরি উক্ত বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন দেখিতে পাই। ১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ২। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, ৩। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ইহাঁদের গ্রন্থের নাম যথাক্রমে চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, কালীকীর্ত্তন এবং শিবায়ন। পৌরাণিক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমে জগতের উৎপত্তি সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দেব যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর পশু পক্ষ্যাদির উৎপত্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়, অন্ততঃ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত উপরিউক্ত তিনটী কবিই প্রথানুসারে সৃষ্টি প্রক্রিয়া উপলক্ষে পরব্রহ্মের সহিত মহাশক্তির সঙ্গতি এবং তাহা হইতে পঞ্চতত্বের উৎপত্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু

ও মহেশ্বরের উদ্ভব ইত্যাদি বিষয় অন্যাতিরেকে বর্ণনা করিয়াছেন তৎপরে স্বায়ম্ভুব মনু। অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষি ও প্রজা সৃষ্টির পর দক্ষের সপ্তবিংশ কন্যার বিবাহ ও তদ্দ্বারা ক্রমশঃ প্রজা বৃদ্ধি। দক্ষ প্রজাপতিগণের অন্যতম, ব্রহ্মার মানস পুত্র, কিছু বেশি অভিমানী, তিনি ভৃগু মুনির যজ্ঞে কনিষ্ঠ জামাতা মহাদেবের নমস্কার না পাইয়া তাঁহার অপমান মাত্র উদ্দেশ্যে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ সকল পুরাণেই দক্ষযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। এই যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণবন্ধ হয়, তৎপত্নী দক্ষকন্যা উমা বিনাহ্বানে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া স্বামীর নিমন্ত্রণরোধের প্রতিবাদ করিলে দক্ষ যতদূর সম্ভব শিবনিন্দা করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর তথায় তনুত্যাগ ঘটে। এরূপ পতিভক্তি জগতে অতুলনীয়, দক্ষকন্যা সতী সতীর আদর্শ। যিনি মহাশক্তির অবতার, যাঁহার ইচ্ছায় পরব্রহ্মের পরিস্ফুরণ এবং উপাধিলাভ, সতীধর্ম্ম তাঁহার আদরণীয়, পতিপ্রাণতা তাঁহারই ভূষণ। তাঁহার নিকট প্রাণাপেক্ষাও সতীধর্ম্মের সমাদর। সতীর দেহত্যাগ ঘটনা তিনটী পৃথক্ কবির পৃথক্ ভাষায় পাঠ করুন।—

শিবনিন্দা শুনি, মহা দুঃখ গুনি,
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর,
কেন বাবা! হেন মতি॥
যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু, তেজিব এ তনু,
তবে যাবে মোর পাপ॥

(অন্নদামঙ্গল)

গুরুজন-নিন্দা শুনি আচ্ছাদি শ্রবণ,
যেবা নিন্দা করে তার করিব শাসন।
সেই স্থান ছাড়ি কিবা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতীকার হেতু তেজিব পরাণ॥
হৃদয়-সরোজে বাঁধি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিল বসন॥
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গীত গৌরী গুণ-গাথা॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এতেক শুনিয়া সতী করে অনুতাপ।
হয়ে হায় হেন পাপী হৈল মোর বাপ॥
পাপ তনু হ'তে জন্ম জানি পাপ ভাগ।
যোগাসনে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ॥

শিবায়ণ।

দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া সতী জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা চতুর্থীতে তুহিনগিরিকন্যারূপে হিমাদ্রিশিখরে ভূমিষ্ঠা হয়েন। শাক্ত সম্প্রদায়ের এই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা উপলক্ষে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অমর সংস্কৃতকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথমে দুইটী শ্লোকের আভাসে হিমালয়ের যে বর্ণনাটুকু করিয়াছেন, পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

উত্তরে করিয়া স্থিতি, আছেন নগাধিপতি,
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে।
যেন পৃথিবীর মানদণ্ড॥

সুমেরু থাকিতে উচ্চ, যাহারে করিয়া বৎস্য,
পৃথু করে পৃথিবী দোহন।
সর্ব্ব শৈল হয়ে জড়, ব্যাপার করিল বড়,
হৈল রত্ন মহৌষধিগণ॥
অনন্ত রত্নের প্রভু, কোন দোষ নাহি কভু,
সবে মাত্র হিমের আলয়।
এক দোষ গুণ রাশি, নাশে নাহি যেন শশী,
শশে ভাসে শোভা সমুচ্চয়ে॥

কবিকঙ্কণ এ পথে পদার্পণ করেন নাই—তিনিও বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবের সন্তান স্বভাবকবির অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন, তিনি কেবল এতদ্প্রসঙ্গে ;—

তুষারশিখর ভাগ্য নিবেদিব কি ?
ভুবনজননী হ'য়ে হৈলা যার ঝি॥
মৈনাক যাহার ভাই পরম সুন্দর।
কাটিতে নারিল যার পাখা পুরন্দর॥
পর্ব্বতরাজার ছিল যত কুলাচার।
ওদনপ্রাশন আদি করিল তাহার॥
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ গৌরী দিবসে দিবসে॥
নিবিষ্ট করিয়া মন চণ্ডীর চরণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবি কঙ্কণেতে ভণে॥
কবিকঙ্কণ।

এই কয়েক পংক্তিতেই দেবীর বাল্যকালের কথা শেষ করিয়া গিয়াছেন, রামেশ্বরও তদনুরূপেই সারিয়াছেন বলিতে হইবে,—

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
শোভা করে কলান্তের যেন জ্যোৎস্নান্তর॥
পর্ব্বত পুণ্যাহ পেয়ে পাঁচ মাস কালে।
কর্ণবেধ কন্যার করিল কুতূহলে॥
পুণ্যায় পরমানন্দে পরিপাটী করি।
সাত মাসে শিশুকে ওদন দিলা গিরি॥
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবান্।
গুণ কর্ম্মভেদে হইল অনন্ত আখ্যান॥
শিবায়ন।

* বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার পর গৌরীর হীরা-মণি-মাণিক্যাদি বহুমূল্য রত্ন প্রভৃতি বহুল অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, সে গুলি যে অঙ্গে যেমন সাজিয়াছে সেই অঙ্গের তেমনি শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু কবিকঙ্কণ বিনালঙ্কারে তাঁহার ভুবনমোহন রূপের বর্ণনায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আনবেশ দিনে দিনে, শোভা অলঙ্কার বিনে,
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
উরুযুগ করিকর, নাভি সুগভীর সর,
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
অধর বন্ধুকবন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবনমোহন॥
নাসাতে দোলয়ে মতি, হীরায় জড়িত তথি,
বদনকমলে ভাল সাজে।
তুলনা সে দিতে নারি, তাহে অতি মনোহরী
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥

গৌরীর বদনশোভা, লখিতে না পারি কিবা,
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চান্দ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্ব-লোকে,
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশনরুচি, দেখিয়া দাড়িম্ববীচি,
মলিন হইল লজ্জাভারে।
অনুমান করি মনে, ওই শোকের কারণে,
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেম মুকুলিকা ভাসে,
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিজুলী সাজে,
পরিহরি চপলতা দোষে॥
স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুঠিয়া নিল,
উরস্থল জঘন ভুজনে।
চরণ চঞ্চল ভাব, লোচন করিল লাভ,
নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ, চিন্তিত পর্ব্বতভূপ,
কারে দিব এই কন্যা দান।
উমাপদে হিত চিত, রচিল নৌতুন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কন রসগান।

এই রূপ-বর্ণনায় সংস্কৃতকবির ছায়া কবিকঙ্কণ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাইলেও যেন তাহাতে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। মুকুন্দরাম ও রামেশ্বর এতদুভয়ে সুকবিত্বসাধক বলিয়া ইহাঁদের বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই, কিন্তু রামপ্রসাদ সেন সাধনায় সিদ্ধ এবং কবিত্বশক্তি সম্পন্ন। তিনি আপনার ইষ্ট দেবতাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন, এবং মাতৃভাবেই পূজা ও উপাসনাদি করিতেন। "মা" বলিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিত, চক্ষু ফাটিয়া মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় পুলকাশ্রু নিঃসৃত হইত, তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহাকে জগন্ময়ী দেখিতেন, পুত্রের প্রতি মাতার যে বাৎসল্যভাব তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইতেন, সুতরাং দেবীর বাল্যলীলা বর্ণনায় মেনকার বাৎসল্যভাব স্বতই পরিস্ফুরিত হইতে পারিয়াছিল। কবিরঞ্জন দেবীর বাল্যলীলা যেরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বড়ই স্বাভাবিক, যার পর নাই চিত্তস্পর্শী। বালস্বভাবা গৌরী নিশাশেষে সুধাকরদর্শনে জননীকে তাহা ধরিয়া দিবার জন্য সাধারণ বালিকার ন্যায় আবদার করিলে মেনকা তাঁহাকে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থা হইয়া স্বামীকে বলিতেছেন,—

গিরিবর!
আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য-পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধ'রে দে উহারে।
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥
কাঁদিয়ে ফুলায় আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথারে॥

গিরিরাজরাণী কন্যার আবদার রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই বিব্রতা ও ব্যতিব্যস্তা হইয়া উঠিলেন এবং অসান্ত্বনীয়া কন্যাকে স্বামীহস্তে অর্পণ করিলে, তিনি পুরুষবুদ্ধির কৌশল বিস্তার করিলেন, তিনি গৌরীকে কোলে লইয়া "এই চাঁদ লও" বলিয়া, তাঁহার হাতে এক খানি আরসী দিলেন। গিরিরাজকন্যা দর্পণে আপনার বদনবিধু দর্শন করিয়া পরম পুলকিত এবং অচিরে সুনিদ্রিতা হইলেন;

উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীকে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটী শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

কালীকীর্ত্তন।

দুর্ভিক্ষচিত্র।

৩ নং।

(শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল।)

১

আমি যে তোদের মাগো! আপন সন্তান,
নাই কোন সাজ সজ্জা, তাতে মা, কিসের লজ্জা।
ছেলের নিকটে মার সকলি সমান!
বসিতে আসন দিতে পারিলেনা, তা'তে চিতে,
কিসের বিষাদ মাগো! কোন্ অপমান?
বসন বিহনে হায়! কলাপাতে ঢাকা কায়*
এই মা বসন লও, কর পরিধান।

অনাহারে জরাজীর্ণ, অবসন্ন ক্লান্ত শীর্ণ,
ওমূর্ত্তি দেখিয়া মাগো! ফেটে যায় প্রাণ!
কি জানি কাহার পাপে, কোন্ ব্রহ্ম-অভিশাপে
সোণার এ বরিশাল হয়েছে শ্মশান,
ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে অনাহার
ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষের বদন ব্যাদান!
সোণার এ বরিশাল হ'য়েছে শ্মশান।

২

আমি ত মা পর নই, আপনার জন,
দুয়ারে দুয়ারে মাগি, এনেছি তোমার লাগি
সামান্য তণ্ডুল এই, কর মা রন্ধন!

---

* বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ১৩১৩ সালের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের দিনে বরিশালের বহুতর মুসলমান কুলললনা, বস্ত্রাভাবে কদলীপত্রে লজ্জানিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত তাহাদের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করেন।

ছেলেদের দিয়ে দু'টী, নিজে খাও এক মুঠি
থাক্ মা, কাঁদিতে নাই,—সম্বর রোদন!
কে জানে কাহার পাপে, কোন্ ব্রহ্ম-অভি-
শাপে
সোণার এ বরিশাল হ'য়েছে এমন!
যার অন্নে দেশ বাঁচে, সেই আজ অন্ন যাচে!
অন্নহীনা অন্নপূর্ণা মলিন বদন!
অধম অভাগা জাতি, নিত্য খায় জুতা লাথি,
তথাপি তাদের আজো হ'লনা চেতন!
দেশের কৃষককুল, হ'য়ে গেল বিনির্ম্মূল,
একটু করুণা নাই তাদের কারণ!
হায়! আজ ঘরে ঘরে, না খেয়ে মানুষ মরে,
কার কাছে এ বেদনা করি নিবেদন?
থাকিলে সহস্রপ্রাণ, করিতাম বলিদান
এ জাতীয়-প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন।
অন্নহীনা অন্নপূর্ণা মলিন বদন!

৩

দেখিয়া দেশের দশা, বুক ফেটে যায়,
এস ভাই বঙ্গবাসি, একবার দেখ আসি
সোণার এ বরিশাল শ্মশান-শয্যায়!
ক্ষুদ্র কি মহৎ উচ্চ, হও দীন, হও তুচ্ছ,
যার যা সামর্থ থাকে, যা থাকে উপায়,
সেও তাই দয়া করে, দীন কাঙ্গালের তরে,
বাঁচাও কৃষকগণে; ভিক্ষা মাগি পায়।
পুত্র কন্যা যার আছে, এই ভিক্ষা তার কাছে
উপবাসে কত শিশু দেখ মারা যায়!
যার আছে মা ভগিনী, আসিয়া দেখুন তিনি
রমণী রাখিছে লজ্জা কলার পাতায়!
এ দুর্গতি এ নিয়তি, হায়! হায়! বিশ্বপতি
কোন্ পাপে এদেশের কে করে আমায়,
যদি এ জীবন দিলে, দেশের মঙ্গল মিলে,
তার চেয়ে কি আনন্দ আছে এ ধরায়?
হে বিভো! সবার পাপ, সমুদায় অভিশাপ,
আমার জীবন নিয়া ক্ষমহ সবায়!
কি আর কহিব আমি, তুমি নাথ অন্তর্য্যামী
প্রাণের সকল কথা ফুটেনা ভাষায়।
যে বাসনা এ অন্তরে পূরাও তা দয়া করে,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, ক্ষতি নাই তা'য়।
হেরিয়া দেশের দশা বুক ফেটে যায়।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বিধবাবিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"এই মূল সূত্র (অথাতোহধিকারঃ) সংক্ষিপ্ত হইলেও অসন্দিগ্ধ স্বল্পাক্ষরনিবদ্ধ উপদেশের আধার। *"

ভারতভূমির সেই প্রথিতযশা, স্বার্থ-পরিশূন্য সর্ব্বজনহিতৈষী শাস্ত্রকারগণ বিধবা রমণীর প্রতি তিন প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম সহমরণ বা অনুমরণ; দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য; তৃতীয় পুনর্ব্বিবাহ। আমরা যথাসাধ্য ক্রমশঃ এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য বিবৃত করিতেছি।

১। সহমরণ বা অনুমরণ—মৃত পতির সহিত চিতানলে পুড়িয়া মরাকে "সহমরণ"

* বঙ্গদর্শন—১৩১১ সাল অগ্রহায়ণ। "ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

কহে। আর প্রবাসী পতির মৃত্যুর পরে তাঁহার পাদুকা প্রভৃতি বক্ষে লইয়া চিতা-রোহণ-করাকে "অনুমরণ" বলা হয়। হিন্দু-শাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাতক রূপে পরি-গণিত হইলেও সহমরণ ও অনুমরণকে আত্মহত্যারূপে গণনা করা হয় নাই। এইখানে সেই "অথাতোঽধিকারঃ" স্মরণ করিতে হইবে। বিধবার সেই শোকের তীব্রতা, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অসমর্থতা, এবং বাকী জীবনের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা নিরা-করণ আশয়ে ঋষিগণ এই সহমরণ বা অনুমরণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে "মানব শরীরে যত কোটি রোম আছে, সহমৃতা বা অনুমৃতা সতী তত কোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গবাস করিতে পারিবেন।" পতিশোকাকুলা সদ্যবিধ-বার পক্ষে এই প্রলোভন অসম্বরণীয় বলিয়াই হউক, আর পরিণামে অনির্ব্ব-চনীয় ক্লেশের বিভীষিকা মনশ্চক্ষে দেখিয়াই হউক, অনেক রমণীই সহমৃতা বা অনুমৃতা হইতেন। কিন্তু একবিধ কার্য্যে সর্ব্বত্র সুফল হয় না। যাঁহারা প্রকৃত প্রেমময়ী ভার্য্যা, যাঁহারা পতির মৃত্যুতে আপনাকে মৃতা বলিয়া মনে করেন, তাদৃশী পতি-প্রাণা রমণীর পক্ষে সহমরণ বা অনুমরণ এক আনন্দময়ী শান্তিময়ী ঘটনা। ঐরূপ অনেক সতী জ্বলন্ত চিতায় হাসিতে হাসিতে জীবন সমর্পণ করিয়া সাধারণের বিস্ময় ও ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয়ে সকলের অধিকার নাই, সেই জন্য এমনও ঘটিয়াছে যে, কত সাধ্বী প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপ, রক্ত মাংসময় দেহে সহ্য করিতে না পারিয়া চিতা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছেন; তখন অখ্যাতিভয়ে—অসতী অপবাদভয়ে তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধু-গণ বংশ দণ্ডাদি আঘাতে তাঁহাদের জীবন শেষ করিয়া স্বর্গবাসের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল সতীর ভাগ্যে পরলোকে যতই সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘটুক না কেন, ইহলোকে এতাদৃশ সহমরণ বা অনু-মরণকে অতি ভয়ানক, অতি নৃশংস ব্যাপার বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। এই জন্য সতী-দাহ নিবারণের চেষ্টা ভারতবর্ষে বহু দিনই হইতেছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই আদেশ প্রচার করিয়া ছিলাম যে, সন্তানবতী জননীগণ স্বামীর সহগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেও এই প্রকারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি পুনরায় আদেশ দিলাম যে, কোন স্ত্রীলোককেই বল প্রয়োগ করিয়া স্বামীর সহিত এক চিতায় জীবন্ত দাহ করিতে পারিবে না। অপর দিকে ইহাও আদেশ দিলাম যে, হিন্দুগণের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান কিংবা অপর কোন কার্য্য কেহ বল প্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে কিংবা বাধা দিতে পারিবে না।" এই সকল চেষ্টা ও ইচ্ছার বহুকাল পরে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ সহৃদয় মহাত্মাদিগের অদম্য অধ্যবসায় ও একান্ত চেষ্টার ফলে সতীদাহ নিবারণ ব্যাপার লর্ড উইলিয়ম

বেণ্টিঙ্ক মহোদয় কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এখন রমণীর ইচ্ছাই থাকুক আর শাস্ত্রেই ব্যবস্থা থাকুক, সহমরণ বা অনুমরণ রাজদণ্ডভয়ে এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরাও এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

২। ব্রহ্মচর্য্য—তখন আইনের নিষেধ না থাকিলেও সহমরণ বা অনুমরণ যে সকলের সাধ্য নহে, একথা পরম জ্ঞানী ঋষিগণ জানিতেন। সেই জন্য অধিকার বিচারপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জনে অশক্তা বিধবাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত করেন। মৃত স্বামীকে স্মরণ করত পত্নী নিয়মস্থা হইয়া মৎস্য মাংস প্রভৃতি রজোগুণের উত্তেজক খাদ্য, অলঙ্কারাদি সর্ব্ববিধ বেশ ভূষা পরিত্যাগ, হবিষ্যান্ন, একাহার ও সত্বগুণের উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ, চীর পরিধান পূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্মে দিনাতিপাত, এবং সর্ব্ব বিষয়ে আত্মসংযম, এই ব্রতাচরণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। সহমরণে অক্ষমা বলিয়া ব্রহ্মচারিণীদিগের প্রতি ঋষিগণ বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে কতদূর গৌরবের চক্ষে দেখিতেন, নিম্নলিখিত একটী মাত্র শ্লোক হইতে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি,

ভগবান্ মনু বলেন—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী-স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

সদাচারশালিনী স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। তিনি অপুত্রা হইলেও (অপুত্রক বালখিল্যাদি) ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিবেন।

আজ যদিও আমরা "বিধবাবিবাহ" আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, তথাপি ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে দুই চারিটী কথা না বলিয়া বিষয়ান্তরে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতেছি না, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

আর্য্য ঋষিগণের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারিণী বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহারা স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমপরায়ণা, যাঁহারা প্রৌঢ়বয়সে মৃতপতিকা, যাঁহারা সন্তানের জননী, যাঁহারা পতিকুলের গৌরব, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি রক্ষার্থে আত্মত্যাগিনী, এই সকল বিধবারই ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার আছে।

যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী অথবা ব্রহ্মচর্য্য করিবার জন্য যোগ্যা, যথানিয়মে তাঁহাদিগের ঐ পবিত্র ব্রতে সহায়তা করা অভিভাবক ও আত্মীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা জানি, অনেক স্থলে বিধবা তরুণীদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে নিযুক্ত করা হয় না। যাহারা তরুণবয়স্কা, যাহাদের মাতা পিতা প্রভৃতি বর্ত্তমান, যাহাদের সমবয়স্কা যাতা, ভগিনী প্রভৃতি ভোগবিলাসে আসক্তা, অনেক সময়ে তাহাদের আহার পরিচ্ছদের সংযম করা হয় না। স্নেহের অনুরোধে বিধবা তরুণী কেশবিন্যাসও করে, ভাল শাড়ীও পরিধান করে, সুন্দর জ্যাকেট বডীও গায়ে দেয়, স্বর্ণালঙ্কারেও দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, স্থানে স্থানে আমিষ আহারও

দেওয়া হইয়া থাকে। উপরোধ অনুরোধে বা চক্ষু-লজ্জার দায়ে সমাজ এ সকল বিষয়ে উদাসীন থাকেন। আমাদের কথা এই যে, যাহাদিগকে চিরদিন বৈধব্যাবস্থায় থাকিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যই যাহাদিগের পালনীয় ব্রত, স্নেহমমতা বশে, মার্জ্জিত-রুচির অনুরোধে অথবা অন্যান্য কারণে তাহাদিগের ভোগলালসা পরিবর্দ্ধন করা, তাহাদিগের সংযমশক্তিকে হ্রাস করা যে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য্য, একথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্য সংযমশক্তির অনুশীলন—আত্মত্যাগ; ফল চিত্তশুদ্ধি। ইহা প্রাচ্য জাতির মনুষ্যত্ব শিক্ষার প্রধান উপকরণ। বিধবাদিগের আহারপরিচ্ছদাদির সংযতি এবং ত্যাগস্বীকার যে, তাঁহাদিগের অবলম্বিত নিবৃত্তিপথকে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া দেয়, একথা অনুধাবন করিলে সকলেরই উপলব্ধি হইতে পারে। *

(ক্রমশঃ)

* আহার পরিচ্ছদাদির সংযমে মানবচিত্তে কতদূর বৈরাগ্যভাবোদয় হইতে পারে, নিম্ন লিখিত আখ্যায়িকাটী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পুরাণে আছে, মহর্ষি অগস্ত্য পিতৃলোকদিগের আদেশক্রমে রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে স্বামীর ইচ্ছাক্রমে হউক অথবা সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালনার্থে হউক, লোপামুদ্রা গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি বিলাসিতার সমস্ত উপকরণগুলি যাচকদিগকে বিতরণ করিয়া, বল্কলধারিণী, ফলমূল হারিণী হইয়া তপস্যায় নিরতা থাকেন। বহু বৎসর এইরূপে অতীত হইলে একদিন মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভদ্রে! আমি পিতৃলোকদিগের আদেশে পুত্রার্থে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এত দিনেও তুমি পুত্র বর প্রার্থনা করিলে না, ইহার কারণ কি?" তখন লোপামুদ্রা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি সর্ব্বাবধ ভোগবাসনা সংযত করিয়া আপনার সহিত তপস্যা করিতেছি, ইহাতে আমার যে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে, সেই ফলে পুত্রবিত্ত প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর সুখকামনা আর আমার চিত্তে স্থান পাইতেছে না। কিন্তু আপনি যখন ধর্ম্মার্থে পুত্রকামনার আদেশ করিতেছেন, তখন আমাকে এই কুশবলয়, রুদ্রাক্ষমালা, বল্কলবস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে রত্নালঙ্কার, উত্তম বস্ত্র, সুস্বাদু আহার পানীয় এবং কৌমার কালের ন্যায় ধনসম্পদ্ দাসদাসী পরিবৃত গৃহ প্রদান করুন।" কথিত আছে, মহর্ষি অগস্ত্য ভার্য্যার পরামর্শে, তপোবলে লোপামুদ্রাকে তাঁহার প্রার্থিত পদার্থ সকল দান করেন এবং অচিরকালমধ্যে লোপামুদ্রা উত্তম পুত্র প্রসব করিয়া পতির পিতৃঋণ হইতে মুক্তির সহায় হন।

প্রঃ লে।

বৎসরান্তে।

আজি সেই ৪ঠা আষাঢ়, যে দিন বামাহিতৈষী মহাত্মা ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত স্বর্গারোহণপর্ব্ব দিন। এই বিদায়ের দিন আমাদের চিরস্মরণীয়। আমরা সকল ভগ্নী সম্মিলিত হইয়া তদীয় আত্মার মঙ্গলার্থে ব্রহ্মপদে আরাধনা করিব। এ পূজায়

আমাদের পত্র-পুষ্প-ফল জল কিছুরই প্রয়োজন হইবেনা; এ কেবল স্মৃতির পূজা, আর অশ্রুজল ইহার উপহার। নারীজীবনের বিশুদ্ধ ভক্তিরসাভিসিক্ত পূত প্রার্থনা যেন পুষ্পসৌরভের সহিত, পবনহিল্লোলের সহিত ও দিবাকরের নব কিরণের সহিত মিলিত হইয়া সেই একাদিদেব মহাদেবের চরণে পতিত হয় এবং তদীয় নির্ম্মল আত্মা উজ্জ্বলতর হইতে উজ্জ্বলতম পুণ্য প্রতিভায় পূর্ণ হয়। তিনি যে, সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার পুরস্কারেই সেই বিশুদ্ধ আত্মা অলঙ্কৃত হইয়াছে, ইহা তাঁহার আত্মীয়স্বজন, পুত্রকন্যা ও বন্ধুবান্ধবের পরম শান্তির আশ্রয়। আমাদের প্রিয়জন পরম সুখে আছেন, তিনি সকল দুঃখ অভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহা শোকসন্তপ্ত ও প্রিয়বিচ্ছেদকাতর প্রাণের সান্ত্বনাদায়ক বটে। কিন্তু মানবহৃদয় এমনি স্বার্থপূর্ণ যে, সুখের সহিত সুখ ও দুঃখের সহিত দুঃখকে মিলিত করিতে না পারিলে আমাদের সার্থকতা হয় না। তাই যেন শূন্যতায় সর্ব্বশূন্যতা বোধ করি। যতক্ষণ না আত্মায় পরমাত্মায় সম্মিলন হয়, যতক্ষণ সেই পরম সত্বার ছায়া এই অপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইবে, ততদিন আমাদের ক্রন্দন ঘুচিবে না। তাই আজি কাঁদিতে কাঁদিতে পরমপিতাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, পরলোকগত আত্মার আশীর্ব্বাদ ইহলোকে বর্ষিত হইয়া, হৃদয়ের মলাধুলা ধৌত করুক। আমরা যেন স্বর্গীয় আত্মার প্রতি চিরদিন সমভাবে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারি। সেই অবিনশ্বর আত্মা আমাদের চক্ষের সম্মুখে চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় নিশিদিন করুণার কিরণ বিকিরণ করুন, আমরা সেই আলোক ধরিয়া সত্য পথে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। আজ স্বর্গমর্ত্ত্যের যে ব্যবধান, যে দূরত্ব অনুভব করিয়া আমাদের প্রাণে হাহাকার ঘটাইতেছে, তাহা নিকট ও এক হইয়া চির আরাম প্রদান করুক। আমরা ভগবানের করুণা ধরিয়া সেই অমৃতময়ধামে প্রবেশের যোগ্য হইতে পারি। এই সংসার যেমন সুখের উপাদানে গঠিত, তেমনি পদে পদে ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বরতায় মণ্ডিত। আমরা আজ যে বস্তুটী অতি মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিলাম, কালই তাহা মলিন হইয়া লুপ্ত হইবে, কেবল একবার মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্য ও শিল্পকুশলতা প্রকাশের জন্য অবনীতে বিকাশ হয়, সেই রূপ গুণ যে ভগবানের অংশ আমরা তাহা বুঝিনা, আমরা ভাবি ইহা বুঝি আমাদের নিজের একচেটে বস্তু, ইহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতে হইবেনা, সেই আশা, সেই ভরসা বক্ষে পোষণ করিরা বর্দ্ধিত হই, কিন্তু আসল মূলসত্তাকে ভুলিয়া যাই। ইহা কি আমাদের অন্ধতা ? না তাহা নহে। আমরা যে অতি ক্ষুদ্র, অতি অকিঞ্চন, সুতরাং আমরা সেই বিশ্বরূপের মহাপ্রেমের মূর্ত্তির কল্পনাও হৃদয়ে ধরিতে পারি না। ক্ষুদ্র

হইতে ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম ছটা টুকু দেখিয়া বিহ্বল হই। ইচ্ছা হয় উহাতেই বিলীন হইয়া থাকি। ঈশ্বর সেই মোহ ভাঙ্গিবার জন্য পরীক্ষায় ফেলেন, তখন আমরা আকুল প্রাণে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। তবু দেখা পাই না। অবশেষে অবোধ শিশুর মত কাঁদিতে থাকি। এই ক্রন্দন মানবজীবনের ধর্ম্ম। জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন, তাই আজ এই মহাপূজায় অশ্রুজলের কল্লোল চারিদিকেই বহিতেছে। সেই ধর্ম্মবীর স্বর্গ-সিংহাসন হইতে দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, আর মঙ্গলসত্ত্বার ভাবে পূর্ণ করিতেছেন। আজিকার মত বর্ষে বর্ষে যেন সেই মহাত্মার স্মরণার্থ আমরা ভগবানের সম্মুখে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মস্তক অবনত করিতে পারি। সেই সাধুজীবনের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে। আজি তাঁহার শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাদিগের সহিত প্রাণের সমবেদনা এক করিয়া এই পবিত্র সাংসরিকে প্রবাস হইতে বিশ্বপিতার চরণে প্রণাম করিতেছি ও সেই সত্যসেবকের আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে সাংসারিক পুণ্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়া ধন্য হইবার কামনা করিতেছি।

হে পরমেশ্বর! পরলোকে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা তোমার দাস। আর ইহলোকে আমরা তোমার দাসানুদাস, অতএব আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখ! আমরা শোকতাপে জর্জ্জরিত ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া জীবনে মৃতবৎ হইয়া আছি। হে পরম দয়ালু অনাথনাথ! তুমি সর্ব্বসন্তাপহারী। কখন পিতারূপে কখন পুত্ররূপে আমাদের মমতা দেখাইতেছ, নিত্য নব নব প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিয়া এমন শৃঙ্খলে জড়াইয়াছ যে, আজ হরিণীর ন্যায় সেই জালে বদ্ধ হইয়া তোমার মুখপানে চাহিয়া আছি, কিন্তু কিছুই দেখিতেছি না। নয়ন, সলিলে মগ্ন হইয়া আছে। জ্ঞান মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। শুধু হতাশা সার। তুমিই একমাত্র অন্ধকারের আলো। আইস! প্রকাশ হও। যে যে প্রাণে দুঃখের আগুন জ্বলিয়াছে, তথায় শান্তি দান কর। কিন্তু স্মৃতিটুক মুছিও না। বামাকুলকল্যাণাকাঙ্ক্ষী সাধু ৺উমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি জাগরিত করিবার নিমিত্ত "বামাবোধিনী" অনাথিনীর বেশে এখনও ঘরে ঘরে ভগিনীগণকে ডাকিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা সাদরে তাহাকে গ্রহণ কর, তাহার জীবনরক্ষার উপায় কর। বহুকাল হইতে তাহার মূল মন্ত্র, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ," সেই মন্ত্র জাগাও। সকলে মিলিয়া এক দেবতার চরণে এক প্রাণে সিদ্ধির প্রার্থনা কর। যাঁহারা ভক্ত ও শিষ্য, তাঁহারা কায়মনচিত্তে যেমন দেবতার পূজা করেন, তদ্রূপ তদীয় কার্য্যের প্রতি আস্থা প্রদান করুন। কর্ম্মই আমাদের ইহ ও পরজীবনের একমাত্র মুক্তির পথ। অদ্য যে সাধুর আত্মার উদ্দেশে সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের করুণা কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই সাধুর কর্ম্মের অনুকরণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের

ভক্তির পরিচয়। সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার চরণে আমাদের নিবেদন, সেই সাধুর কীর্ত্তি ইহলোক ও পরলোকের পুণ্যকর্ম্মের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকুক্। আজ এক বৎসর তাঁহার প্রিয় বামাবোধিনীতে আমরা তদীয় কল্যাণময়ী উপদেশ শুনিতে পাই নাই, তাঁহার মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে শিক্ষিত হই নাই, ইহা বামাগণের পক্ষে পরম ক্ষতিজনক ও অভাবের কারণ,এ কথা ভাবিলেই শোকে মগ্ন হইতে হয়। কিন্তু স্বার্থবন্ধন যদি খুলিয়া দেখি, তবেই জানা যায় যে, এই ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে, ক্ষুদ্র সুখ হইতে অবসর লইয়া তিনি মহাব্রতে ব্রতী হইয়া এক্ষণে অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার যে কার্য্যগুলি আমাদের ক্ষীণশক্তি দ্বারায় চালিতে হইতে পারে, সাধ্যপক্ষে তাহার অবহেলা করা উচিত নহে। একদিন এক সময়ে সকলে এক-বার তাঁহার সংকীর্ত্তির স্মরণ করিয়া, তদীয় অভাবে অনুতপ্ত হইয়া ইতি কর্ত্তব্য করিলে সার্থকতা হয় না। সেই পরোপ-কারী মহাত্মার কার্য্যকলাপ পন্থা প্রতি-দিনের স্মরণীয়।

হে ভগবান্! আমাদের অবলাকুলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাদের হৃদয়ে সৎকার্য্যের জন্য বল দাও। বামাহিতৈষী মহাত্মা ৺ উমেশচন্দ্র দত্তের বাৎসরিকে আমাদের এইপ্রার্থনা।

ওঁ হরি শান্তি

শোকাহতা বিনীতা

ভগ্নী।

স্মৃতি-পূজা। *

ধরণীর শোক তাপ ফেলিয়া ধরায়,
শান্ত সমাহিত যোগী আছ অমরায়;
ভাষায় কি ফুটে কথা! তোমা হারাইয়া,
যে ভাবে অবশ প্রাণে চলেছি ভাসিয়া।
মোরা সবে ও চরণে দিয়েছি অঞ্জলি,
এখনো এ শিরে নিত্য মাখি পদধূলি,।
আমা হেন বালুকণা যতনে লইয়া,
চাহিয়াছ নিশিদিন গঠিতে এ হিয়া।
ভক্তি প্রেম ক্ষমা গুণ শিখাতে পামরে,
মহা ঋষি এসেছিলে এ পান্থ-আগারে।
জ্ঞানধর্ম্ম পিয়াসা ত তুমি জাগায়েছ,
অকাতরে সুধাধারা সদা ঢালিয়াছ,
আজো সে অদম্য তৃষা জ্বলে দিবারাত,
সংসার শ্মশানভূমি কাঁদি অবিরত।
মহাযোগী রাখ মোরে সংসারে অটল,
কর্ম্মযোগী দাও কিছু সাধনার বল।
নির্ব্বাপিত সব শক্তি বিশ্বাসবিহীন,
বজ্রাহত জীব আমি অতীব মলিন।
জীবনের ধ্রুবতারা গিয়াছে ডুবিয়া,
এ মহাশ্মশানে কাঁদি আত্ম হারাইয়া।

---

* ৺ দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে।

এতকাল যত শিক্ষা দিলে ক্ষীণ প্রাণে।
ভুলিয়াছি সব হায়! কি ফল জীবনে?
আজি—
উর্দ্ধলোক হ'তে আলো ঢাল এ পরাণে,
জাগুক এ মৃত প্রাণ বিশ্বাসের গুণে।

গৃহচিকিৎসা-পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। সপিশমের বীচি (হাকিমী মসলার দোকানে পাওয়া যায়) চূর্ণ করিয়া ।০ আনা পরিমাণ দুগ্ধ বা গরম জলসহ প্রতিদিন সকালে সেবন করিলে বাত রক্ত, কুষ্ঠ ও পারদবিকার নিবারণ হয়। ঔষধ সেবন কালীন ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ আহার করিতে হইবে।

২। শ্বেতকুষ্ঠে—গরুর হাড় (যাহা অনেক দিবস মাটীর নীচে আছে) চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ধবল রোগ দূর হয়।

৩। ক্ষত মাত্রে ঘৃত ৮ তোলা, নিমপাতা ১ তোলা, ছোট পেঁজ ১ তোলা, কেঁচুয়া ১ তোলা। প্রথমতঃ ঘৃত অগ্নিতে জাল দিবে। ফেনা মরিলে নিমপাতা প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য পুড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ ঘৃত পৃথক্ পৃথক্ ভাজিবে। পরে ঐ ঘৃত ছাঁকিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে ক্ষত শুকাইবে।

৪। কুষ্ঠ রোগ—শরীরে অর্ব্বুদাকার ডুম ডুম মাংস ফুলিয়া উঠিলে আপাঙ গাছের সমস্তাংশ তামাকের মত কুট্টিত করিয়া নূতন হুঁকা ও কলিকাতে সাজিয়া (দিবসে ৪।৫ বার) ধূমপান করিলে নিশ্চয় কমিয়া যাইবে। কখন কখন মূল রোগও নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ৺ নলিনীবালা নাগ। শ্রীমতী নলিনীবালা নাগের স্বর্গারোহণ দৃশ্য। এখানি ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ। ৺ নলিনীবালা ৺ প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের কন্যা। তিনি আর ইহলোকে নাই। তিনি বিদায়কালে যেন, শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা দিয়া যাইতেছেন, এই ভাবে কাব্যখানি রচিত। কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, অলৌকিক মহত্ত্বপূর্ণ দিব্যভাবে পূর্ণ। লেখিকা গৃহপালিত পশুপক্ষী ও উদ্যানের তরুলতাদি সমস্ত পদার্থে যে অকৃত্রিম সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ৺ স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহনের পরিবারের উপযুক্ত।

২। সতী লক্ষ্মী—শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বিধু বাবু সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। যথার্থ সতী-লক্ষ্মীর আবির্ভাবে ঘোর দুঃখ দারিদ্র্য ও বিপদের মধ্যেও সংসারে যে সুখ ও শান্তির আবির্ভাব হয়, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে অতি সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পাঠোপোযোগী এবং প্রত্যেকেরই শিক্ষাপ্রদ। এইরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সাধারণের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

নূতন সংবাদ

১। সম্প্রতি শ্রীরামপুরে এক পুষ্করিণীর ধারে আট বৎসরের একটী শিশু খেলা করিতে করিতে দৈবাৎ জলে পতিত হয়, এবং গভীর জলে নিমগ্ন হয়। হরেন্দ্রনাথ সান্যাল নামক এক বালক এই ঘটনা শুনিবামাত্র নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ জলে ঝম্প দিয়া পড়িল, এবং গভীর জলমধ্যে বারংবার নিমগ্ন হইতে লাগিল। শেষে বীরবালক হরেন্দ্র ১৪ ফিট জলমধ্য হইতে সেই মুমূর্ষু শিশুটীকে উদ্ধার করিয়া আনিল। বহু শুশ্রূষায় সেই অচেতন শিশুটী প্রাণ পাইল। ধন্য হরেন্দ্র! এই একটী কার্য্য দ্বারা তোমার সমস্ত জীবন পুণ্যময় হইল। যথায় নিঃস্বার্থ পরহিতে আত্মবিসর্জ্জন, তথায় করুণাময়ের করুণা প্রত্যক্ষ। মঙ্গলময় ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রাণ হরেন্দ্রকে অক্ষয় নিরাময় জীবন দান করুন।

২। ভারতবর্ষের অনেক পুরাতন শিল্প, অর্থ ও উৎসাহের অভাবে লুপ্ত হইতেছে, ইহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারতের নানা বিভাগের শাসনকর্ত্তারা কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধান বিবরণ পাইলে গবর্ণমেণ্ট লুপ্ত শিল্পের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।

৩। মৎস্যব্যবসার শিক্ষার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার এক বৃত্তি লইয়া বিহারের সৈয়দ মহম্মদ মাসিন আমেরিকায় যাইতেছেন।

৪। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কাশীধামে ক্ষত্রিয় বালকদের শিক্ষার জন্য ভিঙ্গার রাজা উদয় প্রতাপ সিংহ ৩৷৹ টাকা সুদের ১০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন। স্কুলে যোগদান করিবার পূর্ব্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণ রাজভক্ত থাকিবেন বলিয়া কোনও মাজিষ্ট্রেটের নিকট অঙ্গীকার করিবেন।

৫। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর এক দফা এফ্‌ এ এবং বি, এ, পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এই দ্বিতীয় বার পরীক্ষার দিন আগামী ৭ই ডিসেম্বর সোমবার ধার্য্য হইয়াছে।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং সাধা-

গণের আইন শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রবেন, এবং অন্যান্য কালেজ হইতে আইন অধ্যাপনা তুলিয়া দিবেন।

৭। মহা প্রভাবী আনিবেসান্ট দেবী বর্ত্তমান ছাত্রগণের ধর্ম্মপ্রাণতার অভাব বিশিষ্ট রূপে অনুভব করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ছাত্রগণের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য সভা স্থাপন ও বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ। ঈশ্বর তাঁহার এই সদুদ্দেশ্য সফল করুন।

৮। ভারতে পর্শি জাতীর সংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। এক্ষণে পর্শিরা আপন বালকবৃন্দের শিক্ষার জন্য একটী কলেজ স্থাপনের উৎযোগ করিতেছেন। উহার শিক্ষা প্রণালী বেণারস সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের নিয়মানুযায়িনী হইবে। এই জাতির উন্নতির চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

৯। বিহারে পুরনারীগণের শিক্ষার জন্য বেটিয়ার মহারাজ তাঁহার পত্রিবাট স্থানে স্থানে বৃহৎ কুঠি ও দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে মহাশয়ের এরূপ অনুরাগ ও বদান্যতা অতি শুভ লক্ষণ।

১০। শিবপুরে রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার বিষয়ে এবারকার বর্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায় উক্ত সভার প্রযত্নে বহুতর দুভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র সাহায্য লাভ করিয়াছে। উক্ত সভার সভ্যগণের উৎসাহ ও ঐকান্তিক চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। এ ঘোর দুভিক্ষে যাঁহার চেষ্টায় অনশন মুমূর্ষু একটী প্রাণীরও প্রাণ রক্ষা হয় তিনি ধন্য।

১১। পুনার সম্বাদ পত্রে রাজদ্রোহ সূচক লেখার জন্য খ্যাতনামা বালগঙ্গাধর তিলকের নামে যে তুমুল মামলা চলিতেছিল তাহাতে তিলক স্বপক্ষে কোন উকিল বা বারিষ্টার নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং আত্ম পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। জুরির বিচারে তিলকের ছয় বৎসর দীপান্তর ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। তিলকের এই বিপদে সকলেই ব্যথিত।

বামারচনা।

আকুল প্রার্থনা।

হা দেব দেবেশ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারি !
তোমারে চিনিতে কেন এবে নাহি পারি।
তোমার আদেশে কেন চক্ষে বহে জল,
তোমার প্রদত্ত দানে ফাটে বক্ষঃস্থল।
অশ্রুবারি নহে কিহে তব স্নেহরস,
সিঞ্চিয়া দগধ প্রাণ, করয়ে বিবশ।
শোক দুঃখ ব্যথা জ্বালা দেও হাতে ধরি,
তবে কেন আমি প্রভু ! বহিতে না পারি।
আকুল চঞ্চল হিয়া হয় অবিরাম
বুঝেনা বিবেকবাণী, হত মনস্কাম।
ঘটে যথা অহরহ বিচ্ছেদবিরহ,
পরিপূর্ণ কর নাথ ! সেই শূন্য গেহ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আবেদন।

কতবার ও চরণে ঢালিয়াছি অশ্রুধার,
অনাথ শরণ বলে ডাকিয়াছি কতবার।
অভাগীর এ বেদনা কাতর করুণ বাণী
শুনিলেনা চাহিলেনা, হে বিভু জগতস্বামী!
হৃদয় যে ভেঙ্গে চুরে হ'য়ে গেল ছাই থাক্,
অনল লুকায়ে রাখি যাতনা নীরবে থাক্।
এ নিরুদ্ধ হৃদয়ের এ গভীর হাহাকার
ফুরাবে কি এজনমে বল ওহে স্নেহাধার!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

অনন্তরূপিণী নারী।

হে রমণি! তব অন্ত কে কহিতে পারে।
অনন্ত-রূপিণী তুমি সংসার মাঝারে॥
কোন গৃহ তব গুণে স্বর্গ তুল্য হয়।
তোমারি গুণেতে কোন গৃহস্থ মজয়॥
কোন পতি তোমা হতে জীবন্মুক্ত হন।
কোন ভাগ্যহীন মজে তোমারি কারণ॥
লৌহেরে করিতে স্বর্ণ ক্ষমতা তোমার।
তব গুণে ধরে স্বর্ণ লৌহের আকার॥

আর্য্য নারী।

প্রণমামি হিন্দুনারি! চরণে তোমার।
পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তুমি আদর্শ সবার॥
উজ্জ্বল হিন্দুর মুখ ধর্ম্মেতে তোমার।
তোমার কোমল প্রাণ গুণের আগার॥
অন্যান্য জাতির পতি হাটেতে বিকায়।
হিন্দু ললনার স্বামী ঈশ্বর ধরায়॥

মিসেস এম্ সিংহ।

বর্ষশেষে।

(আরাধ্যতম ৺ বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ-স্মৃতি)

১

আজিকার মত থাক্ সব কাজ,
আজি যে সে বর্ষশেষ—
দয়াময় গুরু, স্নেহময় পিতা,
গিয়াছেন পরদেশ।

২

দিবা নিশা সহ রবি-শশী-তারা
আসে যায় ধীরে ধীরে,
আমাদের সেই স্নেহের দেবতা,
আর না আসিলা ফিরে!

৩

ভুলে আজো খুঁজি সে সৌম্য মুরতি,
সে কথা অমৃতময়,
সস্মিত-আননে ধর্ম্ম-উপদেশ,
উছলিত বরাভয়!

৪

বজ্ররবে কহে নিরাশা রাক্ষসী
"এ জনমে আর নহে"
এতই কঠিন মানব-পরাণ
কতই আঘাত সহে॥

৫

এক বর্ষ আজি—সেই শুভাশীষ
না পাইনু শিরোপরি,
তৈলাভাব যেন জীবন-প্রদীপে,
কে নেছে শকতি হরি।

৬

এক বর্ষ আজি—সে আদর মাখা
পত্র নাহি আসে আর,
প্রতি ছত্র আহা স্বরগ সৌরভ
শত স্নেহ করুণার!

৭

এক বর্ষ আজি—এ আষাঢ় মাসে
সিত নবমীর নিশা,
অমূল্য রতন হরি নিল চোরে
আঁধারিয়া দশ দিশা।

৮

হরি নিল চোর, ভারত-গৌরব,
বঙ্গের বক্ষের ধন,
বঙ্গবাসিনীর স্নেহের আশ্রয়——
পিতা ভ্রাতা সখা জন!

৯

নিরাশ্রয় ধর্ম্ম, শক্তিহীন কর্ম্ম,
অনাথ সন্তানগণ,
বামাবোধিনীর হিয়া শত চীর,
জীবন্মৃত বন্ধু জন!

১০

দেখ চাহি দেব! তোমার বিহনে,
বহে কত অশ্রুধার,
সব আছে তবু শূন্যময় সবি,
ভরা মৌন হাহাকার!

১১

দেব দেশে গেছ দেবতা হয়েছ
বিভুর বিশ্বাসী ছেলে,
তবু পোড়া মন মানেনা প্রবোধ
তবু কাঁদি "কোথা গেলে!"

১২

তুমি ছিলে, ধরা ছিল সুধাভরা
প্রাণে ছিল কত বল,
তুমি ছিলে তাই কত ভরসায়
ভরা ছিল হৃদি তল।

১৩

এক বর্ষ আজি—সায়াহ্নে যেমতি
নিবে রবি-কর-লেখা
তেমনি নিবিছে আয়ু আশা-আলো
আমরা রয়েছি একা।

১৪

জরামৃত্যুময়ী অবনী ত্যজিয়া
রয়েছ অমর ধামে,
ভকতি প্রণতি প্রদানি চরণে,
ও পবিত্র পুণ্য নামে।

১৫

দেব দেশে গেছ দেবতা হয়েছ,
বিভুর বিশ্বাসী ছেলে,
স্বার্থপর মন, মানেনা বারণ
তাই কাঁদি "কেন গেলে?"

প্রণতা
স্নেহের কন্যা
শ্রীমা—

গ্রাহকগণের প্রতি।

১৩১৫ সালের ৩ মাস গত হইল, সহৃদয় গ্রাহকগ্রাহিকাগণ পত্রিকার অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। যাঁহাদের নিকট সাবেক মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। যাঁহাদের নিকট এক বৎসরের অধিক কালের মূল্য বাকি আছে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা ভিঃ, পিঃ ডাকে প্রেরিত হইলে গ্রহণ করিবেন ; ভিঃ, পিঃ, ফেরত দিলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। গ্রাহকগণ নিজ নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন জানাইতে ভুলিবেন না। ঠিকানা না জানাইলে পত্রিকা হস্তগত না হইলে আমরা দায়ীত্ব লইব না।

বামাবোধিনীর অগ্রিম দেয় বার্ষিক	মূল্য	,,	,,	,,	২৸৵০
ঐ	ঐ সান্মাসিক	ঐ	,,	,,	,,	১।৵০
ঐ	পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক	ঐ	,,	,,	,,	৩৲
ঐ	এক খণ্ডের নগদ	ঐ	,,	,,	,,	।০

এক খণ্ডের মূল্য ।০ পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভার, কভারের সম্মুখস্থ পেজ বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকারের পেজের ও নিয়মাবলীর সম্মুখস্থ পেজ, পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের Reading Matter এর সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেক পেজ মাসিক ,, ,, ,, ,, ৫৲

২। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ৩৲

অর্দ্ধ পেজ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ২৲

পেজের চতুর্থাংশ ,, ,, ,, ,, ,, ১৸০

৪। বিজ্ঞাপন এক বৎসরের অধিক কালের জন্য স্থায়ী হইলে মূল্য নিরূপণ জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

রুচি বিরুদ্ধ কোন বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম ও নগদ দেয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৯নং আণ্টনীবাগান লেন,
কলিকাতা।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২৯.৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 540. August, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪০ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৫। আগষ্ট, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

তার বিভাগের বেতন বৃদ্ধি—তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাহাদের গুরুতর পরিশ্রমের জন্য বেতন বৃদ্ধির আবেদন করিয়া কোন ফললাভ না করায় সকলে একযোগে কার্য্যত্যাগ করিয়াছিল। ভারতগবর্ণমেণ্ট এই সকল কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বিদ্রোহিদিগের দণ্ড—কাবুলের আমীরের যে সকল প্রজা সীমান্ত যুদ্ধে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; আফগানিস্থানের গ্রামে গ্রামে তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে।

রাজনিমন্ত্রণ—সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড প্রায় নয় সহস্র গণ্য মান্য প্রজাকে ইংলণ্ড-উইণ্ডসর প্রাসাদে উদ্যান-বিহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতর নেতা, পার্লামেণ্টের সভ্য মিঃ কেয়ার হার্ডির নাম বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তি একযোগ হইয়া সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, এবং যতদিন মিঃ কেয়ার হার্ডির নাম নিমন্ত্রিতের তালিকায় না উঠিবে, তত দিন তাঁহারা রাজকীয় কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না।

অশোক-স্মৃতি—মহারাজ অশোকের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ বিহার ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিহারে রাজগিরি প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সেই পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

আইন কলেজ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম অনুসারে কলিকাতায় একটীমাত্র আইন কলেজ থাকিবে, এবং সেখানে সকলে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে এইরূপ স্থির হয়। ইহার বিরুদ্ধে

অনেক প্রতিবাদ হওয়ায়, শুনা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এক আদর্শ আইন কলেজ স্থাপিত হইবে, কিন্তু আর কেহ কোথাও আইন কলেজ করিতে পারিবে না এরূপ নিয়ম করা হইবে না।

শোক সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সঞ্জীবনীর অন্যতম সত্বাধিকারী বাবু কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় গত ২৬শে আষাঢ় শুক্রবার ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কুমারী নির্ম্মলিনী বসু নাম্নী জনৈকা মহিলা এ বৎসর বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এই প্রথম ভারতীয় মহিলা বি, এ, উপাধি লাভ করিলেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কুমারী শিশিরকুমারী গুহ ও কুমারী শৈলবালা সমদ্দার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গত এফ, এ, পরীক্ষায়, ও কুমারী প্রতিভা গুহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রথমোক্ত দুই বালিকাকে বেথুন কলেজে বি, এ, পড়িবার জন্য ১০৲ টাকা ও শেষোক্ত বালিকাকে এম, এ, পড়িবার জন্য ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

তাহার পর প্রাতে উঠিয়া যথারীতি গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে আরো দুই চারিজন ওঝা আসিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, সর্পাঘাত নহে, তাঁহার শরীরে বিষের নামগন্ধও নাই। আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার আত্মীয়াও প্রফুল্লমনে সহাস্যবদনে গৃহ-কার্য্যে লিপ্তা রহিলেন। অনেক বেলায় দূর হইতে আর একজন ওঝা আসিল। আমার আত্মীয়া বলিলেন,—"আর আবশ্যক কি? আমি বেশ আছি, আমার শরীরে কোনও অসুখ নাই।" আমরা বলিলাম, ইনি যখন দূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তখন আর একবার দেখা যাউক না কেন? ওঝা হাত চালিয়া বলিল,—"সর্পাঘাত বটে; শরীর বিলক্ষণ বিষাক্ত হইয়াছে।" ওঝা যেই এই কথা বলিল, আমার আত্মীয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"ঠিক্ কথা, আমার পা অল্প অল্প চিন্‌চিন্ করিতেছে।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলি-লেন,—আমার পা অসাড় হইয়া আসি-তেছে। অল্পক্ষণ পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। হায়! আমরা যদি ঐ নূতন ওঝা দ্বারা পরীক্ষা না করা-ইতাম, তাহা হইলে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

মাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, ঐ প্রসিদ্ধ ওঝার থা আমার আত্মীয়ার মনে বদ্ধমূল হইয়া ল এবং সেই একান্ত বিশ্বাসের ফলেই নি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আর দুইটী ঘটনা আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট। ভয় স্থলেই, অন্ধকারে আমাকে সর্পে শন করিয়াছে, এই বিশ্বাসে তাহাদের হে সর্পাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে গিল, তাহাদের জীবনের আশা ছিল। ইত্যবসরে আমার সোদরাগ্রজ অতুল ক্তিভাশালী ৺ কলীকুমার তথায় উপস্থিত ইয়া, পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—উহা সর্পাঘাত নহে। এই বিশ্বাস তাহাদের মনে যেই দৃঢ়বদ্ধ হইল, অমনি তাহাদের বিষলক্ষণ ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে লাগিল। তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল।

কয়েক বৎসর গত হইল, খুলনা জেলায় এক স্কুলের বালক তাহার পিতামাতাকে বলিল;—"আগামী জন্মাষ্টমীর দিন আমার মৃত্যু হইবে!" পিতা-মাতা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, প্রাণপণযত্নে তাহার সে বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালক সে কথা শুনিল না। তিন চারি মাস পূর্ব্ব হইতে সে একান্ত মনে ভাবিতে লাগিল যে,—আগামী জন্মাষ্টমীর দিন আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। ফলে তাহাই হইল। অনেক স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। এইরূপ বিশ্বাসের একাগ্রতাবশতঃ, কোনও কোনও স্থলে মৃত্যু না হইলেও, শরীরে উৎকট ব্যাধির উৎপত্তি হয়। আবার যে ব্যক্তি মনে যেরূপ চিন্তা করে, তাহার শরীরে সেই চিন্তার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। যীশুখৃষ্টকে লোকে ক্রুশে নিহত করিয়াছিল। তাঁহার দুই হাতে ও দুই পায়ে পেরেক পুঁতিয়া তাঁহাকে ক্রুশকাষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। তদুপরি এক-জন সৈনিকপুরুষ তাঁহার পঞ্জরের দুই পার্শ্বে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-ভক্তেরা যেরূপ শিব-দুর্গা, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি ধ্যান করেন, সেইরূপ রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনেক পবিত্রাত্মা নরনারী বিরলে বসিয়া একান্ত-ভাবে যীশুর সেই ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যান করেন। এই ধ্যানের ফলে কোনও কোনও নরনারীর হস্ত, পদ ও দুই পার্শ্বে পেরেক ও বল্লমের ক্ষতচিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। মনুষ্য-শরীরে এইরূপ ক্ষত চিহ্ন প্রকাশিত হওয়াকে ইংরাজিতে "ষ্টিগ্‌মাটা" (Stig-mata) বলে। সাত আট শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অতি প্রবল ও প্রগাঢ় ছিল, তখন এই ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিত। এক্ষণে সচরাচর না হইলেও, মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা যায়। আল্‌ভার্ণো নামক পর্ব্বতে কোনও মঠে ফ্রান্‌সিস্ নামক এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। যীশুর শেষ অবস্থা ধ্যান করিতে করিতে তিনি একদিন বিভোর হইয়া পড়িলেন। সেই সমাধির অবস্থায় দেখিলেন যে,—জ্যোতির্ম্ময়-দেহধারী, ছয়টী-পক্ষ-বিশিষ্ট এক স্বর্গীয় দূত আকাশ হইতে অবতরণ

করিতেছেন। তাঁহার সেই পক্ষের ভিতর ক্রুশবিদ্ধ এক নরমূর্ত্তি ছিল। স্বর্গীয় দূত নিম্নে নামিয়া সন্ন্যাসী ফ্রান্সিস্‌কে স্পর্শ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। সন্ন্যাসীর হৃদয় অপূর্ব্ব প্রেমরসে প্লাবিত হইল। তিনি বিহ্বল হইলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার নিজের হস্তে, পদে ও দুই পার্শ্বে সুস্পষ্ট ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। দুই হস্তে ও দুই পদে চারিটী ক্ষতস্থান মাংসনির্ম্মিত পেরেক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আছে এবং ঐ পেরেকের মস্তক কিছুদূর বাহির হইয়া আছে। দুই পার্শ্বের ক্ষত স্থান গাঢ় লোহিত বর্ণের ছিল। বল্লম দ্বারা আহত হইলে যেরূপ দেখায়, সেইরূপ দেখাইতে ছিল। ঐ কয়টী ক্ষত স্থান হইতে মাঝে মাঝে রুধিরধারা বিগলিত হইত। ঐ ঘটনার দুই বৎসর পরে ফ্রান্সিস্ স্বর্গারোহণ করেন।

ভেরোনিকা গিউলানী নামক এক স্ত্রীলোকের শরীরে প্রথমে ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু যীশুকে বধ করিবার পূর্ব্বে যিহুদীরা তাঁহার মস্তকে যে কণ্টকনির্ম্মিত মুকুট পরাইয়াছিল, ঐ স্ত্রীলোকের মস্তকে সেই মুকুটের ক্ষতচিহ্ন প্রথমে প্রকাশ পায়; অনন্তর ক্রুশচিহ্নগুলি বাহির হইয়াছিল। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে গাব্রিয়েলা, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে ক্লেরা, ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সিসিলিয়া, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে কেথেরিণা, এইরূপ অনেক স্ত্রীলোকের শরীরে ক্রুশের আঘাতচিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল।

প্রায় দেড়শত বৎসর গত হইল, জার্ম্মণি দেশে মেস্‌মার নামক এক ডাক্তার এক নূতন বিদ্যার আবিষ্কার করেন; ইহাকে লোকে মেস্‌মেরিসম্ (mesmerism) বলিত। আজকাল উহাকে হিপ্‌নোটিসম্ (Hypnotism) বলে। কিন্তু মেস্‌মেরিসম্ ও হিপ্‌নোটিসম্, এই দুই বিদ্যার কিছু পার্থক্য আছে। এই বিদ্যার প্রভাবে লোকের মানসিক শক্তিকে প্রশমিত অথবা উত্তেজিত করিতে পারা যায়, স্নায়বীয় বিকারঘটিত নানাপ্রকার রোগ হইতে লোককে মুক্ত করিতে পারা যায়। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সকলকে লোকে যেরূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, হিপনোটিক্ ব্যক্তিও সেইরূপ সকল বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই অবস্থায় কল্পিত বিষয়কে সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, তাহার ফলও ফলিয়া থাকে। মানুষ কখনও কখনও আপনাআপনি হিপনোটিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইংরাজিতে ইহাকে Self Suggestion বলে (১)। এ দেশে

(১) এইরূপ ও অন্যরূপ বহুতর বিদ্যা এদেশে নানা 'তন্ত্র' নামে প্রচলিত ছিল। যথা; ফেৎকারিণীতন্ত্র, উড্ডীশতন্ত্র, ক্রিয়াড্ডীশতন্ত্র, গুপ্তসাধনতন্ত্র, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, ইত্যাদি। এই সকল তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, বিষহরণ, রোগহরণ, নষ্টোদ্ধার, রোগশান্তি, নানা ভৌতিক কাণ্ড প্রভৃতি অশেষবিধ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হইত। আমরা স্বচক্ষে ইহার কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, ঐ সকল বিদ্যার আচার্য্যেরা নিজ নিজ বিদ্যা নিজমধ্যেই গূঢ়

উহাকে "দশা পাওয়া" বলে। এই অবস্থায় কোনও একটী বিষয়ে বিশ্বাস মনে প্রগাঢ়-ভাবে বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং সেই বিশ্বা-সের প্রভাবে শরীরের উপরও তাহার ফল হয়। যেমন খুলনার সেই বালকের মনে একান্ত বিশ্বাস হইয়াছিল, সে জন্মাষ্টমীর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবেই। তীব্র আলোকের দিকে বা কোনও একটা উজ্জ্বল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেও মানুষ এইরূপ হিপ্নোটিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায়, মানুষ, হয় নিদ্রায় অভিভূত, অথবা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হিষ্টিরিয়া-রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকেরা কখনও কখনও হিপ্নোটিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে সময় তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল অতি প্রবল হইয়া উঠে। এই কলিকাতায় একজন স্ত্রীলোক হিষ্টিরিয়া অবস্থায় অতি দূর হইতে লোকের ঈষৎ পদশব্দ শুনিয়া, কে আসিতেছে তাহা বলিতে পারিতেন। অন্য লোকে সে শব্দ শুনিতে পাইত না। ইহার মূলে চিত্তের একাগ্রতার শক্তি আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে,—শিশু স্তন্যের জন্য কাঁদিতেছে, তাহার মাতা আসিতে-ছেন, তাহার মাতার পদশব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না, কিন্তু সুদূর হইতেই সেই অব্যক্ত মাতৃপদশব্দ শিশু জানিতে পারিল ও রোদনে ক্ষান্ত হইয়া সেইদিকে চাহিতে লাগিল। সিপাহী-বিদ্রোহকালে, লক্ষ্ণৌনগরের দুর্গমধ্যে বহুসংখ্যক সাহেব, বিবি আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা উক্ত দুর্গে অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে লাগিল। ক্রমে অবরুদ্ধগণের রসদপত্র সকলি ফুরাইল। সে গুলিবর্ষণের মুখে দুর্গ আর কতক্ষণ টিকিবে? সকলেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক বিবি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের উদ্ধার-কর্ত্তারা আসিতেছেন। ঐ তাঁহাদের উদ্ধারসূচক-সুরের বাদ্য শুনিতেছি! কিন্তু সে বাদ্য আর কেহই শুনিতে পাইল না। ফলতঃ উদ্ধারার্থী ইংরাজসৈন্য তখন লক্ষ্ণৌনগর হইতে দশ ক্রোশ দূরে। কয়েক ঘণ্টা পরে উদ্ধারকারীরা ঠিক্ সেই সুরে বাদ্য করিতে করিতে আসিয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন।

যিনি এক ব্যক্তিকে হিপ্নোটিক্ অব-স্থায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঐ ব্যক্তির মস্তক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত নিজের দুই হস্ত সঞ্চালন করিয়া, তাঁহার মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চারিত করেন। ঐরূপ হস্তসঞ্চালনক্রিয়াকে পাস্ (Pass) দেওয়া বলে। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাও করিতে হয় না। হিপ্নোটিক্ বিদ্যায় যাঁহাদের বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা

রাখিতেন, সহজে কাহাকেও শিখাইতেন না। পাছে অপাত্রে পড়ে, এই ভবে অনেকে শিখাইতেন না। অন্যে শিখিলে পাছে নিজের প্রতিপত্তির হানি হয়, এই ভয়েও অনেকে শিখাইতেন না। এই কারণে ক্রমশঃ গুরুধারা লোপ পাইয়াছে। সর্পচালা, নলচালা ও ভূতচালা ঘটিত কয়েকটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম।

তদুপযুক্ত মানসিক অবস্থার ব্যক্তিকে পাইলে, পাস্ না দিয়াই আপনার মনের ভাব তাহার মনে সংক্রামিত করিতে পারেন। সম্প্রতি পারিস নগরে এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। কোনও হিপ্নোটিক্ ডাক্তার এক বন্ধুর সহিত ট্রামগাড়িতে যাইতে ছিলেন। সেই গাড়িতে এক অবিবাহিতা যুবতী ছিলেন। ডাক্তার তাঁহার বন্ধুর কাণে কাণে বলিলেন,—"আমি এই স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিব না, ইহার উপর পাস্ দিব না, ইহার সহিত একটী কথাও কহিব না, অথচ ইহাকে হিপ্নোটাইজ্ করিয়া আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।" বন্ধু কহিলেন, "পাস না দিয়া আপনি তাহা করিতে সমর্থ হইবেন না।" এই বাদানুবাদের পর, দূর হইতে অপরিচিত লোককে হিপ্নোটাইজ্ করিতে পারা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, ডাক্তার আপনার মনে একান্তভাবে চিন্তা করিলেন যে,—"এই স্ত্রীলোক হিপ্নোটাইজ্ হউক এবং আমার সঙ্গে আমার বাসায় চলুক।" ফল তাহাই হইল। তিন জনে ট্রামগাড়ি হইতে নামিলেন। স্ত্রীলোক নিজের বাটীতে না গিয়া, ডাক্তারের সঙ্গে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। বাটীতে গিয়া ডাক্তার তাঁহাকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করিয়া, তাঁহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এ দেশের তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা বশীকরণবিদ্যার অন্তর্গত, 'আকর্ষণ' নামে অভিহিত। অনেক সময় হিপ্নোটাইজ্ ব্যক্তির অন্য সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকে, কেবল এক বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। যেমন ধর,—তুমি একজন হিপ্নোটিক্ ডাক্তার, তুমি চারি দিন পূর্ব্ব হইতে এক জনের মনে ধারণা করিয়া দিলে যে,—সে রবিবার বেলা ৩ টার সময় অমুককে 'কুকুর' বলিয়া গালি দিবে।" ঐ চারিদিন সে লোক ক্রমাগত প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল,—"আমি এ কাজ প্রণান্তেও করিব না।" কিন্তু রবিবার ৩ টার সময় সে কিছুতেই থাকিতে পারিল না। নিজের মনের উপর কর্ত্তৃত্ব সে সম্পূর্ণভাবে হারাইল; সেই লোককে তখন ঐরূপ গালি না দিয়া সে থাকিতে পারিল না। এই হিপ্নোটিক্ বিদ্যার বলে কোনও কোনও দুর্বৃত্ত, স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ করিয়াছে, এক জনের দ্বারা অন্য লোককে খুন করাইয়াছে। এইজন্য, অষ্ট্রীয়া, বেল্জিয়ম্ প্রভৃতি দেশে সচ্চরিত্র ডাক্তার ভিন্ন অন্য দ্বারা হিপ্নোটাইজ্ করা, আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে। যাহাদের নিদ্রা হয় না, হিপ্নোটাইজ্ দ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। তাহাদিগকে হিপ্নোটাইজ্ করিয়া, ডাক্তার তাহাদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করিয়া দেন, যে, "আমি চক্ষু চাহিতে পারি না, এই মুহূর্ত্তেই আমি নিদ্রায় অভিভূত হইব।" বস্তুতঃ তাহাই হয়। অভ্যাসদোষে যাহারা সুরা পান না করিয়া থাকিতে পারে না, সুরার উপর তাহাদের মনে বিতৃষ্ণা জন্মাইতে পারা যায়। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল

কলিকাতার মেডিকেল কলেজে এক ব্যক্তিকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া তাহার উপর বিষম অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয়। রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল; কিন্তু সে অস্ত্রাঘাতের কিছুমাত্র যাতনা অনুভব করে নাই। অপর দিকে, লোকের মনে মিথ্যা চিন্তা বদ্ধমূল করিয়া দিলে তাহারও ফল ফলিয়া থাকে। কোনও লোককে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সামান্য একখানি কাগজ বসাইয়া ডাক্তার যদি বলেন,—"তোমার বুকে আমি বেলেস্তারা (Blister) দিলাম।" কিছুক্ষণ পরেই রোগী সত্যসত্যই জ্বালা অনুভব করিবে। তাহার বক্ষঃস্থল লাল হইবে এবং ফোস্কা হইবে। হিপ্‌নোটিক্‌ অবস্থায় কোনও কোনও লোকের আভ্যন্তরিক ঐশী শক্তি উদ্দীপিত হয়। এরূপ অবস্থায় কেহ কেহ, দূরদেশে যাহা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে পায়। এইরূপ দূরদৃষ্টিকে ইংরাজিতে ক্লেয়ারভয়েন্স (Clairvoyance) বলে। কোনও কোনও লোক দূরের শব্দ শুনিতে পায়। ইংরাজিতে ইহাকে ক্লেয়ারঅডিএন্স (Clairaudience) বলে। কেহ কেহ অন্য লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারে, অথবা আপনার মনের চিন্তা অন্য লোকের মনে পরিচালিত করিতে পারে। এরূপ পরিচালনকে টেলিপ্যাথি (Telepathy) বলে। এই সকল শক্তি কোনও কোনও লোকের সহজ অবস্থাতেও উদ্ভূত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উমার পিতা মাতার কোনই অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। তাহার প্রধান কারণ, উমাকে তাহার পিতামাতা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে এমন ব্যাকুল ভাবে রোদন করিত যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাই দায় হইত। নির্ব্বোধ বালিকা বুঝিত না যে, ইহাতে তাহারই অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের যতদূর সাধ্য অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই। কিন্তু উমার অদৃষ্টক্রমে সমস্তই নিষ্ফল হইল।

আমার মাতা ঠাকুরাণী উমাকে যতদূর ভাল বাসিতে হয় বাসিতেন। নিজ কন্যার ন্যায় আদর, যত্ন, স্নেহ করিতেন; কিসে উমার ম্লানমুখে হাসি আনিবেন, এই চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেন। আমি ইহা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইতাম। আমি কিন্তু উমার একটী বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিলাম। সে প্রথম প্রথম আমার নিকট যেমন অসংকোচে আসিত, গল্প করিত, এখন আর সে ভাব নাই। আমাকে দেখিলে পলায়ন করে এবং তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠে। কোন

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সহজে উত্তর দেয় না। তাহার এ ভাবের কোন কারণ আমি ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি উমাকে ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু সে কি জাতি, কাহার কন্যা, এ সব একবারও ভাবিয়া দেখি নাই। প্রণয়ের রীতিই বুঝি এই যে, পাত্রাপাত্র বাছিয়া লইবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না। এদিকে আমার বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাহার কারণ আমি যে দিন কলিকাতা হইতে বাটী আসিতেছিলাম, সেই দিন যে প্রবল ঝটিকা হয়, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকার স্মরণ আছে।

সেই দিন সেই দুর্যোগে যে কত লোক অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, কত লোক উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? সেই দিনের সেই দুর্য্যোগের মধ্যে আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয় স্ত্রী কন্যা লইয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী ফিরিতেছিলেন। সহসা ঝটিকাঘাতে নদীবক্ষে নৌকা মগ্ন হয়। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী কোন প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কন্যাটীকে পাওয়া যায় নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমার বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। কিন্তু ক্ষণপ্রভার ন্যায় আমার হৃদয়ে এক এক বার আশার বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিত। আমি ভাবিতাম যাহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছি, সেই উমাই কি আমার জলমগ্না ভাবী পত্নী?

এক দিবস আমার শয়নকক্ষে বসিয়া এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমার মস্তিষ্ক এত দূর বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইল যে, আমি আর কোনমতে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শীতল বায়ুস্পর্শে মস্তিষ্ক শীতল হইল এবং মনের অবসন্নতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তখন এক খানি পুস্তক পড়িবার মানসে আলমারী খুলিয়া যেমন পুস্তক লইতে গিয়াছি, নিকটেই কাঁচের একটী ফুলদানী ছিল, অসাবধানতা বশতঃ পড়িয়া গিয়া তাহা শতধা চূর্ণ হইল। পুষ্পাধার-পতনের শব্দের সহিত উমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু আমাকে দেখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, "উমা যাইও না, একটা কথা শুন।"

উমা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম, আসিয়াই যে চলিয়া যাইতেছিলে? কোন দরকার আছে কি?"

উমা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার ঘরে কিসের শব্দ হইল তাই দেখিবার জন্য মা পাঠাইয়াছেন।" উমা আমার মাকে মা বলিত।

আমি বলিলাম, "কিসের শব্দ হইল কারণ না জানিয়া আমাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেছিলে, মাকে গিয়া কি বলিতে? আমাকে এত ভয় কিসের উমা?" উমা নত মস্তকে নীরবে রহিল।

আমি বলিলাম "ফুলদানীটা পড়িয়া

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই শব্দ হইয়াছে, অমন সুন্দর দ্রব্যটা মিথ্যা নষ্ট হইল।” উমা আবার প্রস্থানে উদ্যত হইল। আমি পুনরায় যাইতে নিষেধ করিলাম। অদ্য আমার মনের কথা উমাকে বলিব, এবং উমা আমাকে ভাল বাসে কিনা জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, “দেখ উমা! আজ তোমাকে আমার হৃদয়ের একটী গূঢ় কথা জানাইব। আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারি না। উমা! তোমাকে যে দিন দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে জগৎসংসার ভুলিয়াছি। বেশী কথা বলিতে চাহি না। শুধু এইমাত্র বলিতেছি,—আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি। বল উমা! তুমি কি আমাকে ভাল বাস? আমার ভালবাসার প্রতিদান পাইবার আশা করিতে পারি কি?” উমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নীরবের পর বলিল, “আপনি একি কথা বলিতেছেন? আপনার বিবাহের সমস্ত স্থির, আর আপনি কি অন্যায় কথা বলিতেছেন?” আমি বলিলাম, “উমা! তুমিত সব শুনিয়াছ, সে আপদ ত চুকে গেছে।”

উমা এবারে নতমুখ তুলিয়া ভ্রুকুটীপূর্ব্বক বিরক্তস্বরে বলিল, “আপনি এমনি স্বার্থপর! আহা! জলমগ্নের সময় তাহার কতই কষ্ট হইয়াছিল। আপনি সে জন্য কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন কিনা,”—আমি বাধা দিয়া বলিলাম, “উমা! প্রকৃত বলিতেছি, উহা আমার মনের কথা নয়। সত্য সে হতভাগিনীর পরিণাম ভাবিয়া মনে কষ্ট হয়, কিন্তু আমি কি করিব? সে অল্পায়ু লইয়া জগতে আসিয়াছিল, তাহার জন্য আমি দোষী হইতে পারি না। যাক্ ও কথা। এখন আমার কথার উত্তর দাও। তোমার ঐ কথার উপর আমার ভবিষ্যৎ সুখ, আশা, ভরসা, সমস্তই নির্ভর করিতেছে। বল—একবার বল ভাল বাস কিনা?”

‘বাসি’ বলিয়া, উমা দ্রুত প্রস্থান করিল। তাহার সেই ক্ষুদ্র ‘বাসি’ শব্দটীর ভিতর কত মধুরতা অনুভব করিলাম, তাহা অন্যকে বুঝাইবার সাধ্য নাই।

পর দিবস অপরাহ্ন সময়ে আমি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছি, ইতিমধ্যে বৌদিদি ঠাকুরাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ঠাকুরপো! একটা ভাল খবর এনেছি, কি বক্‌শিশ্ দেবে বল দেখি?” আমি বলিলাম, “কি খবর বৌদি?” বৌদিদি বলিলেন, “আগে বল কি দেবে?”

আমি। আগে খবরটাই শুনি।

বৌদি। যদি ফাঁকি দাও?

আমি হাসিয়া বলিলাম, তবে “আমি নাচার।”

বৌদি। তবে তুমি শুন্‌বেনা?

আমি। আপনি না বলিলে কেমন করিয়া শুনিব?

বৌদি। তবে আমার একটী গল্প শোন।

আমি। এখন কি গল্প শুন্‌বার সময় বৌদি?

'বৌদিদি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "কি কাজে ব্যস্ত আছ যে শুনবার সময় নাই?" বৌদিদি পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে বলিলাম "শুনব বৈকি বৌদি!" বৌদিদি তখন মিষ্ট হাসিয়া, গল্প আরম্ভ করিলেন, "গোপালপুর নিবাসী অমিয় কৃষ্ণ বসুর সহিত শ্রীপুর নিবাসী যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দাসীর শুভ পরিণয়ের কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হয়। পাত্র অমিয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া, কলেজে পড়াশুনা করিত। গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইলে, অমিয়কৃষ্ণের পিতা, অমিয়কে বিবাহের জন্য বাটী আসিতে পত্র লেখেন। অমিয় পত্র পাইয়া, যথা সময়ে নৌকাযোগে বাটী আসিতেছিল। পথিমধ্যে ভয়ানক দুর্য্যোগ—প্রবল ঝটিকাঘাতে অমিয়কৃষ্ণের নৌকা মগ্নপ্রায় হয়, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় অমিয়কৃষ্ণের কোন বিপদ হয় নাই।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "এ আবার কি গল্প বৌদিদি?"

বৌদিদি বলিলেন, "যা বলি শুন বাধা দিওনা। এমনি দুর্য্যোগের মধ্যে অমিয় দেখিল, তাহার নৌকার অতি নিকটেই একখানি আরোহী-পূর্ণ-নৌকা ডুবিয়া গেল। অমিয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, নদীবক্ষে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক অনেক কষ্টে একটী বালিকাকে উদ্ধার করিল। সেই বালিকার নাম হেমলতা দাসী।"

আমি পুনরায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনার গল্প ভুল হইতেছে। তাহার নাম হেমলতা নয়, উমা।" বৌদিদি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার গল্প আমি জানিনা, আর তুমি জান? কি বলিতে ছিলাম হাঁ—সেই জলমগ্ন বলিকার নাম হেমলতা। হেমলতার মাতামহীর মরণাপন্ন পীড়া হওয়ায়, তাঁহার একমাত্র কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রীকে দেখিতে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হেমলতার পিতা যোগেশ বাবু যথা সময়ে স্ত্রী, কন্যা সমভিব্যাহারে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন, এবং শ্বশ্রূর মৃত্যুর পর বাটী ফিরিবার পথে প্রবল ঝটিকাঘাতে তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হয়। যোগেশ বাবু পত্নীর সহিত কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু প্রিয়তমা কন্যার কোনই সন্ধান না পাইয়া, নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন।

এদিকে অমিয় যে বালিকাকে উদ্ধার করিল, সেই যোগেশবাবুর একমাত্র দুহিতা হেমলতাই অমিয় কৃষ্ণের ভাবী পত্নী।" আমি তখন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলাম, "বৌদি শীঘ্র গল্পটী শেষ করুন।" বৌদিদি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া আরম্ভ করিলেন—,"অমিয় অতি যত্নে হেমলতাকে বাটী লইয়া আসিল, কিন্তু অমিয় কিম্বা অমিয়র পিতামাতা কেহই হেমলতার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন না। তাহার কারণ সেই অল্পবুদ্ধি বালিকা হেমলতা অমিয় ও বাটীর অন্যান্য সকলের নিকট উমা নামে পরিচিতা হইয়াছিল। তাহার পিতামাতার প্রসঙ্গ উত্থাপন হইলেই

স এতদূর ব্যাকুল হইত যে, কেহই সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমিয়কৃষ্ণের গৃহে মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু ভ্রমেও জানিল না যে, এই তাহার ভাবী শ্বশুরালয়।

উভয় পক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল সত্য, কিন্তু হেমলতাকে পাত্রের বাটীর কেহ কখন দেখে নাই, কাজেই তাহাকে কেহ চিনিল না। যোগেশ বাবু যখন কন্যার কোনই সন্ধান পাইলেন না, তখন পাত্রের পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। তখন অমিয়কৃষ্ণের বাটীর সকলেই উমাকে হেমলতা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, উমা নামে যোগেশবাবুর কোন কন্যা নাই। হেমলতাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। আর উমা যদি যোগেশ বাবুর কন্যা না হয়, একে তিনি কন্যাহারা হইয়া মনের কষ্টে আছেন, তাহার উপর আবার যদি আশায় নিরাশ হন, তাহা হইলে বড়ই মর্ম্মাহত হইবেন, এই ভয়ে তাঁহাকে সেই বালিকার প্রাপ্তি সংবাদ কেহই দিল না। ক্রমে ক্রমে অমিয় হেমলতাকে ভাল বাসিল।

চতুর অমিয় ভাবিত তাহার এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা কেহ জানে না। কিন্তু তাহার একজন শুভাকাঙ্ক্ষিণী আত্মীয়ার নিকট কিছুই অগোচর ছিলনা। সেই আত্মীয়া, দুটী হৃদয় একত্র করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং সে সর্ব্বদা উমাকে হেমলতা বলিয়া সন্দেহ করিত। এক দিবস অনেক মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিয়া, উমা ওরফে হেমলতার নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইল। তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। বাটীর সকলে এ শুভ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। যোগেশবাবুকে তাঁহার হারানিধি কন্যার সংবাদ পাঠান হইল। সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিলেন, কেবল সেই হতাশ-প্রেমিক অমিয়কৃষ্ণ এ বিষয়ের বিন্দুমাত্রও জানে না। তাই তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী বৌদিদি শুভসংবাদ দিতে উপস্থিত—" এই বলিয়া, বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কেমন ঠাকুর পো! গল্পটা ভাল কি না? এখন কি বখশিশ্ দেবে?" আমি বলিলাম, "কি দিব বৌদি! আমার কি আছে?" বৌদিদি বলিলেন, "তা জানি, তোমরা ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চাওনা। তা যাক্, আমিই তোমায় কিছু পুরস্কৃত করিতেছি।" বলিয়া, বৌদিদি কক্ষের বাহিরে আসিয়া, উমার হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আমার হস্তের উপর তাহার হস্ত দিয়া বলিলেন, "এই নাও ঠাকুর পো! আমাদের হারানিধি হেমলতাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম। স্নেহে, যত্নে তোমার উমাকে চিরদিন আদরে রাখিও—"বলিয়া বৌদি প্রস্থান করিলেন। উমাও সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল। পাঠক পাঠিকাগণ! বৌদির গল্প হইতে

সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছেন পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যোগেশ বাবু যথা সময়ে তাঁহার কন্যাকে লইয়া গেলেন। এবং অল্প দিবস পরেই আমি মহাধুমধামের সহিত হেমলতার পাণিগ্রহণ করিলাম। আজ ফুলশয্যা রাত্রি! জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদের ধবল-কিরণ গবাক্ষ দিয়া হেমলতার বদনে পড়িয়াছে, নানাবিধ ফুল অলঙ্কারে তাহাকে যেন ফুল-রাণী দেখাইতেছে। সুগন্ধি তৈলচর্চ্চিত চিকণচিকুরের উপর আবার আতর গোলাপ মাখিয়াছে, ফুলের সৌরভ, আতরের গন্ধ আর হেমলতার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত চারুমুখ, আমাকে যেন উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, দুই হস্তে হেমলতার নত-মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া ডাকিলাম, "হেমলতা!" হেমলতা একটু হাসিয়া বলিল, "হেমলতা কোথায়? সে ত জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, তোমার আপদ গিয়াছে। আমি উমা।" আমার পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল, বুঝিলাম হেমলতা সেই কথার প্রতিশোধ লইতেছে। আমি বলিলাম, "সে কাহার জন্য বলিয়া ছিলাম? বেইমান! এখন ও কথা বলিবেই তো।"

হেমলতা আবার হাসিয়া বলিল, "তুমি আমাকে হেমলতা না বলিয়া উমা বলিয়া ডাকিও। তোমার মুখে উমা নাম শুনিতে ভালবাসি।"

আমি বলিলাম, "তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি উমা নামে কেন পরিচিতা হইয়া অনর্থক কষ্ট পাইলে?" "উমা আমার আর একটী নাম, কিন্তু ও নাম আমার প্রচলিত নয়, কেন জানিনা ঐ নামে তখন পরিচিতা হইয়া ছিলাম।" বলিয়া হেমলতা আবার বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিল।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

বিধবা-বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১। পুনর্ব্বিবাহ—ব্রহ্মচর্য্যে অশক্তা বিধবা রমণীর অধিকার বিচারপূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রকার আদেশ করিয়াছেন, পুনর্ব্বিবাহ। কলিযুগধর্ম্মপ্রণেতা মহর্ষি পরাশর বলেন,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

ভগবান্ মনু বলেন,

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥

টীকায় কুল্লুক ভট্ট লিখিতেছেন,

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা যে স্ত্রী, সংস্কার দ্বারা পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহার দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্র ঐ উৎপাদকের পৌনর্ভব

নামক পুত্র হইবে।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যে অনধিকারিণী বিধবাদিগের জন্য শাস্ত্রকারগণ পুনর্ব্বিবাহে বিধি প্রদান করিয়াছেন।

মহাপ্রাণ শাক্যসিংহ রাজসম্পদ পদদলিত করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাই তিনি সর্ব্বজন-নমস্য; কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল রাজা বা রাজকুমার শাক্যসিংহের পথাবলম্বন করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু রাজোচিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে কি বাতুলের কার্য্য হয় না? সেইরূপ ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ ভক্তির পাত্রী ও প্রশংসনীয়া বলিয়া ধর্ম্মপরায়ণা, পতিপরায়ণা, বিবাহিতা বিধবাগণকে নিন্দার বা ঘৃণার চক্ষে দেখিলে, তাহাও কি বাতুলের কার্য্য হয় না? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, অনুদার হৃদয় লইয়া আমরা যে রকম বিচার করি না কেন, সেই সর্ব্ব ভূতের কল্যাণপ্রার্থী, তপঃসিদ্ধ আর্য্য ব্রাহ্মণেরা কখনই বিবাহিতা বিধবাকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন নাই, তাহা পরাশর-বাক্যে এবং "সংস্কার দ্বারা অন্যের ভার্য্যা হইয়া" ইত্যাদি ভাষ্যে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা জানি ব্রহ্মচর্য্যই বৈধব্যাবস্থায় শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তথাপি যে আর্য্যঋষিগণ বিধবা বিবাহের বিধি কেন প্রদান করিলেন, সে কথা বর্ত্তমান সমাজের প্রতি মনোনিবেশ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিব।

বিগত সেন্‌সসে হিন্দু বিধবাদিগের বয়সের যে তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে; সে তালিকা এইরূপ,—

১ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বিধবা	৫৩৫
২	৫৭৪
৩	৬৫১
৪	৫৭৬
৫	৩৮৬১

৬ হইতে ১০।১২ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি!!

ইহার মধ্যে আবার,

ব্রাহ্মণ বিধবা

৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত	১২৮
৫ হইতে ১২ "	১৭০৮

কায়স্থ বিধবা

৫ বৎসর পর্য্যন্ত	৯৫
৫ হইতে ১২ "	৬৭৯

হিন্দু শাস্ত্রে অষ্টম হইতে দশম বর্ষীয়া কুমারী কন্যা বিবাহের বিধি আছে; আবার শাস্ত্রকারগণের অনুশাসন,

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্ম-
শাসনাম্॥"

কিন্তু শাস্ত্রার্থীরা দুগ্ধপোষ্যা শিশুকন্যার বিবাহ ঘটাইয়া তাহাকে বিধবা সাজাইতেছেন! সমাজ তাহাকে ব্রহ্মচারিণী করিতে চাহিতেছেন বটে, কিন্তু ঐশী শক্তির নিকটে মানবীশক্তি যে ধূলিকণা মাত্র, স্বাভাবিকতার নিকটে সামাজিক শাসন যে, নগণ্যমাত্র, ইহা স্থিতিশীল মহাশয়েরা কেন বুঝিতেছেন না? এই কি

শাস্ত্রবিধির গৌরবরক্ষা ? এই কি আর্য্য সন্তানগণের হৃদয় ? এই কি, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ?

এখন আমাদের বিনীত নিবেদন, যিনি আর্যাঋষিগোত্রজাত, যিনি হিন্দু, যিনি সমাজের হিতৈষী, তিনি সেই আর্য্য ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া, পরকে আপন করিয়া, ভেদ বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু বিধবাদিগের অধিকার বিচার করুন। যাহারা শিশু বিধবা, যাহারা বালিকা বিধবা, দাম্পত্য সম্বন্ধ বা পতিপ্রেম-জ্ঞানপরিশূন্যা, যাহারা বিবাহিত জীবনে সপত্নীযন্ত্রণাগ্রস্তা, যাহারা দুশ্চরিত্র পাষণ্ড স্বামীর পাশবাচরণে জীবন্মৃতা, যে বালিকাকে প্রায় প্রপিতামহ-তুল্য অশীতিপর বৃদ্ধের ভার্য্যা হইয়া দুই দশ দিন গৃহধর্ম্ম রক্ষার অভিনয় করিতে হইয়াছে, এই সকল অবস্থায় পতিতা রমণীগণের যদি (অতি তরুণ বয়সে নিঃসন্তানাবস্থায়) বৈধব্য দশা ঘটে, তাহা হইলে তুমি আমি, যাহাই বিচার করি না কেন, আজি সেই বিরাট পুরুষ আর্য্যঋষিগণ, এ দেশে বর্ত্তমান থাকিলে, মুক্তকণ্ঠে আদেশ করিতেন, "ইহারা ব্রহ্মচর্য্যে অনধিকারিণী বলিয়া, ইহাদিগের পুনর্ব্বিবাহই আমাদিগের ব্যবস্থা।"

সমাজ-শাসন ভয়ে, উপায়ান্তর অভাবে, অনিচ্ছাকৃত ব্রহ্মচর্য্যে যে, কতদূর বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমাদের সমাজে তাহা বোঝেনও অনেকে, জানেনও অনেকে। দেশে কত ভ্রূণহত্যা হইতেছে, কত হতভাগিনীকে কুপথ অবলম্বন করিতে হইতেছে, কত বিধবাকে গোপনে হত্যা করা হইতেছে, কত বিধবা আত্মহত্যা করিতেছে, এ সকল কথা পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার মন চমকিত না হয় ? কাহার হৃদয় আকুল না হয় ? তথাপি আমাদের যে কি কুবুদ্ধি বিধবা-বিবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া, আমাদের ধর্ম্ম-লোপ, গৃহে অশান্তি, বংশ ক্ষয় * প্রভৃতি মহা অকল্যাণপূর্ণ ঘটনা ঘটিতেছে, তথাপি আমরা বিধবা-বিবাহের পথ মুক্ত করিতে সাহসী হই না ! আমরা কাল্পনিক আশঙ্কায়—পাছে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজে কোন বিপ্লব ঘটে, পাছে আমাদের স্বার্থে কোন আঘাত লাগে, এই সব কল্পিত ভয়ে আমরাই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছি !

এমন করিয়া আর কত দিন কাটিবে ভাই ? এহেন জাতীয় কলঙ্ক আর কত দিন পুষিবে ভাই ? ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ আর কত দিন চলিবে ভাই ? আর কেন ?—এখন মানুষের মত, আর্য্য ঋষি-

---

* বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেকে ভীত হইতেছেন। কিন্তু বিবেচনা করিতেছেন না যে, প্রধানতঃ সে হ্রাসতার মূল আমরা। আপনারাই "স্বখাত সলিলে" ডুবিয়া মরিতেছি। সেন্‌সসের তালিকা দেখিয়া শিশু বিধবা ও বালিকা-বিধবাদিগের সংখ্যা স্থির করিলে, হিন্দুজাতির হ্রাসতার প্রধান কারণ, বিধবা-বিবাহ না দেওয়া, ইহা সকলে বুঝিতে পারেন। প্রঃ লেঃ।

পিতার সন্তানের মত, নবজীবনে জীবিতের মত, ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন, কাল্পনিক ভয়ের পুরাতন গ্রন্থি ছিঁড়িয়া, বিধবা-বিবাহের পথ মুক্ত কর। এ কাজ একের সাধ্য নহে, অনেকের; অনেকের শুধু নহে, সকলের। সকলে এক মত হইয়া সকলের সমাজকে রক্ষা কর। সমাজের লোকক্ষয়, সমাজের পাপ, সমাজের কলঙ্ক—স্থিতিশীল হও, আর উন্নতিশীল হও, তোমরা দেখিবে নয় তো আর কে দেখিবে?

সমাজে যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা অনেকে অনেক রকম আপত্তি করিয়া বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত রাখিতে চেষ্টা করেন। আমাদের যতদূর সাধ্য সেই আপত্তি গুলি অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং জ্ঞান ও বিশ্বাস মত তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?

২। পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন?

৩। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, সন্তানবতী এবং বর্ষীয়সী বিধবাগণ বিবাহ করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইবেন, তাহাতে সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে।

৪। বিধবা বালাগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না কেন?

৫। বিধবা বিবাহে দম্পতী প্রকৃত সুখী হয় কি না এবং বিবাহিতা বিধবা, কুমারী ভার্য্যাদিগের ন্যায় পতিব্রতা হইবে কি না?

৬। বিধবা-বিবাহে কুমারীদিগের বিবাহে বাধা হইবে কি না?

এই সকল আপত্তির আমরা যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সত্য জয়যুক্ত হউন।

১। স্থিতিশীল দলের প্রধান আপত্তি বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না? বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহা আমরা যথাসাধ্য বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের এই নগণ্য প্রবন্ধ পড়িয়া তদ্বিষয় কাহারও শিখিতে হইবেনা। কেননা—যিনি আমাদের জাতীয় গৌরব, আমাদের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিধ শাস্ত্রের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া যে "বিধবা-বিবাহ" বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক প্রচার করেন, বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তদ্বিষয়ক বিচারে তিনিই জয়লাভ করেন; অনেক পণ্ডিতই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচারিত শাস্ত্রবিধি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং দেশের অনেক রাজা, জমিদার সুলেখক, চিন্তাশীল, উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, সকলে একযোগে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এতাদৃশ জলন্ত প্রমাণ থাকিতে নগণ্য ব্যক্তি আমরা, এই নগণ্য প্রবন্ধে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতার বিষয় আবার কি প্রতিপন্ন করিব? যাঁহাদের আবশ্যক হইবে, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সমস্ত আবশ্যকীয় উত্তর পাইবেন। তবে যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী, তাঁহাদের কাছে

আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, যে সকল ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া নিজেদের সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। নিজের মত অপ্রতিহিত রাখা অপেক্ষা, সত্যরক্ষা মানবের প্রধান কর্ত্তব্য।

২। আপত্তি—পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন? এ কথার উত্তরে বলিতে হইতেছে, প্রধানতঃ চারিটী কারণে পুরাকালে বিধবা-বিবাহ বহুল পরিমাণে আবশ্যক হয় নাই। প্রথমতঃ পুরাকালে অকালমৃত্যুর এতটা প্রাদুর্ভাব ছিল না। রোগাদি-জনিত অকালমৃত্যু কচিৎ হইত। সুতরাং অকালবিধবার সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। দ্বিতীয়তঃ তখন শৈশব বিবাহ ছিল না। সমাজে বহু অনুসন্ধান করিলে বাল্য-বিবাহ কদাচিৎ দেখা যাইত; সুতরাং পুনর্ব্বিবাহে যাহাদের বিশেষ প্রয়োজন, সেই শিশু বিধবা বা বালিকা-বিধবা মিলিত না, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে বিবাহিতা বিধবা মিলিবে কি করিয়া? তৃতীয়তঃ তখন সহমরণ প্রথা ছিল; যখন যুদ্ধ বিগ্রহে যে সকল যোদ্ধাগণ মৃত হইতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ প্রায়ই তাঁহাদিগের সহগামিনী হইতে পারিতেন। চতুর্থতঃ তখন নিয়োগপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল; রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের বংশ-লোপ-সম্ভাবনা হইলে সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা-দিগকে নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্তা করা হইত। মহর্ষি দীর্ঘতমা কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বংশরক্ষা, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কুরুবংশ রক্ষা, পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম বিবরণ ইত্যাদি ঘটনা হইতে নিয়োগধর্ম্মের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রতিষেধক ঘটনার মধ্যেও আমরা চারিজন বিধবা মহিলার পুনর্ব্বিবাহের কথা জানিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমা মদনপত্নী মায়াবতী, দ্বিতীয়া বালীপত্নী তারা, তৃতীয়া রাবণ-পত্নী মন্দোদরী, চতুর্থী নাগকন্যা উলূপী। এই মহিলাগণ মধ্যে তারা ও মন্দোদরী অসাধারণ রমণী। যাঁহারা রামায়ণাদিতে ইহাদিগের চরিত্রে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে তারা ও মন্দোদরী উভয়েই ধর্ম্ম-পরায়ণা, পতি-ভক্তিমতী, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, সাম্রাজ্ঞী পদের উপযুক্তা গুণ-বিশিষ্ঠা ছিলেন। ইঁহারা দ্বিতীয় বার বিবাহিতা বলিয়া অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, গুণগ্রাহী আর্য্য-ঋষিগণ গুণগৌরবে ইঁহাদিগকে নারী কুলের শীর্ষস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ভগবৎ-পদে দৃঢ় ভক্তি পূর্ব্বক সংযতি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি করিয়া পতিমাত্র ভজনাই রমণীর সতীত্ব। বিবাহ একবার বা দুইবার হইলে আত্মার অপকর্ষ সাধিত হয় না। এই জন্য নিজের অনিচ্ছায়, কুশিষ্য কর্ত্তৃক বিপথগামিনী হইয়াও অহল্যা দেবী সতী; পঞ্চপতিকা হইয়াও দ্রৌপদী দেবী সতী; স্বামী কর্ত্তৃক নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্তা হইয়া কুন্তী দেবী

তী; ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের বিধানানুসারে বিধবাবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া তারা মন্দোদরী সতী*। তাই উদারচেতা হিন্দুগণ ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পবিত্র প্রাতঃ মুহূর্ত্তে স্মরণ করিতেছেন;—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

অতএব ভারতবর্ষে বিধবা-বিবাহ অপ্রচুর হইলেও কদাপি অবজ্ঞেয় নহে।

৩। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে বর্ষীয়সী ও সন্তানবতী বিধবাগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন কি না, একথার উত্তরে আমরা বলি, সকল সমাজেই পুরুষজাতির বিবাহের পথ মুক্ত; বিপত্নীক অবস্থা দূরে যাউক, কত হিন্দু পুরুষ অদ্যাপি বহুবিবাহ করিতেও বিমুখ নহেন। অথচ হিন্দুসমাজে দেখা যায় স্ত্রী লোকান্তরিতা হইলে, সেই পরলোকগতা স্ত্রীর প্রণয়ানুরোধে অথবা সন্তানসন্ততিদিগের অশান্তিভয়ে অনেক বিপত্নীক পুরুষ দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেন নাই। যখন পুরুষদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকারের এতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তখন মাতৃজাতির নিকটে লোকে অধিকতর ভরসা করিবে না কেন?

এদেশে মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু তথাপি অনেক বিধবা মুসলমানমহিলা মৃত-স্বামীর প্রেমানুরোধে, সন্তানদিগের অশান্তিভয়ে এবং সাংসারিক অসুবিধা-সম্ভাবনায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। একবার রেলওয়ের গাড়ীতে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-মহিলার সহিত একজন হিন্দু মহিলার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মুসলমান-মহিলার বয়স বিংশতি বর্ষের উর্দ্ধ নহে, সঙ্গে দুইটী শিশু পুত্র; প্রায় একবর্ষাধিক কাল তিনি বিধবা হইয়াছেন। কথায় কথায় হিন্দু-মহিলা তাঁহাকে পুনরায় পতি গ্রহণ করিবেন কি না, তদ্বিষয় প্রশ্ন করেন। মুসলমান-মহিলা সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিলেন, "ভগিনি! আমার স্বামী যে মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে মনে পড়িলে আর কোনও পুরুষকে স্বামী বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ এই শিশু দুইটী তাঁহার প্রাণের অধিক ছিল; আমি যদি বিবাহ করি, তবে সে স্বামী আমার বাছাদিগকে সে রকম স্নেহ, মমতা করিতে পারিবেন কি? এই সব ভাবিয়া মনকে ঠিক্ করিয়াছি, আবার 'নিকা' করা অপেক্ষা আমার এই বৈধব্যদশা শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমি চিরজীবন আমার স্বামীকে মনে করিয়া যেন দিন কটাইতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ করিবেন।" মুসলমান-মহিলার

* ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের ইচ্ছা ও আদেশে তারা ও মন্দোদরীর পত্যন্তর ঘটিয়াছিল। যদি ইহা কিছুমাত্র অধর্ম্মকর হইত, তবে ইহা মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কদাপি অনুমোদিত হইত না। আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ধার্ম্মিকবর অর্জ্জুনের উলুপীকে বিবাহ, ইহা যদি কোন অংশে নিন্দিত প্রথা হইত, তবে বিশুদ্ধচেতা আত্মজয়ী, উর্ব্বশীপ্রত্যাখ্যানকারী অর্জ্জুনের দ্বারা কদাপি তাহা সম্ভব হইত না।

(প্রঃ লেঃ)

কথা শুনিয়া হিন্দু-মহিলা পুলকিতচিত্তে বলিলেন, "আপনার মহত্বকে ধন্যবাদ ! কেননা আপনাদের পত্যন্তর গ্রহণের পথ মুক্ত, তাই আপনাদের ত্যাগস্বীকারে, আপনাদের আত্মসংযমে, আপনাদের বৈধব্যব্রতাচরণে যে গৌরব আছে, হিন্দু-বিধবার তাহার শতাংশের একাংশও নাই। পথ খোলা থাকিলে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করিতে প্রবৃত্তা হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারিতাম ; কিন্তু সে পথ যখন একেবারে রুদ্ধ, তখন কে দেবী, কে মানবী, চিনিব কি করিয়া ?" হিন্দু-মহিলার এই কথা সত্য কি না সমাজ-হিতৈষিগণ নিজেই বিচার করুন। যাহা হউক, এই মুসলমান-মহিলার মত হিন্দু-মহিলাগণও যে,মৃতপতির প্রেমময়ী ভার্য্যা ও ত্যাগস্বীকারপরায়ণা হইবেন না, স্ত্রী-জাতি এত অবিশ্বাসিনী হইল কিসে ?

(ক্রমশঃ)

তুষারে বঙ্গমহিলা।

দেশ ভ্রমণ দ্বারা হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা-লাভ হইয়া থাকে। দেশভ্রমণ হৃদয় প্রশস্ত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি লীলাময়ী প্রকৃতিদেবীর সাধের ক্রীড়া-কানন। বিদেশ হইতে ভ্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক ইহার প্রাকৃতিক শ্যামল লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া যান। প্রত্যেক ভারতসন্তানকে অনুরোধ করি, প্রকৃতি সতী ভারতমাতার বরাঙ্গ কি অনন্ত বিচিত্র ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ভারতমাতার বিশালবক্ষে লুক্কায়িত দেশগুলি পরিভ্রমণ করিলে স্বদেশ-প্রেম উথলিয়া উঠিবে। আমি একটী গৃহপিঞ্জরাবদ্ধা বঙ্গমহিলা। জীবনে ভগবানের যে সকল কৃপা উপভোগ করিয়াছি, বহুদেশ ভ্রমণের সুযোগ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করি। সদাশয় স্বামী মহাশয় ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সাহায্যে শারীরিক অনেক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া ভারতমাতার মুখচ্ছবি নানা স্থানে নানা ভাবে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। পাঠক ! এই ভীষণ গ্রীষ্ম-পীড়িত কলিকাতায় বাস করিয়া তোমরা কি কল্পনা করিতে পার যে, ভারতমাতার বিশালবক্ষে বিস্তৃত পিণ্ডার তুষারক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। জীবনে এ স্থান দর্শন-রূপ সৌভাগ্য ঘটিবে কল্পনা করি নাই।

হঠাৎ এক দিন স্বামী মহাশয় সহাস্যমুখে বলিলেন, "কুমাউন রাজ্যের অন্তর্গত পিণ্ডার তুষারক্ষেত্রে কাল যাত্রা করিব। এই অল্প সময়, ইতিমধ্যে যাহা পার,যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লও।" আমি তাঁহার মুখে এ কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদখানি যেন হাতে পাইলাম। মন

আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। গৃহপিঞ্জর কতক্ষণে ছাড়িব, মন কেবল সেই প্রতীক্ষায় চঞ্চল। গৃহে অপোগণ্ড শিশুগুলিকে মাতার স্নেহ-আবরণের অন্তরালে নিক্ষেপ করিয়া, পরদিন তুষারযাত্রীরূপে গ্রীষ্মতাপিত ধূলাজর্জ্জরিত কলিকাতা পশ্চাতে ফেলিয়া হাওড়ায় ট্রেণে উঠিলাম। সময়ের অল্পতাবশতঃ তুষারদেশে যাত্রার উপযোগী বস্ত্রাদি কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। কয়েকখানা নোটবুক ও লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে ভুলি নাই, শিশুদের অসহায় অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক নয়নে অশ্রু বহিল, অসহায়ের অবলম্বন ভগবানের হস্তে সকল ভার অর্পণপূর্ব্বক প্রার্থনাবিগলিতচিত্তে মনের বোঝা লঘু করিতে চেষ্টা করিলাম। হৃদয়ে শত সহস্র নূতন ভাবের লহরী খেলিতে লাগিল। বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া প্রকৃতি সতীর নীরব উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে করিতে আপনা ভুলিয়া গেলাম। নিদ্রা দেবীর সাক্ষাৎ একটীবার ঘটিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ বঙ্গবালার ভাগ্যে তুষারযাত্রার সৌভাগ্য যে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল, তন্ময়চিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে কাশী পঁহুছিতে পঁহুছিতে গ্রীষ্মতাপে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সহযাত্রী একজন ভদ্রলোকের বন্ধুব্যবহারে এই দুঃখের সময় বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। যাত্রার দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে বেরেলী ষ্টেষণ হইতে "অযোধ্যা রোহিলখণ্ড" রেলপথে উঠিয়া কুমাউন রাজ্য ভেদ করিয়া তুষারযাত্রীরূপে কুমাউনের প্রধান নগর আলমোরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই পথের গাড়ীগুলি অতি অল্পপরিসর ও কদর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত। বর্ণভেদের তারতম্য সবিশেষ প্রবল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে লেখা "for European only." গভীর রাত্রিতে আমাদের মত নেটিভকে ১ম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া ইংরেজ-মহিলা ও তাহার সন্তানবর্গ একান্ত অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু স্বামী মহাশয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীরবভাবে আমাদের জন্য স্থান করিয়া দিল। কুমাউন রাজ্যের শ্যামল প্রশান্ত ছবি প্রভাতকালে হৃদয়কে অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সকল সন্তোষের আলয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল, পাহাড়ী স্ত্রী, পুরুষেরা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত। এই কুমাউন রাজ্য ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে মনে হইতে লাগিল যেন, চিরপরিত্যক্ত পিতৃদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ভেদ করিয়া চলিতেছি। আমার হৃদয় ও দুর্ব্বল শরীর নূতন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্রমে পর্ব্বতরাজির উন্নত শিখর গহন ভেদ করিয়া নীল আকাশপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। আমরা পর্ব্বতের পাদমূলস্থ নানা মনোহর গ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় কাঠগুদাম নামক ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন কাঠগুদাম। ইহার একটী ক্ষুদ্র গৃহ পূর্ব্বেই

ইংরাজ পরিবার কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই লোকগুলি যেরূপ অসভ্য ব্যবহারে সাহসী হইল, তাহা লিখিতে লজ্জা হয়। আমিও দমিবার পাত্র নহি। জল আনাইয়া স্নানাদি ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম। এইবার আমাদের পর্ব্বতারোহণ পর্ব্ব আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া স্বামী মহাশয় আমাকে উত্তমরূপে বল সঞ্চয় করিতে বার বার উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আমাদের বন্ধু আলমোরাবাসী যশী মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই আমার জন্য ডাঁণ্ডা ও স্বামী মহাশয়ের জন্য ঘোড়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট দাণ্ডির পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই ডাঁণ্ডা তদপেক্ষায় সঙ্কীর্ণ আয়তন। ইহার জীর্ণ মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট শুনিলাম,—পথে বাঘেরও উৎপাত হইয়াছে। আমি জলের কূজাটা ও কয়খানা নোট বুক লইয়া ডাঁণ্ডা আরোহণ করিলাম। তাহার পূর্ব্বে প্রাণের আশঙ্কায় বাহকদিগকে প্রচুর মিষ্টান্ন বিতরণে তুষ্ট করিলাম।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যদিগের রন্ধনপাত্র ও ভোজনপাত্র

রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ বিশুদ্ধ হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি রন্ধনপাত্র সুনির্ব্বাচিত হইয়া উহার পবিত্রতা রক্ষা হয়, এ বিষয়েও আর্য্যশাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে। আর্য্যগণ মনে করিতেন না যে, যে সে পাত্রে রন্ধন করা হইলেই হইল, যেসে পাত্রে ভোজন করা হইলেই হইল। যে যে পাত্রে রন্ধন, রন্ধিত দ্রব্য রক্ষা ও ভোজন করা উচিত তাহা প্রাচীন আর্য্যগণ পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রমাণিত, প্রমাণদ্বারা সুনিশ্চিত, নিশ্চয়তা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত বা সিদ্ধান্তীকৃত করিয়াছেন। যদি সেইগুলি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে অপ্রচলিত হইয়া থাকে, তবে পুনরায় সেই রীতিতে তৎসমুদায়কে সাধ্যমত চলিত করিবার চেষ্টা করা মন্দ নয়। যাঁহারা মনে করেন,—হিন্দু আচারের মূলে কোন সত্য নিহিত নাই, তাঁহারা ঐ সকল নিয়ম উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐরূপ নিষ্ঠাবর্জ্জিত জঘন্যদিগের জন্য হিন্দু আচার নহে। অন্য দেশবাসী অহিন্দুগণ হিন্দু-আচারে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের ভোজনপাত্র ও রন্ধনপাত্রাদি হিন্দুদিগের সহিত প্রায় মিলে না।

অনেক দেশে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভোজনপাত্র যতদিন পর্য্যন্ত নষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহাতে ভোজন কার্য্য চলিতে কাহারও আপত্তি নাই। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ মৃত্তিকানির্ম্মিত ভোজনপাত্রে অন্ন

অর্থাৎ খাদ্য বস্তু রাখিয়া একবার মাত্র ঐ পাত্রস্থ অন্ন ভোজন করেন, আবার পরক্ষণেই সেই মৃণ্ময় পাত্রটী অপবিত্র বোধে ত্যাগ করেন। উহাতে আর দ্বিতীয় বার সময়ান্তরে ভোজন করিতে পারেন না। সমস্ত প্রকার উচ্ছিষ্ট ধাতুপাত্রই কোন না কোন দ্রব্যবিশেষ দ্বারা মাজিয়া, বা প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ করা যায়, কেবল মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ করা যায় না। মৃণ্ময় রন্ধনপাত্রে একবারমাত্রই রন্ধন করা যায়, আবার পরক্ষণে উহা ত্যাগ করাই প্রধান কর্ত্তব্য।

নিত্যং নূতনভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃ পাক এবচ।
অথবা পক্ষপর্য্যন্তং তত্ত্যাজ্যোঃ মনীষিভিঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

অনুবাদ। প্রত্যহ নূতন ভাণ্ডে পাক করা উচিত। অথবা এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন পর্য্যন্ত পাক করিয়া তাহা ত্যাগ করিবে।

পকপাত্রেণ যৎপক্কং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। একবার যে পাত্রে পাক করা হইয়াছে, পুনরায় তাহাতে পাক করিলে সেই পাক করা খাদ্য নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ উহা দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন করা যায় না এবং নিজেরা ভক্ষণ করিলেও উহাতে স্বাস্থ্যহানি ও অপবিত্রতা জন্মিতে পারে।

হিন্দুসমাজে 'বিধবা ও ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে অদ্যাপি রন্ধনপাত্র সম্বন্ধে উল্লিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। হিন্দু বিধবাগণ পিত্তলনির্ম্মিত পাকপাত্রে পাক করিয়া তাহা না মাজাইয়া আর দ্বিতীয় দিনে বা দ্বিতীয়বারে তাহাতে রন্ধন করেন না। যদি কখন মৃণ্ময়পাত্রে রন্ধন করিতে হয়, তবে পাকান্তেই উহা ত্যাগ করেন, দ্বিতীয়বার আর উহাতে রন্ধন করেন না। মৃণ্ময়পাত্র যে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে পনর দিন পর্য্যন্তও পাক করা যায় এরূপ বিধান আছে, উহা প্রকৃত পক্ষে প্রধান বিধি নহে। বস্তুতঃ প্রত্যহ মৃণ্ময়-পাকভাণ্ড পাকান্তে ত্যাগ করিবার বিধিই প্রকৃত বিধি। যাহা হউক, মাসান্তে বা পনর দিন পরে পাকের মেটে পাতিল ত্যাগ করিলেও চলে। কিন্তু হায়! এক্ষণে আমাদের হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র ঐ নিয়ম কোথায় প্রতিপালিত হয়? যতদিন পর্য্যন্ত পাকের পাতিল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অবাধিতরূপে উহাতে পাক-কার্য্য চলিয়া থাকে। কেবল অশৌচান্তদিনে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কালে মৃণ্ময়পাকপাত্র বর্জ্জন করিবার বিধি আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধি-প্রকরণে উচ্ছিষ্টাদি মৃণ্ময়পাত্র শোধনের কোন নিয়মবিশেষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ দ্বারাও জানা যায় যে উত্তমরূপে ধৌত করা হইলেও পাকের স্থালীতে পর্য্যুষিত অন্নাদির বীজ কিছু না কিছু লাগিয়া থাকে। পর্য্যুষিত অন্নের মধ্যে শরীরের স্বাস্থ্যনাশক ও বল-হানিজনক এরূপ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, যে, তাহা খাইলে মনুষ্য চিররোগী হইয়া

থাকে। যদি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কেহ মৃণ্ময় পাকপাত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে—প্রত্যহ দুই বেলা দুই বার পাকপাত্র বর্জ্জন করা না হইলেও অন্ততঃ পনর দিন বা একমাস পরে উহা ত্যাগ করেন। প্রতিপদে কোন মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন করা আরম্ভ করিলে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিন তাহা ত্যাগ করিলে পনর দিনের কথা বেশ মনে থাকে। অথবা রন্ধন পাত্র ব্যবহারের দিন মনে রাখিয়া পরেই গণনায় যে দিন পঞ্চদশ দিবস হয়, তৎপর দিন উহা ত্যাগ করিলেও হইতে পারে। মাসান্তে অবশ্য উহা ত্যাজ্য। হিন্দু-গৃহস্থের অনেক প্রকারে অনেক ব্যয় হই-তেছে, ঐ সমস্ত ব্যয়ের মধ্যে মৃণ্ময়পাক-পাত্র মধ্যে মধ্যে বর্জ্জনে যে সামান্য ব্যয় হয়, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে ভবিষ্যতে অনেক পীড়ার নিবারণ পক্ষে অনুকুল হইতে পারে। যাঁহারা পিত্তল-নির্ম্মিত পাকপাত্রে পাক করেন, তাঁহারা সাধ্য পক্ষে প্রত্যহ দুই বেলা উহা মাজাইয়া উহার পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করেন ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। পিত্তলনি-র্ম্মিত পাকপাত্র ভিন্ন ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহের ও তামার পাকপাত্র যে রন্ধন বিষয়ে প্রশস্ত নহে, তৎপক্ষে শাস্ত্রে নিম্ন-লিখিতানুরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে ;—

যদাতু আয়সে পাত্রে পক্কমশ্নাতি বৈ দ্বিজঃ।
স পাপিষ্ঠোহপি ভুক্ত্বান্নং রৌরবেং পরি-পচ্যতে॥

(মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রম্॥

অনুবাদ। যদি কোন দ্বিজ লৌহনির্ম্মিত পাত্রে পক্ক অন্ন ভোজন করে, সেই পাপিষ্ঠ সেই অন্নভক্ষণ জনিত পাপের ফলে মৃত্যুর পর রৌরব নামক নরকে পচিয়া কষ্ট পায়।

নেত্রয়োর্মনসোহানিস্তাম্রপক্কান্নভোজনাৎ।

(মতস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। তাম্রপাত্রে পাক করিয়া সেই অন্ন খাইলে চক্ষুর দোষ জন্মে এবং মান-সিক বল নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

ইউরোপ খণ্ডের কোন এক দেশে জনৈক মহিলা ধর্ম্মপ্রাণা বলিয়া বিশবেরূপ খ্যাতিলাভ করেন। এমন কি তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এ কথাও অনেক লোক বিশ্বাস করিতে লাগিল। তাঁহার এই অসাধারণ গুণের জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বহুতর লোক তাঁহার সন্নিধানে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার প্রতিপত্তির কথা পোপের কাণে উঠিল। পোপ সংবাদ পাইয়া একটু আশঙ্কিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে মহিলার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে তাঁহার প্রতি জনসাধারণের

তার কিছু হ্রাসতা জন্মিতে পারে, তাই সত্য সংবাদ জানিবার জন্য একজন কার্ডিনেলকে সেই মহিলা সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কার্ডিনেল যাইয়া দেখিলেন যে লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা অলীক নহে। বহুল লোকের সমাগম দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তৎপরে জনতার মধ্য দিয়া রাস্তা কাটিয়া মহিলার সমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সকলে তাঁহাকে পোপ অপেক্ষা সম্মান করিতেছে। যাহা হউক, ধর্ম্মের ভিত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার পা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়া! আপনি ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হয়েছেন, অনেক লোক আপনার চরণ পূজা করিতেছে, এই দিন আমার পায়ের জুতার ফিতাটা খুলে দিন। বহুলোকের ভক্তি পাইয়া মহিলার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল,ধীরে ধীরে অহঙ্কার অভিমানে তাহার কোমল হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাই কার্ডিনেলের ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া হাত সরাইয়া লইলেন। কার্ডিনেলও আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে পোপের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ যেখানে বিনয়ের অভাব সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি কি উপায়ে মহিলার জীবন পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিলেন। পোপও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কার্ডিনেল অতি অল্প কথায় ধর্ম্মের চরম কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে সাধারণ লোক কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মনে করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নাম ধর্ম্ম। জীব কি,জগৎ কি,জীবের সহিত জগতের কি সম্বন্ধ। জীব ও জগৎ স্বয়ম্ভু কিংবা তাহাদের জনয়িতা কেহ আছে কি না,এই সকল বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভের নাম ধর্ম্ম। আমি আজি অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব না, কেবল জীব সম্বন্ধে যে লোকের একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিব। প্রায়ই সকল লোকই বিশ্বাস করেন যে, জীবের কর্ম্ম করিবার শক্তি জীবের স্বকীয় জিনিষ, তাহা হইতে উৎপত্তি এবং তাহাতেই পরিণতি। যখন মানুষ দেখিতে পায়, যে সে ইচ্ছামত একটা কর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং একটা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। তখন তাহার এ বিশ্বাসের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যদি একবার তাহার দৈনন্দিন জীবনের গতিবিধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে তাহা হইলে দেখিতে পাইবে,যে সে ইচ্ছা মত দশটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেও পাঁচটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। কেন পারিতেছে না,কোন শক্তি তাহার এই সংকল্প সাধনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া দেখিতে পাইবে যে তাহার অতিরিক্ত আর একটা শক্তি তাহার

দৈনন্দিন কার্য্য নিয়মিত করিতেছে। এই শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করিয়াই কবি গাইয়াছেন, "ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার ইচ্ছোপরি ইচ্ছা আছে সন্দেহ কি আছে তার" "তুই যাত্রা করে দক্ষিণে যাস বামে ঘুরিস। কি কারণ তুই ভেবে দেখরে কর্ত্তা গোঁসাই আছেরে তোর আর একজন" যতই মানুষ এই শক্তির খেলা দেখিতে পায়, ততই নিজের শক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে থাকে, এবং পরিণামে আপনার শক্তিরাহিত্য অনুভব করিয়া সেই মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই তত্ত্বজ্ঞানের নামই বিনয়। বিনয়ী আপনাকে দেখিতে পায় না যে সে সর্ব্বত্র মহাশক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে। যদি কেহ তাহার দৃষ্টি সে মহাশক্তি হইতে সরাইয়া লইয়া আপনার দিকে ফিরাইতে চায়, তাহা হইলে সে আশঙ্কিত চিত্তে তদ্বিধ শত্রু হইতে পালাইতে পারিলে নিরাপদ মনে করে।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

প্রণয়ে প্রমাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী। গহনা গহনা কর কি আমি তোমার গহনা খেয়ে ফেলেছি নাকি ?

স্ত্রী। ওকি কথা! যা দিয়াছ তুমি দিয়েছ আরত কেহই দেয় নাই। তবে এই যে তুমি এখন ভিন্ন সংসার করেছ। আমার খোরাক পোষাক ও মান ইজ্জতের রক্ষার জন্য সেগুলির নেহাত্ দরকার হয়ে পড়েছে। তাই চাচ্ছি দাও সেগুলি আমাকে দাও।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া স্বামী কহিলেন,—চুপ কর চুপ্ কর।

স্ত্রী। চুপ করতে বল করছি কিন্তু—

স্বামী। আমার কাছে কিন্তু টিন্তু খাটবেনা বলছি। চুপ্ কর।

স্ত্রী। তবে কি গহনাগুলি আমাকে দিবে না? না খেয়েই আমাকে মরতে হবে?

স্বামী। চুপ্ কর বলছি।

স্থলপদ্ম সেই খানে দাঁড়াইয়াছিল। সে এখনো বালিকা। এখনো সে বৃদ্ধ স্বামীর সম্মুখে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিতে সাহস করে না। আজ সে একটু খানি মুখের কাপড় তুলিয়া একটু খানি সাহস করিয়া স্বামীকে কহিল। তুমি যে পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বাবাকে দেখাইয়া আমাকে বিবাহ করেছিলে তার একখানি দিদিকে দাও না ?

বালিকা স্ত্রীর মুখে এমন হিতকর ও সরল উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভয়ে স্বামীর অন্তরাত্মা শুষ্ক হইল। তখন তাহার মুখ দিয়া সত্য কথাই বাহির হইল। তিনি কহিলেন,—তাহা কি আমার ছিল? আমার মনিব কাগজের উপর আমার নাম লিখিয়া

ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলেন। আমি সেই কাগজ তোমার বাবাকে দেখাইয়াছিলাম, নচেৎ তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন কি? আমি নির্ধন, তাতে বৃদ্ধ, তাই ঐ রূপে ধনী সাজিয়াছিলাম। স্বামীর কথা শুনিয়া বালিকা স্ত্রীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, আর দুবুটী ঠাকুরাণীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি স্বামীকে আর কিছু কহিলেন না. কাজ কি, হাজার হোক স্বামী। মনকে বুঝাইলেন, যাঁহাকে সেবা করিলে স্বর্গ হয়, তাঁহার উপর আমার রাগ কি?

এইভাবে দিন পনর অতীত হইল। কোনও সময় দুবুটী ঠাকুরাণীর কোনও একটী কঠিন পীড়া হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শ মত তাহার স্বামী তাহাকে অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করাইয়াছিলেন। আসামে আসার পর দুবুটী ঠাকুরাণীর নিকট অহিফেন ছিল না এবং উহা সেবন না করায় দুবুটী ঠাকুরাণীর অসুখ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তিনি স্বামীর নিকট অহিফেন চাহিলেন। স্বামী আজকাল বলিয়া অহিফেন দিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে দুবুটী ঠাকুরাণী একদিন আহারাদির পর খট্টার উপর উপবেশন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামী গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—কৈ গো! এই তোমার অহিফেন লও।

দুবুটী হস্ত তুলিয়া অহিফেন গ্রহণ করিলেন। অহিফেনের পরিমাণ অতি অল্প, তিনি কহিলেন,—এত অল্প যে?

স্বামী। এইত খাও।

স্ত্রী। অহিফেন খাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন এবং অহিফেন খাওয়ার পর অতি অল্পক্ষণই তাঁহার জ্ঞান ছিল। তহার পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার বিষম ধনুষ্টঙ্কার হইতে লাগিল।

বালিকা স্থলপদ্ম কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল, পরে ডাক্তারের জন্য চাকর পাঠাইল। ডাক্তার কবিরাজ ও অপরাপর লোক আসায় ঘর দরজা ভরিয়া গেল। মুহুর্মুহু ফিট হইতেছিল। কিন্তু অনেক ঔষধে ফিট কমিয়া আসিল। যখন জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন রাত্রিদ্বি প্রহর। দুবুটী ঠাকুরাণীর স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া যেই দেখিলেন যে দুবুটী ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মৃতকল্পা হইয়াছেন, অমনি তাঁহারও জ্ঞানলুপ্ত হইল ও ফিট হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। এবং তিনি স্ত্রীকে বিষ খাওয়াইয়াছেন বলিয়া লোকে তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল দেখিয়া তিনিও বলিয়া বসিলেন যে,—তাহার স্ত্রীই তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে। কি আশ্চর্য্য!! কে বলে স্বামী হিতকারী। স্থলপদ্ম স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"দিদির উপরে এ আপনার ভারি অন্যায়।"

স্বামী। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি স্থলপদ্ম! তোমার জন্য আমি সবই করিতে পারি। দুবুটী ঠাকুরাণী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন। এবং এইরূপ

মনোমালিন্যের মধ্য দিয়া আরো একবৎসর অতীত হইল।

শাবন্তবাবু শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। এবং কলিকাতায় ছোট একটী বাসা ভাড়া করিয়া স্ত্রীযুগলের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

কলিকাতাতেই স্থলপদ্মের বাপ ছিল। শাবন্ত স্থলপদ্মকে বাপের বাড়ী পাঠানর প্রস্তাবনা করিলেন এবং শ্বশুরবাড়ীর একজন ঝি পাঠাইতে লিখিলেন। স্থলপদ্মের পিত্রালয় হইতে একজন ঝি আসিল।

স্থলপদ্ম পিত্রালয়ে চলিলেন। স্বামী কহিলেন,—একজন ঝির সঙ্গে কি পাঠান যায়? অতএব তিনিও ধুতি চাদর পরিয়া স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। এক সপ্তাহ অতীত হইল। স্থলপদ্মকে রাখিয়া স্বামী আর বাসায় ফিরিলেন না। এই এক সপ্তাহের মধ্যে ছুবুটী দুই দিন মাত্র খাদ্য জিনিস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। আর ছয় দিন কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় অনাহারে অনিদ্রায়, শুধু স্বামীর প্রত্যাশায় কাটাইলেন। স্বামী আসিলেন না। এই সময় আবার বাড়ীওয়ালী ভাড়া চাহিয়া বসিল। তিনি কহিলেন,—বাছা! আমার কাছে ত এক পয়সাও নাই যে তোমাকে দিব।

বাড়ীওয়ালী কহিল,—বাছা টাছা আমি জানিনা, টাকা দিবে কিনা বল? তোমার স্বামী বলে গেছেন যে তোমার কাছে বাসাভাড়ার টাকা রেখে গেছেন। ছুবুটী ঠাকুরাণী অবাক্। কহিলেন, বাড়ীওয়ালী! ও সব মিথ্যা কথা। "মিথ্যা কথা বৈকি, বলিয়া বাড়ীওয়ালী ছুবুটী ঠাকুরাণীকে যাহা মুখে আসিল তাই বলিয়াই গাল দিল। আর পিট করিব বলিয়া ভয় দেখাইল।

ছোটলোকের নিকট অপমানে ছুবুটী ঠাকুরাণী অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিলেন। তারপর উঠিয়া বোনপোর নিকট বিস্তারিত এক পত্র লিখিলেন। তাঁহার বোনপো বিনোদ বাবু কলিকাতাতেই ছিলেন।

বিনোদ বাবু পত্র পাইয়া মাসিমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছুবুটী ঠাকুরাণী বোনপোকে সমুদয় জানাইলেন। বিনোদ বাবু বাড়ীওয়ালীকে বাসাভাড়া চুকাইয়া দিয়া মাসীমাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। ভদ্রলোকের মেয়েকে অপমান করার অপরাধে বাড়ীওয়ালীকে উত্তম মধ্যম কিছু দিতেও ভুলিলেন না।

ছুবুটী ঠাকুরাণী কিছুদিন থাকিয়া, পরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। এবং কিছুদিন পিত্রালয়ে বাস করিয়া বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে কাশী গেলেন ও সামান্য একখানি বাসা ভাড়া করিয়া কাশীবাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে কোথা হইতে খাইতে দিবেন। অতএব তাঁহাকে দাস্যবৃত্তি ও পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইল। ওহো সময়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! পুরুষের প্রেমে ছি ছি ভুলিও না ভুলিও না।

বরঞ্চ কুমারী হয়ে
থাক তার পথ চেয়ে

বামাবোধিনী পত্রিকার প্রবর্ত্তক

৺উমেশচন্দ্র দত্ত।

কিন্তু কথনো আঁখির পানে চাহিও না
চাহিও না।

শ্রীঅমুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত
পত্র ও ভাবভক্তি রচয়িত্রী।

ছবির প্রতি। *

অই সে জীবন্ত মূর্ত্তি হাসি হাসি মুখ,
দেবতার ভাব ওতে আছে প্রকাশিত ;
কি বলিছে ছবিখানি, মৃদু নাড়ি মুখ,
চক্ষু দুটী আমাপানে রাখি বিস্ফারিত !
কি বলিছ ভাবে ভাবে আমি বুঝি নাই,
কথাগুলি স্ফুট স্বরে বল প্রেমময় !
আঁখি ঠারি কি বলিছ শুনিবারে চাই,
কেহ নাই আমি মাত্র, কহ দয়াময় !
গভীর নিশার কথা না হবে প্রকাশ,
বল দেব ! স্ফুট স্বরে ছলিও না আর ;
আমি ধন্য হব, মম জ্ঞান পরকাশ,
মৌন ভাব পরিহরি কহ একবার।
কত কথা বলিয়াছ শিক্ষা দান ছলে,
সশরীরে † যবে তুমি ধরা ধামে ছিলে ;
দয়াময় তুমি দেব, জানে ত সকলে,
কি ভাবে নীরব আছ উত্তর না দিলে !
এই দেখ তব কন্যা এ "বামাবোধিনী,
আছে মম ক্রোড়ে তব যতনের ধন,
অশ্রুনীরে তিতি কত কান্দে অভাগিনী,
পালিতেছি যত্নে একে করি প্রাণপণ।
কিন্তু যদি তব বাণী শুনিবারে পাই,
মণি মুক্তা রত্ন আনি দেশান্তর হতে,
মনের হরিষে একে যতনে সাজাই ;
বুঝিছ কি মম ব্যথা অন্তরীক্ষ হতে ?
শুন দেব ! ব্যথা মম দয়াময় তুমি,
বল শক্তি হারা হই ভাবিবারে গেলে,
কিবা নাই, আছে সব, শুধু নাই তুমি,
শক্তি আসে স্ফূর্ত্তি আসে তব ভাব পেলে।
বল বা না বল কথা, ইঙ্গিতে প্রকাশ,—
"বল বা ভরসা তব না হবে অভাব,
রাখ বিভুপদে মতি, না হবে হতাশ,"—
এই কি বলিলে দেব, তব মনোভাব ?

শ্রীবিপ্রচরণ বসু

রমণীরত্নমালা।

(ব্রহ্মবাদিনী যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী,মৈত্রেয়ী।)
মৈত্রেয়ী বাণি ! ধন্যা তব দয়িতসুতা
স্বামিনো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ
যা হিত্বাহনিত্যবস্তু ন্যমৃতময়পর—
ব্রহ্মবিদ্যামবাপ।

* বামাবোধিনী পত্রিকার প্রবর্ত্তক ৺ উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ছবিটী লক্ষ করিয়া উক্তি।
† সশরীরে অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কথয় দয়িত ! মে
কিন্নু কার্য্যং ততঃ স্যাৎ
ইত্থং যা ধারয়ন্তী পতিপদযুগলং
তেজসা ব্যাজহার॥

—মৈত্রেয়ী তোমার কন্যা ধন্যা হে ভারতি !
ব্রহ্মবিদ্যা দিল যারে যাজ্ঞবল্ক্য পতি ;
অনিত্য সমস্ত বস্তু তৃণজ্ঞান করি,
সতেজে কহিলা সতী পতিপদে ধরি',
"না হ'ব অমৃতা আমি লভিয়া যে ধন,
হেন তুচ্ছ ধনে মোর কিবা প্রয়োজন ?"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দুই পত্নী,—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তিনি মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, "কল্যাণি! আমি এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব, আমার গৃহ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তোমাকে ও কাত্যায়নীকে বিভাগ করিয়া দিতেছি, গ্রহণ কর।" মৈত্রেয়ী কহিলেন, "ভগবন্! যদি এই সসাগরা বসুন্ধরা আমারি ভোগের জন্য সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা হয়, আমি কি তাহাতে 'অমৃতা' (জরামরণাদি-তাপত্রয়-শূন্যা) হইব ? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—"না না, তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ভোগোপকরণসম্পন্ন লোকদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। বিত্তাদি বস্তু দ্বারা যে সকল কার্য্য হয়, তদ্দ্বারা সে অমৃত-বস্তু লাভের আশা মনে জ্ঞানেও করিতে নাই।" মৈত্রেয়ী কহিলেন, "নাথ! যাহাতে আমি সে অমৃত-বস্তু লাভ না করিব, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? অতএব হে নাথ! অমাকে সেই ভূমামৃত-লাভের উপায় বলিয়া দিন।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য সেই সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মামৃত-লাভের উপায়স্বরূপ সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ প্রশ্নোত্তররূপে বৃহদারণ্যকে যাহা বিবৃত আছে, তৎপাঠে ঐ দম্পতীর আধ্যাত্মিক মহিমার অপরিসীম উৎকর্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(বেদসূক্তরচয়িত্রী ব্রহ্মবাদিনী আত্রেয়ী।)

আত্রেয়ী বিশ্বধন্যা সুরনরমহিতা
বেদসূক্তপ্রণেত্রী
ত্বগ্দোষান্মুক্তদেহাঽভবদমরপতিং
যা তপোভিঃ প্রসাদ্য।
নিষ্ঠ্যূতান্যাননেন্দোরমৃতরসপরিস্যন্দি—
সূক্তানি যস্যাঃ
ভক্ত্যা সংকীর্ত্তয়ন্তে পুলকিতহৃদয়া—
দেবসিদ্ধর্ষিসঙ্ঘাঃ॥

—আত্রেয়ী অমর-নর-পূজিতা রমণী,
বেদসূক্ত-রচয়িত্রী বিদুষীর মণি ;
নিজ দেহে কুষ্ঠরোগ-আরোগ্যের তরে
বেদমন্ত্র রচিয়া পূজিলা সুরেশ্বরে ;
ধন্য তার মন্ত্র আর তপস্যার বল !
হৈল দেহ রোগমুক্ত দিব্য নিরমল।
আত্রেয়ী-বদনচন্দ্র হৈতে বিগলিত
সুধাময় দেবসূক্ত অতি সুললিত,
গান করে ভক্তিভরে দেব-ঋষিগণে,
সে সতীর পূজা করে পুলকিত মনে।

এই নারী অত্রিমুনির কন্যা বলিয়া আত্রেয়ী নামে পরিচিতা ; ইঁহার প্রকৃত নাম 'অপালা'। ইনি দৈবদুর্ঘটনায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এজন্য স্বামী

তাঁহাকে পরিত্যাগ করায়, আত্রেয়ী রোগ-মুক্তির জন্য পিতার আশ্রমে আসিয়া ইন্দ্রের কৃপালাভ জন্য, স্বরচিত সূক্তে সুরপতির স্তব করিয়াছিলেন। ইহাঁর সাধনায় ও ব্রহ্মবিদ্যায় সুরপতি প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে রোগমুক্ত করেন। ভবভূতিপ্রণীত উত্তর-রামচরিতে আত্রেয়ীনাম্নী এক বিদুষীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সুদুর্গম দণ্ডকারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক, পুঁথি লইয়া মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রমে বেদান্ত শিখিতে চলিয়াছেন। প্রথমে বাল্মীকির আশ্রমে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় ছাত্রের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতি কারণে পাঠের অসুবিধা দেখিয়া অগস্ত্যমুনির নিকট যাইতেছেন। পথে বাসন্তীনাম্নী বনদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, বাসন্তী তাঁহার যথোচিত আতিথ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি একাকিনী এ ঘোর দুর্গমারণ্য অতিক্রম করিয়া কোথা যাইতেছেন? আত্রেয়ী বলিলেন;—

"অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ সঞ্চরামি॥"

—এ দণ্ডকারণ্য প্রদেশে অগস্ত্যপ্রমুখ বহু ব্রহ্মবিৎ মহর্ষিগণের বাস। তাঁহাদের নিকট বেদান্তবিদ্যা শিখিবার জন্য আমি বাল্মীকির নিকট হইতে এ স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। আহো আত্রেয়ি! ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার ব্রহ্মসাধনায় দৃঢ়তা! এক্ষণকার বামাগণ যদি একবার প্রাচীন ভরেতের বামাগণের চরিত্রে দৃষ্টিপাত করেন, নিশ্চয় তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।

(বীরাঙ্গনা বিদুলা।)

ধন্যা সা বিদুলা প্রবীররমণী—
সীমন্তমুক্তামণিঃ
যস্যা নীত্যনুশাসনং মৃতমপি
প্রোদ্দীপয়েৎ তেজসা।
নিত্যং যচ্চরিতাদ্ভুতং সপুলকং
শৃণ্বন্তি বীরাঙ্গনাঃ
বীরাপত্যললামলাভমনসঃ
শ্রদ্ধান্বিতেনাত্মনা॥

—ভারতের বীরনারীকুলশিরোমণি
ধন্যা সে বিদুলা দেবী ক্ষত্রিয়রমণী!
তাঁর সে শাসননীতি শ্রবণ করিয়া
মৃতও অদম্য তেজে উঠে গরজিয়া;
ক্ষত্রনারী বীরপুত্র-রত্নলাভ তরে
সপুলকে সে কাহিনী শুনে শ্রদ্ধাভরে।
রিপুগণহৃতরাজ্যং দীনহীনং হতাশং
স্বতনয়মিব বিদ্যুত্তেজসোৎসাহবাচা।
রিপুকুলদলনে যোদ্দীপয়ন্তী স্বরাজ্যং
পুনরপি রিপুহস্তান্মোচয়ামাস বামা॥
—রিপুগণে রাজ্য তার করিলে হরণ,
পুত্র তার হৈল ঘোর বিষাদে মগন;
মৃতকল্প ভূপতিত তনয়ে হেরিয়া,
তেজস্বিনী রাণী রোষে উঠিল গর্জ্জিয়া;
বিদ্যুৎ ঝলসে যেন বচনে বামার,
শুনি তাহা মহাতেজে উঠিল কুমার;
সঞ্জীবনী মাতৃনীতি শুনিয়া তনয়,
উদ্ধারিল হৃত রাজ্য শত্রু করি' জয়।
রাজপত্নী বিদুলার পতি স্বর্গারোহণ

করিলে, তদীয় রাজ্য প্রবল শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। ৫ বিদুলা একমাত্র পুত্রকে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নৈরাশ্যে ও বিষাদে শয্যাশায়ী হইলেন। পুত্রের সেই শোচনীয় দশা দর্শনে, তেজস্বিনী বিদুলা পুত্রকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন;—কাপুরুষ! পামর! তুমি কি আমার গর্ভে এবং সেই বীরসিংহের ঔরসে জন্ম গ্রহণ কর নাই? কি জন্য বজ্রাহত শবদেহবৎ ধরাশায়ী হইয়াছ? হা হতভাগ্য! শত্রুরূপ বিষধরের বিষদন্ত উৎপাটন না করিয়া, তুমি শূকর কুক্কুরাদির ন্যায় মরিতে চাও? বিলুপ্ত কীর্ত্তিকে নিজভুজবীর্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার নাম যেন জগতের বীরবর্গের নামের মধ্যে বা অন্তে পরিগণিত না হয়। যদি সর্ব্বাগ্রেই তোমার নাম সগৌরবে কীর্ত্তিত না হয়,, তবে জানিব, আমি বন্ধ্যা। তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমাচ্ছন্ন ভবে থাকা অপেক্ষা তৃণাগ্নির ন্যায় ক্ষণমাত্রও প্রজ্বলিত হইয়া, শত্রুহস্তে নিধন লাভ শ্লাঘার কথা। যাহার বীরবংশে জন্ম, সে যদি যুদ্ধে একটী শত্রুকেও সংহার করিয়া মরে, তবে সে ধর্ম্মের নিকট অঋণী, সে তাহার জননীর শোককারণ নহে। দেখ পুত্র! তোমার কাপুরুষতায় তোমার পিতৃবংশের সমস্ত কীর্ত্তি লোপ পাইতেছে, তুমি ক্লীবের ন্যায় ধিক্কৃত জীবনভার কিরূপে বহন করিতেছ? অদম্য উৎসাহে সিংহের ন্যায় ভীম পরাক্রমে উত্থিত হও! বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য ও সাহস ধারণ কর, ব্যসনমগ্ন এ রাজবংশকে উদ্ধার কর, কোটি কোটি প্রজার নয়নাশ্রু ক্ষালিত কর। এ পতিত রাজবংশকে উদ্ধার কর। সর্ব্বলোক যাহার লোমহর্ষণ পৌরুষের কথা কীর্ত্তন না করে, তাহার নাম কেবল লোকসংখ্যার পূরণমাত্র। দানে, তপস্যায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বিদ্যায় ও অর্থলাভে যাহার নাম বিঘোষিত না হয়, সে তাহার মাতার মলমূত্রসদৃশ। যে ব্যক্তি জ্ঞানে, মানে, সম্পদে ও পরাক্রমে সকলকে পরাভূত করিতে পারে, তাহাকেই পুরুষ বলে। যাহার উৎসাহ নাই, উচ্চ কামনা নাই, বল-বীর্য্য-পরাক্রম নাই, বিপৎপ্রতীকারের ক্ষমতা নাই, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান নাই, তাদৃশ নরাধম কাপুরুষকে যেন কোনও ক্ষত্রিয় নারী গর্ভে ধারণ না করে। যদি দুষ্কর কার্য্য সাধনের ক্ষমতা না রহিল, তবে ক্ষত্রিয়নামের গৌরব কোথায়? উঠ! উঠ! হৃদয়কে লৌহবৎ সুদৃঢ় কর; শত্রুগণের মস্তক আক্রমণ করিয়া যদি তুমি ক্ষণমাত্র প্রজ্বলিত হইয়াই নিহত হও, তোমাকে আমি চিরজীবী জ্ঞান করিব।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ৫ই জুলাই ঝান্‌সি বিধবা-বিবাহ সমিতির উদ্যোগে সাগর জেলার

ছত্রীজাতীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী পিয়ারী দেবীর সহিত হাসিয়ারপুর জেলার ভোলারাম আহলোয়ালার পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। লাহোরের অনেক গণ্য মান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান ও হিন্দুবিধবার দুঃখক্লেশ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ নারায়ণ গঞ্জে প্রসিদ্ধ ধনী সওদাগর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ধর্ণ মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত কলিকাতা বরাহনগরনিবাসী মহেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র বাবু বিজয়কৃষ্ণ সরকারের বিবাহ হইয়াছে। ঢাকা জেলার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন।

বামারচনা।

দেবনিবাস। *

সে দিন গেছিনু আমি সে দেব নিবাসে
সে নিবাসে যে দেবতা,
বঞ্চিতেন সরবদা,
খেলিত দেবের শিশু উৎসাহ উল্লাসে।

২

সেদিন গেছিনু সেই দেব-নিকেতনে
দেখিনু আঁধার ভরা,
চাঁদ নাই আছে তারা,
ফুল নাই গন্ধটুকু বহিছে গোপনে।

৩

সে দিন গেছিনু সেই অমর নগরে
দেখিনু অমর শূন্য,
জমাট রয়েছে পুণ্য,
সুখশূন্য শান্তি আছে, ম্লান মূর্ত্তি ধরে।

৪

সে দিন গেছিনু সেই পবিত্র আশ্রমে
যে আশ্রমে যে গিবর*
বঞ্চিতেন নিরন্তর,
বহিত মন্দার-গন্ধ পলাশ কুসুমে।

৫

দেখিনু সে পুণ্যাশ্রম হয়েছে আঁধার,
গোটাকত মধু-ফুল
হয়ে আছে শোকাকুল
অন্তরীক্ষ হতে উঠিতেছে হাহাকার।

৬

সে দিন গেছিনু আমি সেই সে স্বরগে
যে স্বরগে দান, ধর্ম্ম,
সত্য, দয়া, ক্ষমা, কর্ম্ম,
বহে সুখ-শান্তি সিন্ধু-খরতর বেগে।

৭

দেখিলাম ভগ্ন হয়ে গেছে স্বর্গ-ধাম,
নাই আর সে সৌন্দর্য্য,

*৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহ, কলিকাতা

*৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

বল নাই, নাই বীর্য্য,
দেবতা গেছেন চলে আছে তার নাম

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী

সংসার খেলাঘর।

আমার এ খেলা ঘর দুদিন তরে।
খেলা হ'লে চলে যাব আপন ঘরে।
মার ছেলে মারে ফেলে, আসিয়াছি পথ ভুলে
মা আছেন পথ চেয়ে আমার তরে,
আমি গেলে কোলে নেবে আদর ক'রে।

২

সাজায়ে মা পাঠাইলা খেলার তরে।
"যেও নাক দূরে বাছা" কহিলা মোরে।
"বহু দূরে বহু ভয়, যদি পথভ্রান্ত হয়
কেমনে আসিবি তবে আমার কোলে?
দূরে গেলে পরে বাছা! পড়িবি গোলে।"

৩

মার কথা নাহি শুনে আজি এ দশা!
বড় ভয় সংসারেতে খেলিতে বসা।
কি ছাই খেলিতে এনু শুধুই হারিয়া গেনু
এই খেলিবার তরে সংসারে আসা;
খেলা হায়, এ যে দুঃখসাগরে ভাসা।

৪

খেলিতে কাঁদিয়া চ'খ হয়েছে আঁধা;
পাইনেকো পথ খুঁজে লাগিছে ধাঁধা।
আয় গো মা ত্বরা করে, কোলে ক'রে নেযা মোরে
অবোধ তনয়া তব শোনেনি কথা;
তা ব'লে কি মার প্রাণে বাজেনা ব্যথা?

৫

সারাদিন খেলিলাম কি ছাই খেলা।
মার তরে কাঁদে প্রাণ সাঁজের বেলা।
পড়িয়াছি যে খেলায়, মিটিবে কখন হায়!
কে জানে যাইতে পাব কখন তথা?
পথ চেয়ে স্নেহময়ী মা আছে যথা।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

তরঙ্গিণী।

নেচে নেচে কোথা যাও ওগো তরঙ্গিণি!
হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, ভক্তিপ্রবাহিণী।
শিখিয়াছ কার কাছে ও গভীর তান?
ভক্তির প্রবাহ তানে বিশ্ব কম্পমান।
কল কল তানে গাও মহিমা কাহার?
কে জানে হৃদয় তব মহৎ অপার!!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়
নিলফামারী

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 541. September, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪১ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩১৫। সেপ্টেম্বর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দান—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, মহাত্মা স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত স্মৃতি ফণ্ডে ২৫০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা টেমার্স লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ বসু তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বেলগাছিয়া এলবার্ট ভিক্টর হাঁস-পাতালে ২৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বহুদিন যাবৎ বাতরোগে ক্লেশ পাইয়া বিলাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমেশ্বর এই অশেষ গুণবতী ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর আত্মার শান্তি বিধান করুন।

বিলাত যাত্রা—স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল গত ১৯শে আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই সঙ্গে প্রায় দ্বাদশটী বঙ্গীয় যুবক ইউরোপের বিবিধ প্রদেশে বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় ২০শে আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

কৃষিবিদ্যালয়—ভাগলপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে সাবরে গবর্ণমেণ্ট "বঙ্গীয় কৃষি কলেজ" নামে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ছোটলাট বাহাদুর এই বিদ্যা-লয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পুনা বিধবাশ্রম—বোম্বায়ের পুনা সহরে এই বিধবাশ্রমের দিন দিন বেশ উন্নতি হইতেছে, এবং জন সাধারণের বিশেষ সহানুভূতিতে ইহা উত্তরোত্তর উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। অনেক-গুলি সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলা এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিয়া এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিক্ষা ধর্ম্ম ও সেবাব্রতে বিধবারা শিক্ষিত হইয়া

সমাজের উপকার সাধন করিতে পারেন ইহাই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই আশ্রমের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং ভারতে এইরূপ আশ্রমের বহুল প্রচার আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

স্মৃতি সভা—স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে গত ২০শে আগষ্ট কলিকাতা সিটী কলেজ হলে তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে সেই মহাত্মার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা করেন।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর—সিমলার চিত্রপ্রদর্শনীতে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সূর্য্যাস্ত নামে একখানি চিত্র প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিয়াছেন।

শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যা—বাঙ্গলা ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র বি, এ, ও কুমারী ফৈজী বি, এ, নাম্নী দুইটী মহিলা শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কুমারী ফৈজী কিছুদিন পরেই ভারতে প্রত্যাগমন করেন। সম্প্রতি শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র বিলাত হইতে শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বেথুন কলেজে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, ভবিষ্যতে তিনি তাহার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন।

সৈন্যসংগ্রহ—সম্প্রতি আফগানিস্থানের আমীর নিয়ম করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে প্রত্যেক আট জনের মধ্যে একজন প্রজাকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে হইবে। এই প্রথায় সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে এবং সৈন্য সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে।

তুরস্কের নূতন শাসনপ্রণালী—তুরস্কের সুলতান সম্প্রতি তাঁহার সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপনের আয়োজন করিতেছেন, এই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট।

ভক্তকবি তুলসীদাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—তুলসীদাস কাশীধামে একটী সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে আর একবার ঘটিয়াছিল। তাঁহার অযোধ্যায় বাসকালে কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের একমাত্র শিশু-সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মৃতশিশুকে লইয়া রোদন করিতে

করিতে তুলসীর পদতলে গিয়া পতিত হইলেন, এবং হৃদয়ভেদী করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে ঠাকুর! হে দয়াময়! দয়া করুন—দয়া করুন! এই শিশুকে জীবিত করুন, নহিলে স্ত্রীপুরুষে আমরা প্রাণত্যাগ করিব। তুলসী সেই মৃত শিশুর মস্তকে করস্পর্শ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শিশু আস্তে আস্তে নেত্র উন্মীলন করিল। তুলসী স্নেহভরে শিশুকে লইয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন, বলিলেন,—"তোমাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের ঐকান্তিকতার প্রভাবে এই শিশু প্রাণ পাইল। প্রাণান্তেও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ কৃপাসিন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।"

এই মৃতসঞ্জবনী শক্তি কি মানবের? না ঈশ্বরের? মানবেরই বল, বা ঈশ্বরেরই বল, একই কথা। ঈশ্বর মানবকে যেমন আধিভৌতিক উপাদানে, তেমনি আধ্যাত্মিক উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হৃদয়াধিষ্ঠিত সেই শক্তিকলা বা সচ্চিদংশকে (১) মানব নিজ সাধনাদ্বারা অসীম শক্তিতে পরিণত করিতে পারে। যেমন কণামাত্র অগ্নিকে ব্যজন বা ভস্ত্রাদিদ্বারা দিগ্‌দাহী মহাগ্নিরূপে পরিণত করা যায়, তেমনি অন্তর্নিহিত শক্তিকলাকে সাধনা দ্বারা বিরাট্ শক্তিতে পরিণত করা যায়। মানবের কল্যাণী ভাবনার সহিত ব্রহ্মশক্তির সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। মেঘাবরণে সূর্য্যের ন্যায়, রাজসিক ও তামসিক ভাবের আবরণে মানবাত্মার ঐশী শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। যাবৎ ঐ আবরণ অপসৃত না হয়, তাবৎ ব্রহ্মশক্তির বিকাস হয় না। ঈশ্বর দূরে সমীপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিলেও, অশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যীশুখৃষ্ট সত্যই বলিয়াছেন;—"Blessed are the pure in heart; for they shall see God."—অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, তাঁহারাই ধন্য, কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী। শঙ্করাচার্য্য বলেন;—

"পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েংহং—
শুমানিব॥"

—অর্থাৎ, ঐশীশক্তি মানবাত্মায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, তাহা মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ সত্বের আবির্ভাবে আত্মা, স্বপ্রকাশ-আনন্দময়-চিন্ময় ভাব ধারণ করে। তখন সে আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে সহোদর ভাই, উভয়েই তুল্যগুণ ও তুল্যপ্রভাব। তখন সে আত্মার নিকট অসাধ্য বা অসম্ভব কি আছে? তখন সে আত্মা সমস্ত বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত। তখন তাহার সর্ব্বত্র অবাধ গতি, তাহার প্রভাব সর্ব্বঙ্কষ, এবং তাহার সিদ্ধি সর্ব্বতোমুখী। যতক্ষণ জীবের লেশমাত্র ভববন্ধন থাকিবে, যতক্ষণ "সোঽহং"-ভাবে সে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমাহিত না হইবে,

(১) শঙ্করাচার্য্য মানবাত্মার এই শক্তিকলাকে "সচ্চিদংশ" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন;—

"আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্।
সংযোজ্য বাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে॥"

ততক্ষণ সে জীবন্মুক্ত হইবে না। দেখ! প্রহ্লাদ পিতার আদেশে কঠিন নাগপাশে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, তাঁহার উপর অগণিত শিলা-শৈলাদি স্তূপে স্তূপে নিক্ষিপ্ত হইল।

অতল সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত, তদুপরি অসংখ্য পর্ব্বতরাশির সহস্রযোজনব্যাপী সুবিশাল স্তূপ। তন্মধ্যে থাকিয়াও প্রহ্লাদ, আহ্নিক বেলা উপস্থিত হইয়াছে, জানিতে পারিলেন। তখন একাগ্রহৃদয়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম স্তবগুলি, "জীব ও ঈশ্বর"—এইরূপ দ্বৈতভাবে সম্পন্ন হইল। সে স্তবগুলি অতি উচ্চভাবের হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার নাগ পাশের বন্ধন ও পর্ব্বতস্তূপের আবরণ খসিল না। ক্রমশঃ তাঁহার স্তব উচ্চে উঠিল, আরো উচ্চে—আরো উচ্চে—আরো উচ্চে উঠিল। শেষে যখন চরম সীমা স্পর্শ করিল, জীব ও ঈশ্বর—এ দ্বৈতভাব একেবারে ঘুচিয়া গেল, তখন বলিতে লাগিলেন ;—

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ
পুমান্॥"

অর্থাৎ, সেই আমি এখন সর্ব্বব্যাপী। অনন্তে পরিণত হইলাম। আমা হইতে সকলি, আমি সকলি, আমাতেই সকলি ; আমিই নিত্য, অক্ষয়, অনন্ত, পরমাত্মা। আদিতে আমিই ব্রহ্ম, অন্তে আমিই পরমপুরুষ। এইরূপে যখন তাঁহার আত্মায় ও পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান হইল, তিনি একেবারেই আত্মবিস্মৃত হইলেন, অদ্বৈত ভাবনাযোগে ব্রহ্মময় হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার নাগপাশসকল আপনা হইতেই স্খলিত হইল। সমস্ত জলচর সহ সেই মহাসিন্ধু বিক্ষোভিত হইল। গিরি-নদী-কাননাদি-সহ বসুন্ধরা বিচলিত হইল। দৈত্যগণ-নিক্ষিপ্ত সুবিশাল শৈলরাশিকে তৃণকণার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন।

শুদ্ধসত্ব পরম যোগীরা যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহা প্রাকৃত মানবের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত হইলেও, তাহা অখণ্ড সত্য। তুমি আমি বুঝিতে পারি না বলিয়া কি সত্যের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইবে? পরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলকে আমার চক্ষু ধারণা করিতে পারে না বলিয়া কি সৌরমণ্ডল সঙ্কুচিত হইবে? প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"পিতঃ! যাহার যাহার হৃদয়ে সেই সর্ব্বশক্তিমানের আবির্ভাব, তাহার তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে।" এই প্রহ্লাদ-বাক্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অব্যভিচারী সত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পবিত্রাত্মা সাধুরা নিরন্তর ঈশ্বরসাধনার ফলে অলৌকিকী শক্তি লাভ করিয়া অমানুষিক কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যায়। কয়েকটী ঘটনামাত্র এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। পারস্যসম্রাট্ নাদিরসাহের সৈন্যগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দিল্লীর সহস্র

সহস্র লোককে হত্যা করিল। অবশিষ্ট অধিবাসীদিগকেও তাহারা হত্যা করিত, কিন্তু একজন ফকির তাহাদিকে রক্ষা করিলেন। ফকির নাদিরসাহের নিকট গিয়া তাঁহার হস্তে একখানি দর্পণ দিয়া, তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। নাদিরসাহ সেই দর্পণমধ্যে দেখিলেন,—তাঁহার সমুদায় সৈন্য মস্তকবিহীন হইয়া তন্মধ্যে দণ্ডায়মান! ফকির বলিলেন,—"আপনি এই হত্যাকাণ্ড যদি এই মুহূর্ত্তে নিবারণ না করেন, তবে আপনার সৈন্যের ঠিক্ এই দশা ঘটিবে।" সাতিশয় ভীত হইয়া, নাদির তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিলেন।

কয়েক বৎসর গত হইল, অযোধ্যায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। একধামা লুচি ও এক হাঁড়ি মিঠাই সম্মুখে রাখিয়া তিনি সমাগত বহুসংখ্যক লোককে সেই খাদ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহা আকণ্ঠ ভোজন করিয়া সহস্র সহস্র লোক পরিতৃপ্ত হইল। দ্রৌপদীর কণামাত্র শাকান্নে সহস্র দুর্ব্বাসাশিষ্যের আকণ্ঠ ভোজন, অথবা যীশুর পাঁচখানি রুটি ও অত্যল্প মৎস্যের দ্বারা পাঁচ সহস্র লোকের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধন অলীক উপন্যাস নহে।

ইলাইজা নামক একজন য়িহুদি সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একদা 'গিন জবেফাথ নামক নগরে গমন করিয়া দেখিলেন,— এক দুঃখিনী বিধবা অতিকষ্টে সামান্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিধবাকে কহিলেন,—"আমাকে কিছু আহার প্রদান কর।" বিধবা উত্তর করিল,—"একটী কাষ্ঠপাত্রে কয়েক মুটা ময়দা ও এক মৃণ্ময়পাত্রে কয়েক ফোঁটা তৈল ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। কোথা হইতে আপনাকে আমি আহার প্রদান করিব।" সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,— "যাও, তোমার সেই কাষ্ঠ ও মৃণ্ময়পাত্র বহুদিন পর্য্যন্ত ময়দা ও তৈলে পূর্ণ থাকিবে।" তাহাই হইল। ময়দা ও তৈল বিক্রয় করিয়া বিধবার দুঃখ ঘুচিল। কিয়দ্দিন পরে সেই বিধবার একমাত্র পুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিধবা পুত্রের শবদেহ লইয়া সন্ন্যাসী ইলাইজার শয্যায় শায়িত করিয়া চলিয়া আসিল। ইলাইজা তাহা জানিতে পারিয়া, বালকের পুনর্জীবনের জন্য একান্তভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে বালক পুনরায় জীবন লাভ করিল।—"And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the Lord, and said :—O Lord, my God, I pray thee, let this child's soul come into him again."

"And the Lord heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into him again, and he rivived." (Holy Bible, I. Kings XVII., 21, 22.)

যীশুখৃষ্টের প্রধান শিষ্য পিটর একদা জেরুসেলমের মন্দিরে উপাসনা করিতে

যাইতেছিলেন। একজন পঙ্গু মন্দিরের দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিত। পিটারের নিকট সে ভিক্ষা চাহিল। পিটার বলিলেন,—আমার টাকাকড়ি নাই, কিন্তু তোমার জন্য আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। পঙ্গু জন্মাবধি চলিতে ফিরিতে পারে নাই, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল, এবং আনন্দে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল।

Then Peter said :—"Silver and gold have I none; but such as I have, give I thee : In the name of Jesus Chirst of Nazareth rise up and walk."

"And he took him by the right hand, and lifted him up ; and immediately his feet and ancle bones recieved strength."

"And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking and leaping, and praising God."

(New Testament, the Acts, III. 6, 7, 8.)

যীশুর তিরোধানের পর মহাত্মা পল্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎকালে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকারীরা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। পল্ অভিযুক্ত হইয়া জাহাজে করিয়া রোম-নগরে প্রেরিত হইলেন। ভূমধ্যসাগরে আসিয়া জাহাজ জলমগ্ন হইল। অতিকষ্টে নাবিক ও আরোহিগণ এক দ্বীপে গিয়া উঠিল। পল্ কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কাষ্ঠের ভিতর এক ভয়ানক বিষধর লুক্কায়িত ছিল। সর্প পল্‌কে দংশন করিল। সকলে মনে করিল, যে, পল্ অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। কিন্তু পল্ ঈশ্বরগতপ্রাণ, পরম ভক্ত, সর্পবিষে তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

অলৌকিক সাধুচরিত্রে এরূপ অলৌকিক ঘটনা সহস্র সহস্র উল্লেখ করা যায়। যে ভাবনাযোগের এতদূর শক্তি, যাহাদ্বারা অচিন্তনীয় অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পন্ন হয়, সে ভাবনাকে কল্যাণপথে নিয়োজিত করিলে জীবের অনন্ত উন্নতি এবং অসৎপথে নিয়োজিত করিলে, অনন্ত অবনতি অবশ্যম্ভাবী। মনের বিশুদ্ধিসাধনই মানবের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা। ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখ স্রোতকে অন্তর্মুখ করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী বিভূতির নিরন্তর ভাবনা ও তদনুরূপ আচরণ যতই করিবে, ততই ভাবসকল নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও উন্নত হইতে থাকিবে। উন্নতি বা অবনতি মনুষ্যের নিজের সাধ্যায়ত্ত। তুলসী বলিতেছেন ;—

"তুলসী যহ তনু খেত হৈ, মন বচ কর্ম্ম
কিসান।
পাপ পুণ্য দ্বৈ বীজ হৈং, ববৈ সো লহৈ
নিদান॥"

—এ শরীর ক্ষেত্রস্বরূপ, পাপ ও পুণ্য

বীজস্বরূপ ; মন, বাক্য ও কর্ম্ম—এ তিনটী কৃষক ; যে যেরূপ বীজ বপন ও পোষণ করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে।

"তুলসী যহ তনু তবা হৈ, তপত সদা ত্রয়তাপ।
শাংত হোহি জব শাংতিপদ, পাবৈ রাম-
প্রতাপ॥

—এ দেহ কটাহস্বরূপ, ত্রিতাপ-দহনে সদা দহ্যমান। যদি (সদ্গুরুসেবা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা) মনকে শান্তিপথে প্রবর্ত্তিত কর, তবে ভগবৎপ্রসাদে শান্তিলাভ করিবে।

"তুলসী মিটেন মোহতম কিএ কোটি
গুণগ্রাম।
হৃদয়-কমল ফুলৈ নহিং বিনু রবিকুলরবি-
রাম॥

—হে মানব! তুমি কোটি কোটি গুণগ্রামে বিভূষিত হও, তথাপি, যাবৎ তোমার হৃদয়ে সেই রবিকুলরবি ভগবান্ রামের (ঈশ্বরের) আবির্ভাব না হইবে, তাবৎ তোমার মোহান্ধকার ঘুচিবে না, তোমার হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হইবে না। মন শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত না হইলে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি না হইলে, মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, অসিদ্ধ মানবের ত্রিতাপ হইতে শান্তিলাভ কোথায়? ইহা বলিয়া তুলসী বলিতেছেন,—এ জগতে একমাত্র সাধু মহাত্মারাই শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তয়িতা, শান্তিরাজ্যে নেতা। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া কপট সাধুর কুহকে পড়িওনা, চন্দন-ভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিওনা। ইহা বলিয়া তিনি প্রকৃত সাধুর লক্ষণ জানাইতেছেন ;—

"সরল বর্ণ ভাষা সরল, সরল অর্থময় মানি।
তুলসী সরলে সংতজন, তাহি পরা পাই-
চাংনি॥

—যাঁহার বর্ণ সরল, ভাষা সরল, অর্থ সরল, ভাব সরল, সকলি সরল, তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিও।

"অতি শীতল অতিহী সুখদাঈ,
শম দম রামভজন অধিকাঈ।
জড় জীবনকো করৈ সচেতা,
জগমাহীং বিচরত যহি হেতা॥"

—যাঁহার স্বভাব অতি স্নিগ্ধ, অতি সুখদ, যিনি শান্ত, দান্ত, ভগবদ্ভজনে অধিকারী, যিনি জড় জীবনকে চৈতন্যময় করিয়া দেন এবং ঐ মঙ্গলময় উদ্দেশ্যেই জগতে বিচরণ করেন, তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিও।

"তুলসী ঐসে কহুঁ কহুঁ ধনি ধরণী বহু সংত।
পরকাজে পরমারথী, প্রীতি লিএ নিবহংত॥"

—এই রত্নাগর্ভা ধরণী এরূপ অনেক সাধুকে বক্ষে ধারণ করেন, যাঁহারা পরোপকারকে ও পরের প্রীতিবিধানকেই পরমার্থ জ্ঞান করেন।

"শত্রু ন কাহু করি গনৈ, মিত্র গনৈ নহিং
কাহি।
তুলসী যহ মত সংতকো, বোলৈ সমতা-
মাহিং॥"

—যাঁহাদের কাহারও উপর আপনার-পরজ্ঞান নাই, যাঁহারা আব্রহ্ম-কীটাণু সকলকে সমভাবে পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই সাধু ; কেননা, সমতাই সাধুলক্ষণ।

"অতি অনন্যগতি ইংদ্রিয়জীতা,
জাকো হরি বিনু কতহুঁন চীতা।
মৃগতৃষ্ণাসম জগ জিয় জানি;
তুলসী তাহি সংত পহিংচানী॥"

—যাঁহারা ইন্দ্রিয়জয়ী বীর, যাঁহাদের ঈশ্বর বিনা অন্য গতি নাই, যাঁহাদের চিত্ত ঈশ্বরাভিন্ন আর কোথাও যায় না, তুলসী বলিতেছেন,—তাঁহাদিগকেই সাধু বলিয়া চিনিও।

"সো জন জগত জহাজহৈ, জাকে রাগণ দোষ।
তুলসী তৃষ্ণা ত্যাগিকে, গহেউ শীল সংতোষ॥"

—যিনি রাগদ্বেষাদিদোষ-স্পর্শ-শূন্য, যিনি তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া শীল ও সন্তোষকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি জীবের ভবসিন্ধু পারের তরণী।

"শীলগহনি সবকী সহনি, কহনি হীয় মুখরাম।
তলসী রহিএ এহি রহনি, সংত জননকো কাম॥"

—স্বভাবে সর্ব্বসহিষ্ণুতা এবং হৃদয়ে ও বদনে সদাই ঈশ্বরের নাম, এইরূপ চরিত্রই অবলম্বনীয়, ইহাই সাধুশীলতা।

"কোমল বাণী সংতকো, শ্রবৈ অমৃতময় আয়।
তুলসী তাহি কঠোর মন সুনত মৌন হোই জায়॥"

—সাধুর মধুর বচন, কর্ণকুহরে অমৃত-ধারা ক্ষরণ করে, সে কথা শুনিলে অতি কঠিন মনও স্তম্ভিত হয়।

"অনুভব সুখ উতপতি করত, ভবভ্রম ধরৈ উঠায়।
ঐসী বাণী সংতকো জোউর ভেদৈ আয়॥"

—সাধুবাক্যের এরূপ মহিমা যে, তাহা ভ্রমজালকে বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি উৎপাদন করে, ভেদবুদ্ধিকে দূরীভূত করে।

"শীতলবাণী সংতকী, শশিহূতে অনুমান।
তলসী কোটি তপনি হরৈ, জো কোউ ধারৈ কান॥"

—সাধুবাণী শশাঙ্ক হইতেও সুশীতল; যে কেহ সেই বাণী কর্ণে ধারণ করে, তাহার কোটি তপনতাপ তিরোহিত হয়।

"পাপতাপ সব শূল নশাবৈ,
মোহ অংধ রবি বচন বহাবৈ।
তুলসী ঐসে সদ্‌গুরু সাধূ,
বেদমধ্যগুণবিদিত অগাধূ॥"

—সদ্‌গুরু সাধুর এমনি প্রভাব যে, তাঁহা দ্বারা সমস্ত পাপতাপ নিঃশেষিত হয়, মোহান্ধকারে রবিরশ্মিজাল উদ্ভাসিত হয়; তিনি অগাধ বেদসিন্ধু হইতে সাররত্ন উদ্ধার করেন।

"তন করি মন করি বচন করি কাহূ দূষত নাহিং।
তুলসী ঐসে সংত জন রামরূপ জগমাহিং॥"

—যাঁহারা কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট করেন না, সমভাবে সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করেন, তাঁহারা এ জগতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।

"কংচন কাঁচহি সমগনৈ. কামিনি কাঠ পষাণ।
তুলসী ঐসে সংতজন, প্রথিবী ব্রহ্ম সমান॥"

—যাঁহার কাচে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, কামিনীতে ও কাষ্ঠ-পাষাণে সমজ্ঞান, এরূপ সাধুব্যক্তি ধরাধামে ব্রহ্মতুল্য।

নিষ্কিঞ্চন ইন্দ্রিয়দমন, রমণ রাম একতার।
তুলসী ঐসে সংতজন বিরলে যা সংসার॥"

—যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, অকিঞ্চন, ভূমানন্দের সহিত যাঁহার আত্মা একীভূত হইয়া গিয়াছে, এরূপ সাধু জগতে বিরল।

আর কত উদ্ধৃত করিব? তুলসীর ভক্তিরসের কবিতা উদ্ধৃত করিতে গেলে. "বাঁশবনে ডোমকাণা" হইতে হয়। কোনটী রাখিয়া কোনটী তুলিব ভাবিয়া পাই না। এ প্রেমভক্তির অবতার—এ অপূর্ব্ব কবিত্বের আধার যে দেশে যে যুগে আবির্ভূত হন, সে দেশ ও সেই যুগ ধন্য!

যে মহাত্মা সেই প্রেমসিন্ধুকে আত্মায় ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মহাপ্রেমে দ্রবীভূত হইয়া সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহার চক্ষে রাক্ষস পিশাচ-ভূত, হিংস্র শ্বাপদ. কালসর্প. কৃমিকীট, কীটাণু, কেহই উপেক্ষার পাত্র নহে। তাঁহার নিকট সকলি ব্রহ্মময়, মহাশূন্য ও পূর্ণানন্দময়। মরুভূমির প্রতপ্ত বালুকারাশির মধ্যেও তিনি বিরাট ব্রহ্মের করুণারাশি বিকীর্ণ দেখিতে পান, শবকঙ্কালসমাকীর্ণ ঘোর শ্মশানেও তিনি বিশ্বপতির অপার-করুণা-চিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তিভরে মস্তক নত করেন। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তাঁহার নিকট সকলি আনন্দময়, সকলি অমৃতময়. সকলি মধুর, সকলি সুন্দর।

অন্যান্য কবি বা গ্রন্থকার, নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিজ ইষ্টদেবের স্তুতি ও প্রণতি করিয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক তুলসীদাস নিজ কাব্যের মঙ্গলাচরণে, ব্রহ্ম হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতমণ্ডলের স্তুতি ও প্রণতি করিয়াছেন, কেননা, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুর নিকট ইতর-বিশেষ নাই, সকলি সমান, সকলি ব্রহ্মময়। এস্থলে তদীয় রামায়ণের মঙ্গলাচরণ হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল;—

"জড় চেতন জগ জীব যুত, সকল রামময় জানি।
বন্দোং সবকে পদকমল, সদা জোরি যুগপানি॥
দেব দনুজ নর নাগ খগ, প্রেত পিতর গন্ধর্ব্ব।
বন্দোং কিন্নর রজনিচর, কৃপা করহু অব সর্ব্ব॥
আকর চারিলাখ চৌরাসী জাতজীব নভজলথলবাসী।
সীয় রামময় সব জগ জানি. করৌং প্রণাম সপ্রেম সুবাণী॥
জান কৃপাকর কিঙ্কর মোহু, সব মিল করহু ছাঁড়ি ছল ছোহু।
নিজ বলবুদ্ধি ভরোস মোহি নাহি. তাতে বিনয় করহুং সব পাহীং॥"

—যত জীব আছে ভবে জড় বা চেতন,
সকলি তো রামময় করি দরশন;

কৃতাঞ্জলিপুটে তাই চরণে সবার,
অদ্বৈত ভকতিভরে করি নমস্কার।
সুরাসুর, নাগ, নর, ভূচর, খেচর,
পিতৃ-মাতৃ প্রেতলোক, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর;
রাক্ষস, পিশাচ, ভূত প্রণমি সবারে,
সকলেই কৃপাদৃষ্টি করুন আমারে।
চারিটী যোনিতে সৃষ্ট যত জীবগণ,
যাদের চৌরাশীলক্ষ ভেদের গণন; (১)
জলে স্থলে নভস্তলে যে যেখানে রয়,
হেরিতেছি সবি আমি সীতারামময়;
যুক্ত করে নতশিরে সবারি চরণে,
নমি আমি বারবার প্রেমপূর্ণ মনে।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে সকলে মিলিয়া,
দয়া কর মোর প্রতি কপট ছাড়িয়া;
নাহি বল, নাহি বুদ্ধি, ভরসা আমার,
তাই মম এ মিনতি চরণে সবার।

(ক্রমশঃ।)

(১) হিন্দুশাস্ত্র মতে চারি যোনিতে উৎপন্ন চৌরাশী লক্ষ প্রকার জীব জলে, স্থলে ও আকাশে বাস করে। চারি যোনিতে উৎপন্ন যথা;— স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে স্থাবর ৩০ লক্ষ প্রকার; জঙ্গম-মধ্যে জলচর ৯ লক্ষ প্রকার; কৃমিজ ১০ লক্ষ প্রকার; অণ্ডজ ১১ লক্ষ প্রকার; পশু ২০ লক্ষ প্রকার; মানব ৪ লক্ষ প্রকার। ৩০+৯+১০+১১+২০+৪= ৮৪ লক্ষ প্রকার।

আর্য্যদিগের রন্ধনপাত্র ও ভোজনপাত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লৌহনির্ম্মিত পাকপাত্র বিধবাদিগের পক্ষে ব্যবহার নাই। অপরের পক্ষে লৌহ-পাত্রে পাক করা অপেক্ষা উহাতে ভোজন করা অত্যধিক নিষেধ। এক্ষণে বিদেশীয় সংস্রবে ষ্টীলের বাসনে ভোজনাদির ব্যবহার হইতেছে, কলাই করা মৃণ্ময় ভোজনপাত্রও প্রকারান্তরে চলিতেছে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে ঐ সকল নিষিদ্ধ পাত্রে ভোজনে যে অনিষ্ট হইতেছে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। বাঙ্গালীরা চিররুগ্ন কেন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্রোক্ত রন্ধনভোজনাদির ব্যতিক্রমে রোগোৎপত্তি হয়, যদি ইহা কাহারও মনে হয়, তাহা হইলে ইহাও মনে করা উচিত যে, নিষিদ্ধ ভোজনপাত্রাদিও ত্যাগার্হ। হিন্দুসমাজে তাম্রপাত্রে পাক করিবার রীতি এখন পর্য্যন্তও হয় নাই বলিয়া আমার জানা আছে। কলাইকরাতাম্রপাত্রে পাক করার রীতি যবন ম্লেচ্ছাদির মধ্যেই প্রচলিত আছে। কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, তাম্রপাত্রে তুতিয়ার অংশ আছে। দৈবাৎ কলাইকরা তাম্রপাত্রের কলাই উঠিয়া গেলে উহাতে পাককরা অন্ন খাইলে বমন ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। তাম্রে বিষাক্ত আরও অনেক পদার্থ আছে, ইহা জানিয়া হিন্দুগণ তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান করেন না, এবং উহাতে রন্ধন ভোজনাদিও বর্জ্জন করেন।

রন্ধন করা হইলে সেই রন্ধিত পদার্থ কোন্ কোন্ পাত্রে রাখিবে, তাহারও প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্তং স্বপাত্রকে স্থাপ্যং ন স্থাপ্যং পাত্রকান্তরে।
ঘৃতং কাষ্ঠারসে স্থাপ্যং মাংসং মাংসভবং রসম্॥
স্থাপয়েদ্রাজতে হৈমে পাত্রে লৌহেঽন্যকাষ্ঠজে।
পত্রাদি ষড়্বিধং শাকং স্থাপ্যং কাষ্ঠাশ্মলৌহজে॥
পক্কান্নং পিষ্টকং ভক্ষ্যং স্থাপ্যং কাংস্যেঽন্যদারুজে।
ধারয়েচ্চ সদা ক্ষীরং পার্থিবে বাঽন্যকাষ্ঠজে॥
পানীয়ং পায়সং তক্রং মৃণ্ময়েষ্বেব ধারয়েৎ।
উক্তপাত্রান্তরে স্থাপ্যং যদ্ দ্রব্যং তদ্রুজাপহম্।
সর্ব্বদা সুখদং হৃদ্যমন্যথা দোষকারকম্॥
(পাকরাজেশ্বরঃ।)

অনুবাদ। যে পাত্রে ভাত পাক করা হয়, সেই পাত্রেই উহা রাখিবে, অন্য পাত্রে উহা স্থাপনযোগ্য নহে। কাষ্ঠপাত্রে ও লৌহপাত্রে ঘৃত রাখিবে। মাংস ও মাংসভবরস অর্থাৎ মাংসের ঝোল প্রভৃতি রৌপ্য, স্বর্ণ, লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। পত্র প্রভৃতি ছয় প্রকার শাক, হয় কাষ্ঠপাত্রে নয় প্রস্তরপাত্রে কিম্বা লৌহপাত্রে রাখিবে। মৃণ্ময়পাত্রে বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে দুগ্ধ রাখিবে। জল, পায়স ও ঘোল মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রেই রাখিবে। এইরূপে উল্লিখিত পদার্থ সকল উল্লিখিত পাত্রে রাখিলেই উহা রোগনাশক হইয়া থাকে, খাইতেও ভাল স্বাদ লাগে, সুতরাং মনের মত খাদ্য হয়। আর যদি উল্লিখিত পাত্রে রাখা না যায়, তাহা হইলে সেই খাদ্য দোষজনক হইয়া থাকে।

হিন্দুগণ রন্ধনবিজ্ঞান এতই ভাল বাসিতেন যে, উহার কোন প্রকার আলোচনা হইতেই বিরত হন নাই। নতুবা ভোজনদ্রব্য সকল পদার্থবিশেষে স্থাপন বশতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষে যে উপকার বা অপকারজনক হয়, তাহা কখন অনুসন্ধান করিতেন না। তাই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, রন্ধননিষ্পন্নপদার্থ উত্তম হইলেও পাত্রান্তরে স্থাপনের দোষে উহা অনুপকারী হইতে পারে, অতএব কখন যেন কেহ ঐ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম না করেন।

কলিযুগে ভোজনপাত্রের নির্ণয় নাই। লোক সকল নানাস্থানে নানা অবস্থায় পড়িয়া ঐ নিয়ম স্থির রাখিতে পারিবে না বলিয়াই হয় ত ঐরূপ নিয়ম নাই। কিন্তু নিয়ম থাকা যে উচিত নয়, ইহা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ধাতুপাত্রে, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে ও প্রস্তর পাত্রে ভোজন করিবার রীতি আছে। তাহাদের দোষগুণ নানাস্থানে নানা ভাবে বর্ণিত থাকিলেও কতকগুলি ভোজনপাত্রের দোষগুণ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

দোষহৃদ্দৃষ্টিদং পথ্যং হৈমং ভোজনভাজ-
নম্।
রৌপ্যং ভবতি চক্ষুষ্যং পিত্তঘ্নং কফবাত-
কৃৎ॥
পৈত্তলং বাতকৃদ্রুক্ষমুষ্ণং কৃমিকফপ্রণুৎ।
কাংস্যং বুদ্ধিপ্রদং রুচ্যং রক্তপিত্তপ্রসাদ-
নম্॥

(ভাব প্রকাশঃ।)

স্বর্ণময় ভোজনপাত্র সর্ব্বদোষনাশক, দৃষ্টিশক্তিদায়ক ও হিতকর। রৌপ্যময় ভোজনপাত্র চক্ষুর হিতকর, পিত্তনাশক ও কফবাতকৃৎ। পিত্তলময় ভোজনপাত্র বাতজনক, রুক্ষ, উষ্ণ ও কৃমিকফনাশক। কাংস্য ভোজনপাত্র বুদ্ধিপ্রদ, রুচিজনক ও রক্তপিত্তপ্রসাদন।

পদ্মপত্রে ভবেৎ পুষ্টির্হবিষ্যাশীতু পুণ্যবান্।
ক্ষয়ী ভবতি তাম্রে চ কাচপাত্রে দরিদ্রতা॥
তূতপত্রে ভবেদায়ুঃ কদলে কীর্ত্তিমাপ্নুয়াৎ।
মধুপাত্রে চ রোগঃ স্যাদ্বটপত্রে তু বৈষ্ণবঃ॥
শালপত্রে ভবেৎ কামী পনসে চৈব স্বর্গতিঃ॥

মৎস্যসূক্তং মহাতন্ত্রম্।

অনুবাদ। পদ্মপত্রে ভোজন করিলে পুষ্টিলাভ হয়, বিশেষতঃ যদি কেহ উহাতে হবিষ্য ভোজন করেন, তিনি পুণ্যবান্। তাম্রপাত্রে ভক্ষণ করিলে ক্ষয়রোগ জন্মে ও কাচপাত্রে খাইলে পরিণামে দরিদ্রতা জন্মে। তূতপত্রে ভক্ষণ করিলে লোক-বিশেষে আয়ুলাভ হয় ও কদলীপত্রে ভক্ষণ করিলে কীর্ত্তিলাভ হয়, অর্থাৎ উহাতে কোন নিন্দা নাই। মধুপত্রে আহার করিলে রোগ জন্মে, বটপত্রে আহার করিলে ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়। শালপত্রে ভক্ষণ করিলে কামী ও পনসপত্রে ভক্ষণ করিলে স্বর্গলাভ হয়।

উল্লিখিত শ্লোকে যে দরিদ্রতা জন্মে, কীর্ত্তিলাভ হয়, বৈষ্ণব হয়, স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি লিখিত আছে, ইহাতে উক্ত ভোজনপাত্র সকলের দোষ ও গুণই যে ঐরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শাস্ত্রীয় বিধি সকলের পক্ষে যুক্তি অনুসন্ধানদ্বারা গুণাগুণ প্রমাণ করা আমার ন্যায় অজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। উক্ত ভোজন-পাত্রাদির নিয়ম সম্বন্ধে বহু প্রমাণ শ্লোক আছে। ঐ সকল সংগ্রহদ্বারা প্রস্তাববাহুল্য করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে অতিরিক্ত বিরক্ত না করাই সঙ্গত মনে করি।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

রমণী-রত্নমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে ব্যক্তি প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, যে চুরি করিয়া আপন প্রাণরক্ষা করে, ক্ষত্রিয়েরা তাহাকে চৌর ও কুলাঙ্গার বলে। যুদ্ধে বিজয়ী হউক বা বিজিত হউক, হত হউক বা জীবিত থাকুক, প্রাণপণে পরাক্রম প্রকাশ করিলেই সে
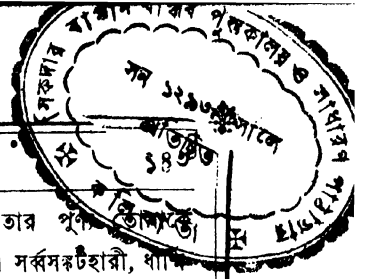
অশোচ্য হয়। উঠ! উঠ! এ বিষাদের সময় নহে; মহাতেজে উত্থিত হও, শস্ত্র ধারণ কর। যেন তোমাকে বিজয়ী হইয়া আসিতে দেখি, অথবা রণক্ষেত্রে তোমার রক্তাক্ত শবদেহ দর্শন করি; এ উভয়ই আমার তুল্য প্রীতিকর জানিও। পুরুষের জীবন ও মরণ ধর্ম্মপালনের জন্য। একমাত্র ধর্ম্মের নিকট নত হইবে; বরং শতধা বিচূর্ণ হইবে, তথাপি অন্যের নিকট নত হইবে না, কোনও কার্য্যেই কাহারও পশ্চাদ্‌গামী হইবে না। এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই, প্রাণান্তেও কেহ দীনতা প্রকাশ করে নাই। হে ক্ষত্রিয়কুমার! আর্ত্তত্রাণ ও স্বদেশরক্ষা এই মহাব্রত পালনের জন্য, তুমি শপথপূর্ব্বক অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছ, তাহা কি বিস্মৃত হইলে? প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষত্রিয় সহস্র মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করে। আমি কি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই? তোমার বীরসিংহ পিতার রক্ত কি তোমার দেহে বিলুপ্ত হইল? আমাদের প্রাণাধিক প্রজারা শত্রুহস্তে নিপীড়িত, তাহাদের আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! আর তুমি কাপুরুষের ন্যায় নির্বেদ শয্যায় শয়ন করিয়াছ! ধিক্ তোমার মাতৃগর্ভে! তোমার পিতৃশোণিতে ধিক্!

পুত্র! প্রাণ দিয়া ধর্ম্মপালন কর, তোমার আত্মাকে ও বংশকে কলঙ্কপঙ্কে নিক্ষেপ করিও না। উত্থিত হও! জাগরিত হও! শস্ত্র ধারণ কর; মাতার আশীর্ব্বাদ ও পিতার পুণ্য তোমাকে সঙ্কটে রক্ষা করুক। সর্ব্বসঙ্কটহারী, ধার্ম্মিকের সহায় মধুসূদন তোমাকে সিদ্ধি দান করুন।”

মনস্বিনী জননীর অমূল্য উপদেশে ও উৎসাহে পুত্র উত্থিত হইলেন। ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মাতঃ! আমি এ বিষাদশয্যা পরিত্যাগ করিলাম। আপনার তেজঃপূর্ণ উৎসাহবাক্যে আমার হৃদয় বজ্রবৎ কঠিন হইয়াছে, এই আমি আপনার চরণ ও কৃপাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি,—হয় শত্রুনিপাত করিয়া ফিরিব, না হয় রণযজ্ঞে জীবন আহুতি দিব। কিন্তু মাতঃ! আমরা হৃতরাজ্য, নির্ব্বাসিত, সহায়-সাধন-শূন্য, আমাদের ধন-রত্ন-রাজকোষ সকলি লুণ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা জীবিকার অভাবে অবসন্ন। প্রবল শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধার করা, তদুপযুক্ত অর্থ ও লোকবল বিনা কিরূপে সম্ভবে? এ জগতে নির্ধনের কেহই সহায় নাই। বিদুলা কহিলেন,—বৎস! আমার স্বর্গীয় পতিদেবের আমি সর্ব্বেশ্বরী ছিলাম। আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া তিনি কোনও কার্য্য করিতেন না। সমস্ত রাজকোষ ও ব্যয়ভার আমার হস্তে ছিল। কাহারও ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতীকার জন্য আমি গোপনে ধনসঞ্চয় করিয়াছি। তোমার অজ্ঞাত সে অসীম ধনরাশি অতি গূঢ় স্থানে রক্ষিত আছে। আমার জন্য প্রাণদানে উদ্যত, সর্ব্বদুঃখসহিষ্ণু সহস্র

সহস্র বীরপুরুষ নানা স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছে। তাহারা ছদ্মবেশে ও নানা ব্যপদেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এক্ষণে আমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে। ফলতঃ সেই মহাপ্রভাবা বিদুষীর অদ্ভুত নীতি-কৌশলে তৎপুত্র অচিরাৎ হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। (১)

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

পুরা নৃপর্ষের্জনকস্য যজ্ঞে
সমাগতা ব্রহ্মবিদো মুনীন্দ্রাঃ।
অধ্যাত্মবাদেষু শশাক কোঽপি
ন যাজ্ঞবল্ক্যস্য পুরোঽপি গন্তুম্॥

—রাজর্ষি-জনক-যজ্ঞে হ'য়ে নিমন্ত্রিত,
ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ হৈল সম্মিলিত;
সুদুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব করিতে বিচার,
যাজ্ঞবল্ক্য-সম্মুখে যাইতে সাধ্য কার?

গার্গী বচক্নোস্তনয়া মহর্ষেঃ
ব্রহ্মানলস্যেব শিখা জ্বলন্তী।
বিস্মাপয়ন্তী সকলান্ সভাস্থান্
বেদান্তবাদান্ সহ তেন চক্রে॥

—বচক্নু মুনির কন্যা গার্গী ভগবতী,
জ্বলন্ত ব্রহ্মাগ্নিশিখা যেন মূর্ত্তিমতী,
সতেজে সভায় আসি' বসিয়া আসনে,
বিচার করিলা বালা যাজ্ঞবল্ক্য-সনে।

প্রশ্নোত্তরৈস্তত্র তয়োঃ সভায়াং
যাস্যাত্মতত্ত্বানি বিঘোষিতানি।
জয়ন্তি তান্যেব চিরং ভবেঽস্মিন্
বিজিত্য লোকত্রয়ভূতিসারম্

—সে নারীর অলৌকিক জ্ঞানপ্রতিভায়—
চমকিত মুগ্ধ সবে হইল সভায়;
যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী উভয়ের সে বিচার—
প্রশ্নোত্তররূপে ভবে হইল প্রচার।

মিথিলার অধীশ্বর রাজর্ষি জনক একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নানাদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সভামণ্ডপে এক সহস্র পয়স্বিনী ধেনু আনয়ন করেন। প্রত্যেক ধেনুর শৃঙ্গে আড়াই সের করিয়া স্বর্ণ নিবদ্ধ ছিল। রাজর্ষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—এ সভায় ব্রহ্মবিদ্যাবিচারে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনি এই স্বর্ণযুক্ত সহস্র গোধন পুরস্কার পাইবেন। পরাভবভয়ে সভাস্থ কেহই যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য সে সকল গোধন স্বয়ং গ্রহণ করায়, তত্রত্য প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্রমে সকলেই পরাস্ত হওয়ায়, আর কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হইলেন না। অনন্তর বচক্নু মুনির কন্যা তেজস্বিনী গার্গীদেবী যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে গিয়া, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক নিগূঢ়তম তত্ত্বসকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উভয়ের বিচার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্যময় যজ্ঞক্ষেত্রে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিচারে যে সকল অমূল্য আধ্যা

---

(১) বিস্তৃত বিবরণ, মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, বিদুলার পুত্রানুশাসন, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ অধ্যায় দেখ।

ত্মিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা গুরু-পরম্পরায়, উপনিষদের সাররত্নরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (১)

মদালসা।

অধ্যাত্মতত্ত্বং যত্নদাজহার
সুতোপদেশেষু মদালসা সা।
যোগীশ্বরাণামপি তন্মুনীনাং
পদে পদে বিস্ময়মাতনোতি॥

—মদালসা স্বপুত্রের হরিতে অজ্ঞান,
যে গভীর আত্মতত্ত্ব করিল ব্যাখ্যান,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র তাহা করিয়া শ্রবণ
পদে পদে হন সবে বিস্ময়ে মগন।

অশেষকর্ত্তব্যবিধীন্ নরাণাং
বিশ্বেষু জীবেষু চ বিশ্বনাথে।
বিজ্ঞায় তস্যাস্তনয়ঃ স্বমাতুঃ
পুণ্যৈরলর্কোঽমরতাং প্রপেদে॥

—অশেষ জীবের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি
সমস্ত কর্ত্তব্য সুতে শিখাইল সতী;
অলর্ক মাতার সেই উপদেশ-বলে
অক্ষয় অতুল কীর্ত্তি রাখিল ভূতলে।

দিব্যপ্রভাবা মদালসা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা। শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ, দুর্জ্জয় দানবগণকে জয় করিয়া মদালসার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নারী অনন্ত জ্ঞানের আধার ছিলেন। মদালসা অলর্কনামক নিজ পুত্রের শিক্ষা-কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল যাবৎ পুত্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া তাঁহাকে যে সকল অমূল্য জ্ঞানরত্ন দান করিয়াছিলেন, তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকল উপদেশ পাঠ করিলে, তাঁহাকে বিরাট্ ধর্ম্মের অবতার বলিয়া জ্ঞান হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ মদালসা-চরিত্র সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভারতীয় ঋষিগণকর্ত্তৃক মদালসার উপদেশ বেদবাক্যের ন্যায় আদৃত। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২০ অধ্যায় হইতে ৩৬ অধ্যায় দেখ।)

সাবিত্রী।

সাবিত্রী জিতসূর্য্যদীপ্তমহসা—
জাজ্বল্যমানা সতী
পাতিব্রত্যতপোময়ী ভগবতো—
মূর্ত্তা বিভূতির্ভুবি।
ভর্ত্তারং বিকরালকালকবলাৎ—
প্রত্যাহরন্ত্যা যয়া
ত্রৈলোক্যং চ কুলত্রয়ং চ যুগপৎ—
পুণ্যৌজসা পাবিতম্॥

—উদিল সে সতীমূর্ত্তি সাবিত্রী ধরায়,
ভাস্কর নিষ্প্রভ যার তেজের প্রভায়;
সতীত্ব-তপস্যা বিদ্যা-প্রভাবের সার
সাবিত্রী-আকারে যেন সৃষ্ট বিধাতার;
করাল কালের গ্রাসে নিপতিত পতি,
কৃতান্তে জিনিয়া তারে উদ্ধারিল সতী;
পুণ্যময় সুধাময় সাবিত্রী-চরিত্র
ত্রিভুবন, তিন কুল করিল পবিত্র।

---

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়, ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ দেখ।

সিদ্ধশবরী শ্রমণা।

চণ্ডালকন্যা শ্রমণৈব ধন্যা
যাঽদ্বৈতভক্ত্যা রঘুনাথপাদে।
লব্ধ্বা মহামন্ত্রমৃষীন্ নিষেব্য
সিদ্ধিং প্রপেদে পরমাত্মযোগে॥

—ধন্যা সে চণ্ডালকন্যা শ্রমণা ভুবনে,
একান্ত ভকতি যার শ্রীরাম চরণে;
লভিয়া যে মহামন্ত্র মহর্ষি-সেবায়,
ব্রহ্মযোগে মহাসিদ্ধি লভিল ত্বরায়।

মূঢ়াঽবলা হীনকুলেঽপি জাতা
সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ শ্রমণা বিহীনা।
পরাৎপরে শাশ্বতভক্তিযোগাৎ
ব্রহ্মর্ষিমৃগ্যং পদমাশু লেভে॥

—শ্রমণা অবলা, মূঢ়া, জন্ম হীন কুলে,
তার প্রতি কেহ না চাহিত মুখ তুলে;
পরাৎপরে ছিল তার শাশ্বতী ভকতি,
ব্রহ্মর্ষিবাঞ্ছিত পদ লভিল মুকতি।

স্ত্রীত্বং চ পুংস্ত্বং বয় আশ্রমো বা
জাতিশ্চ বিদ্যা বিভবস্তপো বা।
দানং চ যজ্ঞো নহি সিদ্ধিহেতুঃ
ভক্ত্যৈব লভ্যা পরমার্থসিদ্ধিঃ॥

—পুরুষত্ব, স্ত্রীত্ব, জাতি, বিদ্যা, মান, ধন,
বয়স, আশ্রম, যজ্ঞ, তপস্যাচরণ,
দান, ধ্যান, ব্রত নহে ঈশ্বর-সাধন,
প্রাণের ভকতি দিলে মিলে সেই ধন।

কর্ণাটরাজমহিষী।

কর্ণাটরাজমহিষীব সরস্বতী সা
প্রজ্ঞাকবিত্ববিজিতাখিলসূরিবৃন্দা।
কর্ণাটভূপতিসভা বুধরত্নবৃন্দৈঃ
নক্ষত্ররাজিনিচিতা রজনীব রেজে॥

—কর্ণাটমহিষী ছিল রমণীর মণি,
অতুল পাণ্ডিত্য আর কবিত্বের খনি;
যার সনে সুধীগণ হারিয়া বিচারে,
মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বলিত তাহারে,
কর্ণাটনৃপতি-সভা বুধরত্নগণে
শোভিত শর্ব্বরী যথা নক্ষত্র-ভূষণে।

কর্ণাটের রাজা ও রাজ্ঞী, রাজসভা-পণ্ডিত বল্লনকবি এবং মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির বিষয়ে নানা কিম্বদন্তী ও শ্লোক প্রচলিত আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে উল্লিখিত হইল না। একদা কলিদাস আত্মগোপন করিয়া কর্ণাটরাজসভায় গিয়াছিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, কালিদাস আপনাকে কবি বলিয়া পরিচয় দিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া দাম্ভিকা কর্ণাটমহিষী মহাক্রোধে বলিলেন;—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাদ্—
বল্মীকতশ্চাপরঃ
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরব—
স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈ—
শ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং—
কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥

—এক কবি জন্ম যাঁর হইল নলিনে, (১)
অন্য কবি জন্ম যাঁর হইল পুলিনে, (২)

(১) 'নলিনে' অর্থাৎ ব্রহ্মার নাভিকমলে উৎপন্ন,—বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা।

(২) 'পুলিনে, অর্থাৎ নদীসৈকতে মৎস্যগন্ধার গর্ভে উৎপন্ন,—ব্যাসদেব।

অপর কবীন্দ্র যাঁর বল্মীকে উদ্ভব, (১)
আমার নমস্য তাঁরা ত্রিলোক-গৌরব;
আর যারা গদ্য পদ্য করিয়া রচন,
বেড়ায় লোকের চিত্ত করিয়া রঞ্জন,
কর্ণাটরাজের প্রিয়া আমি সে সবার,
শিরে এই বাম পদ স্থাপিনু আমার।

রাজা ও রাজ্ঞী শেষে কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বপ্রতিভার পরিচয় পাইয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কালিদাসকে সমস্ত সাম্রাজ্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বী কালিদাস সে দান প্রত্যাখ্যান করেন।

(ভারতসাম্রাজ্ঞী মহারাণী, ভিক্টোরিয়া।)

ভিক্টোরিয়া সকলমঙ্গলবাসভূমিঃ
মূর্ত্তেব ভূতকরুণা জগদীশ্বরস্য।
ব্যাপ্য স্থিতে নিখিলবিশ্বমসীমরাজ্যে
যস্যাঃ প্রয়াতি সবিতা ন কদাচিদস্তম্॥
স্বর্দুর্লভৈরপি ভবে বিভবৈর্বৃতাপি
ভোগক্ষমে বয়সি সত্যপি ভর্তৃহীনা।
নিষ্কামলোকহিতমাত্রমহাব্রতা যা
কালং নিনায় সুকৃতৈঃ শিবযোগিনীব॥
ভাষাং ন জাতিমপি বর্ণমপেক্ষমাণা
সর্ব্বেষ্বভিন্নহৃদয়া সমসৌম্যদৃষ্টিঃ।
ধর্ম্মাৎ পথোঽবিচলিতা ধ্রুবতারকেব
যাঽপালয়ৎ স্বতনয়ানিব সর্ব্বলোকান্॥
লোকোত্তরৈর্জগতি ধন্যমগণ্যপুণ্যৈঃ
যন্নাম সংস্মরত এব জনস্য সর্ব্বং
দূরং প্রয়াতি দুরিতং ননু ভারতীয়াঃ!
ভিক্টোরিয়াং স্মরত তামিব দেবতাং স্বাম্॥

(১) 'বল্মীকে উদ্ভব'—ভগবান্ বাল্মীকি।

—ভিক্টোরিয়া দয়ামূর্ত্তি বিশ্ববিধাতার,
একাধারে সর্ব্বসুমঙ্গলের আধার;
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যার সাম্রাজ্য অমিত,
দিবাকর যাহে নাহি হন অস্তমিত।
ত্রিদিব-দুর্লভ ভোগসুখের সাধন—
যদিও চৌদিকে তার ছিল অগণন;
যৌবনে হারায়ে পতি সতীকুলমণি,
শিবময়ী তপস্বিনী হইল তখনি;
নিষ্কাম বিশ্বের হিত করিয়া সাধন,
সতত সুকৃত-ধর্ম্মে যাপিল জীবন;
জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-বর্ণ না করি' বিচার,
সম সৌম্য দৃষ্টি তার উপরে সবার;
ধর্ম্মপথে অবিচলা ধ্রুবতারা প্রায়,
পালিলা সে পুত্রসম প্রজা সমুদায়;
অগণ্য সুপুণ্যে ধন্য ভুবন-পূজিত—
নাম যার স্মরিলেই পলায় দুরিত;
ইষ্টদেবী সমা সেই ভিক্টোরিয়া মার—
পুণ্য নাম স্মর নিত্য ভারতকুমার!

ভারতসাম্রাজ্ঞী, ইংলণ্ডেশ্বরী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া অতি পুণ্যবতী ছিলেন। প্রজাবাৎসল্য, দয়া ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে মহারাণী সর্ব্বত্র পূজিতা। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণা, দয়াবতী রমণী জগতে দুর্লভ। তাঁহাকে সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। অল্প বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিচারপতিগণ লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে, সেই আজ্ঞালিপি মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইত। মহারাণী

তাহার উপর স্বাক্ষর করিলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। একদা কোনও সৈনিক সেনাবিভাগের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল। সেই অপরাধে সেনাপতি তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। স্বাক্ষরের নিমিত্ত সেই কাগজ পত্র মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইলে, রাজমন্ত্রী তাহা মহারাণীর সম্মুখে রাখিয়া স্বাক্ষরের প্রার্থনা করিলেন। মহারাণীর হস্ত কম্পিত হইল ও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"এই হতভাগার হয় ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আছে, আমি তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারি না।" রাজমন্ত্রী অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন;—"এত দয়া করিলে, সুচারুরূপে রাজ্যশাসন হইবে না।" কিন্তু দয়াময়ী বালিকা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন;—"ঈশ্বর দয়াময়; আমি যদি তাঁহার জীবের প্রতি দয়া করি, তাহা হইলে, তিনিও আমার প্রতি দয়া করিবেন।" এই বলিয়া তিনি সেই আজ্ঞালিপির উপর লিখিয়া দিলেন;—"আমি এই লোককে ক্ষমা করিলাম।" দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার আজ্ঞায় সে হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা হইল।

ভিক্টোরিয়া দয়াগুণে কত শত তাপিতের অশ্রুমোচন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারকালে তদীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যে কত বিষয়ে কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি চরিত্র ও পুণ্যশীলতার আদর্শ। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবতী নারী আর দেখা যায় না। তাঁহার রাজত্বকালে বিজ্ঞানাদি অসংখ্য বিষয়ে এত নব নব আবিষ্কার হইয়াছে, মানবের জ্ঞাতব্য অশেষ বিষয়ে এত নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মানবজাতির এত সুবিধা, সুখ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে, যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালকে জগতের "বিজ্ঞানময় নবযুগ" বলা যায়।

অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, যে পৃথিবীতে যাঁহারা জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বড় হইয়াছেন, তাঁহারা বড় মায়ের সন্তান। সন্তানেরা প্রায়ই মাতৃগুণ অধিকার করে; এজন্য স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়। আমাদের সম্রাট্ এড্ওয়ার্ড তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া জননীর সমস্ত সদ্গুণ অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, ইহা তাঁহার আন্তরিক কামনা। যুদ্ধবিগ্রহে দেশ উৎসন্ন হয়, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সহস্র সহস্র পরিবার অনাথ হয়, কত শত লোক হস্তপদাদিবিহীন হইয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে, প্রভুত-অর্থরাশির ক্ষয় হয়। এই ঘোরতর অনিষ্টকর যুদ্ধবিগ্রহ যাহাতে পৃথিবীতে না ঘটে, আমাদের ধর্ম্মবীর সম্রাট্ এড্ওয়ার্ড সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নানা স্থানে গমন করিয়া, নানা দেশের রাজগণকে সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ করিতেছেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, দয়াময় বিধাতা, সম্রাট্ এড্ওয়ার্ডের এ মঙ্গলময়, বিশ্বজনীন সংকল্প পূর্ণ করুন। (ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিনোদিনী এক ধনী ব্যবহারজীবীর পত্নী। তিনি বিদুষী রমণী বলিয়া সকলের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহার স্বামীও তাঁহাকে বিদ্যাবতী বলিয়া আদর করিতেন. যদিও তিনি বিদ্যাবতী ছিলেন, তথাপি তাঁহার চরিত্রের একটু দুর্ব্বলতা ছিল। সংসারে কাহাকে ষোল আনা গুণসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, বিনোদিনাও এ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। অপরিসীম যশঃস্পৃহা তাঁহার হৃদয়রাজ্য ষোল আনা দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাই তিনি সর্ব্বদা লোকরঞ্জন করিবার জন্য যত ব্যতিব্যস্ত হইতেন, অন্য কিছুর জন্য তত ব্যগ্র হইতেন না। অনেক সময় লোকরঞ্জন মানসে কর্ত্তব্যপথ হইতে সরিয়া যাওয়াও অন্যায় মনে করিতেন না। তাঁহার স্বামী তাঁহার ক্রোড়ে এক অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া মর্ত্ত্যধামের লীলা সাঙ্গ করেন। পতিশোকে বিনোদিনী পাগলিনীর প্রায় হইলেন। কিছুতেই আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ আসক্তি নাই। প্রাণপ্রতিম সন্তানও তাঁহার সমীপে অনাদরের পাত্র হইয়াছে। স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হইতেছে. তিনি স্বামিবিচ্ছেদে সকল সুখের প্রতি উদাসীনা হইয়া ব্রহ্মচারিণী যোগিনী সাজিয়াছেন। তাঁহার জীবনে তাদৃশ যুগপ্রলয় ঘটিল বটে, কিন্তু চরিত্রের সেই দুর্ব্বলতা—সেই লোকপ্রশংসাপ্রিয়তা—বিদূরিত হইল না। শোক চিরদিন সমভাবে থাকে না। বিচ্ছেদের প্রারম্ভকালে শোক যে তীব্র বেগে হৃদয়রাজ্যকে আলোড়িত করিয়া থাকে, কালসহকারে সে বেগ থাকে না। যতই শোকতরঙ্গ প্রশমিত হইতে থাকে, ততই প্রকৃতিগত পূর্ব্বভাবসকল শিথিলতার সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে স্ব স্ব স্থান পুনরধিকার করিতে আরম্ভ করে। বিনোদিনীর পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল। এ দিকে নবকুমার শৈশবে পিতৃবিহীন হইয়াও আদরের সহিত লালিত পালিত হইতেছিল। বিনোদিনীর স্বামী—স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাই মৃত্যুকালে উইল করিয়া একমাত্র স্ত্রীকেই নাবালক পুত্রের সম্পত্তির অছি করিয়া যান। এদিকে বিনোদিনীর শোকাবেগ শিথিল হওয়াতে সন্তানবাৎসল্য সুযোগ পাইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। কিরূপে পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইবেন, তজ্জন্য বন্ধু বান্ধবদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদিনীর আত্মীয়-স্বগণের সংখ্যা যেরূপ অধিক ছিল, মিত্রসংখ্যাও তদনুরূপই ছিল। বিশেষতঃ ইঁহাদের প্রায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং কোন বিষয়েই ইঁহাদের সকলের ঐক্যমত্য হওয়া অসম্ভব ব্যাপার মধ্যে

পরিগণিত ছিল। একদিন বিনোদিনী তাঁহার পিশেমহাশয়কে সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রদান জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিশে মহাশয় কিছু সংস্কৃতশাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রতি ঔদাসীন্যই ভারতবর্ষের যত দুর্গতির মূল। সুতরাং তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসল জ্ঞানী লোক নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে না করিলে, ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। তিনি ভাবিলেন, বিনোদিনীর স্বামী যে অগাধ বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার পুত্র অনায়াসে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিবে। জীবিকানির্ব্বাহজন্য তাহার অর্থকরী ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সংস্কার ছিল যে, ইংরেজি শিক্ষা করিতে গেলেই সাহেবি চাল অলক্ষিতভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং সাহেবী চালের ফলস্বরূপ চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে। যদিও তিনি তদ্বিরুদ্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নিজ চরিত্র এ সংস্কারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল, তথাপি তিনি এ সংস্কারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বিনোদিনী কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "না, মা, আমার মত নয় যে, তোমার ছেলে ইংরেজি শেখে, দেশটা এই করে উৎসন্ন গেল। যত বেটা ছোট-লোক দুপাত ইংরেজি পড়েই সাহেব সেজে বসে, এর জন্য সাহেবমহলেই বা কত নাকাল হয়, তবু তারা স্বভাবদোষ ছাড়তে পারে না, যাক্, তবু পেটের দায়ে গরীবের ইংরেজি না পড়লে নয়, তাই তারা পড়বেই, কিন্তু তোমার ছেলের আর ত খাবার পরবার অভাব নেই, তবে ইংরেজি পড়িয়ে দরকার নেই, ভট্টাচার্য্যি মহাশয়ের টোলে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র প্রভৃতি প্রথমে পড়তে দাও, তার পর শাস্ত্রে একটু অধিকার হলে বেদ বেদান্ত পড়ে মানুষ হবে।"

বিনোদিনী—সম্পত্তিটা রেখে খেতে হলে ত সাহেবদের সঙ্গে একটু মিশতে হবে, সে বেলা ত একটু ইংরেজির দরকার, নেহাত সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত হলে ত লোকে গ্রাহ্যই কর্ব্বে না।

পিসা মশায়—এটা তোমার ভুল সংস্কার, কেন মহামহোপাধ্যায়—ত আর ইংরেজি জানেন না, অথচ তাঁর কেমন সম্মান, সাহেবরাও ত কোন শাস্ত্রের মত জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হলে তাঁকে জিজ্ঞেসা করেন। একান্তই যদি দরকার মনে কর, না হয় একজন ভাল ম্যানেজার রেখে নেবে।"

বিনোদিনী—তাই যদি হল, তবে এর ইংরেজি শিখতে ক্ষতি কি? পরের মুখে ঝাল খাওয়ার চেয়ে আপনার মুখে খাওয়া কি ভাল নয়?

পিশা মহাশয় আর বিতণ্ডা করিতে রাজি না হইয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—নাও, আমার মত জিজ্ঞেস কচ্ছিলে

তাই যা ভাল বুঝেছি বল্লুম, এখন তোমার ইচ্ছে।

বিনোদিনীর দুর্ব্বলতার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পিশামহাশয়কে অসন্তুষ্ট করিলে যদি একটু বিপরীত ফল ঘটে—তখন নিন্দিত হইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার মতে মত দিয়া এক শুভ দিনে সন্তানকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে প্রেরণ করিলেন। সন্তান তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এইরূপে এক বৎসর কাল অতীত হইলে। একদিন বিনোদিনীর সহাধ্যায়িনী এবং শুভাকাঙ্ক্ষিণী শশিমুখী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিনোদিনী বহুকাল পরে শশিমুখীকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দুই বন্ধুতে কিয়ৎকাল নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল, তন্মধ্যে শশিমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তোমার ছেলেটি কোথায়? তাকে অনেক দিন দেখি নাই, স্কুলে গিয়াছে কি?

বিনোদিনী—না ভাই! তাকে ত স্কুলে পাঠাই নাই। পিশে মশায়ের মতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে পাঠিয়েছি।

শশিমুখী—বটে? তুমি ত দেখছি নেহাৎ বোকা, আজ কাল নাকি কেউ টোলে যেয়ে থাকে। যার নেহাত সংস্কৃত পড়বার ঝোঁক হয়, সে ত সংস্কৃত কলেজে যায়। তুমিও যেমন হাবা মেয়ে, তোমার পিশে মশায়ও তেমনই হবু।

বিনোদিনী—কি কর্ব্ব ভাই! দেখ্লুম তাঁর কথাটা না রাখলে তিনি বড়ই রাগ কর্ব্বেন, তাই তাঁর মনের দিকে চেয়ে এরূপ কর্য়েছি। আমার আদবেই মত ছিল না।

শশিমুখী—বেশ ত, আচ্ছা তাঁর মনের দিকে চেয়ে ত এ কল্লে, এখন আমার মনের দিকে চেয়ে ছেলেটাকে তুলে এনে একজন সুশিক্ষকের হাতে সঁপে দাও।

বিনোদিনী—এ কল্লে ত একটা বছর মাটি হয়ে গেল। যা শিখেছে তা কোনও কাজেই আসবেনা, পিশে মহাশয়ও ত্যক্ত হবেন।

শশীমুখী—এটা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যেমনি কাজ, তার তেমনি ফল। এখনও সময় আছে। অগাধ সংস্কৃতশাস্ত্রের পক্ষে এক বছর ত কিছুই নয়। সে অতি সামান্যই শিখেছে, তজ্জন্য আক্ষেপ কর্বার কারণ নেই। তার পর তোমার পিশে মহাশয়কে আমার কথা বল, তিনি আমায় খুব স্নেহ করেন, তাই কিছু বলবেন না।

বিনোদিনী দেখিলেন,—প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দিয়া পুত্রকে টোল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। এ ঘটনার কিয়দ্দিন পর একজন সুযোগ্য পাদরী সাহেবকে সন্তানের ইংরেজি অধ্যাপনা করাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সন্তান বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেছে। পাদরি সাহেবও মনে মনে কত কি জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন,—তাহার ধনী লোকের সন্তান যদি যীশুকে উপলব্ধি করিতে পারে

এবং খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে পাদরী মহলে তাঁহার প্রতিপত্তি কত বাড়িয়া যাইবে। আবার ভাবিতেছেন,—যদি বুদ্ধি দিয়া তাহাকে বিলাত পাঠান যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকেও এক পাদরী রূপে প্রস্তুত করা সম্ভবপর। অধ্যাপনা-কালের ছয় মাস চলিয়া গেলে পর, একদিন বিনোদিনার ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া, যখন প্রত্যুত্তরে অবগত হইলেন যে, তাঁহার সন্তান এক পাদরি সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করি-তেছে তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেটির পরকাল খাবার যোগাড় করেছ, নিশ্চয়ই এ খৃষ্টান হবে, যদি ভাল চাও শীঘ্র সাহেবকে বিদায় দাও, এর চেয়ে মূর্খ হওয়া ভাল।

বিনোদিনী—আপনি কি বলছেন? আমার ছেলে সে গড়নের নয়। এর ঠাকুরদের প্রতি কেমন ভক্তি।

আচার্য্যদেব— বাবুর ত ছোট বেলায় বেশ ঠাকুদের প্রতি ভক্তি ছিল, বামুন দেখিলেই পায় লুটিয়ে পড়ত। যেই পাদরী সাহেবদের স্কুলে গেল, অমনি কপাল পুড়ল! বাপ মায়ে কত চেষ্টা কল্লে কিছুতেই মন ফিরিল না। এখন কেমন টেঁস্ সেজেছে! এখন না পারে ময়ূরের দলে মিশতে, না পারে কাকের দলে। এর দুর্দ্দশা দেখেও কি সাবধান হবে না?

বিনোদিনী—আপনি ভালই বলছেন, এখন সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল, তবে বলুন দেখি,—এর শিক্ষার একটা কি বন্দোবস্ত করি।

আচার্য্যদেব—কেন মাতৃভাষা শিক্ষা কল্লেই ত হয়, আর অন্য ভাষা শিখিবার দরকারটা কি? বাঙ্গালা বেশ জানে এমন একজন পণ্ডিত রেখে দাও, সে এসে বাঙ্গালা পড়িয়ে যাবে, আর জমিদারীর কাজ কর্ম্ম একটু একটু দেখুক, তা হলেই হয়ে যাবে। নিজের জমিদারী বুঝে খেতে পাল্লেই হল।

বিনোদিনীর সকলের মন রাখিবার প্রয়াস, সুতরাং আচার্য্যদেবের উপদেশ অনুসারে পাদরী সাহেবকে সরাইয়া দিয়া, তৎপদে একজন সুযোগ্য বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পর দৈবচক্রে তিনজন উপদেষ্টাই সম্মিলিত, সকলেই বিনোদিনীর তাদৃশ মতচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করিয়া ত্যক্ত হইয়া-ছেন। বিনোদিনী এইরূপ লোকের রুচি-বৈচিত্র্য অনুধাবনা করিয়া এক উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, আর কোন কাজেই অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। নিজে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবেন, শত লোকের বাধা-বিঘ্ন থাকিলেও তাহা করিয়া যাইবেন। যখন সংসারের লোকদিগের মধ্যে এত মত-পার্থক্য রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের উপদেশ লইয়া চলা বিড়ম্বনা, এ ধারণা তাঁহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি বিপরীত দিকে গমন করিয়া আত্মম্ভরিতার শীর্ষমার্গে আরোহণ করিলেন।

বিধবা-বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।•)

৪। বিধবা বালাগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না কেন? এই কথা শুনিয়া আমাদের বড় দুঃখে হাসি পাইতেছে। বোধ হয় সকলেই জানেন, হিন্দু-বালাগণ লজ্জা ও সঙ্কোচে পরিপূর্ণা, তাহার উপরে বিধবাদিগের আত্মীয়েরা স্নেহশীল হইলেও অনেকেই সহানুভূতিশূন্য। সমাজ বিধবা-বিবাহের নামে খড়্গহস্ত; অনেক প্রবীণা মহিলা বিধবা-বিবাহকে ব্যভিচারের মতই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এরূপ স্থলে কোন বালিকা, কিশোরী বা যুবতী বিধবার সাধ্য যে মাতা পিতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের নিকটে প্রার্থনা করে — "আমার বিবাহ করিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, তোমরা দয়া করিয়া আমার বিবাহ দাও"! একি একটা কথা যে ইহা লইয়া আপত্তি? আমাদের বিশ্বাস এই যে,— হিন্দু-বিধবাগণ অসহনীয় ক্লেশ সহিয়া মরিবে, তথাপি কাহারও কাছে বিবাহের ইচ্ছা জানাইতে পারিবে না। তবে যদি কেহ ভিন্নপথাবলম্বিনী হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক, শিশু ও বালবিধবাগণ প্রকাশ না করিলেও ১০০০ জনের মধ্যে যে ৯৯০ জন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, আমরা ইহা সত্য বলিয়াই বুঝিয়াছি।

৫। বিধবা-বিবাহে দম্পতী প্রকৃত সুখী হইবে কি না এবং বিবাহিতা বিধবা প্রথম বিবাহের ভার্য্যাদিগের ন্যায় পতিব্রতা হইবে কি না? এ বিষয়ে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহা বিবৃত করিতেছি।

প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হইল, যশোহর জেলায় নলডাঙ্গার স্বর্গীয় রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়ের জনৈক বন্ধু বিধবাবিবাহ করেন। উক্ত মহিলা সম্ভ্রান্তবংশজাতা এবং সুশিক্ষিতা ছিলেন। এই বিবাহের কিছু কাল পরে তৎকাল প্রচলিত "সুরভি ও পতাকা" নামক সংবাদপত্রে "বিবাহিতা বিধবার পত্র" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধ তাঁহার আত্মজীবন; তাহাতে তাঁহার বৈধব্যাবস্থায় পরিজনের নিষ্ঠুরতা, ব্রহ্মচর্য্যপালনে পীড়িত শরীরে অক্ষমতা, বর্ত্তমান সহৃদয় পতি লাভে জীবনের কৃতার্থতা, স্বামিসেবা, দম্পতীর একত্রে ভগবদারাধনা ও জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোচনা প্রভৃতি ঘটনাবলী এরূপ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে তাহা পাঠে পাঠকের মন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ধকারে ও আলোকে যতটা প্রভেদ, তাঁহার গত বৈধব্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সধবাজীবনের ততটা প্রভেদ অনুমিত হইয়াছে। এই পত্র হইতে আমরা বুঝিয়াছি, বিধবা-বিবাহে দম্পতী সুখীও হন, ভার্য্যা পতিব্রতাও হন।

বোম্বাই প্রদেশে ধানকোরবাই নাম্নী একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া এবং অশেষগুণবতী মহিলাকে বৈধব্যাবস্থায়, সহৃদয় ও

সদাশয় সম্ভ্রান্ত বণিক্ মাধোদাস রঘুনাথ দাস বিবাহ করেন। ধানকোরবাই অল্প দিন হইল এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন; এখনও তাঁহার জীবনীতে কল্পনা স্পর্শ করে নাই। এই দম্পতী যে কত সুখী হইয়াছিলেন এবং ধানকোরবাই যে কত দূর পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে।*

এ বিষয়ে আরও একটু বলিবার আছে। ইয়ুরোপীয় সমাজ হিন্দু-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, যুদ্ধ, বিগ্রহ, বাণিজ্য রাজনীতি বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও কি ফরাসী কি ইংরেজ সকলেই আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ। তাঁহাদের হৃদয়ের ক্রিয়া—দম্পতীপ্রীতির বিষয় আলোচনা করা অবশ্য অসঙ্গত নহে। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছেন, মহাবীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট এবং মহাত্মা জনষ্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহাদের নিকটে সুপরিচিত। এই দুই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিধবাবিবাহ করেন। নেপোলিয়ান-পত্নী জোসেফাইনের পরিণাম শোচনীয় ঘটনাপূর্ণ হইলেও যত দিন জোসেফাইনকে লইয়া নেপোলিয়ান সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ততদিন তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী ছিলেন। আবার জোসেফাইনের যে পতিপ্রাণতা, তাহা আর্য্যমহিলা সীতা বা দময়ন্তী হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। স্বামী তুচ্ছ সুখলালসায় নিরপরাধা রমণীরত্ন জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিলে পতিপ্রাণা স্বামীর ধ্যানেই মগ্না ছিলেন। মহামনা রামচন্দ্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নির্ব্বাসন করিয়া, তাঁহারই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি লইয়া দিন যাপন করিয়াছেন; নৈষধরাজ দময়ন্তীর মঙ্গলোদেশ্যে তাঁহাকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া বিরহকাল তাঁহারি স্মৃতি লইয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং সীতা ও দময়ন্তীর নির্ব্বাসন যন্ত্রণার মধ্যেও অভূতপূর্ব্ব সুখ ও সৌভাগ্যগর্ব্ব ছিল। আর নেপোলিয়ান প্রেমময়ী জোসেফাইনকে পঠিত গ্রন্থের মত, পূজাবশিষ্ট ফুলের মত অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নব পরিণীতা ভার্য্যা সহ ভোগবিলাসে দিন রাত্রি কাটাইয়াছেন, তথাপি সেই পতিপ্রাণা দুঃখিনী নেপোলিয়ানকে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয় হইতে বিচ্যুত করেন নাই! যখন নেপোলিয়ানের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইল, নেপোলিয়ান সেণ্টহেলেনায় বন্দী হইলেন, তখন সেই অভাগিনী জোসেফাইনই সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখিলেন; তিনিই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, প্রাণাধিক স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে যাইতে অগ্রসারিণী হইলেন। কিন্তু প্রেমময়ী জোসেফাইন সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেও বিধাতা নেপোলিয়ানকে ক্ষমা করেন নাই, তাই হতভাগ্য কয়েদী প্রিয়তমার অমৃতময় প্রেমধারায় সকল জ্বালা আর জুড়াইতে পারিলেন না। মৃত্যু আসিয়া সেই

* ধানকোরবাই মাধোদাসের সচিত্র জীবনী ১৩—১৩ সালের চৈত্র মাসের ভারতমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যোৎস্নাময়ীকে অমরধামে লইয়া গেল! —এ প্রেমের—এ আত্মবিস্মৃত প্রেমের তুলনা হয় কি? এখনও কি কাহারও বিবাহিতা বিধবার পতিপ্রাণতায় সন্দেহ হইবে?

মহাপ্রাণ জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার মৃত বন্ধু টেলরের ভার্য্যাকে বিবাহ করেন। এই রমণী প্রথম পতির জীবদ্দশায় মিলের সখী, পতির মৃত্যুর প্রায় তিন বর্ষাধিক কাল পরে মিলের পত্নী হইয়াছিলেন। এই মহিলা সর্ব্বগুণসম্পন্না এবং সর্ব্বাংশে মিলের সুযোগ্যা সহযোগিনী ও সহধর্ম্মিণী ছিলেন; অধিক কি মনস্বী মিলের মানসিক অত্যুন্নত শক্তিসমূহ ইঁহারই সাহচর্য্যের ফল বলিয়া মিল্ নিজে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিল্ স্বরচিত "স্বাধীনতা" নামীয় পুস্তক (এই মহিলার মৃত্যুর পরে) পত্নীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমি যত কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, ইনি সে সমুদয়ের উত্তেজনাকারিণী বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃহিণী ও সখী ছিলেন। ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিত। ইনি আমার কোন কার্য্য অনুমোদন করিলে সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করিতাম।"* ইহার পরে মিলের দাম্পত্য সুখের কাহিনী বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র; সে বিচার পাঠক পাঠিকা নিজেই করিবেন। আমরা স্বদেশ ও বিদেশ হইতে এই সকল কাহিনী লইয়া দেখাইলাম যে, বিধবা-বিবাহে রমণী প্রকৃত পতিপ্রাণা এবং দম্পতী প্রকৃত সুখী হইয়া থাকেন।

৬। স্থিতিশীলগণের ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, বিধবা-বিবাহে কুমারীদিগের বিবাহের বাধা হইবে কি না? আমাদিগের উত্তর এই যে, সেন্‌সসের লোকগণনায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, দেশের প্রায় সকল সম্প্রদায়েই স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। অতএব বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে কুমারীদিগের বিবাহে কিছু মাত্র বাধা হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজ যদি সতর্কতাপূর্ব্বক আর একটী কাজ করেন, তাহা হইলে সকল দিকে সুবিধা হয়। সে কাজ এই যে, কুমারের সহিত কুমারীর এবং বিপত্নীকের সহিত বিধবার বিবাহ সংঘটন। অপার্য্যমাণে অন্যথা হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ ঐরূপ হইলেই সমাজিক সুবিধা হইবে।

এখন আমরা রক্ষণশীল মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি;—বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে আর আত্মকলহ কেন করিবেন?

---

* স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত মিলের জীবনী সমালোচনা কালে "বঙ্গ দর্শন" পত্রে সাহিত্যগুরু বঙ্কিম চন্দ্র এই অদ্বিতীয়া রমণীর বিষয়ে লিখিয়া ছিলেন, "আমার ইচ্ছা এইটুকু স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে প্রকাশ করিয়া এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। তাঁহারা দেখুন যে, কেবল সীতা সাবিত্রী নহে, তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শ আরও আছে।" * * *

"যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল; যে স্বামীর মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল" ইত্যাদি।

কাল্পনিক আশঙ্কায় সমাজমঙ্গলের মূল কেন শিথিল করিবেন? প্রতিপক্ষকে জব্দ করিতে গিয়া মাতৃভূমিকে কেন ক্ষতিগ্রস্তা করিবেন? জানেন তো, মানব সত্যের দাস—মতের দাস কদাপি নহে; জানেন তো "স্বর্গও যদি চ্যুত হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও।"

এখন উন্নতিশীল মহাশয়দিগকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাই বা কতজন বিধবার বিবাহ দিতে পারিলেন? আর কয়জন হিন্দুযুবক বিধবা-বিবাহ করিতে পারিয়াছেন? যে কয়টী বিধবার বিবাহ হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান এবং বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগের সহিতই হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যাঁহারা উদারতার পরিচয় দেন, বিধবা-বিবাহের অনুকূলে লেখালেখির সময়ে যাঁহারা অগ্রণী, বক্তৃতার সময়ে যাঁহারা বদ্ধকক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ দিতে অথবা বিধবা-বিবাহ করিতে কয়জনকে দেখা যায়? হায়! এমন করিয়া কি তাঁহারা সমাজকে উন্নত করিবেন?

যদি সকলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফলে পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, তবে "দেশাচার" কেন যাইবে না? মেডিকেল কলেজে শবচ্ছেদন করিয়া মধুসূদন গুপ্তকে জাতি হারাইতে হইয়াছিল, সে দেশাচার তো চলিয়া গিয়াছে? শাস্ত্রের নিষিদ্ধ ম্লেচ্ছ-সেবাপর কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া নিমন্ত্রণ-সভা পবিত্র করিতেছেন, সে দেশাচার তো চলিয়া গিয়াছে? তাই বলিতেছি, বুকে সাহস করিয়া কথায় কাজে এক হইয়া সকলেই যদি বিধবা-বিবাহ দিতে এবং বিধবা-বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে দেশাচার কেমন করিয়া থাকিবে? জষ্টিস আশুতোষ গালি ও বিদ্রূপ সহিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, আমাদের ধারণা এই যে, তাঁহার পদ-গৌরব হইতে এই গৌরবে অধিকতর পৌরষ আছে। উন্নতিশীল হিন্দুগণ যদি তাঁহার কার্য্য বাস্তবিক অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে সংশয়শূন্য হইয়া সকলে তাঁহার পথানুসরণ করুন। সমস্ত জগৎ চাহিয়া দেখুক্, বাঙ্গালি কথায় কাজে এক হইয়াছে, বাঙ্গালির অধমত্ব ঘুচিয়াছে।

হিন্দুসমাজের দাসানুদাস,
জনৈক হিন্দুসন্তান।

জাপানী পরীর গল্প।

পট্ পট্ পর্ব্বত।

পূর্ব্বে এক ওজিছান (১) ছিলেন, একটা শৃগালের উৎপাতে তিনি বড় কষ্ট পাইতেন। শৃগাল প্রত্যহ রাত্রিতে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া ওজিছানের বাগানে আসিত ও অশেষ প্রকারে তাঁহার ক্ষতি করিত।

(১) সম্মানিত বৃদ্ধ।

অবশেষে একদিন শৃগালপুঙ্গব ফাঁদে পড়িলেন! দেখিয়া ওজিছান তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন,—"ওবাছান! (১) আজ দুষ্ট ধাড়ী শৃগালটাকে ধরিয়াছি। আর বাছা নিশা-ভ্রমণে বাহির হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আজ রাত্রে উহার ঝোল রাঁধিয়া খাইতে হইবে।"

ইহা বলিয়া ওজিছান শৃগালের পা দুই খানি একত্রে বাঁধিলেন, তারপর রান্না ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রফুল্লমনে তাঁহার দৈনিক কার্য্য করিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেই কড়িকাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে শৃগাল চিন্তা করিতে লাগিল, কিরূপে পলায়নের সুবিধা করা যায়। ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে তাহার ধূর্ত্তবুদ্ধি এক উপায় স্থির করিল। ওবাছান সেই ঘরে বসিয়া যব চূর্ণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল,—"ওবাছান! বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় বৃদ্ধা মহিলাকে এমন শ্রমজনক কার্য্য করিতে হয়! আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসকে অনুমতি করুন, যব চূর্ণ করিয়া দিই।"

ওবাছান বলিলেন,—"না, না, ওজিছান বাড়ী নাই, যদি একটা কিছু ঘটে, আমাকেই দায়ে ঠেকিতে হইবে। অমনি ভালো, আমার জন্য তুমি যে দয়া প্রকাশ করিলে, সে জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর।"

কিন্তু ধূর্ত্ত শৃগাল এই কথাতেই ক্ষান্ত না হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল,—"আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও সতর্কতা খুব যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আপনি কেন এ সন্দেহ মনে স্থান দিতেছেন, আমি যখন একবার ধরা পড়িয়াছি, তখন আবার আমার পলায়নের সম্ভাবনা আছে? বিনাকার্য্যে এখানে ঝুলিতেছি, তাই আপনার কার্য্যে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে ইচ্ছা হওয়া কি অসঙ্গত? দেখুন, কাজটা আমাকে একবার দিয়াই দেখুন।"

(ক্রমশঃ)

(১) সম্মানিতা বৃদ্ধা।

বামাবোধিনীর ষষ্ঠচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

আজ আবার সেই দিন—সেই শুভদিন, যে দিন অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাবৃন্দের অন্তরে জ্ঞানের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রসন্ন জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার সাধু সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া 'বামাবোধিনী' প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল। সে আজ ৪৬ বর্ষের কথা। একের পর এক করিয়া বামাবোধিনীর জীবনেতিহাসের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। যাঁহার অনুকম্পায় এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শত আশা, শত আনন্দ, সহস্র উদ্বেগ, লক্ষ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া বামাবোধিনী আপন পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিয়াছে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের পদে প্রণাম করিয়া আমরা আবার নবোদ্যমে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবঅবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত, তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়, যাঁহার অসীম জ্ঞান ও অতুলনীয় যত্নের প্রভাবে পিতৃহীনা বামাবোধিনীর হৃদয়ে পিতৃশোকের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই, যাঁহার সহায়তা না পাইলে বামাবোধিনীর সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না, তাঁহার চরণ বন্দনা, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা ভগিনী ও জননীস্থানীয়া সাহিত্যানুশীলন-নিরতা বঙ্গললনাগণকে সাদরে যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

শুভদিনে অশ্রুপাত করিতে নাই। কিন্তু আবেগবন্যা যখন হৃদয়ভূমি প্লাবিত করিয়া তীরবেগে প্রধাবিত হয়, তখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়— দর দর ধারে দুনয়নে বারিবিন্দু ঝরিতে থাকে। আজ এই অপার আনন্দের দিনে তিনি কোথায়? সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহাত্মা, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই মহাশিক্ষায় বঙ্গবাসীকে শিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি ঐ অত্যুচ্চ অমরধাম হইতে অজস্র আশিষরাশি ও অশেষ কল্যাণবাণী বর্ষণ করিতেছেন। আজ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত মূল মন্ত্র গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে,—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
বুঝিবা ভারত জাগেনা জাগেনা।"

মহাপুরুষের বাণী ভবিতব্যের অভিব্যক্তি মাত্র। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ঐকান্তিক যত্নের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে, যে নারীজাতির উপর ভগবান্ পুরুষজাতির জীবন ও চরিত্র গঠনের, অধিক কি মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই নারীজাতি যদি চিরকাল অজ্ঞানতামসের অন্ধতম কূপে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান পতিত ভারতের উদ্ধারের আশা অনন্তকাল কবিকল্পনায় পর্য্যবসিত থাকিবে।

যে দেশ পদ্মিনী, মীরাবাই, দুর্গাবতী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলাগণের জন্মভূমি, সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতমাতার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া অর্দ্ধভাগ অধিবাসী অর্থাৎ সমস্ত স্ত্রীসমাজ যে অশিক্ষিতাবস্থায় চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, ইহা কখনই করুণাময় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাই আজ আমরা তাঁহারই প্রেরণায় ভারতীয় মহিলাবৃন্দের মধ্যে নব অভ্যুদয়ের অরুণ-কিরণ-রেখা-সম্পাত দর্শন করিতেছি।

শিক্ষিতা মহিলাগণ! আপনারা পুরোবর্ত্তিনী হউন। আপনাদের সংসাহস ও শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের ভবিষ্য সন্তানগণ প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে সক্ষম হইবে।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! তুমি আমাদের প্রাণে শক্তি দাও—হৃদয়ে অমিত বল সঞ্চারিত কর। আমরা যেন অবিচলিত চিত্তে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া মানব নামের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হই।

বিনয়াবনত,
শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অতৃপ্তি কি পাপ নয়?

যখন স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, বিশাল তরুর সুশীতল ছায়ার অন্তরালে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের ঝটিকাঘাত হইতে সুরক্ষিত ছিলাম, প্রিয়জনের সুস্নিগ্ধ প্রেমসম্ভাষণে শ্রবণ শীতল হইত, হে প্রভো! তখন কি এ সকল অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত স্বর্গের বর লাভ করিয়া তোমার চরণে সমুচিত কৃতজ্ঞতাভরে, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অঞ্জলি দান করিয়াছি? মোহমুগ্ধ প্রাণ ত অতৃপ্ত, পিপাসাতুর ও ক্লান্তিতে পরিশ্রান্ত হইয়া সুধার অন্বেষণে সংসার-মরীচিকায় বিমুগ্ধ হইয়া গন্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়া আবিলতায় নিমজ্জিত ঘোর অশান্তি-বিদগ্ধ হইয়াছে। প্রভো! তোমার দিব্যজ্যোতি লক্ষ্য করিতে অক্ষম হইয়া কি গভীর বিষাদ-জলধিতে আত্ম হারাইয়াছি। এ জীবন নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তনে ঘোর কুহেলিকাচ্ছন্ন। গৃহ শূন্য, শ্মশানতুল্য, বিভিষিকাময় ও নিস্তব্ধ। তবুও কি বিশ্বাসদীপ উজ্জ্বল হইয়াছে? সংসারের ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া আত্মা অমরধামের যাত্রী হইবার উপযুক্ততা লাভে সচেষ্ট, অই উর্ণনাভের মত নিজের জালে নিজেই জড়িত, তাই বিবেকবাণী প্রাণকে ঊর্দ্ধে তুলিতে অক্ষম। তাই এখনও "আমার আমার" বলিয়া ছায়াপথে ভ্রান্ত মন সর্ব্বদাই ধাবিত ও নিরাশায় অবসন্ন। হায়! সে দিন কবে আসিবে, যখন বিশ্বাসে, পুলকে প্রাণ খুলিয়া বলিব, হে প্রভো! সুখও চাহিনা, দুঃখও চাহিনা, তোমার ব্যবস্থায় যাহা আসে তাহাই সর্ব্বোত্তম।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আমাশয় রোগের ঔষধ—জীরে ভাজা চূর্ণ ও শ্বেতধুনা চূর্ণ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উহার ৴০ এক আনা পরিমাণ চূর্ণ বেলপাতার রস কিম্বা ঘোল সহ দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে সাদা ও রক্তামাশয় দূর হয়।

২। অর্শ রোগের ঔষধ—রক্তার্শরোগে কৃষ্ণ তিল (খোসা ছাড়ান), রক্তচন্দনচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, ও পুরাতন ইক্ষুগুড়, সমস্ত তুল্য পরিমাণে একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ৴০ এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৩। হাঁপানি রোগের ঔষধ—আপাঙ মূল ৵০ দুই আনা, শ্বেতচন্দন ঘসা ।০ চারি আনা, গোল মরীচ ৭ সাত গণ্ডা জল দ্বারা মর্দন করিয়া প্রাতে ১ বার জলসহ সেবন করিলে শ্বাস (হাঁপানী) আরোগ্য হয়।

৪। বমি রোগের ঔষধ—ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি রোগে শশার বিচি চূর্ণ ৵০ দুই

আনা ও কুলের আঁটীর শাঁস চূর্ণ ৵০ দুই আনা স্তন্যদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। মূত্ররোধের ঔষধ—মাদার ফলের (ডহুয়ার) বীচি চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা ও চিনী ॥০ অর্দ্ধ তোলা /০ এক ছটাক জলসহ সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয়

মূত্রাঘাতে ও মূত্রকৃচ্ছ্রে, তেলাকুচার মূল নাভিতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়

নূতন সংবাদ।

১। বিলাতের ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিস্ পরীক্ষায় গত জুলাই মাসে নিম্নলিখিত ভারতবাসী ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পঞ্জাবের রামনাথ চোপরা, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আবদুল সাটার খাঁ, বোম্বাই মেডিকেল কলেজের সরাব সাপুরজি, মেলেক ধনজী সাওয়াডিয়া এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুরেশ্বর সরকার।

২। পঞ্জাবের খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় ও রামভুজ দত্ত চৌধুরী বিলাতে ভারতবর্ষের অবস্থা বিশদরূপে জানাইবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

৩। রাঁচী কলেজ স্থাপনের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ময়মনসিংহ সিটি কলেজের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ঝালকাটীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তত্রত্য শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় ১০১ টাকা দান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আরও অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডে কুমারী লিলি স্মিথ নাম্নী ১৮ বৎসর বয়স্কা এক বালিকা ডোবার হইতে রামস্ গেট পর্য্যন্ত ২০ মাইল জলপথে ৭ ঘণ্টা কাল সাঁতার দিয়া ১৮ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

৫। চীনদেশে অহিফেন পরিত্যাগের জন্য চীনবাসীরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে অহিফেনের পরিবর্ত্তে অনেক পরিমাণে মরফিয়া আমদানী হইতেছে। চীনদেশে সম্প্রতি আইন হইয়াছে, যে কোন চীনবাসী বিনানুমতিতে মরফিয়া প্রস্তুত করিলে, তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

৬। পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ সর্পাঘাতের একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা সর্পদষ্ট স্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণের পথ করিতে হইবে। পরে যাহাতে রক্তের সঙ্গে মিশিতে পারে এরূপভাবে দষ্টস্থানে পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ লাগাইতে হইবে। এই ঔষধ সমস্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

৭। আগামী ১৪ই অক্টোবর মান্দ্রাজের

উই কামন্দ মেসনিক হলে একটী শিল্প-সমিতির অধিবেশন হইবে। মান্দ্রাজের গবর্ণর এই সভার অধিবেশন কার্য্য সম্পাদন ও বক্তৃতা করিবেন।

৮। জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে সমান অধিকার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বামারচনা।

বর্ষায়।

চাতকী-ভরসা আসিল বরষা,
নিবিড় নীরদে গগন ঢাকা;
হেরি নবঘন সুখে নিমগন,
নাচিছে কলাপী খুলিয়া পাখা।
জলদের কোলে হাসিয়া হাসিয়া,
সোহাগে দামিনী পড়িছে ঢলি;
দুকূল প্লাবিয়া নাচিয়া নাচিয়া,
উচ্ছ্বাসে তটিনী যেতেছে চলি।
ঝর ঝর ঝর বরিষার জল,
লতায় পাতায় কুসুমদলে;
ঝরে অনুক্ষণ গুরু গরজন,
ডাকি নব ঘন অম্বরে চলে।
কেতকী সুবাসে মুগ্ধ ধরাতল,
সজল বাতাস বহিছে ধীরে;
লতিকার বুকে ধরি তরুবর,
বরিষার জল মাখিছে শিরে।
সরসী-সলিলে বিমল শোভায়
হাসিছে কুমুদ কহ্লার কত;
সোণার বরণে করি আলোকিত,
ফুটিছে কদম্ব কেশর শত।
সে দিনো এমনি গিয়াছে বরষা,
হৃদয়ে কতই সুখের গাথা;
আজি কেন পুনঃ হেরি বরষায়,
জাগিছে অতীত স্মৃতির ব্যথা?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

বামাবোধিনীর লেখক লেখিকাগণের প্রতি

সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা পত্রিকায় প্রকাশ জন্য যে প্রবন্ধ এবং কবিতাদি আমাদিগকে ভবিষ্যতে পাঠাইবেন, তাহা যেন পরিষ্কার এবং সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়। অস্পষ্ট এবং অপরিষ্কার লেখা ছাপাখানার কম্পোজিটারগণ পড়িতে না পারায় অনেক স্থানে ভুল থাকিয়া যায়। লেখা অপরিষ্কার থাকিলে প্রুফ সংশোধন করিবার সময়েও বৃথা সময় নষ্ট হয়।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

উমেশচন্দ্র দত্ত-স্মৃতিভাণ্ডার।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আজীবন নারীজাতির কল্যাণের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কলিকাতায় মহিলাদিগের একটী শোকসভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত মহাত্মার পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণার্থ একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। তদনুসারে আমি বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরলোকগত মহাত্মার অনুরাগীদিগের নিকটে—বিশেষতঃ মহিলাগণের নিকটে—অনেক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনেকে এই সাধুকার্য্যে যে প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। মফঃস্বলের নানা স্থানের মহিলাগণ অর্থসংগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীপ্রবাসিনী শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, শিলংএর শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত, কটকের শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয়ের পত্নী এবং শ্রীমতী মানকুমারী দেবীর নিকটে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আছি। আনন্দের বিষয় যে, বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী এই কার্য্যের জন্য ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত টাকা সংগৃহীত হইয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখনও অনেক গুলি প্রতিশ্রুত দান সংগৃহীত হয় নাই। আশা করি, অবিলম্বে দাতৃগণ স্বীয় স্বীয় প্রতিশ্রুত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের জন্য অনূ্যন তিন হাজার টাকা প্রয়োজন। সুদ হইতে দুঃস্থা বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। মৃত মহাত্মা যেরূপ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের কল্যাণসাধন করিতেন, এই সকল বৃত্তিও সেইরূপ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র বালিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে। বৎসরাধিক কাল হইল এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমারও স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। শীঘ্রই সংগৃহীত অর্থের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতএব সানুনয় নিবেদন যে, পরলোকগত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ যিনি যাহা দিতে ইচ্ছুক, অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

৯৩ অপার সারকুলার রোড, — বিনীতা
কলিকাতা। — স্বর্ণপ্রভা বসু

২।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 542. October, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪২ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৫। অক্টোবর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জন্মোৎসব—গত ১৯এ ভাদ্র শুক্রবার শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজির ৮৩ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার এই শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থানে সভা হইয়াছিল। আমরা পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

হাইকোর্ট জজের বিদায়—কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী চিফ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত রামপিণি সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক কাল ভারতে কাটাইয়াছেন এবং বিলাতে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ভারতের মঙ্গলসাধনে বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

তীর্থযাত্রার সুবিধা—রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর তীর্থদর্শনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কা এবং মেদিনা যাওয়ার অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আরবদেশে দামাস্কা হইতে মেদিনা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে এবং শীঘ্রই মক্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় এই সংবাদে যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার মসজিদে মসজিদে ভগবানের নিকট ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চিকিৎসা-সম্মিলন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর সি-আই-ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার অনেক বড় বড় ডাক্তারগণ মিলিত হইয়া এক সভার অধিবেশন করেন। তাহাতে হাতুড়ে চিকিৎসকের বিস্তার বন্ধ করিবার এবং এই সকল অশিক্ষিত চিকিৎসকদিগের নিকট অনেকে চিকিৎসা করাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন

ইহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নানারূপ আলোচনা হয়; এবং এই সকল বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট উত্থাপিত করিবার প্রস্তাব হয়।

ভারতে শিল্পবিস্তার — এলাহাবাদে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী মিলিত হইয়া ৩ লক্ষ টাকা মূলধনে একটী চিনির কল স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। এই কলের প্রতি অংশের মূল্য ১০৲ টাকা মাত্র স্থির করা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রতিদিন ২৫০ মণ গুড় হইতে ১০০ মণ পরিষ্কার চিনি ও ১৫০ মণ নালী তৈয়ার হইবে।

বেনারসে "কাশী গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী" নামে দুই লক্ষ টাকা মূলধনে একটী কাচের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানায় ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতা মাণিকতলায়, ময়মনসিংহের এক জমিদারের সাহায্যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রসাদ বসু জাপান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া এক ছাপার কালীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

পদ্মার সেতু—বহুদিনের আলোচনার পর সারাঘাট ষ্টেসনের নিকট পদ্মার উপর সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সর্ব্বত্র এইরূপ ভগবদ্দর্শন দ্বারা মানব ত্রিবিধ দুঃখের অতীত হয়, সে মুক্তজীব হইয়া অনন্তকাল ভূমানন্দ সম্ভোগ করে। দেবত্ব বা পিশাচত্ব মানবের কর্ম্মাধীন। একমাত্র সঙ্গই উন্নতি বা অবনতির কারণ। সাধুসঙ্গে যেমন উন্নতি, অসৎসঙ্গে তেমনি অধোগতি।

"অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সংজল্পাচ্চ সহাসনাৎ।
ধর্ম্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে সিধ্যন্তি চ ন মানবাঃ॥"

—অসতের দর্শনে, স্পর্শে, তাহার সহিত আলাপনে বা উপবেশনে, মানবের সদাচার সকল অতীব হীনতা প্রাপ্ত হয়, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। স্বর্গ বা নরক মনেরই সৃষ্টি। মানুষের মন আপনার মধ্যে স্বর্গ আনিতে পারে, আবার নরকও আনিতে পারে। মহাকবি মিল্টন বলিয়াছেন ;—

"The mind is its own place, and itself can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."

অর্থাৎ মন নিজেই নিজের আধার; মন আপনিই আপনাতে স্বর্গকেও নরকরূপে এবং নরককেও স্বর্গরূপে সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রাচীনতম বৈদিক আচার্য্যেরা শিক্ষার্থী

শিষ্যকে প্রথমেই এই কয়েকটী উপদেশ দান করিতেন ;—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং
পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ"—

— আমরা যেন কর্ণদ্বারা সর্ব্বদা কল্যাণবাণী শ্রবণ করি ; চক্ষু দ্বারা সকলি মঙ্গলময় দর্শন করি ; স্তুতি মন্ত্রাদি দ্বারা ভগবানেরই স্তব করি।

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

—হে শিষ্য ! তুমি সত্য হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; ধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; (ধর্ম্মসাধন) শারীরিক কুশল হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; শুভকার্য্য হইতে কদাচ বিচলিত হইও না ; সদ্‌বিদ্যার অধ্যয়ন ও অনুশীলন হইতে কদাচ বিচলিত হইও না। দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য হইতে কদাচ বিচলিত হইও না

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।"

—দেবতাজ্ঞানে মাতাকে সেবা কর। দেবতাজ্ঞানে পিতাকে সেবা কর। দেবতাজ্ঞানে আচার্য্যকে সেবা কর। দেবতাজ্ঞানে অতিথিকে সেবা কর। শিষ্টসম্মত অনিন্দিত কর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান করিও, কদাচ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না। হে শিষ্য ! আমাদের সদাচারই গ্রহণ করিও। অসৎকার্য্য গুরুজনে করিলেও, তাহা করিও না। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অহো কি অমূল্য উপদেশ ! স্বর্গের অমৃতকুণ্ড হইতে যেন বিন্দু বিন্দু অমৃত শিষ্য হৃদয়ে পতিত হইতেছে। মর মানব ইহার এক বিন্দু পান করিলেই অমর হইয়া যায়। বৈদেশিকগণকর্ত্তৃক ভারতের সমস্ত ধনরত্ন, ধূলাগুঁড়া পর্য্যন্ত যদি কবলিত হয়, তথাপি পূর্ব্ব ঋষিগণের প্রদত্ত এ সকল অপার্থিব বৈভব ভারতের অক্ষয় গৌরবস্বরূপ দীপ্যমান থাকিবে।

"সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥"
(হিতোপদেশ)

—যত কিছু ধন রত্ন আছে এ জগতে,
বিদ্যাধন সকলের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ;
না পারে হরিতে কেহ, নাহি পায় ক্ষয়,
অমূল্য এ ধন ভবে জানিও নিশ্চয়।

সদ্গুরু সাধুর সেবাই তুলসীদাসের নিকট সর্ব্ব তীর্থের, সর্ব্ব সাধনার ও সর্ব্ব বিদ্যার সার ছিল। তিনি সাধুসমাগমেই সর্ব্বতীর্থের মহাসঙ্গম দেখিতেন। সাধুসঙ্গের মহিমাবর্ণনে তাঁহার লেখনী সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। যথায় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ত্রিবেণীরূপে সম্মিলিত ; যথায় অক্ষয় বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, সেই প্রয়াগতীর্থকে তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ;—

মুদমঙ্গলময় সন্তসমাজূ,
জো জগ জংগম তীরথরাজূ ;

রামভক্তি জহঁ সুরসরি ধারা,
সরস্বতি ব্রহ্মবিচার প্রচারা ;
বিধিনিষেধময় কলিমলহরণী,
কর্ম্মকথা রবিনংদিনি বরণী ;
হরি-হর-কথা বিরাজতি বেণী,
সুনত সকল মুদমংগলদেনী ;
বট বিশ্বাস, অচল নিজ ধর্ম্মা,
তীরথরাজ-সমাজ সুকর্ম্মা ;
সবহিং সুলভ সব দিন সব দেশা,
সেবত সাদর শমন কলেশা ;
অকথ অলৌকিক তীরথরাউ,
দেই সদ্য ফল প্রগট প্রভাউ।

(অনুবাদ।)

—আনন্দ-মঙ্গলময় সজ্জনসমাজ,
জঙ্গম প্রয়াগতীর্থ সর্ব্বতীর্থরাজ ;
এ তীর্থের ভাগীরথী শ্রীরামে ভকতি,
ব্রহ্মতত্ত্বকথা তথা পুণ্যা সরস্বতী,
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিধি-নিষেধ সহিত,
যমুনারূপেতে তথা হয়েছে মিলিত ;
তথায় অক্ষয়বট অক্ষয় বিশ্বাস,
সনাতন ধর্ম্মমূলে যাহার বিকাস ;
এ তীর্থ সর্ব্বত্র সদা আছে বিদ্যমান,
সেবামাত্র হাতে হাতে ফল করে দান ;
এ অপূর্ব্ব তীর্থরাজ যে করে সেবন,
ত্রিতাপ-দহনে শান্তি লভে সেই জন।

মহাত্মা তুলসীদাস সাধুসঙ্গের এইরূপ মহিমা কীর্ত্তন করত, করযোড়ে সকলকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন ;

"সুনি সমুঝহিং জন মুদিতমন মজ্জহিং অতি অনুরাগ।
লহহিং চারি ফল অছতততনু, সাধুসমাজ-প্রয়াগ ॥"

(অনুবাদ।)

—হে মানবগণ! প্রসন্নচিত্তে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তিভরে ঐ তীর্থে অবগাহন কর। তুমি এই দেহেই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে। যদি বল!—যে ব্যক্তি আজন্ম কর্ম্মচণ্ডাল, ঘোর পিশাচ, যাহার সমস্ত ধাতু, অস্থি, মজ্জা পর্য্যন্ত পিশাচ হইয়া গিয়াছে, সাধুসঙ্গে তাহার কি করিবে।

তুলসী বলিতেছেন ;—

"শঠ সুধরহিং সতসংগতি পাঈ।
পারস পরসি কুধাতু সুহাঈ ॥"

—ঘোরতর দুর্বৃত্তও সাধুসঙ্গে আমূলতঃ সংশোধিত হয়। দেখ! স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও সুবর্ণ হইয়া যায়।

"বাল্মীকি, নারদ, ঘটযোনী।
নিজ নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী ॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ।
জব জোহি যতন জহাঁ জোহি পাঈ ॥
সো জানে সতসংগ প্রভাউ।
লোকহুঁ বেদন আন উপাউ ॥"

দেখ! বাল্মীকি, নারদ, অগস্ত্য, ইহাঁরা নিজমুখে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—আমরা কর্ম্মবিপাকে তাদৃশ হেয়তম দশায় পতিত হইয়াও যে শেষে এই অচিন্তনীয় দিব্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, তাহা সাধুসঙ্গেরই ফল। সাধুসঙ্গেই আমাদের মতি, গতি ফিরিয়াছিল। আমাদের এ অতুল ভূতি ও কীর্ত্তি সাধুসেবারই ফল (১)।

(১) বাল্মীকির পূর্ব্বকথা সকলেই জানেন।

তুলসী-চরিত্রের একটী প্রধান উপাদান দৃঢ়তা। বাল্যাবধি সকল কার্য্যেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যে গুরুর নিকট রামায়ণপাঠকালে তিনি একদিন অধীত বিষয় স্মরণ রাখিতে না পারায় তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিরস্কৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—অদ্য রাত্রিমধ্যে রামায়ণের সমগ্র আদিকাণ্ড কণ্ঠস্থ করিব। পরদিন প্রাতে তিনি সমগ্র আদিকাণ্ড মুখস্থ শুনাইয়া গুরুকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন (২)। তিনি যাহা বলিতেন, প্রাণান্তেও তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বলিতেছি। তিনি একদা এক জলাশয়ে অতি প্রত্যূষে স্নান করিতে নামিয়াছেন, এমন সময় এক যুবতী তাঁহার সম্মুখে স্নান করিতে নামিল। যুবতী তুলসীকে কহিল ;—"যতক্ষণ আমি স্নান

নারদ ব্যাসকে নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—আমি পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। মাতার আজ্ঞায় আমি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে সেই বিপ্রগণের সেবা করিতাম। তাঁহাদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতাম। নিয়ত তাঁহাদের সেবায় ও তাঁহাদের মুখে হরিকথা শ্রবণে আমার মতিগতি ফিরিল। শেষে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, আমি জীবন্মুক্ত হইলাম। (ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। অগস্ত্য মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, আমি কেবল সাধুসঙ্গপ্রভাবেই এ অতুল যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি।

(২) এ দেশে অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত অনেক ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও কয়েকটী শ্রুতিধর পণ্ডিত দেখিয়াছি। ৺ কাশীধামে এক যুবক সংস্কৃত রামায়ণের প্রথম হইতে শেষ, আবার শেষ হইতে প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্গের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তির কথা অনেকে শুনিয়াছেন। ত্রিবেণীর ঘাটে এক ইংরাজের সহিত এক ফরাসীর বিবাদ হয়। প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি করিয়া উভয়ে বিচারার্থে আদালতে নীত হয়। বিবাদের সময় তথায় জগন্নাথ বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। তিনি উদাসীনভাবে তাহাদের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি ফ্রেঞ্চ বা ইংরাজি ভাষার এক বর্ণও জানিতেন না। ইংরাজ ইংরাজি ভাষায় এবং ফরাসী ফ্রেঞ্চ ভাষায় গালি দিয়াছিল। জগন্নাথ তাহাদের কথাগুলি অবিকল বলিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতায় এক পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনি যুগপৎ তিন চারি জনের প্রশ্নের উত্তর, শ্লোক দ্বারা সমস্যাপূরণ, আবার ঠিক্ সেই সময়েই দাবা প্রভৃতি খেলার চাল, ও গণিতবিষয়ক নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলকে অবাক্ করিয়াছিলেন। আমার পরমারাধ্য ৺ পিতৃদেবের স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত ছিল। সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিল। তিনি আমাদের মুখে সমগ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া, তাহার ছয় বৎসর পরে তাহা আদ্যোপান্ত অবিকল বলিয়াছিলেন। বর্ণিত ঘটনা সকলের সন, তারিখ, মাস, ও ব্যক্তি সকলের নাম ধাম কিছুই বিস্মৃত হন নাই। এরূপ শ্রুতিধর পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে। যখন লিপিপ্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, তখন শ্রবণ ও স্মরণ দ্বারা শাস্ত্র সকল রক্ষিত হওয়ায়, শাস্ত্রের শ্রুতি ও স্মৃতি নাম হইয়াছে।

করিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন না করি, ততক্ষণ আপনি আমার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকুন; আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাকে জানাইলে, আপনি সম্মুখ ফিরিয়া স্নানাদি করিবেন।" তুলসী তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর দিকে পিছন করিয়া জলমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ দিকে যুবতী স্নানাদি কবিয়া, তুলসীকে কোনও কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে প্রাতঃকাল অতীত হইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ অতীত হইল; তুলসী সমভাবে দণ্ডায়মান। রাত্রি উপস্থিত, তুলসী সেইভাবে দণ্ডায়মান। অনন্তর সেই কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, যুবতী তাহা জানিতে পারিয়া তুলসীর নিকট আসিয়া কুণ্ঠিত-ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তুলসী তাহার অনবধানতাজন্য কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, স্নেহমধুরবাক্যে সেই নারীকে অভয় দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাল্যাবধি তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি অতীব প্রবলা ছিল। প্রথম যৌবনে তাহা লাবণ্য-বতী পত্নীর রূপজ মোহে আবদ্ধ ছিল। সে মোহ কাটিলে, যাহা আত্মার অবিকারী অক্ষয় সৌন্দর্য্য, সেই পুণ্যশীলতাকেই সুন্দর বলিয়া জানিলেন। তখন পাপকেই কুরূপ ও পুণ্যকেই সুন্দর দেখিতে লাগি-লেন। যে যত দয়ার্দ্রচিত্ত, সে তত সুন্দর; কৃপাপীযুষসাগর হরি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের পূর্ণ-পাত্র,—এই ভাবের উক্তি তাঁহার ভূরি ভূরি কবিতায় দৃষ্ট হয়। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

কোনও কবি এক দয়াবতী রমণীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন;—

"গুলিস্তাঁমে জাকে হরেক গুল্‌কো দেখা।
ন তেরিসি রঙ্গৎ, ন তেরিসি বু হৈ॥"

—অর্থাৎ, এই সংসাররূপ উদ্যানে আমি নানাজাতীয় পুষ্প দেখিলাম, কিন্তু তোমার ন্যায় বর্ণ ও তোমার ন্যায় সৌরভ কোথাও দেখিলাম না। এ স্থলে একটী ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদা তিনটী শিশু পাঠশালা হইতে গৃহে যাইবার সময় এক ময়রার দোকানে জল খাইতে বসিয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটী শিশু গৌরবর্ণ, অপরটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ময়রা খাবার দিতেছে, ইত্যবসরে গৌরবর্ণ শিশুদ্বয় নিজ নিজ হস্ত খুলিয়া কৃষ্ণবর্ণ শিশুর সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে বলিল;— "দেখ্‌! দেখ্‌! আমার হাত কত সুন্দর! তোর হাতখানা কালো ক্যাঁট্‌কেঁটে, বড় বিশ্রী!" কৃষ্ণবর্ণ শিশুটী দ্বিরুক্তি করিল না। এক বৃদ্ধা ভিখারিণী ক্ষুধার্ত্তা হইয়া তথায় বসিয়াছিল। ময়রা যখন তাহা-দিগকে খাবার দিল, ভিখারিণী কাতর-ভাবে শিশুদের নিকট কিছু খাইতে চাহিল। গৌরবর্ণ বালকদুটী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ শিশুটী তখন খাবার মুখে তুলিতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধার কথায় তাহার হাত আর মুখে উঠিল না, সে সমস্ত খাবার বৃদ্ধাকে দিল। বৃদ্ধা বলিল,—বাছা! তুমি কিছুই খেলে না! বালক বলিল;—আমি এখনি বাটী গিয়া খাইব। এ খাবার তুমি খাও। আহা!

আজি বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? বৃদ্ধা বলিল,—হাঁ বাছা! আমি দুই দিন কিছুই খাই নাই। তাহা শুনিয়া ঐ বালকের চক্ষু জলপূর্ণ হইল। বৃদ্ধা কহিল;—"বাছা! তোমার হাতখানি সকলের চেয়ে সুন্দর! তুমি বেঁচে থাক।"

"হস্তস্য ভূষণং দানম্"

যে হস্ত দরিদ্রকে দান করিবার জন্য উত্থিত হয়, সেই হস্তই সুন্দর। স্বভাব-কবি মহাত্মা গোল্ডস্মিথ বলিতেন,—"Handsome is, that handsome does." অর্থাৎ, যাহার কার্য্য সুন্দর, সেই সুন্দর।

শাস্ত্রে বিবিধ পাপের জন্য যে সকল নরকভোগের ব্যবস্থা আছে, তুলসীদাস তাহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন। এজন্য সকলের সম্মুখে সেই সকল নরকের চিত্র প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শন করিয়া সাবধান করিয়া দিতেন। একদা কোনও মঠে ভাগবত কথা হইতেছিল। তথায় কেহ কেহ উচ্চ আসনে বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন। তুলসী তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে তাঁহাকে সসম্রমে উচ্চ আসনে বসাইবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি আসনে না বসিয়া, দীনভাবে ভূতলে উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন,—যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ করান, তিনি পরমগুরু। শ্রোতা যিনিই হউন, তাঁহাকে কদাচ সে স্থানে উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে নাই। ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার সময় তাম্বূল ভক্ষণ করিলে, মল ভোজন করা হয়, উচ্চ আসনে উপবেশন করিলে, অধমযোনিতে জন্মলাভ হয়। কথককে ভক্তিভরে প্রণাম না করিলে, জন্মান্তরে বিষবৃক্ষ হইতে হয়। ভগবৎ-কথার সময় শয়ন করিলে অজগর-যোনিতে পতন হয়। যিনি কথকের সমান আসনে উপবেশন করেন, তাঁহাকে গুরুপত্নীগমন জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যিনি কথকের নিন্দা করেন, তিনি শতজন্ম কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হন। ভগবৎকথার সময় যিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে জন্মান্তরে গিরিগিটি হইতে হয়। যিনি ভগবৎকথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্য চিন্তা করেন, তিনি শূকরযোনি প্রাপ্ত হন। যিনি ভগবৎকথার বিঘ্ন ঘটান, তাঁহাকে বহুজন্ম নানা নরকভোগ করিয়া শেষে শূকরযোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়। তুলসীদাসের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে উচ্চ আসন ত্যাগ করিয়া, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অধোমুখে নিম্নে উপ-বেশন করিল।

একদা কোনও কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, তুল-সীকে কহিলেন;—"রামচন্দ্রে পূর্ণব্রহ্মের দ্বাদশ কলামাত্র ছিল, কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ-চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ। অতএব আপনি পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা না করিয়া রামকে ভজনা করেন কেন? (১) তাহা শুনিয়া

(১) যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—ভগবান্ বিষ্ণু সনৎকুমারের শাপে মর্ত্ত্যে অজ্ঞানা-বতার রামরূপে অবতীর্ণ হন। অজ্ঞানাবতার অর্থাৎ তিনিই যে, পূর্ণব্রহ্ম, তাহা তিনি নিজে জানিতেন না। এই অজ্ঞানটুকুর জন্য, রামচন্দ্রে

তুলসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ;—আপনি ভালই বলিলেন। আমি এ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে অযোধ্যার সামান্য রাজকুমার বলিয়াই জানিতাম। আপনি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাঁহার উপর আমার ভক্তিকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিলেন। এখন তাঁহাকে আর কিরূপে ছাড়ি? আরো দেখুন! চন্দ্রমার পূর্ণতা যেমন ষোল কলায়, সূর্য্যদেবের পূর্ণতা তেমনি দ্বাদশ কলায় (২)। চন্দ্রকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে ষোলকলা থাকায়, তিনি যেমন পূর্ণ, সূর্য্যকুলসূর্য্য রঘুনাথে বার কলা থাকায়, তিনিও তেমনি পূর্ণ (৩)। উভয়েই "পূর্ণব্রহ্ম।" ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রতিভ হইয়া, তুলসীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদা কাশীধামে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জানিয়া, তাঁহার সহিত বিচারে কেহই সাহসী হইলেন না। উক্ত পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে কে যোগ্য হইবেন, ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতেরা শিবমন্দিরে গিয়া ধন্না দিলেন, রাত্রিকালে প্রত্যেকেই প্রত্যাদেশ পাইলেন যে,—তুলসীদাস উহাঁর সহিত বিচারে সমর্থ। অনন্তর পণ্ডিতসভায় বিচারার্থ তুলসীদাস উপস্থিত হইলেন। সমাগত সভ্যগণকে তাম্বূল দিয়া অভ্যর্থনা করা শিষ্টাচার। তথায় পাঁচটীমাত্র তাম্বূল ছিল, কিন্তু সভ্যসংখ্যা অনেক। তুলসী সেই পাঁচটী তাম্বূল লইয়া শিষ্যহস্তে দিয়া কহিলেন,—প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া তাম্বূল দাও, অভাব হইবে না। শিষ্য সেই পাঁচটী তাম্বূল একজনকে দিবামাত্র, তাহার হস্তে আর পাঁচটী তাম্বূল আসিল। এইরূপে সে সমস্ত লোককে পাঁচটী করিয়া তাম্বূল বিতরণ করিল, এবং শেষে তাহার হস্তে পাঁচটী তাম্বূল শেষ রহিল। এই ঘটনা দর্শনে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত অবাক্ হইয়া তুলসীর চরণে পতিত হইলেন। তুলসী তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন ;—"আপনি পাণ্ডিত্যাভিমান ও বাগ্‌বিতণ্ডা ছাড়িয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করুন।" অনন্তর তাঁহার হস্তে একখানি রামায়ণের পুঁথি দিয়া কহিলেন ;—ভক্তিভাবে ইহা পাঠ করুন, আপনার সকল সংশয় দূর হইবে।

"বিশ্বাসেই হরি মিলে, তর্কে বহুদূর।"

ভক্তকবি কবির, যাঁতায় গোধূমচূর্ণ হইতেছে দেখিয়া, বলিয়াছিলেন;—"এই ব্রহ্মাণ্ড একটী যাঁতাস্বরূপ, ভুবন ও গগন,

ষোলকলা ঈশ্বরত্বের চারিকলার ন্যূনতার কথা উক্ত বৈষ্ণব ঠাকুরের অভিপ্রেত।

(২) "দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ" ;—সূর্য্যদেব দ্বাদশ আত্মায় পূর্ণ। ঐ দ্বাদশ আত্মার নাম যথা ;—

"ধাতাঽর্য্যমা বিধাতা চ ত্বষ্টা পূষা চ ভারত।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।"
(হরিবংশ)

—(১) বিবস্বান্, (২) অর্য্যমা, (৩) পূষা, (৪) ত্বষ্টা, (৫) সবিতা, (৬) ভগ, (৭) ধাতা, (৮) বিধাতা, (৯) বরুণ, (১০) মিত্র, (১১) শত্রু, (১২) অতিতেজা। এই দ্বাদশরূপ সূর্য্যেই এক একটী প্রতিবর্ষে দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে উদিত হন।

যাঁতার দুইখানি পাট; জীবরূপ শস্য সকল ইহার মধ্যে পড়িয়া বিচূর্ণিত হইতেছে, কেহই অখণ্ড থাকিতেছে না। কবীরের এই উক্তি খণ্ডন করিয়া তুলসী বলিয়াছিলেন;—

"চলতি চক্কি সব্ কোই দেখে, কীল্ দেখে না কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়কে রহে, সাবেৎরহা হেয় ওই॥"

—ঘূর্ণিত যাঁতা হইতে শস্য চূর্ণ হইয়া বাহির হইতেছে, ইহাই সকলে দেখিতেছে, কিন্তু ঐ যাঁতার মধ্যস্থলে যে কীলক (খোঁটা) নিহিত আছে, তাহা কেহই দেখে না। ঐ কীলকের বাহিরের শস্য সকলই চূর্ণ হইতেছে; যে সকল শস্য ঐ কীলককে আশ্রয় করিতেছে, তাহারা অখণ্ড রহিয়াছে।

সেই সচ্চিদানন্দ হরি সর্ব্বজীবের অভয়-দাতা—একমাত্র আশ্রয়। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, এ সংসার-যন্ত্রে চূর্ণ হইতে হয় না। তাঁহার আশ্রিতেরা এ ভব-সাগর অবহেলে উত্তীর্ণ হয়। (ক্রমশঃ।)

রমণী-রত্নমালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

(বীরাঙ্গনা বিশ্‌পলা।)

সা বিশ্‌পলা বীরবরাগ্রগণ্যা
বিচ্ছিন্নপাদা যুধি শক্রশস্ত্রৈঃ।
বিনির্ম্মমে লৌহপদং যদর্থে
স আশ্বিনেয়ঃ সুরবৈদ্যরাজঃ॥

—বীরনারী-অগ্রগণ্যা বিশ্‌পলা কামিনী,
বেদে বিঘোষিত যার বিক্রম-কাহিনী,
যে করিল শত্রুসনে সংগ্রাম ভীষণ,
রিপু-শস্ত্রে ছিন্ন তার হইল চরণ;
দেববৈদ্যরাজ সেই অশ্বিনীকুমার,
নিরমিয়া দিল লৌহ-চরণ তাহার।

প্রাচীন ভারতের বীরনারীগণের বীরত্বের কথা পাঠ করিলে, ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ঋক্-বেদে উল্লিখিত আছে,—শত্রুগণ আসিয়া এই আর্য্যভূমিকে আক্রমণ করিলে, এ দেশের বামাগণ শস্ত্রধারণপূর্ব্বক ভীম বিক্রমে সংগ্রামে অগ্রগামিনী হইতেন। স্বদেশ-রক্ষার্থে তাঁহারা প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন। কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্তা, কেহ যুদ্ধোপকরণের বহনাদি কার্য্যে নিযুক্তা, কেহ আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইতেন। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে রাজার কল্যাণসাধন করিতেন। প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন রোম প্রভৃতি রাজ্যে অনেক সময়, বামাগণের সহায়তায় রাজ্যরক্ষা হইয়াছিল। ভারতের রাজভক্তি চির-প্রসিদ্ধ। "মহতী দেবতা হেষা নররূপেণ

তিষ্ঠতি"—রাজা নররূপিণী মহতী দেবতা, এ মনুবাক্য ঈশ্বরবাণীর ন্যায় পালিত হইত। রাজকার্য্যে সমরোন্মুখী সহস্র সহস্র বীরনারীর কণ্ঠোত্থিত সিংহনাদে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইত। তৎকালের অস্ত্রচিকিৎসার অদ্ভুত উৎকর্ষের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋক্-বেদের ১৫ ঋক্, ১ম মণ্ডল, ১১৬ সংখ্যক সূক্তে 'বিশ্‌পলা' নাম্নী রমণীর কথা এই-রূপ উল্লিখিত আছে ; যথা—

"চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্
আজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ
ধনে হিতে সর্ত্তবে প্রত্যধত্তম্॥"

ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা যথা ;—অগস্ত্যপুরোহিতঃ খেলো নাম রাজা তস্য সম্বন্ধিনী বিশ্‌পলা নাম স্ত্রী, সংগ্রামে শত্রুভিঃ ছিন্নপদা আসীৎ। পুরোহিতেন অগস্ত্যেন স্তুতৌ অশ্বিনৌ রাত্রৌ আগত্য আয়োময়ং পাদং সমধত্তাম্। তদেতদাহ—'আজা'—আজৌ, সংগ্রামে, অগস্ত্যপুরোহিতস্য খেলস্য রাজ্ঞঃ সম্বন্ধিন্যাঃ বিশ্‌পলাখ্যায়াঃ, 'চরিত্রং'—চরণম্, 'বেরিব'—বেঃ পক্ষিণঃ পর্ণং পতত্রম্ ইব, 'অচ্ছেদি হি'—পুরা ছিন্নমভূৎ খলু। হে অশ্বিনৌ! যুবাং অগস্ত্যেন স্তুতৌ সন্তৌ, 'পরিতক্ম্যায়াং'—রাত্রৌ, আগত্য, 'সদ্যঃ'—তদানীমেব, 'সর্ত্তবে'—সর্ত্তুং গন্তুম্ ইত্যর্থঃ, বিশ্‌পলায়ৈ 'আয়সীং'—লৌহময়ীম্, 'জঙ্ঘাং'—জঙ্ঘোপলক্ষিতং পাদম্, 'প্রত্যধত্তম্'—সন্ধানম্ একীকরণমিত্যর্থঃ, কৃতবন্তৌ।"

—অর্থাৎ—খেলনামক এক রাজা ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। সেই রাজার পত্নীর নাম বিশ্‌পলা। শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে, শত্রুকর্ত্তৃক বিশ্‌পলার একখানি চরণ ছিন্ন হইয়াছিল। রাজপুরোহিত মহামুনি অগস্ত্য সেই দিন রাত্রিকালে দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই রাত্রিতে আগমন করিয়া, লৌহময় চরণ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক, বিশ্‌পলার দেহে সংযোজিত করিয়া, তদীয় ছিন্ন চরণের অভাব পূর্ণ করিলেন। ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গের নূতন পক্ষ লাভের ন্যায়, বিশ্‌পলা নূতন চরণ লাভ করিলেন। ঋগ্বেদে ও রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের অস্ত্রচিকিৎসার এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। এ ভারতে বীরাঙ্গনার সংখ্যাও অল্প ছিল না। কিছু কাল পূর্ব্বে রাজপুতানায় কত শত বীর-নারীর উদয় হইয়াছিল।

(বিদুষী লীলাবতী ও খনা।)

ধন্যা লীলাবতী সাঽখিলবুধমহিতা ভাস্করা-
চার্য্যপত্নী
যস্যা লীলায়তে ধীরতিশয়গহনেঽপ্যঙ্ক-
শাস্ত্রস্য তত্ত্বে।
নারীরত্নং খনা সা বহুবিধগণনাশ্চর্য্য-
বৈদগ্ধ্যপূর্ণং
গেহে গেহে যদীয়ং প্রচরতি বচনং সর্ব্ব-
কার্য্যেষু নিত্যম্॥

—বিখ্যাত ভাস্করাচার্য্য-পণ্ডিত গৃহিণী
ধরাধন্যা লীলাবতী প্রতিভারূপিণী ;
দুরূহ গণিততত্ত্ব-নিরূপণে যার
অদ্ভুত বুদ্ধির লীলা জগতে প্রচার।
খনাদেবী এদেশের রমণীরতন,
অসংখ্য বিষয়ে যাঁর আশ্চর্য্য গণন;
বিচিত্র কৌশলপূর্ণ খনার বচন—
গৃহে গৃহে সর্ব্বকার্য্যে মানে সর্ব্বজন।

(বিক্রমাদিত্য মহিষী বিদুষী ভানুমতী।)

আসীদ্‌বিদুষীকুলমৌলিভূষা
শ্রীবিক্রমাদিত্যনরেশপত্নী
যা বুদ্ধিবিদ্যাপ্রতিভাপ্রভাভিঃ
মহীপতের্মূর্ত্তিমতীব লক্ষ্মীঃ ॥

—বিদুষীর শিরোমণি রাজ্ঞী ভানুমতী,
বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য রাজা যার পতি ;
বুদ্ধিবিদ্যাপ্রতিভাপ্রভাবে সেই সতী
আছিলা রাজার যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।

মহিষী ভানুমতীর বুদ্ধি, বিদ্যা ও প্রতিভার প্রভাবে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অনেক সময় অনেক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। দুরূহ রাজ্যতন্ত্রবিষয়ক মন্ত্রণাস্থলে মহিষী উপস্থিত থাকিতেন। কোনও গুরুতর কার্য্য তাঁহার সম্মতি ও পরামর্শ বিনা স্থিরীকৃত হইত না। তাঁহার পরিণাম-দৃষ্টি অতি আশ্চর্য্য ছিল। কোনও কার্য্যের ফলাফল তিনি অগ্রেই বলিতে পারিতেন। এজন্য সকলে তাঁহার দৈব-শক্তি স্বীকার করিত। মন্ত্রিগণ এবং স্বয়ং মহারাজ মহিষীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তৎকালে সমস্ত ভারতভূমির উপর বিক্রমাদিত্যের একাধিপত্য ছিল। ভারতের এবং অন্যান্য দেশের বাছা বাছা গুণিরত্নে তাঁহার সভা অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার 'নবরত্ন সভা' ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। ঐ সভার এক একটী রত্ন এক এক বিষয়ে অতুলনীয়। উজ্জয়িনীর প্রাচীন প্রস্তরফলকে ঐ নবরত্নের নাম এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

—(১) ধন্বন্তরি ; (২) ক্ষপণক ; (৩) অমরসিংহ, (৪) শঙ্কু ; (৫) বেতালভট্ট ; (৬) ঘটকর্পর (৭) কালিদাস ; (৮) বরাহমিহির ; (৯) বররুচি। এই নবজন সুধীবরের কৃতি ও কীর্ত্তি বিদ্যমান। অহো ! বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল এ জগতে কি গৌরবময়, কি পুণ্যময় যুগ !—যে যুগে জগতের অদ্বিতীয় কবি কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধন্য বিক্রমাদিত্য ! ধন্য তোমার সভাসদ কালিদাস! মহাপ্রলয়েও তোমাদের কীর্ত্তি লয় পাইবে না। কথিত আছে,—বিক্রমাদিত্যের চতুরঙ্গিণী সেনার সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ছিল। মহিষী সমস্ত সেনার ও সমস্ত আয় ব্যয়ের পরিদর্শন করিতেন। প্রধান প্রধান যুদ্ধে রাজাকে সুপরামর্শ দিবার নিমিত্ত মহিষী রাজার সঙ্গে থাকিতেন। স্বয়ং আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা

ও তত্ত্বাবধান করিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট সাহায্য, সান্ত্বনা ও উৎসাহ পাইত।

(ধরণী-গৌরব, রোমনারী ভিটূরিয়া দেবী।)

স্বদেশরক্ষার্থমদাদ্ বলিং যা
প্রাণাধিকং পুত্রমকুণ্ঠচিত্তা।
ভিটূরিয়া সাঽক্ষয়পুণ্যকীর্ত্তিঃ
রোমাঙ্গনা গৌরবমঙ্গনানাম্॥

রোমনারী ভিটূরিয়া নারীশিরোমণি,
যাহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিছে ধরণী;
স্বদেশরক্ষার তরে অম্লান হৃদয়ে,
শত্রুহস্তে দিলা বলি প্রাণের তনয়ে।

পূর্ব্বকালে রোমরাজ্যে দুইটী সম্প্রদায় ছিল;—প্লীবিয়ান্ বা সাধারণ দল, এবং পেট্রিসিয়ান বা সম্ভ্রান্ত দল। রাজ্যতন্ত্রের উপর সম্ভ্রান্ত দলের অসীম প্রভুত্ব থাকায়, তাহারা জনসাধারণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। উহাদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রজাসাধারণ মিলিত হইয়া, 'ট্রিবিউন্' নামে কতিপয় বিচারপতি নিযুক্ত করিল। কোরাইলেনস্ নামে এক মহাপ্রভাব যুবক সম্ভ্রান্তদলের কন্সল্ ছিলেন। কন্সলেরা রাজ্যের এক-প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার কন্সল পদ-প্রাপ্তি বিষয়ে সাধারণ দল বাধা দিয়াছিল। এজন্য সাধারণদলের উপর তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ। রোমে একদা ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় সিসিলি হইতে রোমে শস্য আনীত হয়। কিন্তু কোরাইলেনস্ দুর্ভিক্ষপীড়িত সাধারণদলকে উক্ত শস্য দিতে নিষেধ করায়, এবং ট্রিবিউন্দিগকে অপমান করায়, সাধারণদলের সমবেত চেষ্টায়, তিনি রোমের মহাসভা কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে চির নির্ব্বা-সিত হইলেন। তিনি রোমের চিরশত্রু ভলসিয়ান্দিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে তিনি বৈরনির্য্যাতনের জন্য স্বদেশের ও স্বজাতির সর্ব্বনাশসাধনে কৃত-সংকল্প হইলেন। অচিরে বিপুল ভল্সিয়ান্ সেনা সংগ্রহ করিয়া, ক্রমে রোমনগরের দ্বারে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তৎকালে রোমের এমন শক্তি ছিল না যে, কোরাইলেনসের ন্যায় অদ্বিতীয় সেনানীর পরিচালিত, প্রবলপরাক্রম ভলসিয়ান্ সেনাকে বাধা দিতে পারে। অবিলম্বে সমস্ত রোমবাসী অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত হইবে। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক ও প্রধান প্রধান বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকেরা কোরাই-লেনসের নিকটে গিয়া কাতরভাবে দয়া ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কোরাইলেনসের পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন রোমনগরের গৃহে গৃহে তুমুল আর্ত্ত-নাদ উঠিল। সেই সঙ্কটকালে নগরের মহিলাগণ সমবেত হইয়া কোরাইলেনসের জননীর নিকট গিয়া বলিলেন, দেবি! এ সময় আপনি কৃপা না করিলে আর রক্ষা নাই। এ রাজ্য এখনি মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। এক প্রাণীও বাঁচিবে না। আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এখনি আপনার পুত্রের শিবিরে চলুন। আপনার পুত্র যতই নিষ্ঠুর হউন, যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, তাঁহার নিকট জননীর কাতরোক্তি ও

অশ্রুবারি কথনই উপেক্ষিত হইবে না। মহাপ্রাণা বিটুরিয়া তৎক্ষণাৎ নারীবৃন্দের সহিত পুত্রের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জননীকে দেখিয়াই কোরাইলেনস সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভিটুরিয়া পুত্রকে বাহুপাশে বক্ষে দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক, অশ্রুধারায় তদীয় দেহ প্লাবিত করিয়া কহিলেন ;—বৎস ! রোম রক্ষা কর, নহিলে আমি এখনি প্রাণত্যাগ করিব। বৃষ্টিধারায় দাবানলের ন্যায় জননীর অশ্রুধারায় পুত্রের সে প্রদীপ্ত বৈরানল তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল। কোরাইলেনস কহিলেন ;—"মা! আপনি রোম রক্ষা করিলেন, কিন্তু আপনার পুত্রকে হারাইলেন।" সে সময় রোম ধ্বংস না করিয়া ফিরিলে, ভলসিয়ান্‌দের হস্তে নিজের অতি নিষ্ঠুর ভাবে মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও, কোরাইলেনস্ জননীর কাতরোক্তি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

জগত্যজেয়া খলু মাতৃশক্তিঃ
মাহেশ্বরী শক্তিরিবাপ্রমেয়া।
সর্ব্বক্ষয়ং দণ্ডমপীহ মৃত্যোঃ
যস্যাঃ প্রভাবো বিফলীকরোতি ॥

মাতৃশক্তি এ জগতে অজেয়া অসীমা,
ঐশী শক্তি সম যার অমেয় মহিমা ;
যে করাল কালদণ্ডে বিশ্বনাশ হয়,
মাতৃশক্তি তাহাকেও করে পরাজয়।

(ক্রমশঃ)

জাপানী পরীর গল্প

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে সে তাঁহাকে নিতান্ত ভাল মানুষের মত করুণকণ্ঠে মিষ্টবচনে তুষ্ট করিতে লাগিল। ওবাছান বেচারী নিতান্ত সরল মানুষ, মিথ্যা ও ছলচাতুরীর রহস্য তিনি কোন দিন জানিতেন না। এবারে তিনি শৃগালের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইলেন। তাহার বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিলেন এবং সে নীচে নামিলে তাহার নিকট যবচূর্ণের পাত্র সরাইয়া দিয়া কহিলেন,—"ভালো, তবে অল্পক্ষণের জন্য করো।"

দুষ্ট শৃগাল এখন বন্ধনমুক্ত। তাহার অভিসন্ধি সফল করিবার এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সে তাহার প্রতিশ্রুত যবচূর্ণ করা দূরে থাকুক, তৎক্ষণাৎ ওবাছানের মাথার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই তাঁহাকে বধ করিল! তার পর সে নিজে অবিকল ওবাছানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া * ঠিক সেই বাড়ীর কর্ত্রীটির মত সেখানে ওজিছানের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল। ওজিছান সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন ; তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই বাড়ীতে কি হইয়াছে।

* জাপানের সাধারণ সংস্কার, এই সকল পশু স্বেচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে।

ওজিছান ডাকিলেন,—"ও ওবাছান! মাংস প্রস্তুত হইয়াছে তো? এস, ভোজন করি।"

ওবাছান মাংস আনিয়া দিলে ওজিছান আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখেন যেন ওবাছান অস্বাভাবিকরূপে সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আহা! ওজিছান, আমার নিকট সাচ্চা খবর শুনিলে আহারে আর রুচি থাকিবে না। মহাশয় শুনিতেছেন? আপনার ওবাছানকে আমি বধ করিয়াছি। যাহাকে বড় যত্নে আপনি কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শৃগালপুঙ্গব আমি।" —সে এই কথা বলিতে না বলিতে ওজিছান দেখিলেন, ছদ্মবেশী শৃগাল লেজনাড়া দিয়া পলায়ন করিল।

বারান্দায় বসিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন,—ওঃ! শয়তান শেয়াল! হায়, হায়, আমার স্ত্রী বেচারীকে সত্য সত্যই সে বধ করিয়াছে! আহা, তাঁহার বিহনে আমি সংসারে আর কি করিব?"— এমন সময়ে তাঁহার অতি নিকটে এক মৃদু-সম্বোধন শুনিতে পাইলেন, বলিতেছে, "ওজিছান! আপনি কাঁদিতেছেন?"

ওজিছান মুখ তুলিয়া দেখিলেন, শ্বেত খরগোষ। শ্বেতখরগোষ ওজিছানের বাড়ীর নিকটে বাস করিত। সেই শৃগাল ও এই খরগোষ কত বিভিন্ন! খরগোষকে সকলেই ভালবাসিত।

ওজিছান বলিলেন,—"শ্বেতখরগোষ মহাশয়! ধন্যবাদ! হায়, আর কি জিজ্ঞাসা করেন, দুষ্ট শৃগাল আমার স্ত্রী বেচারীকে হত্যা করিয়াছে। আমার ভয়ানক অবস্থা অনুমান করুন।"

আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা শুনিয়া খরগোষ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে বলিল, "ইহা অপেক্ষা ভয়ানক আর কি হইতে পারে? সেই হত্যাকারীর শাস্তির ভার আমি লইলাম। পামর কখনই পার পাইবে না।"

ওজিছান বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! একই জাতীয় দুইটী প্রাণী পরস্পর এমন বিভিন্নপ্রকৃতি! একটী এমন সহৃদয়, আর একটী এমন পামর!" তখন খরগোষ, "আমার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন" ইহাই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

যাইতে যাইতে খরগোষ ভাবিল,—"এখনি যাইনা কেন? দেখিয়া আসি প্রতিশোধের কোনও উপায় করিতে পারি কিনা।" ইহাই বলিয়া সে শৃগালের গর্ত্তের নিকট গেল। শৃগাল মনে মনে জানে সে অসৎকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, তাই সে তখন গর্ত্তের নির্জ্জন এক প্রান্তে বড় গম্ভীর-ভাবে বসিয়াছিল। শ্বেতখরগোষ তখন শিষ্টাচারের সহিত ডাকিল,—"মহাশয়! মহাশয়! ভাল আছেন? আপনাকে তো বড় প্রফুল্ল দেখিতেছি না! এমন সুন্দর দিনে আপনি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন কেন? আমার সঙ্গে পাহাড়ে কঞ্চি সংগ্রহ করিতে আসুন না।"

শৃগাল দেখিল আর কেহ নহে, শ্বেত-খরগোষ। তখন সাহস পাইয়া কহিল,

"ভাল, তবে আপনার সঙ্গেই যাই। আমি বরং ঘরে বসিয়া কিছু অসুখই বোধ করিতেছিলাম।"

তখন উভয়ে একত্র পাহাড়ে যাইয়া সারাদিন সেখানে কঞ্চি সংগ্রহ করিল। সন্ধ্যাকালে সেগুলি পৃষ্ঠে বাঁধিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিতে লাগিল। দুইজন একসঙ্গে যাইতে যাইতে শ্বেত খরগোষ শৃগালের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে চলিতেছিল। এই সুযোগে তখন খরগোষ পশ্চাৎ হইতে অতি সাবধানে শৃগালের পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় আবদ্ধ কঞ্চিরাশির মধ্যে একটু আগুন ধরাইয়া দিয়াছে! দুই মিনিটের মধ্যেই শৃগাল ডাকিয়া কহিল,—"খরগোষ মহাশয়, পট্‌পট্ শব্দ ও কি শুনি?"

অবলীলাক্রমে খরগোষ উত্তর করিল,—"বাঃ আপনি জানেন না? এটার নাম পট্ পট্ পর্ব্বত। তাই এই পাহাড়ের পথে চলিতে চলিতে আমিই বলিয়া যাইতেছি 'পট্ পট্ পট্ পট্'।"

শৃগাল কহিল,—কিন্তু মহাশয়, আমি যে এখন আমার কাণের কাছে হু হু শব্দ শুনিতেছি!"

খরগোষ বলিল,—"তাহাও যথার্থ। এই পাহাড়ের দুইটী নাম আছে। আমি দুই নামই উচ্চারণ করিতেছি—"প্রথমে পট্ পট্, তার পর হু হু।" কিন্তু ততক্ষণে কঞ্চির আগুন শৃগালের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে। সে তখন চীৎকারস্বরে "ওরে আমি আগুনে পুড়িয়া মরিলাম" বলিয়া বেগে ছুটিতে লাগিল

খরগোষ মনে মনে বলিল,—"ইহাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি!" কিন্তু মৌখিক সে শৃগালের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চাতে থাকিয়া শৃগালের পিঠের উপর আগুনে বাতাস দিতেছিল। শৃগাল আগুনের জ্বালায় অস্থির হইয়া আগুন নিভাইবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাহার গর্ত্তের মধ্যে গেল। খরগোষ আর সেদিন তাহার অনুসরণ করিল না, পরদিন যাইয়া শৃগালের সংবাদ লইল।

খরগোষ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"শৃগাল মহাশয়! আহা! আপনার গাত্রের অনেকখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, না? আজ আপনি কেমন আছেন?

শৃগাল। ওঃ খরগোষ মহাশয়! কাল আমার কি ভয়ানক বিপদই গিয়াছে!

খর। আহা! তাই ত, এই ঔষধটি আপনার জন্য আনিয়াছি। দগ্ধ স্থানে মালিস করিয়া দেখিবেন তো।

শৃগাল। আপনার বড় দয়া। যদি বলেন এখনই মালিস করি।

সে ঔষধ বটে! ঘায়ের উপর দিবামাত্র শৃগালের সর্ব্বাঙ্গ যেন নূতন আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। জ্বালায় ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া সে লাফাইতে লাগিল।

খরগোষ সে দিন আর অধিক কিছু করিল না। বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু ইহাতেই সে দুষ্ট শৃগালের যথেষ্ট শাস্তি হইল মনে করে নাই। শৃগালের পাপ জীবনের বিনিময়ে সে নিরপরাধ

ওবাছানের হত্যার প্রতিশোধ লইবে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। এমন সময়ে একদিন সে দেখিতে পাইল শৃগাল তাহার দিকে আসিতেছে।

খর। ভাল, ভাল, শৃগাল মহাশয়! কেমন আছেন? আর একবার ভ্রমণে যেতে হবে না কি?

শৃগাল। আর পট্ পট্ পর্ব্বতে নয়!!

খর। না, না, তা আর নয়। সমুদ্রতীরে চলুন না?

শৃগাল। আচ্ছা, তাতে বেশ আমোদ হবে।

খর। হঁ্যা, বেশ হবে। আমি নৌকা প্রস্তুত করি। তার পর উভয়ে সমুদ্রে নৌকা-দৌড় খেলার বাজি রাখা যাবে।

খরগোষ অবিলম্বে দুইখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। একখানি নিজের জন্য, সে খানি কাষ্ঠের; আর একখানি শৃগাল মহাশয়ের জন্য, সে খানি শুধু মাটির; কিন্তু দেখিতে খুব শক্ত ও কাজের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়।

কয়েক দিন পরে শৃগাল আসিয়া বলিল,—"খরগোষ মহাশয়! আপনার নৌকা তৈয়ার কতদূর?"

"প্রস্তুত, চলুন! অবিলম্বে রওনা হওয়া যাক্" বলিয়া খরগোষ শৃগালকে নৌকা দেখাইল। তখন মহা উৎসাহে দুইজনে রওনা হইয়া সমুদ্রতীর হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল—শ্বেত খরগোষ কাঠের নৌকায়, শৃগাল মাটির নৌকায়।

ক্ষুদ্রতরণীর উপর দিগন্তব্যাপী জলরাশিতে ভাসিতে ভাসিতে খরগোষ বলিল, "কি সুন্দর!"

শৃগালও মাথা নাড়িয়া বলিল,—"যথার্থ! এমন প্রশান্ত দিনে সমুদ্রবক্ষে নৌকা-ভ্রমণ বড় সুন্দর!"

"কিন্তু মহাশয়," খরগোষ বলিয়া উঠিল, "এমন ধীরে ধীরে দুইজন পাশাপাশি চলায় একটুও মজা নাই। চলুন আমাদের দুই নৌকার দৌড় হোক্।"

শৃগাল। বহুতাচ্ছা! কিন্তু দেখবেন যেন ঠিক্ এক সঙ্গে ছাড়া হয়। এই—এক, দুই, তিন।

শৃগাল ও খরগোষের নৌকা ছুটিল। দুইজনের প্রাণপণ ক্ষেপণী সঞ্চালনে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়াছে। কিন্তু শৃগালের যে মাটির নৌকা! ক্ষণকালমধ্যেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল, তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল।

শৃগাল চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিল,—"গেলাম রে, গেলাম রে! খরগোষ মহাশয়! থামুন থামুন! আর না, আমার নৌকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তখন খরগোষ নৌকা থামাইল এবং শৃগালের সেই নিমজ্জমান নৌকার অদূরে নিজের নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল,—"ওরে পাপিষ্ঠ শৃগালের ধাড়ী! নিরপরাধ ওবাছানকে কে হত্যা করিয়াছিল? সেই মহাপাপের প্রতিশোধ লইবার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। পট্ পট্ পর্ব্বত ও

সেই দগ্ধক্ষতের ঔষধ, এ সব তোর শাস্তির এক এক অংশ; আর আজ তাহার শেষ।”

ইহা বলিয়া শাস্তিদাতা খরগোষ দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে দাঁড় তুলিয়া ধরিয়া শৃগালের মৃন্ময় নৌকায় এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা সহিত শৃগালের দেহ সমুদ্রের অতল জলে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল।

সাধু প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া শ্বেত খরগোষ যথাকালে ওজিছানের নিকট উপস্থিত হইয়াছে ও সকল সংবাদ বলিয়াছে। ওজিছান, পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া, এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন এবং সেই উপলক্ষে সকলের সম্মুখে শ্বেত খরগোষকে আপনার পরম উপকারী সুহৃদ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া সুখী হইলেন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়

জাপানের অভ্যুদয়।

ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি! অধ্যবসায়ের কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি! সংশিক্ষার মধ্যে কি অদ্ভুত সঞ্জীবনী! তিনটিই যেন এক; সেই অব্যক্ত ত্রিমূর্ত্তি।—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (God, Holy ghost, Spirit).প্রত্যেক জাপানী যেন ত্রিমূর্ত্তিতে অনুপ্রাণিত। প্রত্যেক জাপানীর দেহে ইহারা অনুক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদিগকে উন্নতির চরমসীমায় প্রধাবিত করিতেছে। ব্রহ্মা ধর্ম্মমূলক সংশিক্ষার দ্বারা জাপানীর হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছেন; বিষ্ণু কিরূপ চেষ্টায় ও কি স্বার্থত্যাগে তাহারা কর্ত্তব্য পালনে ও দেশ রক্ষণে সক্ষম হইবে তাহাই নির্দ্ধারিত করিতেছেন; রুদ্রমূর্ত্তি সেই কর্ত্তব্যপালনের ফল প্রকটন করিয়া জগৎকে দেখাইতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, জাপানে উন্নতির পথ এত অল্পদিনে প্রসারিত হইল কিরূপে? কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি সামরিক কি শিল্পচাতুর্য্য, কি শিক্ষা, সকল বিষয়েই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হইল? কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছি,—লোকে বলিত,—“অসভ্য জাপান;” এখন সেই অসভ্য, অশিক্ষিত জাপানই সভ্য-জগতের শিক্ষার আদর্শ হইতে চলিল। “যাহাকে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্বপদতলে,” সেই আজি কুলকামিনীর কণ্ঠাভরণ হইতে চলিল। তখন ছিল জাপান লৌহময়, এখন সেখানে কাঞ্চনের খনি। এখন তাহারা পরশপাথর পাইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া যে দ্রব্য স্পর্শ করিতেছে, তাহাই স্বর্ণে পরিণত হইতেছে। ইহা তাহারা একদিনে প্রাপ্ত হয় নাই; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছে; তন্ময়চিত্ত হইয়া যোগাভ্যাস করিয়াছে; মুখে রক্ত উঠিয়াছে,

মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়াছে; কতদিন অনশনে কত রাত্রি জাগরণে কেটে গেছে, তাই আজি তাহারা স্বীয় পরিশ্রমের অমৃতময় ফল ভোগ করিতেছে। আপনি খাইতেছে, অপরকে খাওয়াইতেছে। অনাটন হইলে আপনি অনশনে থাকিয়াও ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন দিতেছে। স্বদেশীর মুখ শুষ্ক দেখিলে আপন মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। বৃদ্ধা মাতাকে একা গৃহে রাখিয়া দেশরক্ষার্থে পুত্র যুদ্ধে যাইতে পারিতেছে না দেখিয়া, মাতা স্বহস্তে আপন বুকে শাণিত ছোরা বসাইয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তরায় ঘুচাইয়া দিতেছেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই প্রগাঢ় ধর্ম্মবলে বলীয়ান্—দুরতিক্রম কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদ্দীপ্ত। কর্ত্তব্য সাধনার্থ তাহারা সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে, এমন কি, দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নয়, "হয় যদি বিবর্দ্ধিত স্বদেশ-গৌরব"।

এক্ষণে পূর্ব্বের জাপানের অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই এই অভ্যুদয়ের কারণ নির্দ্ধারিত হইবে।

জাপানের সম্রাট্‌কে কোটে (Kwotei) বলে। সাধারণতঃ বৈদেশিকগণ তাঁহাকে মিকাদো বলেন। বর্ত্তমান সম্রাটের নাম মুসিটো (Mutsuhito)। তিনি ১৮৬৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার শাসনের প্রতি বর্ষকে মেয়জি (Meizi) বলে। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে একাধিক রাজা রাজত্ব করিতেন এবং জাপান অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকলেই আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেন। ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে, এমন কি বর্ত্তমান সম্রাটের অভিষেকের সময়েও—সমগ্রদেশে অশান্তি বিরাজিত ছিল। উচ্চশ্রেণীর হস্তে সাধারণ লোকে অতিশয় কঠোরভাবে নিগৃহীত হইত। তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ছিল না। রাজা প্রজার মধ্যে প্রাণের টান ছিল না। রাজা প্রজাকে ও প্রজা রাজাকে অকপটচিত্তে বিশ্বাস করিত না। সকলেই আপন আপন স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। রাজার বাৎসল্য ও প্রজার রাজভক্তি অতীব শিথিল ছিল। বর্ত্তমান জাপানসম্রাট্ সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার পূর্ব্বে কিয়োটো (Kioto) একটী যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই যুদ্ধের গোলাগুলি অজস্রভাবে রাজপ্রাসাদে বর্ষণ করা হইয়াছিল। এই ঘটনা আলোচনায় ইংলণ্ডের মধ্যযুগের কথা মনে হয়।

বর্ত্তমান সম্রাটের পূর্ব্বে শতাব্দী ধরিয়া সোগানদিগের (Shogun) সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তখন সামরিক কোন কার্য্যের উপর সম্রাটের হাত ছিল না। এখনকার মত জাপানী সৈন্য শিক্ষিত ছিল না। তখন গুণের আদর অপেক্ষা স্বীয় পক্ষাবলম্বীর আদর ছিল। তবে, অতি প্রাচীন কালে সম্রাট্ ও

সাম্রাজ্ঞী পর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধে সেনানায়ক হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। রাজারা সকল বিষয়ে নিজে লক্ষ্য রাখিতেন না। পূর্ব্বে শিল্পের যদিও বিশেষ উন্নতি হয় নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা কতকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তবে এখন জাপানে যেরূপভাবে বিদ্যা অর্থকরী ও সম্পদের আকর হইয়াছে, তখন ইহার এক আনার কমও ছিল কিনা সন্দেহ। এ সকল বিষয় আমরা পরে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব।

এখন জাপানে যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা ও দেশহিতৈষী বিদ্বান্ মন্ত্রণাদাতা ও ধর্ম্মমূলক শিক্ষা। মিকাদোর ন্যায় প্রজারঞ্জন, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, অধ্যবসায়ী, পাঠানুরক্ত; সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী রাজা অতি বিরল। তিনি মর্য্যাদা রাখেন; রাজাহিতৈষীর পুরস্কার দেন। তিনি (Gakumonjo বা) বৈঠকখানায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি সর্ব্বদা প্রজার মঙ্গলচিন্তায় ব্যস্ত। জাপানে যত সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার অনেকগুলিই রাজবাটীতে যায়, সম্রাট্ তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বয়ং পাঠ করেন; সুতরাং বাহিরের খবর তাঁহার বড় একটা অগোচরে থাকিতে পায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবাদও অবগত হইবার জন্য তিনি অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রজাহিতৈষিতা তাঁহারই লিখিত পদ্য হইতে অবগত হইতে পারা যায়। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন।

"Inishiye no
Fumi miru tabiri
Omoo Kana
Ohoga osamuru
Kuni waikanito"

Whenever I open
The ancient Books
The one thing I ponder is,
How goes it with the people I rule.

যখনই আমি কোন প্রাচীন পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করি, তখনি আমার নজরে প্রজাগণ কিরূপ সুখে আছে, এই কথাই মনে হয়। প্রজাই রাজার প্রাণ, সুতরাং রাজাও প্রজার প্রাণ। রাজাও প্রজার সুখের জন্য সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন। প্রজারা রাজার জন্য প্রাণ দিতে কাতর নহে। ভালবাসার প্রতিদান আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এখন জাপানে দেশহিতৈষীর অর্থ রাজভক্ত, রাজভক্তের অর্থ দেশহিতৈষী। তাঁহার অধিরোহণের সময়ে অন্যান্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে Iwakura একজন প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। Iwakura ইউরোপ ও আমেরিকায় দূতভাবে ভ্রমণ করিয়া ঐ সকল দেশের রীতিনীতি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিজ্ঞ ও পাশ্চাত্যনীতিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রণাদাতা। এই সকল মহাত্মাদিগের

নিকট হইতে তিনি প্রজাগণের রাজভক্তি দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ পবিত্র উপায় সকল অবগত হইয়াছিলেন।

তিনি নিজ খেয়ালে কথনও অনুপযুক্ত মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন না, কিম্বা উপযুক্ত লোককে বিদায় দেন না। রাজ্য ও প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাঁহার অপ্রিয় হইলেও তিনি তাহার নিয়োগে বাধা দিতে চেষ্টা করেন না।

পূর্ব্বে জাপানি সম্রাট্‌গণ কথনও মন্ত্রণাদাতাদিগের মৃত্যুকালে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের বাটী যান নাই। ইহাতে তাঁহারা অপমান বোধ করিতেন এবং ইহা অতি ঘৃণাজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাট্ ভিন্ন প্রকৃতির লোক; Prince Sando and Iwakura—র মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট্ স্বয়ং তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান President of the house of Peers, Prince Iyesato Tokugawa বহুদিবস ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কোনও রাজকার্য্যের আন্দোলন হইলে রাজা ধীরভাবে সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং শেষে দুই চার কথায় তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ মত সকল ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইংলণ্ডে Parliament মহাসভায় প্রায়ই যেরূপ তুমুল কাণ্ড হইতে শুনা যায়, এখানে সেরূপ কিছু হয় না। সকল কার্য্য ধীরভাবে পরিচালিত হয়। জাপানের প্রজারা রাজাকে দেবতা ও প্রাণের বন্ধু বলিয়া জানেন, তাঁহাকে বাঘ ভালুকগোছের একটা মনে করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকেন না। প্রজারা রাজাকে দেবতা মনে করেন। রাজার মনে অশান্তি হইলে প্রজা কথনও সুখে থাকিতে পারে না এরূপ সকলের ধারণা। এইরূপ ভাবে যে দেশে শান্তির উপর রাজ্য সংস্থাপিত, সে দেশে সুখের অভাব হইবে কেন ?

(ক্রমশঃ)

এই সেই।

"সে আজ এক যুগের কথা" (সৌধ অট্টালিকা, তাহার উত্তর পূর্ব্ব কোণে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার ধারে বিকশিত কামিনী-কুসুম-তরুমূলে চিন্তা সখী সহ গতানুশোচনায় ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট,) "প্রিয়তমা সহদোরা, স্নেহময়ী জননী এবং জীবন-সমুদ্রে একমাত্র ভেলা, আপদে বিপদে দোসর, সংসার-সমরে সারথি, ভ্রমণে অনুচর, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর। সকলেই একে একে কালকবলে নিপতিত হইলেন ; অপত্য ও জামাতৃশোকে হৃদয় দগ্ধীভূত ! এ সংসারে, এ অশান্তির আগারে আর বাস করা ভার। বিধির কি অবিচার ! আজ কোথায় সহোদর সহোদরা, পুত্র কন্যা সহ মনের আনন্দে দিন যাপন করিব এবং বৃদ্ধা মাতার চরণসেবা করিয়া হৃদয়ে অপার সুখ

অনুভব করিব, না আমি আজ প্রিয়জন হারাইয়া সংসার মরুভূমিবৎ দেখিতেছি! এক ঘোর অমানিশায় এইরূপ চিন্তানলে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলাম। সুকুমারমতি কনিষ্ঠা কন্যা বড় আদরের মেয়ে। তাহার মুখে একবার দক্ষিণ হস্ত বুলাইলাম, আর মনে মনে বলিলাম আমার স্বর্ণপ্রতিমাখানি, আর কি কখন তোকে দেখিব! প্রিয়তমা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম, এই কণ্টকময় সংসারারণ্যে বিচরণকালে আমার পায়ে কণ্টকাঘাত লাগিবে এই ভয়ে কত সময় তুমি বুক পাতিয়া দিয়াছ। আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত। কাল কেহ আমার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে কে উহু বলিবে? তুমি স্বর্ণলতিকার ন্যায় ক্রমবৎ আমাকে প্রেমে বন্ধন করিয়াছিলে। আজ প্রবল শোকঝটিকাঘাতে আমি তোমার প্রেম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিলাম। কাল তুমি ভূতলে লুণ্ঠিতা হইবে, কে তোমাকে ধরিয়া তুলিবে? আমার শরীরের কোন স্থান মশকদষ্ট দেখিলে তোমার হৃদয়ে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ; কাল বিজন বনে আমাকে সর্পে দংশন করিলে, কে চাহিয়া দেখিবে? প্রিয়তমে—না, ও সম্বোধন আজ আমার সাজে না; আমি তোমাকে সংসার-পাথারে কাণ্ডারীবিহীন তরীর ন্যায় ভাসাইয়া যাইতেছি, আমার হৃদয়ে কি ভালবাসার লেশমাত্র আছে—অভাগিনি! আমি চলিলাম,! স্ত্রী ঘুমের ঘোরে আলস্য ভাঙ্গিয়া "হুঁ" শব্দ করিলেন, আমি উহাই বিদায় মানিয়া লইলাম।

এক পা ঘরে, অন্য পা দরজার বাহিরে। ঘোর অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে আবার বৃষ্টি পত্রোপরি পতিত হওয়ায় ঝর ঝর শব্দ উত্থিত হইতেছে। ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সাহসে বুক বান্ধিয়া মনে মনে বলিলাম, কিসের ভয়? মরিবার? আমার বাঁচিয়া আর সুখ কি? মরিলেই তো আমার শান্তি। তখন গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। বহির্দ্বারে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কমণ্ডলু লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা গ্রহণ করিলাম। বাহিরের ঘর হইতে অগ্রজের ভগ্ন যষ্টি লইলাম। পৃষ্ঠে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দক্ষিণ হস্তে যষ্টি, বাম হস্তে কমণ্ডলু। ভাবিলাম এখনও সাজ পূর্ণ হয় নাই। অন্দর বাটীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে গৃহিণী নিত্য উনানের ছাই ফেলেন, তথায় গিয়া সর্ব্বশরীরে বেশ করিয়া বিভূতি লেপন করিলাম। এখন সাজ পূর্ণ হইল বুঝিলাম।

যদি বাটীর কেহ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে আমি আটক পড়িব, এই ভাবিয়া দ্রুতপদে বাটী হইতে নির্গত হইলাম। রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। কিছুদূর গিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় তালগাছ। একটা রাত্রিচর পেচক সুদীর্ঘ তালগাছের উপর হইতে বলিতেছে;—"সুন্দরি! বুঝলুম;" অন্য একটী পেচক নিকটবর্ত্তী বাঁশবন হইতে উত্তর দিতেছে; "বুঝলুম।" আমি সন্ন্যাসীর বেশে সংসার ত্যাগ করিয়া

যাইতেছি,—সেই কথাই উহারা বলাবলি করিতেছে, আমি ইহাই বুঝিয়া লইলাম। অল্পক্ষণমধ্যে নদীতীরে বাজারের ঘাটে পৌছিলাম। ভাবিলাম বাটীর কেহ আমার অনুসরণ করিতে পারে, অতএব নদী পার হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ঘাটে একখানি পানসি নৌকা বাঁধা ছিল। নিকটে গিয়া বলিলাম, "মাঝি আমাকে নদী পার করিয়া দিবে?" এত রাত্রে সন্ন্যাসী দেখিয়া মাঝির মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। মাঝি উত্তর করিল,—"হা ঠাকুর।" সহজে নদী পার হইলাম। পারে উঠিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। কত খাল, বিল, মাঠ, ময়দান, জনপদ পশ্চাতে রখিয়া, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম।

এখন সূর্য্যদেব উদয়-গিরি হইতে নিজ কিরণজাল বিস্তার করিয়া পূর্ব্ব গগনে উদয় হইবার আয়োজন করিতেছেন। বিহঙ্গকুল কিচির মিচির, বিশেষতঃ বায়স "কা" "কা" রবে সূর্য্যদেবের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

পল্লিগ্রামে কাঁচা রাস্তা। গত রাত্রে অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় কাদা হইয়াছে। নগ্ন পদে চলা অভ্যাস নাই, তাহাতে আবার রাস্তায় কাদা, বড় কষ্ট হইতেছে। এখন আমায় কে দেখিবে, কাহার হৃদয় আমার ব্যথায় ব্যথিত হইবে। যাহারা আমাকে আমার বলিত, যাহারা আমার দুঃখে দুঃখিত হইত, তাহারা সকলেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর নিদারুণ বিধির অবিচারে যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। বাকি যাহারা আছে তাহারা কোথায়? আমি তাহাদিগকে অনেক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আজ তাহারা নিরাশ্রয়, আমি পথের ভিখারী।

বেলা দশটা। আমি প্রতিদিন ৯টার সময় আহার করি। আহারের সময় অতীত হইয়াছে, ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল। পিত্তে পেট গুড় গুড় করিয়া উঠিল, পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। আর চলিবার শক্তি নাই, বসিয়া পড়িলাম। ক্ষণেক বিশ্রামের পরে অদূরে একটী সরোবর দেখিতে পাইলাম। ধীরে ধীরে সরোবরে অবতরণ করতঃ দুই চারিটী মৃণাল তুলিয়া তাহার কিয়দংশ দ্বারা জঠরানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ করিলাম। তীরে উঠিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি শয়ন করিলাম।

পথশ্রমে এবং ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রান্তিনাশিনী নিদ্রা-দেবী অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার নয়ন যুগল আবৃত করিয়া বসিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমাইলাম।

এখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্ন-তপন খরতর অগ্নিশিখা বর্ষণ করিতেছেন। অশ্বত্থ গাছের ভিতর দিয়া সূর্য্যদেব উকি মারিয়া আমার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বোধ হইল যেন সূর্য্যকিরণে উদ্দীপ্ত এক খণ্ড আতসী কে আমার চক্ষের উপরে ধরিয়া রাখিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, অন্য একজন সন্ন্যাসি-বেশধারী তেজোময় পুরুষ আমার শিয়রে বসিয়া ধূমপান করিতে-

ছেন। উঠিয়া বসিলাম। কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ ধৌত করিলাম। আগন্তুক ভদ্রতার সহিত সসম্ভ্রমে ধূমপানার্থ কলিকাটী আমার হস্তে দিলেন। আমি ধূমপানে অনভ্যস্ত। ধূমপান করা সন্ন্যাসীর একটা লক্ষণ। সন্নাসী সাজিয়াছি. সন্ন্যাসীর সহিত মিশিতে হইলে ধূমপান আবশ্যক। যাহা হউক, ভদ্রতার অনুরোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, কলিকাটায় দুই এক বার মুখ বুলাইয়া দিলাম। সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপে বুঝিলাম তিনিও এখন আমার সহিত এক পথের পথিক। পথের সঙ্গী মিলিল। সন্ন্যাসীর সহিত প্রেমালিঙ্গন করিয়া মিত্রতা পাতাইলাম। সন্ন্যাসী তখন প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন—"যতদিন এই সংসারে থাকিব তোমার সহিত থাকিব, তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

দুইজনে বহুদিন কাশি, দ্রাবিড়, মথুরা প্রভৃতি নানা স্থানে পর্য্যটন করিলাম। কখন বৃক্ষমূলে, কখন বা গিরিগুহায়, কখন জঙ্গলে, কখন বা লোকালয়ে বাস করিতাম। আমরা সাধারণতঃ ফল মূল আহার করিতাম। লোকালয়ে কেহ কখন দুগ্ধাদি দিলে গ্রহণ করিতাম। আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হইলে ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীকে দেখিলে তাহাকে না দিয়া আহার করিতাম না। আহারান্তে ভক্ষ্য দ্রব্য কিছু অবশিষ্ট থাকিলে পশুপক্ষীদিগকে যত্নপূর্ব্বক উহা প্রদান করিতাম। (ক্রমশঃ)

বামাবোধিনীর বার্ষিক সভা

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২৮শে ভাদ্র, রবিবার, ৯নং আণ্টনি বাগান লেনস্থ ভবনে "বামাবোধিনী" পত্রিকার ষষ্ঠ-চত্বারিংশ জন্মোৎসব-সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভায় উপস্থিত—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন, সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
„ সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
„ ত্রৈলোক্যনাথ দেব।
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র, শোভাবাজার রাজবাটী।
„ কিশোরীমোহন রায়, কাকিনা।
„ নৃত্যগোপাল সরকার।
„ বিপ্রচরণ বসু, কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীমতী শ্যামকুমারী দেবী।
„ বিরাজমোহিনী দেবী।
„ প্রেমলতা দেবী।
„ শান্তশীলা মজুমদার।

এবং অন্যান্য সদস্য ও মহিলাবৃন্দ।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত সূর্য্য-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঈশ্বরোপাসনা

করিলে পর, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। পণ্ডিতপ্রবর সভাপতি মহাশয়ের জ্ঞান-গর্ভ, মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের অন্তরে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদ্রেক হইল।

"অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কোনও পত্রিকা ভারতে প্রচারিত হয় নাই, যখন স্ত্রীজাতি পশ্বাদির ন্যায় ঘোর মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, স্ত্রী-জাতির বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা অতীব অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া যখন সাধারণের কুসংস্কার ছিল, তখন "বামাবোধিনী" প্রথম আবির্ভূতা হইয়া, ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায়, অশিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাবৃন্দের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে শিক্ষার নবালোক বিকীর্ণ করিয়া, ক্রমে সমগ্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয়! কিন্তু যিনি অক্লান্ত যত্ন ও অটল অধ্যবসায় সহকারে ঐ দীপশিখার জ্যোতি বঙ্গীয় রমণী জাতির হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টায় সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন, তিনি কোথায়! মহিলাজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে জীবনোৎসর্গকারী সেই মহাত্মা উমেশচন্দ্র আজ কোথায়! তিনি স্বদেশের অনন্ত মঙ্গলের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, এক্ষণে নিত্যানন্দ অমরধামে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তাঁহার প্রশান্ত, পাবন মূর্ত্তি আর আমরা দেখিতে পাইব না! ভাবিতে গেলে বিষাদরূপ ঘনটঘায় হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তিনি এই ভারতের ভাবী মঙ্গলের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত এই মহোপকারের জন্য মহিলা-সমাজ তাঁহার নিকট অনন্ত কাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে। যদি কাহারও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রতিদানেচ্ছার উদ্রেক হয়, তবে তাঁহার প্রিয় বস্তু, তাঁহার যতনের ধন, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত—বামাবোধিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে এবং অকপট-চিত্তে ইহার মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দেখান হইবে। স্বদেশের ও স্বদেশের নারীকুলের অকপট বন্ধু, সাধুকার্য্যমাত্রেই সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ, দীনবন্ধু, মাতৃভূমির সর্ব্বস্ব ধন, সেই ক্ষণজন্মা ধর্ম্মবীরের কৃতি ও কীর্ত্তিরক্ষণে এবং তৎপ্রদর্শিত পুণ্যমার্গের অনুসরণে যদি আজি দেশবাসীরা উদাসীন থাকেন, তবে বুঝিব, এ দেশের সমুন্নতি এখনও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে।" ইত্যাদি।

বামাবোধিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন এবং উহার সর্ব্বত্র বহুল প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে, এ দেশের বামাকুলের যে কিরূপ প্রযত্ন ও উদ্যম প্রদর্শন করা উচিত, তাহা সভাপতি মহাশয় নিজ মর্ম্মনিঃসৃত জ্বলন্ত ভাষায় সকলকে বুঝাইলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সদস্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বামাবোধিনীর উন্নতি-কল্পে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রেমভাব জাগরিত হওয়ায় কেহ কেহ নিজ আত্মীয় বন্ধুদিগকে বামাবোধিনীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া

দিয়া তাঁহাদের নিকট পত্রিকা পাঠাইতে কার্য্যাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন।

মহিলাগণ সুললিত ভগবৎসঙ্গীতে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিলে পর, বামাবোধিনীর প্রতি সভাপতি মহাশয়ের অক্লান্ত যত্ন ও প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্য এবং মহিলাগণকে সাদরসম্ভাষণে পুলকিত করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, ও কচি আমরুলপাতা,—প্রত্যেককে সমভাবে লইয়া, থেঁতো করিয়া উহার এক ছটাক রস লইবে, এবং উহা মাটির পাত্রে করিয়া অগ্নির উত্তাপে বসাইলে, উহার শিটে পৃথক্ হইয়া নির্ম্মল রস নিম্নে থাকিবে। ঐ রস মিছরির গুঁড়ার সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় এক ঝিনুক মাত্রায় সেবন করিবে।

২। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—ইষফগুলের ভুষি ১০ তোলা, মিছরির গুঁড়া ১০ তোলা একত্র করিয়া, সমভাগে ২০টী পুরিয়া করিবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় উহার এক এক পুরিয়া সেবন করিবে।

৩। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ—থড়েল নারিকেলের শাঁস এক ছটাক ও দধি এক ছটাক পরিষ্কার শিলে উত্তমরূপে পিষিয়া, আর এক ছটাক দধির সহিত মিলাইয়া, প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

৪। টাকের ঔষধ—কাঁটানটের শিকড় পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া শিলে বাটিয়া এক তোলা পরিমাণ প্রস্তুত করিবে। উহা টাকের স্থানে অন্ততঃ ১০ মিনিট করিয়া ঘর্ষণ করিবে। প্রত্যহ নূতন করিয়া উহা প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রস্তুত করা ঔষধ ডেলা পাকাইয়া, স্নানের সময় পর্য্যন্ত টাকের স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। টাকের স্থান সমস্তই যাহাতে ঔষধ দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপে লাগাইয়া রাখিবে।

৫। পালাজ্বরের মহৌষধ—কাঁকড়ার গর্ত্তের উপরের মাটি লইয়া, জ্বরের দিন প্রাতে বাসিমুখে ঐ মাটি দ্বারা চন্দনের ন্যায় নাসাগ্র হইতে কপালের উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ফোঁটা করিবে।

কাঁকড়ার গর্ত্তের উপর একপ্রকার মাটি জমিয়া থাকে। ঐ মাটি পুকুরের ধারে বা মাঠে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়।

৬। বমননিবারণের ঔষধ—চালিতার কুঁড়ির রস ১ তোলা পরিমাণ সেবনে সর্ব্বপ্রকার বমন নিবারিত হয়।

৭। হাত পায়ের জ্বালা—দধির ননি (মাখম) অর্দ্ধপোয়া ও তুঁতে ।০ আনা, উত্তমরূপে একত্র মিশাইয়া, ফেটাইয়া, প্রত্যহ ৩।৪ বার হাত পায়ে মালিস করিবে।

৮। অর্দ্দিতরোগ অর্থাৎ নাক, মুখ, চোখ, ঘাড় যাহাতে বাঁকিয়া যায়। ঐ রোগে, দুই কোয়া রশুনের সহিত মাখম প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া সেবন করিলে, উক্ত রোগের উপশম হয়।

বেদান্তদর্শনের কিঞ্চিৎ আলোচনা।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের ন্যায়, বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিও দুঃখবাদে। জীবের জীবত্ব-জ্ঞানই এই দুঃখের আকর। বাইবেলে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়া আদি মানুষ যেমন পাপী হইল, সেইরূপ বেদান্তমতে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবিয়া এই দুঃখের বোঝা মাথায় করিল। তবে বেদান্তদর্শনকার ইহাকে জ্ঞান বলেন নাই, ইহাকে অজ্ঞান বা মায়া বলিয়াছেন। ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জীবে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু কোথা হইতে এক অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়া আসিয়া জীবে ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান জন্মাইয়া জীবকে মহা-দুঃখার্ণবে ভাসাইয়াছে। এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় এই মায়া বা অ-জ্ঞানের বিনাশসাধন। বেদান্তের যাহা কিছু সাধনা, তাহা এই জন্য অভাবাত্মক অর্থাৎ আমি আমাকে বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা জানিতেছি তাহা আমি নহি, আমি জীব নহি, ইহা আমার মায়িক অবস্থা। এই মায়া কিসে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য সাধনা। জীবের অজ্ঞান বা মায়া জীবকে বলিয়া দিতেছে যে, তুমি ব্রহ্ম নহ, আর জীবের জ্ঞান বলিয়া দিবে যে, জীব! তুমি জীব নহ, তুমি ব্রহ্ম, কিন্তু জীবের ঐ অজ্ঞান বা মায়া বিনষ্ট না হইলে এই জ্ঞান প্রকাশিত হইবে না। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল,—ব্রহ্ম আপনাকে মায়াভিভূত করিয়া জীব হইয়া-ছেন, সেই মায়া অপনীত হইলেই তিনি যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই হয়েন বা থাকেন। ব্রহ্ম কেন মায়া দ্বারা অভিভূত হইলেন? আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য। কার কাছে? আপনার কাছে। কেন তিনি কি আপনাতে আপনি ছিলেন না? বেদান্ত-দর্শন এ প্রহেলিকার কোনও মীমাংসা করিতে পারেন নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষরূপ দ্বৈতবাদ ঠেলিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত হইতে গিয়া তিনি মায়াবাদে জড়িত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের এক ঢেউ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে আর এক ঢেউর মধ্যে পড়িলেন। ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যা বা মায়া আসিয়া জুটিল। এ মায়া যে কি? তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন নাই—যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্ম-বিরোধী ভাব, অজ্ঞান বা অবিদ্যা। বেদান্তসার বলিতেছেন,—"মায়া ভাবরূপী কোন কিছু,

ইহা জ্ঞানের বিরোধী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে।” অথচ মায়ার কার্য্য অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মও ইহাদ্বারা অভিভূত হইলেন। এ মায়ার কথা তিনি অদ্বৈতবাদ সমর্থনের জন্য না তুলিলেও তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে দর্শনকার সৃষ্টিতত্ত্ব বা সংসারতত্ত্ব কিছুই বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। মায়া না থাকিলে সংসারও হয় না, জীবও হয় না। সুতরাং সংসারে, জীবে, ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়াকে থাকিতেই হইল। অদ্বৈতবাদের জন্য দ্বৈতবাদ আবশ্যক হইল। অদ্বৈতজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের মায়া এ দুই যদি স্বতন্ত্র কিছু হয় বা থাকে, তবে আর অদ্বৈতবাদ কিরূপে হয়? আর জীবের জন্য, সংসারের জন্য, ব্রহ্ম যদি অগত্যা বাধ্য হইয়া এই মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা অদ্বৈতবাদ কোথায় রহিল? আর এই মায়া যদি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হয়, তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমবাদ ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় এবং সংসার ও জীব তাঁহার সেই শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের লীলাক্ষেত্র হয়, যদি এ সকলের ভিতর তিনি বিরাজ করেন, তবে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। দ্বৈতাদ্বৈত মিশিয়া এক ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদে পরিণত হইল। জীবের ভ্রম আছে, দুঃখ আছে, অজ্ঞান আছে, এ সকলি সত্য। এ সংসার এবং ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহার কিছুরই উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না, স্থাপন করিলেও প্রতারিত হইতে হয়, কিন্তু তা বলিয়া এ সকল জীবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক নহে। ইহারা সকলেই শিক্ষা দান করে। বেদান্তের সেই নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি অজ্ঞেয়, অমেয় ও অচিন্ত্য, তিনি আছেন কি নাই, এবং থাকিলেই বা কিরূপ? এ সম্বন্ধে যদি কেহ কখন প্রশ্ন করিয়া থাকে, তখনই দ্বৈতবাদের পরিচয় হইয়াছে এবং এ প্রশ্নের যদি কেহ কখন কোন সদুত্তর পাইয়া থাকে, তাহা হইলেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সম্মিলন বা সামঞ্জস্য হইয়াছে। শ্রুতি, গীতোপনিষদ্ গ্রন্থে এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের প্রয়াস দেখা যায়।

ব্রহ্ম—সকল লক্ষণ, সকল বিশেষণ, সকল গুণ, সকল উপাধির অতীত হইলেও তিনি স্বপ্রকাশ, আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন। তিনি স্বরূপতঃ নিরুপাধিক হইলেও আপনার ইচ্ছা বা বিচিত্র মায়া শক্তিতে এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেন এবং আত্মজ মানবে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের পরিচয় দেন। কেবল ইহাই নহে, জ্ঞান ও ভক্তিরূপে তাহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত তাহাদের একত্ব দর্শন করাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তাঁহার এই আত্মপরিচয়ের কোথাও অন্ত হয় না। তিনি অপার ও অনন্ত। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জীব বা সংসার ভ্রম হইতেছে না। জীব ও

সংসার সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জড়ে তাঁহার শক্তি, জীবে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে৷ ফুলটী ফুটিবার পূর্ব্বে কিছু বৃক্ষের বাহিরে ছিল না, বৃক্ষের অন্তর্ভূতই ছিল, ফুটিয়া বরং বৃক্ষের বাহিরে প্রকাশিত হইল, অথচ বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নহে। সেইরূপ সংস্বরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ও জীব প্রকাশিত হইয়াছে। মানবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিতেছে।

নূতন সংবাদ

১। আশ্চর্য্য ধর্ম্মের কল—পৈসা আকবর নামক পত্রিকায় এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন;—জব্বলপুর জেলায় একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছে। কয়েক দিন গত হইল, উক্ত বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক একটী অল্পবয়স্ক ছাত্রকে, ছুটীর পর বিদ্যালয়ের এক ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তাহাকে বলেন—সে দিনের পড়া সে মুখস্থ না করিলে তাহাকে বাটী যাইতে দিবেন না। সেই বালকের গাত্রে স্বর্ণালঙ্কার ছিল। ছুটীর পর বিদ্যালয়ের সমস্ত বালক বাটী গমন করিলে, শিক্ষক বালকটীকে বিদ্যালয়ের এক নিভৃত ক্ষুদ্র ঘরে বদ্ধ করিয়া, তাহার স্বর্ণালঙ্কার হরণ করিবার জন্য, তাহাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ছুরী দ্বারা তাহাকে, বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। ছুরীখানি ভোঁতা ছিল, এজন্য বারংবার আঘাতেও বালকের প্রাণ বাহির হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। সে অসহ্য যাতনায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বালক কাতরস্বরে বলিল;—বড় যাতনা! আমাকে এরূপে না মারিয়া, একাঘাতে মারিয়া ফেলুন! অদূরে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়াছিল; বালক সেই প্রস্তর দেখাইয়া বলিল—ঐ প্রস্তর দ্বারা এক আঘাতেই আমাকে মারিয়া ফেলুন। শিক্ষক দ্রুতপদে সেই প্রস্তর আনিতে গেলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বালকটী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কয়েকজন পথিক ঐ চীৎকার শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই বালকের মুখে সকল কথা শুনিয়া, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিল ও তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিল। তাহারা শিক্ষকের নিকট গিয়া দেখিল—একটী প্রকাণ্ড কালসর্প শিলার পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া, শিক্ষকের হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বেষ্টনপূর্ব্বক, তাহার মুখের দিকে ফণাটী তুলিয়া দুলিতেছে! অবিলম্বে তথায় পুলিস আসিল। লোকজন দেখিয়া সর্পটী শিক্ষককে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। শিক্ষক তৎক্ষণাৎ পুলিসের হস্তে অর্পিত হইল, এবং বালকটীর যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল।

বালকটীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে। অহো! দয়াময়ের অচিন্ত্য লীলা কে বুঝিতে পারে? তিনি কখনও মাতৃরূপে, কখনও বা কালসর্পরূপে জীবনরক্ষা করেন।

২। রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—২৭শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, কলিকাতা, সিটিকলেজ ভবনে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৭৫ বার্ষিক পারলৌকিক স্মৃতি-সভার কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভায় অনেক গণ্য মান্য মহাত্মা উপস্থিত হইয়া,স্বর্গীয় মহাত্মার কৃতি ও কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—মহাত্মাদের ভৌতিক দেহ অদৃশ্য হইলেও, তাঁহারা শাশ্বত পুণ্যময় কীর্ত্তি-দেহে জগতে চিরজীবী।

৩। ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণের উপর ঘোরতর অত্যাচারের কথা বিবৃত করিয়া, সুরাটের প্রাদেশিক সভা বোম্বেলাটের নিকট যে প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে বোম্বেলাট তাঁহাদের প্রার্থনায় সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার উত্তরে জানা যায় যে, ইম্পিরিয়াল্ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের যথোচিত অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতেছেন। অদ্যাপি এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ইহার সন্তোষকর মীমাংসা শীঘ্র হইবে, আশা করা যায়।

৪। ২৮শে সেপ্টেম্বর, মহাত্মা স্যার জেমসেট্‌জী জিজীভয়ের পুণ্যকীর্ত্তি স্মরণার্থে বোম্বে টাউনহলে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বয়ং বোম্বেলাট মহোদয় উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক জিজীভয়ের নানা সৎকার্য্যে বিপুল অর্থদান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তদীয় পুণ্যোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধনবান্ মাত্রেরই অনুকরণীয়।

৫। ময়মনসিংহের অন্তর্গত রামগোপালপুরের জমিদার রায় যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়, ময়মনসিংহের নূতন কলেজের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই মহাত্মার এইরূপ বদান্যতার কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলময় ঈশ্বর, সপরিবার যোগেন্দ্র কিশোরকে চিরজীবী করুন। সৎকার্য্যে দানই অর্থের সার্থকতা। "তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে"।—যাহা সৎকার্য্যে প্রদত্ত না হইল; তাহা বিনষ্ট হইল।

৬। কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই অশেষ অনর্থের মূল। মানবের ধর্ম্মজীবন যাবৎ গঠিত না হয়, তাবৎ তাহার অশেষ শাস্ত্রপাঠ ও জ্ঞানার্জ্জন নিষ্ফল। এই গুরুতর অভাবের নিরাকরণজন্য পুণ্যশ্লোকা আনিবেশান্ত দেবীর অশ্রান্ত ঐকান্তিক চেষ্টায় ইংলণ্ডের বড় বড় লোকে উদ্যোগী হইয়াছেন। জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একটী সাধারণ সন্ধিস্থল বা সংযোগভূমি আছে। এজন্য, সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের যাঁহারা অকপট সমুন্নত ধার্ম্মিক, তাঁহারা সকলে একভাবাপন্ন। যতই

ঊর্দ্ধে উঠিবে, ততই চতুর্দ্দিকের ভূমি সমতল বোধ হইবে। এ বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবের প্রতিষ্ঠাই লোকসমাজের প্রকৃত শিক্ষা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

"পাপের পরিণাম"—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নবন্যাস। কি ইংরাজিভাষায়, কি বাঙ্গালাভাষায়, ইঁহার রচনাশক্তি অসামান্য। ইঁহার প্রণীত—"A Visit to Europe"নামক গ্রন্থ ইংরাজিভাষায় লিখিত এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে প্রশংসিত। ইনি ইংরাজি-গ্রন্থ-রচনায় খ্যাতিলাভে সমর্থ হইয়াও, সে পথে অগ্রসর না হইয়া যে, মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা এদেশের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। ইনি মাতৃভাষায় ক্রমশঃ অনেকগুলি উপন্যাস-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ইঁহার সকল গ্রন্থই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত, শান্ত—এক-একটী রসের অবতারণায় ও আভোগে ইনি সিদ্ধহস্ত। ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি, প্রত্যেক পদার্থেই সেই অনন্তশক্তির অপার করুণা ও মঙ্গলভাব, সর্ব্বজীবে দয়া, যথাশক্তি সকলেরই কল্যাণচেষ্টা, পাপের বিষময় পরিণাম, জীবে ও ঈশ্বরে নিগূঢ় সম্বন্ধ, নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রভৃতি অনেকগুলি বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য লইয়া ইনি মাতৃভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার প্রসাদে আমরা গভীর নীতিগর্ভ অথচ চিত্ত-বিমোহন অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লাভ করিলাম। ইঁহার বাঙ্গালা রচনা এত সরল, স্বাভাবিক, মধুর, এবং গ্রন্থ সকলের উদ্দেশ্য এত মহান্ যে, তৎপাঠে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় আর্দ্র হয়, তাহার পাপ-বুদ্ধি প্রশমিত হয়। আবার, গ্রন্থগুলিতে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সন্নিবেশ যে, পদে পদে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে থাকে, পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই "পাপের পরিণাম" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আমি সকলকেই, বিশেষতঃ বামাগণকে অনুরোধ করি। ইহাতে "সুবালা"-নাম্নী বালার চরিত্র, বস্তুতই অমৃত দিয়া নির্ম্মিত। বামামাত্রেরই ইহা অবশ্য পাঠ্য ও সর্ব্বথা অনুকরণীয়। এই গ্রন্থে বিজয় ও বিনয়ের চরিত্র, সাধুতার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর্শস্বরূপ। অরুণকিরণ কমলাকরে পতিত হইয়া যেমন পদ্মের বাহ্য, আভ্যন্তর, দল, কোষ, কেশর, পরাগ প্রভৃতি প্রত্যেক অংশকে উন্মীলিত ও সুরঞ্জিত করে; ইঁহার প্রতিভা-রশ্মি তেমনি প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকল অংশকেই অপূর্ব্বভাবে বিকশিত ও রঞ্জিত করিয়াছে।

আজি কালি, প্রেমের অপভ্রংশ বা বিকারস্বরূপ, আবেগপূর্ণ, জ্বালাময় চিত্র-

সকল জলন্ত ভাষায় চিত্রিত করিয়া অনেক গ্রন্থকার বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন। সে সকল নভেল-নাটক-পাঠের বিষময় ফল দেখিয়াও লোকের চৈতন্য হইতেছে না। আমাদের অন্তঃপুরে ও বালক-দিগের হস্তে কিরূপ ভাবের গ্রন্থ পতিত হয়, এ বিষয় অল্প লোকেই অনুসন্ধান করেন। ইহার বিষময় ফল-স্বরূপ কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে এক অদ্ভুত, আবেগময়, সমাজ-ধর্ম্ম-বহির্ভূত, কাল্পনিক জীবন পথের অনুসরণ করিয়া অনেকে বিনষ্ট হইতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়,—এই "পাপের পরিণাম" গ্রন্থখানি অসঙ্কোচে আমাদের পুত্রকন্যাগণের হস্তে দিবার সামগ্রী। বালিকা সুবালার মনুষ্য হইতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবে দয়া ও আন্তরিক সহানুভূতি, অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি সকলেরি অনুশীলন ও অনু-করণের সামগ্রী। ভারতের গৌরবস্বরূপ মহাত্মা গ্রন্থকার আমাদের সমালোচনার অতীত। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণসাধনের জন্য, ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির মহোন্নতিসাধনে দেহপাত* করিয়াছেন, স্বয়ং অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, নিজ কষ্টোপার্জ্জিত আয়ের অধিকাংশই ঐ সকল মহৎ কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বদেশের কোন্ বিষয়ে কি উপায়ে উন্নতি হয়, এই সাধনার জন্য তিনি ইউরোপের নানা স্থানের কল,কারখানা ও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-প্রণালী স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লণ্ডন-প্রদর্শনীতে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়া, উক্ত প্রদর্শনীতে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রণীত,—"The Art Manufactures of India, A List of Indian Economic Products, A Hand Book of Indian Products and Manufactures, প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ আমাদের দেশের যে কিরূপ মহোপ-কারক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার দয়াগুণে অনেকগুলি দীনহীন ব্যক্তি ও অনাথা মহিলার প্রাণধারণ হইতেছে। মঙ্গলময়, দীনবন্ধু জগদীশ এরূপ মহাত্মার জীবন নিরাময় ও অক্ষয় করুন।

বামারচনা।

পরিচয়।

তুমি স্বপ্ন কিম্বা সত্য শুধাইছে সবে ;
তুমি কি স্বপ্নেরি মত মুগ্ধ মনোহর ?
অথবা জাগ্রত সত্য চির সহচর,
ছিলে কি রয়েছ তুমি আজো এই ভবে ?

আমারে ঘেরিয়া ধরে শুধাইছে সবে,
কি বলিব নাহি জানি হাসি গো নীরবে !
তুমি কি কেবলি স্বপ্ন মধু নিশীথের ?
শুধু ক্ষণিকের মোহ তুমি চকিতের ?

দক্ষিণ পবনে মেশা ফুলের গন্ধের নেশা,
তুমি কিম্বা প্রতিধ্বনি কোকিলগীতের ?
বসন্তের ফুলবনে শুধু দেখা তব সনে,
চন্দকরে বার্ত্তা আসে তব জগতের
প্রথম উত্তর বায়ু শান্তে শরতের ?

তুমি মোর শুধুই স্বপন,
তবু যেন পড়ে মনে, করে আধ জাগরণে,
তোমারে দেখেছি গৃহকোণে,
আমার শিয়রপাশে বিজন ভবনে !
তুমি কিগো স্বপ্ন নহ শুধু জাগরণ ?

সুখে দুঃখে শ্রান্তিহীন, জীবনের প্রতিদিন,
আমার জীবনখানি করেছ বরণ ?
তুমি কি সোহাগভরে, বুকেতে রেখেছ ধরে,
আমার ভ্রমণশ্রান্ত কাতর চরণ ?
তুমি কি গো জীবনের একান্ত শরণ ?
তুমি নহ চির জাগরণ !
ক্ষণিক দর্শন তব বিদ্যুতের রশ্মি নব
দূর করে আঁধার স্বপন
নহ তুমি চির জাগরণ !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে।

আজি শুভ উৎসবের দিনে,
প্রাণ কাঁদে বিহনে তোমার ;
সবি আছে, শুধু তুমি নাই,
তোমা বিনে সব শূন্যাকার।

দেব ! তব আদরের ধন,
(আজি) বামাবোধিনীর জন্মদিনে ;
হরিষে বিষাদ সবাকার
সে বিমল স্নেহ সুধা বিনে।

বৎসরের অতীত কাহিনী,
জাগে প্রাণে হইয়া নূতন ;
আজি হায় ! কোথা আছ তুমি,
বলি, কাঁদে আমাদের মন।

সংসারের শোক তাপ ভুলি,
সুখে আছ অমর-আবাসে ;
জানি, তবু নাহি বুঝে মন
প্রাণ কাঁদে নিরাশা হতাশে।

গুরু, পিতা, জ্ঞানদাতা তুমি,
রমণীর হিতৈষী বান্ধব ;
একাধারে এত গুণ কারো—
নাহি কভু কোথা মোরা পাব ?
স্নেহমাখা সে বচনসুধা
পাইব না শুনিবারে আর ;
মধুময় সে দেবমূরতি
হেরিবে না নয়ন কাহার।
তুমি দেব ! স্বরগ হইতে,
হেরিতেছ সদাই সকল ;
আশীষ গো ! বামাবোধিনীরে,
হোক তার বাসনা সফল !
তোমার এ স্নেহের লতিকা,
রহে যেন চিরজীবী হ'য়ে ;
জীবনের কর্ত্তব্য পালন
করে সদা সানন্দে নির্ভয়ে।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 543. November, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৩ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৫। নবেম্বর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—বোম্বাইয়ে বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে তত্রত্য শ্রীযুক্ত জ্যাকব স্যাসুন ১০ লক্ষ টাকা, এবং আহামাদাবাদের শ্রীযুক্ত ছিনুভাই মাধোলাল চারি লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এ মহাদানে ইঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বোম্বাইয়ের কুমারী হামাবাই পেটিট তাঁহার মাতার স্মরণার্থ পার্শীবালিকাদের জন্য একটী অনাথাশ্রম সংস্থাপনকল্পে তাঁহার প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি সমস্ত দান করিয়াছেন। এ রমণী ভারত-জননীর আদর্শ কন্যা।

মৃত্যু—শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী নব্বই বৎসর বয়সে স্বামী পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয় গত ১৩ই অক্টোবর ৫৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

গত ২০শে অক্টোবর ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বৈদ্যনাথে জ্বরাক্রান্ত হইয়া ৬০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

ভীষণ বন্যা—গত আশ্বিন মাসে ভীষণ জলপ্লাবনে হায়দ্রাবাদ সহরে পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, পনর হাজার ঘর বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে এবং এক লক্ষ লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। বিলাত হইতে ভারতসম্রাট্ এবং সিমলা হইতে বড় লাট বাহাদুর হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। সর্ব্বত্র সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আকবর উৎসব—সিন্ধুদেশে আকবরের জন্ম হয়। গত ১৫ই অক্টোবর

আকবরের জন্মদিন উপলক্ষে করাচীতে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিসভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৭৫ বার্ষিক পারলৌকিক-স্মৃতি-সভার অধিবেশন নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে।

দেশী সূতা—দেশী কার্পাস-সূত্রের উন্নতিকল্পে বাঁকিপুরে বেহার ইণ্ডষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েসনের একটী প্রদর্শনী হইবে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। এই প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট চরকা এবং চরকায় কাটা সূতার জন্য পুরস্কার বিতরিত হইবে।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥"
(ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়)

—পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির চরণতরী সর্ব্বজীবের পরম আশ্রয়। যাঁহারা একান্তভাবে তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, কোনও বিপদেই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। এই দুস্তর ভবসাগর তাঁহাদের নিকট গোবৎসের ক্ষুদ্রতম পদচিহ্ন মাত্র। তাঁহারা যে পরম পদ লাভ করেন, তাহা শাশ্বত, আনন্দময়।

সেই শুদ্ধসত্ব সচ্চিদানন্দকে আরাধনা করিতে হইলে, কপটতা, কুহক, দুরভিসন্ধি একেবারে বিসর্জ্জন করিতে হয়। ভগবান্ দুষ্টের সহায় নহেন। তাঁহার সাধনায় ভাবশুদ্ধি ও ঐকান্তিকতা চাই। তুলসী বলিতেছেন,—

"কর্ম্ম বচন মন ছাড়ি ছল, জব লাগি
জনন ওঙ্কার।
তব লাগি সুখ স্বপনে হু নহি, কিয়ে
কোটি উপচার॥"

—হে মানব! যতদিন তুমি কপটতা বিসর্জ্জন করিয়া, কায়, মন ও বাক্য দ্বারা একান্তভাবে ভগবানকে আশ্রয় করিতে না পার, ততদিন কোটি কোটি উপায় দ্বারা স্বপ্নেও তোমার সুখের আশা নাই।

ভগবান্‌কে কিরূপ ভাবে আশ্রয় করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য তুলসী পতিব্রতা রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন ;—

"পতিপ্রিয় নারী পতিব্রতা ছাড়ত নহি
পতি লেহ।
সেওত মন বচ কর্ম্মতে পতিচরণ অতি
স্নেহ।
জয়্সে তনু ত্যজি ছাহ নহি, প্রভাত জহি
নহি ভানু।
চন্দ্র ত্যজহি নহি চন্দ্রিকা, পতিব্রতা তিয়
জানু॥"

—পতি (সহস্র দুঃখ দিলেও) পতিব্রতা পতিকে ত্যাগ করে না। সে

কায়মনোবাক্যে অতীব অনুরাগে নিয়ত পতিচরণ সেবা করে। যেরূপ দেহের ছায়া দেহকে, সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যকে ও চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পতিব্রতা প্রাণান্তেও পতিকে ত্যাগ করে না। যে ভগবানের সেবক হইতে চায়, তাহারও ঠিক্ এই ভাবে তাঁহার সেবা করা উচিত। এ সেবা নীরস নহে, এ সেবার একটী পরমাণুও বিফল হয় না। এ সেবা আদ্যোপান্ত নিরুপম মাধুর্য্যরসে পরিপ্লুত। জগতে ইহাই সফল সেবা। ভোগতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ভক্তকে বাহিরের বস্তু খুঁজিতে হয় না। সে "ঘরের মাঝে অমূল্য ধন" পাইয়া বিরলে উপভোগ করে; ক্ষণে ক্ষণে নব নব মাধুর্য্য সম্ভোগ করে। সে সম্ভোগে ক্লান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিঘ্ন নাই। যাঁহারা আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, জীবন্মুক্ত, যাঁহাদের কিছুই চাই না, তাঁহারাও এ অহেতুকী ভক্তি-সেবা ছাড়িতে পারেন না।

ভাগবতে কথিত আছে,—ভগবান্ ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করিয়া, প্রথমতঃ তাহা স্বপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। ইহা শুনিয়া শৌনকমুনি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"শুকদেব নিবৃত্তিনিরত, সম্পূর্ণ উদাসীন, জীবন্মুক্ত, আত্মারাম,—আত্মাতেই নিত্য সন্তুষ্ট, তিনি এ সুবিস্তীর্ণা ভাগবতসংহিতা অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে গেলেন কেন?" সূত কহিলেন;—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"
—ভাগবত, ১ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ১০ শ্লোক।

—ঠাকুরটী এমনি গুণের! এমনি তাঁহার আকর্ষণ! সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, আত্মারাম যোগীরাও তাঁহাকে অহেতুকী ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এ সংসারে অনেকেই ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন, তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য জপ-হোম-পূজাদিও করিয়া থাকেন, অথচ নিয়ত রোগ-শোকাদি দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, মনে বিন্দুমাত্র শান্তি পাইতেছেন না, ইহার কারণ কি? অনেকেই ভগবানের উপর এই অনুযোগ করিয়া থাকেন,—কৈ? আমি তাঁহাকে এত ডাকি, আমার বিপদ্ ত তিনি ঘুচাইলেন না। ইহার উত্তর এই যে,—তুমি ভগবান্‌কে ডাকিতেছ না, তুমি নিজ বিপদ্‌কেই ডাকিতেছ। তোমার মনটী আদ্যোপান্ত স্বার্থে ও কপটতায় পরিপূর্ণ। তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে, তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, সকল দুঃখের শান্তি হয়, এটী অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু সেই স্মরণ ও সেই আহ্বান অন্তর্ভেদী হওয়া চাই। রোগার্ত্ত শিশু যেরূপে জননীকে আহ্বান করে, তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যে কণ্ঠে জলধরের নিকট বারিধারা প্রার্থনা করে, ভুজঙ্গধৃত ভেক যে স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, সেই তৃষ্ণা ও সেই আকুলতা চাই। তুমি ডাকিতে জানিলে, তোমার ডাক, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত

বাণের ন্যায় চক্রভেদ করিয়া লক্ষ্য বেধ করিবে। দ্রৌপদীর ন্যায় শান্তিদেবী স্বয়ং আসিয়া তোমাকে বরণ করিবেন। আহা! বাল্যের সেই অতীত ঘটনা আজি স্মরণ হইতেছে! শৈশবে রাত্রিকালে যখন পিতা মাতার যুগল বক্ষে সংলগ্ন হইতাম, তখন পিতৃদেব আমার জননীকে হর-গৌরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির কথা বলিতেন। মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব ভগবৎসঙ্গীত শুনাইতেন; সে সঙ্গীতে পাষাণও দ্রব হয়। সে সঙ্গীতের প্রভাব অদ্যাপি হৃদয়ে জাগিতেছে। পিতামাতার একটী প্রিয়তম সঙ্গীত এ স্থানে উদ্ধৃত হইল;—

"মম মানস! ডাক তারা মারে। (ধুয়া)
মন ঐক্য কোরে, প্রাণ ঐক্য কোরে।
পূরিয়া রসনাযন্ত্র ডাক তারা মহামন্ত্র
যে নামে মুক্তি দিতে পারে।"

রে মানব!—তুমি সর্ব্বেন্দ্রিয় একীভূত করিয়া, মন-প্রাণকে একতানে একস্বরে বাঁধিয়া, রসনাযন্ত্র ভরিয়া, মহামন্ত্র তারানাম গান কর, নির্ব্বাণ পাইবে। ভগবৎসাধনায় মন-প্রাণ-বাক্যের একতা ও ভক্তির গভীরতা থাকিলে সিদ্ধিবিষয়ে সংশয় নাই। দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে লোকের সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী গবেষণার ফল ব্যর্থ হইতে পারে। যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একদিন নিঃসংশয় সত্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাই আবার মিথ্যারূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু সরল প্রাণে নির্ম্মল ভক্তিমাত্র সম্বল লইয়া, ভগবানের আরাধনা করিলে, তাহা কস্মিন্ কালেও বিফল হইবার নহে। এ সাধনায় সিদ্ধি স্বসংবেদ্য। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, সাধক স্বয়ং তাহা অন্তরে বাহিরে অনুভব করেন। যেমন মধুমাসের উদয়ে তরুলতায় বসন্তলক্ষ্মীর কমনীয় চিহ্নসকল প্রকাশ পায়, প্রকৃতিদেবীর অভ্যন্তর হইতে মধুধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তেমনি, হৃদয়ে সেই প্রেমময়ের উদয় হইলে, সাধকের সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের ন্যায়, তাঁহার এক অপূর্ব্ব জন্মান্তর উপস্থিত হয়! চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুর ন্যায় তাঁহার হৃদয় প্রেমানন্দে উচ্ছলিত হইতে থাকে।

তুলসী বলিতেছেন;—

"মনক্রম বচন নেম করি, ভজন করত
অতি প্রীত।
তবে বাঢ়ত হরিভক্তি দৃঢ়, উপজত প্রেম
পুনীত॥
পুলক দেহ তব হোত হয়, হরিগুণ গাওত
গান।
গদগদ গিরা তব হোত হয় বহত নীরনিদান॥
তব হরিভক্তি সো জানিয়ে হোত কৃতারথ
নেম।
এহি বিধি যাকো হোত, হয় উর অন্তর
দৃঢ় প্রেম॥"

—কায়মনোবাক্য একীভূত করিয়া পরমপ্রীতিভরে শ্রীহরির ভজনা করিলে,

সাধকের হৃদয়ে হরিভক্তি বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির আবির্ভাবে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা, বদনে গদগদ ভাষে হরিগুণগান এবং সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ আবির্ভূত হয়। যাঁহার এ দশা ঘটে, তাঁহার অন্তরে হরিভক্তি জন্মিয়াছে, জানিও। যে ভাগ্যবানের এই প্রেম-ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি ভগবানের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় ও অভিন্নদেহ। এ বিষয়ে তুলসীর উক্তি, যথা ;—

"ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম, বপু এক।
ইন্‌কে পদ বন্দন করৈ, নাশৈ বিঘন অনেক ॥"

—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ ও গুরু, এ চারিটী বস্তু নামমাত্রেই ভিন্ন, বস্তুতঃ একই পদার্থ। ভক্তের চরণ বন্দনা করিলে অশেষ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন ;—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

—সাধুরা আমার হৃদয়, আমিও সাধুদের হৃদয়। তাহারা আমা বিনা আর কিছু জানে না, আমিও তাহাদের বিনা আর কিছু জানি না।

৮ কাশীধামে সাধনার প্রথমাবস্থায় তুলসী সমস্ত দিবাভাগ জপে মগ্ন থাকিয়া, সায়ংকালে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া আসিবার সময় এক ময়রার নিকট কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভিক্ষা করিতেন। ময়রা পরমাদরে তাঁহাকে মিষ্টান্ন দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত। তুলসী দিনান্তে ঐ মিষ্টান্নের কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া পুনরায় জপে মগ্ন হইতেন। একদিন ঐ ময়রা দোকানে উপস্থিত ছিল না, তাহার ভ্রাতা ও কর্ম্মচারীরা ছিল। তুলসী তাহাদের নিকট মিষ্টান্ন প্রার্থনা করায়, তাহারা অতি রুক্ষ ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল ;— ওরে ভণ্ড ভেকধারি! লোভী সন্ন্যাসি! রোজ রোজ মজা পেয়েছিস্! চলিয়া যা, আর আসিস্ না।" ঐ তিরস্কারে তুলসী মরমে মরিয়া গেলেন, ভাবিলেন,—সত্যই ত আমি লোভী, উহারা ঠিক্ বলিয়াছে। আর কদাচ এ দুষ্কর্ম্ম করিব না। শ্রদ্ধাদত্ত অযাচিত তণ্ডুলকণা যদি সপ্তাহেও এক দিন মিলে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। অনন্তর তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একটী নিভৃত শিবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত তিরস্কারে তাঁহার নির্বেদ ও যোগতৃষ্ণা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি সেই মন্দিরের মধ্যে ক্রমে মহাযোগে মগ্ন হইলেন। একভাবে একাসনে প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এদিকে সেই ময়রা তুলসীদাসকে আসিতে না দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইল। যখন জানিতে পারিল, তাহারই লোকেরা সন্ন্যাসীকে গালি দিয়া তাড়াইয়াছে, তখন সে মর্ম্মাহত ও মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর শপথ করিল ;— "যাবৎ সেই সন্ন্যাসীকে আহার করাইতে না পারি, তাবৎ জলগ্রহণ করিব না।"

সে অনশনে থাকিয়া নিরতিশয় কাতরভাবে সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিস্তীর্ণ কাশীক্ষেত্রের প্রতি মঠে, প্রতি ঘাটে, প্রতি মন্দিরে, প্রত্যেক স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। ক্রমে প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল; অহোরাত্র দারুণ উৎকণ্ঠায়, অনশনে ও অনিদ্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে কঙ্কালশেষ হইল, তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। শেষে সংবাদ পাইল, এক সন্ন্যাসী অমুক শিবালয়ে মহাসমাধিতে নিমগ্ন আছেন; প্রায় এক সপ্তাহ একভাবে আছেন, আহারাদি করেন নাই। তাঁহাকে আহার করাইবার জন্য বিবিধ মিষ্টান্ন লইয়া দলে দলে নরনারী তথায় যাইতেছে (১)। এই সংবাদ পাইয়াই ময়রার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল,—উনি আমারি সন্ন্যাসী। ভগবান্ নিশ্চয় এ হতভাগ্যের উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। উনি যে আমারি ঠাকুর, উনি ত আর কাহারও নহেন; উনি আমারি—আমারি—আমারি. এই বিশ্বাসে সে অন্ধ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে তৎক্ষণাৎ বাছা বাছা মিষ্টান্ন মাথায় করিয়া, উন্মত্তভাবে সেই মন্দিরের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল,—সেই পরিচিত সন্ন্যাসী যোগমগ্ন, তাঁহার নয়নদ্বয় স্পন্দহীন, দেহ পাষাণবৎ নিশ্চল। তথায় এরূপ নিবিড় জনতা যে, তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে যাওয়া অসাধ্য ব্যাপার। যোগাবসানে তাঁহাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছে। ময়রা ভিড় ঠেলিয়া যাইতে অক্ষম হইয়া কাতরপ্রাণে মনে মনে ভগবান্কে ডাকিতে লাগিল। সে আজি সপ্তাহ উপবাসী; সন্ন্যাসী আজি তাহার হস্তে ভোজন না করিলে তাহার মৃত্যু অবধারিত। তাহার হৃদয়ের সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ভগবানের নিকট পঁহুছিল। যোগদর্শী মহাত্মারা বলিয়া থাকেন;—

"ভেরী যোজনশব্দা চ স্ফূর্য্যা দ্বাদশযোজনা।
ভক্তান্তর্গতশব্দস্তু ক্ষণাদাক্রম্যতে জগৎ॥"

ভেরী যন্ত্রের শব্দ এক যোজন দূর গমন করে, বজ্রধ্বনি দ্বাদশ যোজন গমন করে, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ের কাতরধ্বনি ক্ষণমধ্যে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়, উহা চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়। তাই তাহার সে আর্ত্তনাদ ভগবানের নিকট পঁহুছিল; ভগবানের আসন টলিল। তখন তুলসী-হৃদয় ভগবান্রূপ আধারেই সংলগ্ন। আধার টলিলে আধেয়ও সেই সঙ্গে টলিতে থাকে। যেই ভগবানের আসন টলিল, অমনি তুলসী হৃদয় বিচলিত হইল, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া

(১) যোগমগ্ন সন্ন্যাসীর যোগাবসানে তাঁহাকে আহার করাইলে, বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। এজন্য সে সময় তাঁহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত অনেকে যত্ন করে। তিনি প্রথমে যাহার হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহার মহাপুণ্য লাভ হয়। সন্ন্যাসী সেই খাদ্যের অধিকাংশ বিতরণ করেন, স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করেন।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরে সেই ময়রাকে গলদশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে দীন-ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, তাহাকে সম্মুখে আনাইলেন। হে দয়াময়! হে ঠাকুর! এ দাসকে দয়া করুন, ক্ষমা করুন, আমার প্রাণ যায়, আমার মিষ্টান্ন ভোজন করুন, বলিতে বলিতে সে তুলসীর পদতলে পতিত হইল। তুলসী তাহাকে তুলিয়া, স্নেহমধুরবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাহার মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া তাহাকে ভোজন করাইলেন। তদবধি সে তাহার চির-সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি দীনসেবায় দান করিয়া, তুলসীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিল। সেই অযাচিত রাশি রাশি মিষ্টান্ন উপস্থিত দেখিয়া, নিম্নলিখিত দোঁহা তুলসীর মুখ হইতে বহির্গত হইল;—

"বিন্ধ্য ন ইন্ধন পাইয়ে, সায়র জুরে ন নীর।
পড়ে উপাস কুবের-ঘর, যও বিপক্ষ রঘু-বীর॥

তুলসী মাঙত না মিলে চূণ।
যব কৃপা হুয়ে ভগবানকে
তব লুচই দুনো জূণ॥"

—ভগবান্ প্রতিকূল থাকিলে, বিন্ধ্য পর্ব্বতেও একখানি ইন্ধনকাষ্ঠ মিলে না, সমুদ্রেও বারিবিন্দু মিলে না, কুবের-ভবনেও অর্থাভাবে উপবাস ঘটে। দেখ! তুলসী যখন আহার চাহিল, তখন একটী খুঁদও জুটিল না। কিন্তু যখন ভগবানের কৃপা হইল; তখন রাশি রাশি মিষ্টান্ন আসিয়া জুটিল। তিনি বলিতেন—মায়াই জীবের অশেষ ক্লেশের নিদান। ঈশ্বর তোমা হইতে যত দূরে থাকিবেন, তোমার মায়া ততই বাড়িয়া যাইবে, আবার ঈশ্বর যতই সন্নিহিত হইবেন, মায়া ততই সঙ্কীর্ণ হইবে। ঈশ্বর যখন তোমার অন্তিকতম হইবেন, তখন তুমি মায়াকে পদদলিত করিয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে তাঁহার একটী সুন্দর দোঁহা আছে, যথা;—

"রাম দুরী মায়া বঢ়তী, ঘটতী জান মন মাহ।
ধূরী হোতী রবি দূরী লখি, শিরপর পগতর ছাঁহ॥"

ভগবান্ যত দূরে থাকেন, মায়া ততই বাড়িয়া যায়। দেখ! সূর্য্য তোমা হইতে যত দূরে থাকেন, তোমার ছায়া ততই বাড়িয়া যায়; সূর্য্য যত কাছে আসেন, ছায়া ততই কমিয়া যায়। (মধ্যাহ্নে) সূর্য্য যখন তোমার মাথার উপর, তখন তোমার ছায়া তোমার পদতলে লীন হয়। আবার দেখ!—সূর্য্যের দিকে তুমি সম্মুখ করিলে, ছায়া তোমার পিছু হটিয়া যায়, এবং সূর্য্যের দিকে তুমি পশ্চাৎ করিলেই ছায়া তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা সমাধিবলে সেই অচিন্ত্যবৈভব ব্রহ্মজ্যোতিকে অন্তিকতম করিয়াছেন, তাঁহাকে আপন আত্মায়

বাঁধিয়াছেন, "তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী, তদ্ভিন্ন, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই ;—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

(ক্রমশঃ)

রমণী-রত্নমালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

(কাশ্মীররাজ তুঞ্জীনের মহিষী বাক্‌পুষ্টা।)

বাক্‌পুষ্টা করুণেব বিগ্রহবতী
কাশ্মীররাজপ্রিয়া
দম্পত্যোঃ সুকৃতাবলী বিজয়তে
বিশ্বম্ভরাপাবনী।
যৌ দুর্ভিক্ষকরালরাক্ষসমুখগ্রস্ত-
প্রজারক্ষণে
সর্ব্বস্বং নিজজীবিতং চ যুগপৎ
ত্যক্তুং পণং চক্রতুঃ॥

—তুঞ্জীন কাশ্মীররাজ দয়া-অবতার,
বাক্‌পুষ্টা করুণাময়ী মহিষী তাঁহার ;
যাঁদের সুকৃতকীর্ত্তি ঘোষিছে ভুবন,
চিরজয়ী যাঁহাদের অমর জীবন।
হইল কাশ্মীরে যবে দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
রাজা রাণী প্রজাতরে সঁপিল জীবন ;
তাঁদের সুকৃতে প্রীত হ'য়ে পরমেশ,
অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা করিল সে দেশ।

প্রাতঃস্মরণীয়া নারী বাক্‌পুষ্টা কাশ্মীরপতি তুঞ্জীনের মহিষী ছিলেন। তিনি পতির সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পতির অদ্বিতীয় সহায় হইলেন। এ সংসারে বিপদ্ ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেন তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষার জন্যই রাজ্যে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। একদা ভাদ্রমাসে অকস্মাৎ ঘোর তুহিনপাত হওয়ায়, দেশের পাকোন্মুখ শালিশস্য সমস্তই হিমানীগর্ভে নিমগ্ন হইল। সেই সঙ্গে প্রজার জীবনাশাও বিনষ্ট হইল। ক্রমে রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইল। অন্নাভাবে দিন দিন অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়া রাজদম্পতী প্রজারক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। যে যেখানে অনাহারে মুমূর্ষু, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া অন্নদান করিতে লাগিলেন। প্রজার জন্য বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রমে রাজকোষ ও মন্ত্রিগণের সর্ব্বস্ব নিঃশেষিত হইল। মহিষী গাত্রের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া দিলেন ; রাজভবনে মৃৎপাত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল। মহিষী কাঙালিনীর বেশে আলুলায়িত কেশে গৃহে গৃহে অন্নমুষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। পিতা মাতা অপত্যপ্রেম, জায়া-পতি দাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নর, নারী, সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। যাহারা

জীবিত, তাহারা কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ; এক মুষ্টি অন্ন লইয়া মাতা-পুত্রে বিবাদ বাঁধিল। সমস্ত দেশ যমপুরীর ন্যায় ভয়ানক হইল। সেই লোমহর্ষণ সময়ে, গভীর নিশীথে, একদা নরপতি শয়নকক্ষে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহিষী দুর্দ্দৈবশান্তিকামনায় ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্না ছিলেন, পতির রোদন শুনিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—দেবি! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় না। আমারি কোনো পাপে প্রজার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। যাহা কিছু উপায় ছিল, সকলি নিঃশেষ হইল। দেখ! চক্ষের উপর কত মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে! শিশুগুলি মাতার বিবশ বাহুপাশ হইতে স্খলিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমার সেই অমরাবতী কাশ্মীর আজি মহাশ্মশান! এ স্থান হইতে পলাইয়া কাহারও প্রাণরক্ষার উপায় নাই, হিমসঙ্ঘাতে নির্গমপথ রুদ্ধ। দেবি! আমার প্রাণাধিক প্রজার এ সর্ব্বনাশ দেখিতে পারি না ; আমি জ্বলন্ত হুতাশনে এ দেহ আহুতি দিব। নরপতি এইরূপ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মহিষীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দভাবে ছিলেন ; অকস্মাৎ তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। তিনি যেন দিব্য-শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া, পতির চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—"নাথ! এ জগতে অসাধ্য-সাধনেই যদি সমর্থ না হইলাম, তবে আমাদের মহত্ব কোথায়? কোন্ পিতা-মাতা মুমূর্ষু সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে? যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, আমাদিগকে অটল ভাবে প্রজা রক্ষা করিতে হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতিলাভ কাপুরুষের কার্য্য। যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, যতক্ষণ এ রাজ্যে একটীও প্রজার প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। অবশেষে তাহারও জীবন নির্ব্বাণ হইলে, আমরা উভয়ে সেই শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব"। এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞীর বদনজ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইল, নয়নদ্বার হইতে তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল। রাজ্ঞী বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ! ভয় নাই—ভয় নাই! হে ধর্ম্মবীর উঠুন! উঠুন! আমি যদি পতি-সেবা করিয়া থাকি, যদি প্রজাদুঃখে আমার অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হইয়া থাকে, যদি একান্তচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে আপনার প্রজাদিগের আর দুর্ভিক্ষভয় নাই।" অহো! পতিব্রতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! মহিষী সেই কথা বলিবামাত্র, শূন্যমার্গ হইতে অকস্মাৎ ভূরি ভূরি মৃত কপোত পতিত হইতে লাগিল। রাজা আশ্চর্য্য মানিয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন। প্রত্যহ সেই মৃত কপোত ভোজন করিয়া প্রজারা প্রাণধারণ করিল। সকলে বলিতে লাগিল;—জগদীশ্বর মহিষীর সাধনায় প্রসন্ন হইয়াই, এই

অদ্ভুত উপায়ে আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিলেন। সকলে পরমানন্দে জগৎপতির অপার করুণা এবং সেই রাজদম্পতীর অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় সে রাজ্যের সমস্ত দুর্দ্দৈব দূর হইল, অচিরে তথায় প্রচুর শস্যরত্ন উৎপন্ন হইল।

ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রজাবৎসল মহারাজ তুঞ্জীন পরলোক গমন করিলেন। পতি-প্রাণা বাক্‌পুষ্টা প্রজাগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পতির সহগমন করিলেন। সেই সতী যে স্থানে পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "বাক্‌পুষ্টাটবী" নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। (১)

(কৃষ্ণকুমারী।)

সহস্রশঃ ক্ষত্রিয়বীরকন্যাঃ
স্বধর্ম্মরক্ষার্থমরাতিহস্তাৎ।
সমাশ্রয়ন্ দীপ্তচিতাহুতাশং
প্রসূনশয্যামিব লীলয়ৈব॥

—সহস্র সহস্র ক্ষত্রবীরনারীগণ
শত্রু হৈতে নিজ ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
পুষ্পশয্যাসম সুখে চিতাহুতাশন—
আলিঙ্গিয়া বিসর্জ্জিল জীবন আপন।

জ্বালাং দীপ্তহুতাশনস্য বপুষি
স্নিগ্ধাং শরচ্চন্দ্রিকাং
তীব্রং কালভুজঙ্গমস্য গরলং
পীযূষবন্মন্যতে।
তীক্ষ্ণং খড়্গনিপাতমপ্যতিসুখং
পুষ্পপ্রবর্ষং যথা
মৃত্যুং মানধনায় ভারত-সতী
নির্ব্বাণবন্মন্যতে॥

—চিতাহুতাশনশিখা কালাগ্নিসমান,
শারদী-কৌমুদী-সম করে তারে জ্ঞান;
কালভুজঙ্গীর বিষ সুতীব্র ভীষণ,
জ্ঞান করে সুমধুর সুধার মতন;
নিজ অঙ্গে খরশাণ-কৃপাণ-আঘাত,
জ্ঞান করে সুখস্পর্শ পুষ্পবৃষ্টিপাত;
মানধর্ম্ম মহানিধি রক্ষণের তরে,
মৃত্যুকে ভারত-সতী মোক্ষ জ্ঞান করে।

তা ভারতব্যোম্নি কথাঃ সতীনাং
প্রদীপ্যমানাঃ প্রতিদীপ্ততারম্।
লীনেঽপি বিশ্বে প্রলয়াম্বুরাশৌ
সা নশ্বরা স্বাস্থতি কীর্ত্তিরেকা॥

—সে সকল সতীকীর্ত্তি ভারত-অম্বরে
নক্ষত্রে নক্ষত্রে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে;
প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড যবে পাইবে বিলয়,
ভারতের সতীকীর্ত্তি রহিবে অক্ষয়।

ধন্যাসি হে কৃষ্ণকুমারি দেবি!
পীতং সুধাবদ্ গরলং ত্বয়া যৎ।
রাজ্যস্য তাতস্য চ রক্ষণার্থং
বালাঽপ্যহাসীস্ত্বমসূন্ সুখেন॥

—হে কৃষ্ণকুমারি! ধন্যা কে তব সমান?
হালাহল সুধাসম করিলে হে পান!
পিতার জীবন, রাজ্য, প্রজার জীবন—
রক্ষিতে বালিকা! সুখে ত্যজিলে জীবন।

কৃষ্ণকুমারী উদয়পুরের মহারাণা ভীমসিংহের কন্যা (১)। তাঁহার অতুল রূপ-লাবণ্য ও অলৌকিক গুণ রাজপুতজাতির

---

(১) কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রাজ-তরঙ্গিণী দেখ।

(১) সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক চিতোর নগর ধ্বংস হইলে, তদ্বংশীয় রাজারা উদয়পুরে রাজ্য স্থাপন

গৌরব। যৎকালে মোগলসম্রাট্‌গণের অদম্য শক্তির নিকট সমস্ত ভারতবর্ষ অবনত, রাজস্থানের ক্ষত্রিয়কুলতিলক নৃপতিগণ নিজ নিজ কুল, মান, মর্য্যাদা প্রভৃতি বলি দিয়া মোগলরাজলক্ষ্মীর আরাধনায় নিযুক্ত, তখন কেবল উদয়পুর আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সম্রাটেরা রাজপুতরাজকন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতেন। কোনও কোনও রাজপুতরাজা ভয়ে ভয়ে মোগলরাজহস্তে কন্যা দান করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হইতেন। কেবল উদয়পুর নিজ কুলকে অকলঙ্ক রাখিয়াছিলেন। তৎকালে রাজস্থানের শত শত ক্ষত্রিয়রমণী অম্লানবদনে চিতানলে দেহ আহুতি দিয়া দুর্বৃত্ত যবনহস্ত হইতে নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অকলঙ্ক নামকেই স্বর্গমোক্ষ জ্ঞান করিতেন, এবং সেই নামের জন্য জীবনকে তৃণকণা অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

কৃষ্ণকুমারী ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তদীয় অসামান্য রূপলাবণ্যের ছটা, স্বভাবের অকৃত্রিম মাধুরী ও হৃদয়ের অতুলনীয় তেজ ও দৃঢ়তা বিকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে 'রাজস্থানের নলিনী' বলিত। কৃষ্ণকুমারী ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। মহারাণা কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি যোধপুরের রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত রাজা বিবাহের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অনন্তর অনেক অনুসন্ধানের পর শেষে জয়পুরের রাজার সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের কথা ধার্য্য হইল, এবং কুলপ্রথানুসারে উক্ত বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি হইল।

এদিকে এক আকস্মিক বিপদ্ উপস্থিত হইল। যোধপুররাজের মৃত্যুর পর, যিনি তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তিনি উদয়পুরের মহারাণার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন;—"আপনি প্রথমে যোধপুররাজের সহিত আপন কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে এক্ষণে আমি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত; এজন্য ধর্ম্মতঃ আমিই কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের অধিকারী। আমি আপনার নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমাকে কন্যাদান করুন।"

এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মহারাণা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। জয়পুররাজকে বা যোধপুররাজকে, কাহাকেও স্পষ্টাক্ষরে

করেন। তাঁহারা 'মহারাণা' নামে খ্যাত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত রাজবংশ। কথিত আছে,—তাঁহারা রাজটীকা দিলে রাজপুতানার অন্য রাজা স্বরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে উদয়পুরের আর সে প্রভাব ছিল না। তথাপি সম্মানে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

কিছুই বলিতে পারিলেন না। নানা ব্যপদেশে কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। জয়পুররাজের সহিত সম্বন্ধ স্থির হওয়ায়, জয়পুররাজ কালবিলম্বে অসহিষ্ণু হইলেন। যোধপুররাজও শীঘ্র শীঘ্র বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ত্বরা দিতে লাগিলেন ও নানা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইল, মহারাণা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর, জয়পুররাজ ও যোধপুররাজ উভয়েই কৃষ্ণকুমারী লাভের জন্য বিপুল সৈন্য লইয়া উদয়পুর আক্রমণে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা উদয়পুর সীমায় উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলকে উদয়পুররাজ্যের লুণ্ঠনে উন্মুক্ত করিলেন। কামান্ধ, লুব্ধ সৈন্যেরা উদয়পুরে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। উন্মত্ত পিশাচগণ উদয়পুরের প্রজাগণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে লাগিল. প্রজাগণের ধন, প্রাণ, সতীত্ব হরণ করিতে লাগিল। এক্ষণে মহারাণাবংশের আর সে শক্তি ছিল না, বিশেষতঃ দুই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা, তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। চৌদিকে রক্তস্রোত বহিতেছে, প্রজাগণের ধনপ্রাণাদি বিধ্বস্ত হইতেছে, হাহাকারে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে, দিন দিন শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটস্থ হইতেছে। পণ্যদ্রব্যাদির আসার প্রসার রুদ্ধ হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, প্রজাসমেত সমস্ত রাজ্য ছারখার হয়, প্রতীকারের উপায় নাই।

এই ভীষণ সঙ্কটে একদিন মহারাণা সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে ও মন্ত্রিগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন ;—"বৎসগণ! তোমরা আমার প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ, তোমাদের বিপদ্‌-সম্পদ্‌ই আমার বিপদ্‌ সম্পদ্‌। তোমাদের কুশলের জন্য আমি ধন প্রাণ সকলি বিসর্জ্জন করিতে পারি। এ বিপদে আমার কর্ত্তব্য কি? যেরূপে হয়, এ সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার কর! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ইহার প্রতীকারসাধনে কালবিলম্ব হইলে, এক প্রাণীও রক্ষা পাইবে না। আমি নিজে কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ; তোমরাই আমার বল, বুদ্ধি ও ভরসা, শীঘ্র উপায় বিধান কর।"

সভাস্থ সকলেই নীরব রহিলেন। মহারাণা বলিলেন ;—"হায়! তোমরাও এ সময় মূক হইলে! এ সভায় এমন কেহই নাই যে, এ বিপদের প্রতীকার উদ্ভাবন করে? ওঃ! কি দুর্দ্দৈব! কি লজ্জার কথা! তোমরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে রহিলে!

মহারাণার গভীর ক্ষোভপূর্ণ তিরস্কারবাক্যে সভাসদ্‌গণের মধ্যে এক ব্যক্তি করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন ; তাঁহার নাম দেওয়ান আমির উদ্দীন। তিনি মহারাণার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তিনি বিষণ্ণবদনে গদগদকণ্ঠে কহিলেন ;— "ধর্ম্মাবতার! এ বিপদে কেবল একমাত্র উপায় দেখিতেছি। ধৈর্য্য ধারণ করুন, বলিতেছি।" মহারাণা অধীরভাবে

কহিলেন ;—"বল! বল! শীঘ্র বল! আমি আদেশ করিতেছি, নির্ভয়ে বল! নিমেষমাত্রও বিলম্ব করিও না।"

সভাসদ্ আমির উদ্দীনের মনে যে ভীষণ উপায় উদিত হইয়াছিল, তাহা তিনি সাশ্রুলোচনে ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন ;—"মহারাজ! যাহার জন্য এই ঘোর অনর্থ উপস্থিত, তাহাই যদি বিলুপ্ত হয়, তবেই এ সঙ্কট কাটিতে পারে, অন্য উপায় নাই।"

আমির উদ্দীন ঐ কথা বলিবামাত্র সমস্ত সভা চমকিত হইল। গভীর শোকে ও ভয়ে সকলে যেন বজ্রাহত হইল। সকলে নির্বাক্, নিস্তব্ধ। সম্মুখে অকস্মাৎ কালসর্প ফণা তুলিলে লোক যেমন শিহরিয়া উঠে, মহারাণা তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন, বাতাহত কদলীর ন্যায় সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন। মহারাণা কাহারও নিকট ওরূপ প্রস্তাব আশা করেন নাই। ঐ প্রস্তাবে রাজসভার চতুর্দ্দিক্ হইতে গভীর শোক ও ক্রোধসূচক ধিক্কার উত্থিত হইল। কেননা, সেই কন্যারত্ন কৃষ্ণকুমারী সমস্ত রাজস্থানের ভূষণ, তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। সেই রাজবালার দীনদয়া ও পরোপকার দর্শনে তাঁহার উপর প্রজাগণের প্রগাঢ় অনুরাগ। কিন্তু হায়! সেই ঘোর সঙ্কটে হতাশ ও উদ্‌ভ্রান্ত মহারাণার চিত্তে ক্রমশঃ উক্ত প্রস্তাব বদ্ধমূল হইল। তিনি একবার ভাবেন, হায়! কৃষ্ণকুমারী যে আমার প্রাণনাড়ীর বন্ধন, হৃদয়ের স্নেহসার; সেই প্রাণপ্রতিমা কন্যাকে, পিতা হইয়া কিরূপে হত্যা করিব? এ কার্য্য করিতে যে নৃশংস রাক্ষসেও পারে না। আবার ভাবেন ;—সমস্ত প্রজার ধন, প্রাণ, মান কি একটী কন্যা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর বস্তু নহে? বিপদ্ ঘনীভূত ; শত্রুগণ ক্রমেই রাজধানীর সন্নিহিত হইতেছে, অবিলম্বে প্রতীকার আবশ্যক, নহিলে সমূলে নিপাত।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে তিনি সেই ভীষণ প্রস্তাবকেই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। ঘোরতর দুশ্চিন্তায়, অনাহারে, জাগরণে মহারাণা যেন শবদেহে পরিণত হইলেন। ভাবিলেন,—অহো! কি দুর্দ্দৈব! পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাপ করিয়া, এজন্মে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছি! কৃষ্ণকুমারী যে আমার সর্ব্বস্ব ধন! 'মা মা' বলিয়া আদর করিয়া, যে সুকুমারীর কোমল অঙ্গে ভূষণ ও অনুলেপন দিয়াছি, কোন্ প্রাণে সেই অঙ্গে খড়্গাঘাত করিব! সোহাগ করিয়া যে চাঁদমুখে সুধাসম ভক্ষ্য পেয় দান করিয়াছি, কোন্ প্রাণে সেই মুখে তীব্র-হালাহল দান করিব! মা! বসুন্ধরে! বিদীর্ণ হও, এ মহাপাপীকে শীঘ্র বিলুপ্ত কর। অহহ! না,—না, এ কার্য্য করিব না, কখনই নয়। পরক্ষণেই ভাবিলেন, ওঃ! এ কার্য্য করিতেই হইল। আর উপায় নাই। আমার পুত্রাধিক প্রজারা নিষ্ঠুর-ভাবে হত হইতেছে, আমার রাজ্য মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই ঘোর

বিভীষিকা! মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! আর বিবেচনার সময় নাই।

প্রজার আর্ত্তনাদে ও দুশ্চিন্তায় মহারাণা ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। অবশেষে প্রজারক্ষার জন্য প্রিয়তমা কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ কার্য্য কে করিবে? নিরপরাধা সুকুমারী বলিকা—রাজস্থান-নলিনীর কোমল অঙ্গে কে খড়্গাঘাত করিবে? এ কার্য্য তো রাক্ষসেও করিতে পারে না। শেষে অনেক চেষ্টায়, মহারাণার কোনও জ্ঞাতি-যুবক এ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কৃষ্ণকুমারীকে এ কথার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে দেওয়া হইল না। নিরপরাধা লীলাময়ী বালিকা আপন পরিণামের বিষয় কিছুই জানিলেন না। সেই জ্ঞাতি-যুবক রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণকুমারীকে সে সোদরার ন্যায় ভাল বাসে, কিন্তু রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। সে মহাসঙ্কটে পড়িল। গভীর নিশীথে যখন সেই ভীষণ রাজাজ্ঞা-পালনের সময় উপস্থিত, তখন সে খড়্গা-হস্তে স্খলিত পদে, অলক্ষ্য ভাবে রাজকন্যার শয়নাগারে চলিল। তাহার জ্ঞান হইল, প্রতিপদক্ষেপে ধরণী বিদীর্ণা হইয়া যেন মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা। সে সাশ্রুলোচনে, কম্পান্বিত-কলেবরে বারবার ধরণীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল,—যেন তাহার হস্ত নিরপরাধা বালিকার রক্তে কলঙ্কিত না হয়, যেন এ রাত্রিতে কৃষ্ণকুমারীকে তাহার শয়নাগারে না পাওয়া যায়। ক্রমে অন্তঃপুরের বহু কক্ষ অতিক্রম করিয়া, রাজকন্যার শয়নাগারে প্রবেশ করিল। দেখিল,—বালিকা নিদ্রা যাইতেছেন, গৃহ-প্রান্তে দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছে; সেই স্তিমিত আলোকপ্রভা নিদ্রিতা কুমারীর লাবণ্যময় মুখকমলে পতিত হওয়ায়, তাহা হইতে প্রশান্ত, পবিত্র, অপরূপ রূপমাধুরী উদ্ভাসিত হইতেছে! সেই দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি যেন বলিতেছে,—এ সংসারে পাপ নাই, তাপ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, কলহ নাই; আমরা সকলেই সেই প্রেমময়ী বিশ্ব-জননীর সন্তান। এক রক্তে এক মাংসে একই মায়ের স্নেহরসে আমরা পালিত। আমাদের মা আনন্দময়ী—শান্তিময়ী—দয়াময়ী—সর্ব্বমঙ্গলা—জন্মভূমি। দেবতা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেরি মা তিনি, সকলেরি উপর তাঁর সমান প্রীতি, সমান যত্ন, প্রাণের সমান টান। বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা যত্ন করিয়া নানা সুগন্ধি কুসুম চয়নপূর্ব্বক, তাঁহার শয্যায় বিকীর্ণ করিয়াছিল, স্নেহভরে তদীয় কণ্ঠে ফুল্ল নবমল্লিকামালা পরাইয়াছিল; সে সকল কুসুম অম্লান রহিয়াছে, বরং তাঁহার বরাঙ্গস্পর্শে অধিকতর সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করিতেছে। সেই ঘাতুক ক্ষত্রিয়-যুবা রাজাজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, নিস্পন্দভাবে ও নির্ণিমেষনেত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্বর্গীয় রূপমাধুরী দর্শন করিল। অনন্তর হঠাৎ তাহার রাজাজ্ঞা স্মরণ হইল।

তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য, তাহা যতই কঠোর হউক, ভৃত্যকে পালন করিতে হইবেই। কঠোর কর্ত্তব্য-পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যুবক তখন দৃঢ় হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, রাজকন্যার শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঠিক্ প্রহারের সময় তাহার হস্ত অবশ হওয়ায়, ঝনঝনা শব্দে অসি ভূতলে স্খলিত হইল, এবং সেই সঙ্গে তাহার নেত্র হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল খড়্গাপতনের শব্দে অন্তঃপুরবাসিনীরা জাগিয়া উঠিল, এবং ভয়বিহ্বলচিত্তে ঐ শব্দের কারণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণকুমারীও জাগিয়া উঠিলেন এবং তথায় সেই আত্মীয় যুবককে দেখিয়া এবং সম্মুখে ভীষণ খড়্গ পতিত দেখিয়া তাহাকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর যখন সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহার দেহের একটী শিরাও বিচলিত হইল না, বদনে অণুমাত্র বিকার লক্ষিত হইল না, কণ্ঠস্বর স্থির, ধীর; কেবল তাঁহাতে সে বালিকাভাব—সে সুকোমল শিশুমাধুর্য্য—সে মধুর চপলতা লক্ষিত হইল না। যেন কোনও ইন্দ্রজালপ্রভাবে তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রৌঢ়া ক্ষত্রবীরাঙ্গনার জ্বলদনলকল্প তেজ ও শক্তি লাভ করিলেন। তিনি সদর্পে সেই যুবককে কহিলেন;—"তুমি আমার পিতাকে গিয়া বল;—আমি রাজপুতকন্যা। রাজপুতবালা মৃত্যুকে ভয় করে না, এ কথা কি পিতা বিস্মৃত হইলেন? আমি যখন পিতার জন্য, প্রজার জন্য, আত্মমর্য্যাদার জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তখন কাপুরুষের ন্যায় এরূপ গোপনে পিতা আমাকে কেন হত্যা করেন? কর্ত্তব্যপালনের নিকট যমদণ্ডের ভয় তো উপহাসের কথা। পিতৃকার্য্যের নিকট অমরাবতীর বৈভবকে আমি ধূলিকণা জ্ঞান করি। পিতার ইচ্ছায় এ বালিকা স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিতে কুণ্ঠিতা নহে। ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি শীতল জলে অবগাহন করিয়া যে শান্তিলাভ করে, ক্ষত্রিয়বালা ধর্ম্মের জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া ততোধিক শান্তি লাভ করে। আমি বালিকা হইলেও, এ দেহের শিরায় শিরায় সে আর্য্যতেজ—সে আর্য্যশোণিত—সে বীর্য্যহুতাশন বিদ্যুৎপ্রভায় প্রদীপ্ত। হা বিধাতঃ! রাজপুতরমণী প্রাণ দিতে ভয় করে, কি ঘৃণার কথা! কি কলঙ্কের কথা! অহো! আমার কি শুভ দিন! প্রজার জন্য প্রাণ দিব!—পিতার বিপদ্ উদ্ধার করিব! কি শুভক্ষণে জননী আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন! আজি ক্ষত্রকুলে আমার নারীজন্ম সার্থক, আমার উপর ঈশ্বরের অপার করুণা। বিষপানে, শস্ত্রাঘাতে বা অগ্নিকুণ্ডে, পিতা যে উপায়ে বলিবেন, আমি এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিব। পিতার শান্তিলাভের জন্য প্রাণ দান করিব, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি আছে?

কৃষ্ণকুমারীর জননী অসহ্য বেদনায়

উন্মাদিনীর ন্যায় কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মর্ম্ম-স্থান যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। রাজ-পরিবারের আর্ত্তনাদে রাজপুরী প্রতি-ধ্বনিত হইল। কৃষ্ণকুমারী পরম যত্নে জননীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন ;— "আপনি সূর্য্যকুলতিলক মহারাণার মহিষী। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে এ বংশের কেহ কখনও কাতর নহে। মা! তুমি শোক করিও না। সকলি সেই মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছা। আমার প্রাণত্যাগের সঙ্গেই আমার পরমারাধ্য পিতার রাজ্য শান্তি-লাভ করিবে, নিরপরাধ প্রজাগণের এ সর্ব্বনাশ নিবারিত হইবে। মা! পিতা-মাতার মঙ্গলকামনায় প্রাণ দান করা অপেক্ষা সন্তানের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আমি নিজ জীবন অপেক্ষা তোমাদের মঙ্গলকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করি। মা! তোমাদের বিপদুদ্ধার কি আমার ক্ষণভঙ্গুর জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম নহে?"

কৃষ্ণকুমারীকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা না করিয়া, বিষপ্রয়োগে হত্যা করাই শেষে স্থিরীকৃত হইল। বিষপূর্ণ পাত্র তাঁহার নিকট আনীত হইল। কৃষ্ণকুমারী ভক্তি-গদগদ চিত্তে ভগবান্‌কে প্রণাম করত, সানন্দে তাহা পান করিলেন। জননী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল, তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু সে বিষপানে তাঁহার মৃত্যু না হওয়ায়, দ্বিতীয়বার বিষপাত্র আনীত হইল। কৃষ্ণ-কুমারী সানন্দে পিতা-মাতা ও ঈশ্বরের স্তব করিয়া, তাহা পান করিলেন। তথাপি তাঁহার মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। শোকে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সকলে বলাবলি করিতে লাগিল ;—ঈশ্বর ইঁহার প্রাণ-হরণ করিতে অনিচ্ছুক। কৃষ্ণকুমারী তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ;— হায় রে! মরণ কি এত কঠিন? দয়াময়! সর্ব্বসাক্ষিন্! জগদীশ! তুমি আমার হৃদয় জানিতেছ, আমি যদি পিতার ও রাজ্যের বিপদুদ্ধারের জন্য পরমানন্দে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকি, তবে এবার যেন এ গরলের শক্তি বিফল না হয়। পরিচারকেরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেবল রাজদণ্ডভয়ে তৃতীয়বার বিষপাত্র আনয়ন করিল। কৃষ্ণকুমারী পিতৃ-রাজ্যের কুশল প্রার্থনা পূর্ব্বক, গভীর ভক্তিভরে সেই বিষ পান করিলেন। এবার ক্ষণমধ্যেই বিষশক্তি প্রকট হইল। সেই কমললোচনার লোচনযুগল অল্পে অল্পে মুদ্রিত হইয়া আসিল। শোকোন্মত্তা জননীর ও শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের পাষাণ-ভেদী আর্ত্তনাদ আর তাঁহার কর্ণে পশিল না। যে কণ্ঠ হইতে ক্ষণপূর্ব্বে বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে ভগবৎসঙ্গীত উত্থিত হইতে-ছিল, তাহা নীরব হইল। জ্ঞান হইল যেন তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া অমৃত-রসের প্রস্রবণে অবগাহন করিতেছেন। প্রেমভরে চক্ষু দুটী হইতে পক্ষ্মাগ্রবিলগ্ন অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলি ফুরাইল। বিষপানকালে সেই বিম্বাধরে

যে মধুর হাস্যরেখা ফুটিয়াছিল, কেবল তাহাই ফুরাইল না। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—সেই গতাসু রাজবালার অধর-পল্লবে চন্দ্রিকার ক্ষীণ আভার ন্যায় সেই হাসিটুকু লাগিয়া আছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—ধর্ম্মের জন্য রাজপুতরমণীরা সহাস্যমুখে চিতারোহণ করে, তিনি তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। ভারতের অকলঙ্ক চন্দ্রমা—সে ত্রিদিব-দুর্লভ রমণী-রত্ন পিতৃরাজ্যের কল্যাণার্থে প্রফুল্লহৃদয়ে সহাস্যমুখে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

অভাগা ভারতসন্তান! তোমরা বিশ্ব-জয়ী বীর হইয়াও, তুচ্ছ রমণীর লালসায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, আত্মদ্রোহের অনলে ভারতলক্ষ্মীকে দগ্ধ করিলে! তোমাদের এ কলঙ্ককালিমা জগতের ইতিহাসে অবিলুপ্ত থাকিবে। কথিত আছে, তুচ্ছ স্ত্রীলোক লইয়া মহারাজ পৃথ্বীরাজ ও কনোজরাজ জয়চন্দ্র—উভয়ে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তৎকালে দিগ্‌বিজয়ী সাহেব উদ্দীন ঘোরি ভারতবর্ষজয়ে সমুৎসুক। পৃথ্বীরাজ তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া দূতমুখে ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"হে বীরবর! আপনাদের সুশীতল দেশের আঙ্গুর, খর্জ্জুর প্রভৃতি সুকোমল ফল ছাড়িয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া এ দেশে আসিতেছেন কেন? এ দেশের মৃত্তিকা বড় কঠিন; এ স্থানের বিল্ব, বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি কঠিন ফলে দন্তস্ফুট হয় না।" এই ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম এই—অদম্য ক্ষত্রিয়-বীরের ভুজবলরক্ষিত, এ ভারতবর্ষকে জয় করা কঠিন, ইহা বহিঃশত্রুর অভেদ্য। চতুর ঘোরি এই ব্যঙ্গোক্তির অর্থ বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন.—"হাঁ, হিন্দুস্থানের মৃত্তিকা কঠিন বটে; কিন্তু ঐ স্থানে 'ফোট' নামক ফল আছে; আমরা সেই লোভেই যাইতেছি (১)। শেষে ঘোরির কথাই ফলিল। স্বজাতীয়ের বিশ্বাস-ঘাতকতায় হিন্দুস্থান পরহস্তে পতিত হইল।

ভারতের বামাগণ স্বদেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, আত্মমর্য্যাদার জন্য হাসিতে হাসিতে জলচ্চিতায় দেহ আহুতি দিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরল নহে।

সম্রাট্ আকবর যখন ছলে বলে চিতোর অধিকার করিলেন, চিতোরের পুরুষগণ সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য চিতোররমণীরা অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি দিয়া নিজ সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সমৃদ্ধিশালী, জনকল্লোলপূর্ণ মহেন্দ্রপুরী অচিরে মহা-শ্মশানে পরিণত হইল। পাষাণচিত্ত আকবরও সে দৃশ্যদর্শনে অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। কোনও পরিব্রাজক সতীগণের সেই মহাসমাধি দর্শন করিয়া বলিয়াছেন;—চিতোরের ভগ্নবক্ষে এখনও যেন সারি সারি চিতানল জ্বলিতেছে।

(১) "ফোট" অর্থাৎ ফুটি; ফুটি বড় হইয়াই ফাটিয়া যায়, একজন্ত উহা ভাঙ্গিতে কষ্ট হয় না।—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ফোট অর্থাৎ প্রবল গৃহ-চ্ছিদ্র বিদ্যমান।

তদুপরি যেন অসংখ্য দেবযান দিব্য প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সেই সকল সতী-মূর্ত্তির তেজঃপুঞ্জ যেন সেই মহাশ্মশানের ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

সতীগণের দেহভস্মপূত সেই মহা-তীর্থকে সপুলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি।

(ক্রমশঃ।)

বটবৃক্ষের কাহিনী

কত যুগ, কত কাল এই নদীতটে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। কত বার সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিলাম, ছয় ঋতুর যাতায়াত দেখিলাম, জগতের কত সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, জন্ম মৃত্যু দেখিলাম, তাহার হিসাব দিতে পারি না। আমি শুধুই দাঁড়াইয়া আছি!

এক জীবনে কতই দেখিলাম! অই নদীতে লাল নিশান উড়াইয়া রাজার বজরা আসিতে দেখিয়াছি; আবার ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি ও ডোঙ্গা ভাসিতে দেখিয়াছি; শাঁখা সাড়ী সোণা রূপায় বিভূষিতা কুলবধূগণকে গঙ্গা পূজা করিতে আসিতে দেখিয়াছি, আবার সদ্য বিধবাকে শাঁখা চুড়ী ভাঙ্গিয়া প্রথম বৈধব্য-স্নান করিতে দেখিয়াছি! কতই দেখিলাম!

কেন, এতদিন আছি?—সে কথা আমি জানি না। বুঝি জগতের কেহই সে তত্ত্ব জানে না। তবে এই যে বিপুল দেহ, এই যে পল্লবমর্ম্মরিত স্নিগ্ধ সমীর, এই যে মানবের মাতৃক্রোড়তুল্য সুশীতল শান্তিময়ী ছায়া, এ সব যে বিশ্বস্রষ্টার শুধু খেয়াল মাত্র নহে, এ কথা বুঝিতে পারি। সেই জন্য যখন আমার কোটরে বিহঙ্গকুল নীড় নির্ম্মাণ করে, নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন পথিকগণ ও রাখাল বালকেরা আমার ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, যখন শ্রান্ত পশু আমার কাছে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধমীলিত নেত্রে রোমন্থন করে, তখনই এ জীবনের সার্থকতা অনুভব করি। মনে হয় বিশ্বজীবন পরের মঙ্গলের জন্য—আমার এই নগণ্য জীবনও পরের মঙ্গলের জন্য মনে হয়। বিশ্বদেবতার ব্রহ্মাণ্ডযজ্ঞে আমিও এক উপকরণ, আমিও অনর্থক নহি।

আমার বামদিকে ঐ দূরে মহাশ্মশান! ঐখানে কত কি দেখিয়াছি! কত সতী-লক্ষ্মীকে পতির শব বক্ষে লইয়া জ্বলন্ত আগুনে পুড়িতে দেখিয়াছি, কত শিশু কত যুবা, কত বৃদ্ধকে জন্মের মত শয়ন করিতে দেখিয়াছি, কতই মর্ম্মভেদী বিলাপ শুনিয়াছি!

আর এক সময়ে যাহা দেখিয়াছি, তাহা—সে কাহিনী এ জনমে ভুলিতে পারিব

না। সেদিন অনেক দিন গিয়াছে, কিন্তু সেই স্মৃতিই এই জীবনের অবলম্বন।—আহা সেই শৈলজা! সে বিধবা মাতার একমাত্র কন্যা; বালিকা রাঙাপেড়ে কাপড় পরিয়া, ফুলের সাজি হাতে করিয়া মায়ের সঙ্গে ঘাটে আসিত, মা শিবপূজা করিতেন, বালিকা নিস্পন্দ হইয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিত, তার রূপে ঘাট আলো হইয়া থাকিত; মা পূজাশেষে, বাছার সুখ সৌভাগ্য কামনা করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, সেই সময়ে বালক সুধীর ছুটিয়া আসিত। সে শৈলর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিত, শৈলর শূন্য ফুলের সাজি আপন হাতে লইত, নিজের ছত্র তলে শৈলকে টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে, দু'টি নবস্ফুট পদ্মফুলের মত দুজনে বাড়ী যাইত। সুধীরের মুখ দেখিয়া মনে হইত সে যেন শৈলকে জগতের কোন ব্যথা লাগিতে দিবে না। তখন সুধীরের বয়স চৌদ্দ; শৈল আট বছরের।

কতদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুধীর ও শৈল ঐ বাঁধা ঘাটে বসিয়া কত খেলা করিত; পশ্চিমের আকাশের সূর্য্যাস্ত-শোভায় দুজনের সুন্দর মুখ কতই সুন্দর দেখাইত; তাহারা মোচার খোলায় নৌকা গড়িয়া জলে ভাসাইত; জলের ছায়ায় মুখ দেখিত; আমার পল্লবগণনা করিত; দাঁড়ী মাঝিদের গান শুনিত; শেষে দুজনে ছুটা ছুটি করিতে করিতে বাড়ীর দিকে যাইত। তাহাদের সেই মধুর কথা, মধুর হাসি সমস্ত রাত্রি আমার বুকে প্রতিধ্বনিত হইত।

ক্রমশঃ সুধীর ও শৈল বড় হইতে লাগিল। তথাপি আমার তলায় তাহারা আসিত। দুজনের কত আদর, কত আশা, কত কল্পনা আমি কাণ পাতিয়া শুনিতাম। জনসমাগম দেখিলে শৈল আমার অন্তরালে আপনাকে লুকাইত দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইত। আমি মনে মনে হাসিতাম।

এই রকমে কত দিন কাটিল। শেষে শৈল যখন চৌদ্দ বৎসরের হইল, তখন দেখিলাম শৈলের সীঁথিতে সীঁদুর, হাতে শাঁখা। একদিন আমার ছায়ায় দাঁড়াইয়া, মাথার কাপড় খাটো করিয়া শৈল সুধীরকে বলিতে লাগিল,—"তুমি কেন এ কাজ করিলে?—আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে কেন?" সুধীর হাসিল; সে বরাভয়প্রদ, জয়গর্ব্বিদৃপ্ত উল্লাসের হাসি হাসিয়া বলিল,—"তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে শৈল? আমায় কি তোমার পছন্দ হয় নাই?" সলজ্জভাবে শৈল বলিল—"যাও!"

পশ্চিমের আকাশে সূর্য্যের উদয় হওয়া যতটা অসম্ভব, এই দম্পতীর পরস্পরকে "অপছন্দ" হওয়া ততটা অসম্ভব; দুজনেই তাহা জানিত, তাহা বিশ্বাস করিত। তথাপি যে এমনতর কৃত্রিম কলহে প্রণয়ী-দিগের যে কি সুখ, তাহা প্রণয়ীরাই বোঝে; আমি বটবৃক্ষ, এই কাষ্ঠহৃদয় লইয়া কি করিয়া বুঝিব?

একটু পরে শৈল কাতরস্বরে বলিল,—"দেখ, ঠাট্টা তামাসা নয়; বল দেখি,

তোমার জেঠা মহাশয় দেশে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া কি বলিবেন?”

সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল,—“জেঠামহাশয় যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, তাহাতে আমি একবিন্দু কাতর নহি। তারপরে তোমার মা, আর আমার মা, দুজনে ইচ্ছা করিয়া যখন আমাদের বিবাহ দিয়াছেন, তখন জেঠা মহাশয় রাগ মাত্ত করিতে পারেন।” শৈল অন্যমনে আমার একটী পাতা তুলিয়া লইল, তাহাই ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল—ম্লান মুখে বলিল, “তুমি অমন ভরসা করিও না; তোমরা কুলীন, আমরা বংশজ; এ বিবাহে যে তোমার কুলভঙ্গ হইয়াছে, জেঠা মহাশয় এমন অপরাধ কখনই ক্ষমা করিবেন না।” শৈলর নীলোৎপলতুল্য চক্ষু জলভরে ছল ছল করিতে লাগিল; অভিমানিনী আনতমুখে দাঁড়াইল।

দেখিয়া সুধীর দৃপ্ত সিংহের মত গর্ব্বিত-ভাবে বলিতে লাগিল,—“ও কি বলিতেছ শৈল? কুল চুলায় যাউক, জেঠা মহাশয় ফাঁসির ব্যবস্থা করিলেও আমি একবিন্দু কাতর নহি, ইহা নিশ্চিত জানিও। পৃথিবীর সকল দুঃসহ কষ্ট যদি আমার জন্য আসে, তাহাতেও আমি ভ্রূক্ষেপ করিব না। ‘শৈলজা আমারই’ এই কথাই আমার অমৃতময় মন্ত্র।—তুমি কি তা বোঝনা শৈল?”

আমি দেখিলাম,—সে আদরে শৈল গলিয়া গেল, তার চক্ষের জল উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

আহা! এই ফুল্ল-কুসুম-তুল্য কিশোর-কিশোরী যখন আমার “বটতলা” আলো করিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার এই “কাষ্ঠ-হৃদয়” যেন সজীব ও কৃতার্থ হইত।

একদিন অই বাঁধা ঘাটে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বজ্র-নিনাদে বলিতেছেন,—“আমি অপুত্রক, সুধীর আমাদের একমাত্র বংশধর; দুই জন কুলনাশিনী কালভুজঙ্গী একত্র হইয়া কৌলীন্যদেবতাকে ধ্বংস করিয়াছে। আচ্ছা, এ কাজের প্রতিফল আমি অবশ্য দিব; হয় সুধীর সেই স্ত্রীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করুক, নয়তো সুধীরকে সেই দুই কুলনাশিনীর সমক্ষে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তার রক্ত কুকুর দিয়া খাওয়াইব, তবে তোমরা জানিও আমার নাম মহাদেব চাটুয্যে।”

পরপীড়ক প্রতিবাসীরা ইহাতে খুব খুসি হইয়া আগুনে “ইন্ধন” দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুএকজন সহৃদয় ব্যক্তি মৃদুভাবে দু একটী সান্ত্বনার কথা বলিতে গিয়া লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হইলেন।

হায়! চাটুর্য্যে মশাই! তোমার রক্ত-মাংসের হৃদয় কি এত কঠিন? আমি যে বৃক্ষ—আমার হৃদয় যে কাষ্ঠখণ্ড, আমি তো সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসি-মাখা সুধীর শৈলজার উপরে এমন নির্ম্মম ব্যবহার সহিতে পারিতেছি না!

এই ঘটনার পর হইতে সুধীর ও শৈল আর আমাকে কৃতার্থ করিতে আসে না।

অতৃপ্ত হৃদয়খানি লইয়া প্রতিদিনই আমি তাহাদের আসার পথ চাহিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা একবারও দেখা দেয় না। বাছারা না জানি কি বিপদে পড়িয়াছে, খবরটাও পাই না।

সহসা একদিন সন্ধ্যাকালে গোধূলির ম্লান ছায়ার মত মলিনবদনা মলিনবসনা শৈলকে দেখিলাম। শৈল প্রতিবাসিনী কুসুমের সহিত কলসী লইয়া জল আনিতে আসিয়াছে।

শৈল তো আসিয়াছে, কিন্তু যে চাঁদ মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণে মধুর স্নিগ্ধতা উছলিয়া উঠিত, আজ যেন সে চাঁদমুখ জ্যোৎস্নাশূন্য হইয়া গিয়াছে! দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল

আমি নির্ব্বাত নিষ্কম্প হইয়া শুনিতে লাগিলাম,—শৈল কুসুমকে বলিতেছে—"ভাই, জেঠা মহাশয়ের দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্ব্যবহারে আমি নিজে গৌরব মনে করি; কিন্তু উনি মা জানি ওঁর কোমল প্রাণে কতই ব্যথা পেয়েছেন!—সেই সব ভেবে ভেবে কি ওঁর এমন অসুখ হ'ল?—এমন অসুক কেন হ'ল কুসুম? দিনান্তে যদি ওঁকে একবার দেখ্‌তে পাই, তাহ'লে জগতের কোন কষ্টেই আমার মন অবসন্ন হয় না।—" উচ্ছ্বসিত অশ্রু শৈলর উজ্জ্বল গণ্ড প্লাবিত করিল; শৈল মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল; আর কোন কথা কহিতে পারিল না।

কুসুম বলিল,—"কাঁদিস না ভাই! মা বলেছেন, কাল সন্ধ্যাবেলা চখের জল ফেলিতে নাই; সুধীর দাদার অসুখ অবিশ্যি ভাল হবে। এ গাঁয়ের সকল লোক তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোচ্চে; তাঁর মত ভাল লোক কি আর আছে?"

"কাল সন্ধ্যাবেলায়" চক্ষের জল পড়িলে পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে শৈল তাড়াতাড়ী চক্ষের জল মুছিয়া আমার পাদমূলে ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল; শেষে করযোড়ে বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! হে নারায়ণ মধুসূদন! আমার স্বামীর অসুখ আরোগ্য করে দাও; আমি কাল সন্ধ্যাবেলায় কেঁদেছি, তাতে যেন তাঁর কোন অমঙ্গল না হয়।" তার পরে উঠিয়া কুসুমের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কুসুম, আজি সতর দিন তাঁকে দেখি নাই; আমি এই অসুখের সময়ে তাঁর কাছে থাকিলে তিনি কত আরাম পেতেন! তা' জেঠা মহাশয়ের ভয়ে তিনি আমায় সে বাড়ীতে যেতে মানা করেছেন, কিন্তু আর যে আমি থাক্‌তে পারি না—" শৈল আর কিছু বলিতে পারিল না; তার চক্ষের জল আবার উছলিয়া উঠিল। দেখিয়া কুসুম তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল; আমি চাহিয়া রহিলাম।

তার পর?—সে কথা আর কি বলিব! আর দুই তিন দিন পরে কি দেখিলাম?—সেই প্রাতঃসূর্য্যের মত স্নিগ্ধ-তেজস্বী, প্রাতঃসূর্য্যের মত রমণীয়, প্রাতঃসূর্য্যের মত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্রকান্তি কিশোর সুধীরকে ব্রাহ্মণযুবকেরা গম্ভীর

হরিধ্বনি সহকারে চিতাশয্যায় শয়ন করাইল; সর্ব্বভূক্ হুতাশন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া সেই কমনীয় বর বপু গ্রাস করিতে লাগিল! উহু! সে দৃশ্য আমি আর দেখিতে পারিলাম না!

আমার ছায়াতলে অই বাঁধা ঘাটে বর্ষীয়ান্ বিপ্রগণের মধ্যবর্ত্তী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় গড়াগড়ি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—"বাপ সুধীর! আমার একমাত্র বংশধর! আমার যুধিষ্ঠির-তুল্য নিষ্পাপ সন্তান! তুমি ফিরিয়া এস; আর আমি পিশাচের মত তোমায় অপমান করিব না—আর আমি রাক্ষসের মত তোমার প্রাণে ব্যথা দিব না!—আমি নরাধম, আমি পশু, আমার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া যাইও না। এস! বাপধন, আমার, সত্যবান্ আমার এস, আমার সাবিত্রী মা শৈলজাকে রাণী সাজাইয়া তোমার বামে বসাইব, বাবা, ফিরিয়া এস!" সহস্র সহানুভূতি সহস্র সান্ত্বনা ছাপাইয়া তাঁহার আর্ত্তনাদ গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

হায়! মানবের সুখ, আশা, অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ সবই এত নশ্বর! পলক ফেলিতে সবই ফুরাইয়া যায়?—তবে মানব এত নির্ব্বোধ কেন? তাহাদের দুদিনের খেলা যদি দু'দণ্ডের মধ্যে এমন করিয়া ফুরাইয়া যায়, তবে তাহারা এত আস্ফালন করে কেন?

তারপরে একদিন দেখিতে পাইলাম,—এই ঘাটে নৌকায় উঠিয়া শৈল তাহার মায়ের সহিত কাশীধামে চলিয়া যাইতেছে। সে যে শৈল, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হয় না।—সেই আদরিণী, আনন্দময়ী প্রভাতের পদ্মফুল কি আজিকার এই দীনা ক্ষীণা, চীর-পরিহিতা, ভূষণ সম্পর্কহীনা, অশ্রুমুখী, যেন জগতের কাঙালিনী—এই কি আমার সেই শৈলজা?

যখন শৈল প্রিয়সখী কুসুমের গলা জড়াইয়া বলিল, "কুসুম! কাশী যাইতেছি বটে, কিন্তু আমার কাশী গয়া, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, হরিদ্বার সবই এই বট-তলায় আছে!" তখন এই কাষ্ঠাবরণ সরাইয়া আমার এই বৃক্ষ-হৃদয় ফাটিয়া যেন শতধা হইবার উপক্রম হইল! আমি মাথা হেলাইয়া, পাতা দোলাইয়া বলিলাম,—"সত্য, সত্য, সত্য, শৈল! আমিও তোমার সাক্ষী রহিলাম।"

আর সুধীর ও শৈল ফিরিয়া আসিল না। সেই দুইটী রত্ন হারাইয়া অবধি আমিও জীবনে মরিয়া আছি। যখন তাহাদের স্মৃতি বুকে ঘনাইয়া আসে, তখনই একটু আরাম পাই।

এস পথিক এস! এস শ্রান্ত এস! এস পীড়িত এস! আমার শৈল সুধীরের মিলনতীর্থে একবার বসো; তোমায় স্নেহের ছায়া দিব, পাখীর মধুর গান শুনাইব; কেননা পরসেবা ও প্রীতি-বিতরণ ব্যতীত এ সংসারে শোকাকুল হৃদয়ের অন্য শান্তি নাই।

লেখিকা শ্রীমা—

জাপানের অভ্যুদয়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে আমরা সামরিক বিভাগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিব। কারণ যদি রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ না বাধিত, তাহা হইলে বোধ হয় জ্বলন্ত অগ্নি আরও কিছু দিন ছাই-চাপা থাকিত। এত প্রবল যোদ্ধা হইয়াও জাপান যে এতদিন আপন বল কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান সম্রাট্ রাজ্যবিস্তারের জন্য পররাজ্য আক্রমণ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি কেবল স্বরাজ্যের উন্নতি ও রক্ষার দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাখেন। আরো এক কারণ আছে, রুষিয়ার বিরুদ্ধে এক দিন না এক দিন অনতিবিলম্বে আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চিত জানিয়াই এতদিন ধরিয়া গোপনে প্রাণপণে সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন। ১৮৯২ সালে চীনের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাও কেবল রুষিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য। রুষিয়া প্রথমে কোরিয়ায় ও তাহার পর মাঞ্চুরিয়ায় ব্যবসা আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সকল স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থান চীনরাজের অধীন, সুতরাং চীনরাজ না নিষেধ করিলে রুষিয়া জাপানের কথা শুনিবেন কেন। জাপান বুঝিল যে রুষ ক্রমশঃ সমগ্র মাঞ্চুরিয়া হস্তগত করিয়া জাপানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে। মাঞ্চুরিয়া হস্তগত হইলে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রুষিয়াকে রসদের নিমিত্ত ভাবিতে হইবে না এবং রুষসৈন্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। এখন রুষকে তাড়াইতে চীন ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই। জাপান চীনকে পত্র লিখিলেন। চীন জাপানের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; রুষিয়া চাহিবার অগ্রেই চীন তাহার অভিলষিত দেশ রুষকে অর্পণ করিলেন, রুষিয়াও জাপানের নিষেধবাক্য শুনিলেন না। সুতরাং কৌশলে চীনের বলহ্রাস না করিলে জাপান আত্মরক্ষার্থ সমর্থ হইবে না দেখিয়া, চীনের বিরুদ্ধে সকল প্রধান প্রধান মার্কিন একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়া চীনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া স্বাধীন হইল। লঙ্কা ভাগ হইল; রুষিয়ার ভাগে পোর্ট আর্থার পড়িল। জাপান দেখিল যে, পোর্ট আর্থারই তাহার ভীতির কারণ। এই স্থান হইতেই রুষিয়া নিজ মতলব সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। এই সময় হইতে জাপান সমরবিভাগে ক্রমশঃ সৈন্য ও গোলাগুলি প্রভৃতি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কারণ, তাহারা বেশ বুঝিল যে, এখন ভল্লুক বনছাড়া হয় নাই। ক্রমশঃ রুষিয়া মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। জাপান দেখিল আর অপেক্ষা করা চলে না, এবং তাহাদের সমর-উদ্যোগও বড় কম হয় নাই। তাই তাহারা

আত্মরক্ষার্থ রণে মত্ত হইল। এই দূরদর্শী রাজার ও রাজমন্ত্রিগণের সৈন্য কিরূপে এত রণকুশল হইল ও অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান সম্রাটের পূর্ব্বে সামরিক বিভাগে সম্রাটের কোন হাত ছিল না। সম্রাট্ রাজকার্য্য লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাট্ সে প্রকারের নন। পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌসেনা প্রভৃতি সকল বিষয়েই রাজা নেতা এবং সম্যক্ পরিদর্শন করেন। তিনি যে কেবল রাজা বলিয়া সেনাদিগের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, তাহা নহে। তিনি বাস্তবিকই একজন প্রধান রণকুশল সেনাধিনায়ক। যখনি দেশে সৈন্যদিগের রণকৌশল প্রদর্শন জন্য (Field manœvoures) বড় রকম আয়োজন হয়, তখনি রাজা স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যদিগের গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহিগণের মধ্যে স্বয়ং সম্রাট্ একজন। দেশে যাহাতে ভাল ভাল অশ্ব জন্মাইতে পায় ও তাঁহার প্রজাগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হয়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। নেগিমি নামক স্থানে ঘোড়দৌড় হইয়া থাকে এবং সম্রাট্ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। ইহা যে কেবল আমোদ উপভোগের জন্য, তাহা নহে; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যে যাহাতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্ব জন্মায় ও ভাল ঘোড়সওয়ার হয়। যদিও রাজা সৈন্যবিভাগে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন ও সমধিক উৎসাহ প্রদান করেন, তথাপি সামরিক বিভাগে অতিশয় খ্যাতিলাভ করিবেন, এ প্রকার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আদৌ নাই। যাহা করা উচিত বিবেচনা করেন, তিনি তাহাই প্রাণপণে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, নিজে যশস্বী হইব, তিনি এরূপ আকাঙ্ক্ষার ধার ধারেন না। ভারতবর্ষে যেরূপ বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে অতি উপযুক্ত লোক থাকিলেও সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, জাপানে সেরূপ নহে। প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা জাপানের সকল শ্রেণী হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইয়া সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। উপযুক্ত লোক হইলেই হইল, যে গ্রাম বা জেলা বা বিভাগ হইতেই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। Satsuma Class ও Choshu Clan প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক আছে। বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়া বলবান্ লোককে সৈন্য নিয়োগ করা হয়। অন্য দেশে অধিকাংশ স্থলে কেবল সাহস ও বলই দেখিয়া থাকে, বুদ্ধির দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। জাপানে শতকরা ৯০ জন সৈন্য লেখাপড়া জানে। জাপানী গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পরায়ণতা ও অপক্ষপাতিত্ব ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাই সামরিক বিভাগের উন্নতির প্রধান কারণ। রাজাই প্রজার প্রাণ, সুতরাং তাঁহার জন্য, তাঁহার সুখের জন্য প্রজা প্রাণ দিবে না কেন?

"I love you what is that to you" জাপানীদিগের রাজভক্তি এইরূপ। জাপানীসেনা যখন বীরদর্পে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহারা স্বদেশরক্ষার্থে বা রাজার রাজ্যরক্ষার্থে, কোনটীকে মনোমধ্যে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রাণ দিতে রাজি হয়, বলা কঠিন। কারণ, জাপানে দেশরক্ষা অর্থে রাজার প্রাণরক্ষা, রাজার মানরক্ষা, রাজ্যরক্ষা। তাহারা ভাবে,—এমন রাজা হারাইলে তাহারা একটী অসময়ের প্রকৃত বন্ধু হারাইবে, একটী আশ্রয়দাতা হারাইবে, ও চির দিনের মত তাহাদের জীবনের সুখশান্তি হারাইবে; এ রাজার জন্য যদি না তাহারা প্রাণ দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরকগামী হইতে হইবে। জাপানী সেনার মত শিক্ষিত সেনা আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। রুষিয়ার শতকরা ২০ জন সৈন্য লেখা পড়া জানে কিনা সন্দেহ। ভারতের সেনার মধ্যে শিক প্রভৃতির মধ্যে অতি অল্প সেনাই লেখাপড়া জানে। সম্রাট্ সৈন্যদিগকে কিরূপে উৎসাহ দিয়া থাকেন এ সম্বন্ধে আরো দুই এক কথা বলিব। জাপানে রাজবাটীর সীমার মধ্যে দুইটী Museum সম্রাট্ নিজে প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহা সাধারণের জন্য খোলা থাকে না বটে, কিন্তু রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও স্কুলের ছাত্রগণের জন্য অবারিতদ্বার। এই Museum-এ Chino-Japanese যুদ্ধের ও পিকিন অভিযানের গৌরবসূচক স্মরণচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা সৈন্যদিগের সাহস ও প্রাণপণ যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, এরূপ অনেক দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে; যেমন শত্রু গোলার দ্বারা ছিন্নভিন্ন সেনাবিভাগের পতাকা (regimental flag) এবং যে সকল সৈন্য বা অন্য লোক স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি।

জাপানী সম্রাটের উৎসাহ প্রদান কম কোন্ দিকে! শিল্প ও শিক্ষা বিষয়েও সেইরূপ। তিনি সকল প্রকার শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদান করেন, এবং রাজধানীতে ও অন্যান্য স্থানে নিয়মমত সময়ে সময়ে প্রদর্শনী হইয়া থাকে। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী এই সকল প্রদর্শনী দর্শন করিতে যান; এবং তাঁহারা পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিতে প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য যে, গৃহে কতকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করা তাহা নহে; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পকার্য্যে উৎসাহ প্রদান। এক্ষণে শিল্প সম্বন্ধে আমরা একটু বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব। কারণ জাপানের শিল্প ও রণনিপুণতা সকলই উপযুক্ত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাপানে শিক্ষা—

৩০০ খ্রীঃ অঃ প্রথমে চীনভাষা জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দেশে লেখা পড়া ছিল না, এ কথা যদিও বলা যায় না, কিন্তু ছিল বলিয়াও কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৫০০ খ্রীঃ অঃ লেখা পড়া এরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে,

তখনকার জাপানী সম্রাট্ তাঁহার অধনীস্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গবর্ণমেণ্টের record রাখিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে জাপানে শিক্ষা শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ৬৬৪ খ্রীঃ অঃ গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, এবং ঐ বৎসরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ভদ্র-লোকদিগের জন্য কীয়টো নগরে কতক-গুলি বিদ্যালয় ও একটী Central University সংস্থাপিত হয়। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক Province বা বিভাগে এইরূপ কলেজ স্থাপনা করা হয়; এবং স্কুলের নামে অনেক অর্থ দান ও ছাত্রদিগের ভরণপোষণের জন্য একটী বন্দোবস্ত করা হয়। ইতিহাস, কম্পো-জিসন,* অঙ্ক, আইন, চিঠিপত্রাদি লেখা প্রভৃতি স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং এ সময়েও ছাত্রদিগের শারীরিক পরিশ্রমের উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ শিক্ষার উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পর হইতে দেশে নানা রাজ্যবিপ্লব ও গৃহবিবাদ হওয়ায় প্রায় দুই শত বৎসর কাল শিক্ষার উন্নতি কমিয়া গিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইলে সকলে পুনরায় লেখা পড়ার দিকে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। এ সময় প্রায় প্রতি Province-এ Government College স্থাপিত হয় ও গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখেন। এই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ১৮৬৭ সালের যে সময়ে বর্ত্তমান সম্রাট্ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সেই সময়েই শিক্ষার তত্ত্বাবধারণার্থ পৃথক্ একটী "শিক্ষাবিভাগ" (Department of education) খোলা হয়। এ সময়ে যে Imperial Rescript প্রচারিত হয়, তাহাতে লেখা পড়ার উন্নতিকল্পে যাহা লিখিত আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই—"The acquirement of knowledge is essential to a successful life. All knowledge is acquired by learning. A long time has elapsed since schools were first established, but amongst farmers, artisans and merchants and also amongst women, learning has frequently been regarded as superfluous, and even among the higher classes much time has been spent in writing poetry and composing maxims, which might have been better spent in learning what would have been of benefit to the individual or to the state. It is desired henceforth that education shall be so defused that there may not be a village with an ignorant family nor a family with an ignorant member."

"জ্ঞান লাভ না হইলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা সকল জ্ঞানই উপার্জ্জন করা যায়। যদিও বহু দিন হইল স্কুল কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি কৃষক, মিস্ত্রী, ব্যবসায়ী, ও স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা অনাবশ্যক বলিয়া লোকে মনে করিয়া আসিতেছে এবং উচ্চ শ্রেণীর লোক সকল তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যক্তিগত বা রাজ্যের উপকারে নিয়োজিত না করিয়া কেবলমাত্র পদ্য ও নীতিরচনায় অনর্থক মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতেছেন। অতএব এই সময় হইতে এরূপভাবে শিক্ষার বিস্তার হওয়া আবশ্যক যে, কোন পল্লীতে একটীও মূর্খ গৃহস্থ না থাকে, এবং কোন গৃহে যেন একটীও মূর্খ লোক না থাকে।" যে দেশে সম্রাট্ এরূপ ভাবে মনোনিবেশ করেন, সে দেশে শিক্ষাবিস্তার হইতে কত দিন লাগে? আমাদের দেশের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। অনেকে বলেন যে, গরীবকে লেখা পড়া শিখিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাদের মূর্খ থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু জাপানের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়, কেননা "ফলেন পরিচীয়তে।"

১৮৭২ খ্রীঃ অঃ শিক্ষা সম্বন্ধে জাপানে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে প্রত্যেক জাপানীকে তাহার সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হয়; এবং যতদিন না তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, ততদিন পর্য্যন্ত কেহ বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে না। ১৮৯০ অব্দে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং সম্রাট্ বক্তৃতায় বলেন যে, সাম্রাজ্যের স্থিতি ও উন্নতির জন্য রাজভক্তি ও নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণতা যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানোপার্জ্জন ও বুদ্ধি-বৃত্তির পুষ্টিসাধন ও তদনুরূপ আবশ্যক। সেই জন্য সাধারণকে উপদেশ দেন যে, "লেখা-পড়ার দ্বারা চরিত্র গঠন কর, জ্ঞান উপার্জ্জন কর, গবর্ণমেণ্টকে মান্য কর, আইনের বশবর্ত্তী হও, এবং জাতীর মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর।" এই বক্তৃতার নকল সমস্ত পল্লীতে ও দেশের সমস্ত স্কুলে বিতরিত হইল; এবং অধিকাংশ ছাত্রকে তাহাদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হইল। এইরূপে বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণ স্বদেশহিতৈষী হইতে শিক্ষা পায়; এই অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ফল পুষ্পে বিমণ্ডিত হইয়া পরোপকারে নিয়োজিত হয়।

(ক্রমশঃ)

গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ

১। বাতবেদনা—বাতবেদনা যে কোনও স্থানে হউক, রশুন, মুসব্বর, আদা, কৈওকড়া, এই তিন দ্রব্য সমভাগে একসঙ্গে বাটিয়া, গরম করিয়া, বেদনা-স্থানে প্রলেপ দিবে। দিনে দুই তিন বার প্রলেপ দিবে।

২। অম্লশূল—ঝুনা নারিকেলের মুখ কাটিয়া জল ফেলিয়া, তন্মধ্যে যমানী (যোয়ান) এক ছটাক, পঞ্চ লবণ অর্থাৎ সৈন্ধব, বিট্ বা কালো লূণ, কর্কচ লূণ, সচল লূণ, (অভাবে পাঙ্গালূণ,) এবং সাম্বর লূণ (যাহা দেখিতে লালবর্ণ), প্রত্যেক এক তোলা করিয়া, এবং কলিচূণ এক ছটাক পূরিয়া নারিকেলের মুখে ছিপি বন্ধ করিয়া. সমস্ত নারিকেলে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। উহা শুকাইলে, দুই হাত পরিমাণ গভীর ও প্রশস্ত গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ বিলঘুটে দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তদুপরি ঐ মৃত্তিকালিপ্ত নারিকেলটী রাখিয়া, তদুপরি বিলঘুটে দিয়া সমস্ত গর্ত্তটী পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ তদুপরি দুই এক খান ঘুটে আগুনে ধরাইয়া রাখিবে। ক্রমে সমস্ত ঘুটে পুড়িয়া শীতল হইয়া গেলে, নারিকেলটী তুলিয়া লইবে। নারিকেলের দগ্ধ মালা ভিন্ন সমস্ত অংশ শিলে পেষণ করিয়া শিশিতে ভরিয়া উত্তমরূপে ছিপি দিয়া রাখিবে, না হইলে উহা গলিয়া জল হইয়া যাইবে। এই ঔষধ /০ এক আনা হইতে ৵০ দুই আনা (যেরূপ সহ্য হয়) শীতল জল দিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিবে।

৩। দদ্রুরোগ—গন্ধক, সোহাগার খৈ, শ্বেতধুনা, কৃমিমস্তকী এই চারি দ্রব্য গব্য ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

৪। কুষ্ঠ ও বাতরক্ত—একটী বড় ও পুরাতন নিমগাছের গায়ে গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে কতকগুলি ছোলা রাখিয়া, গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। ১৫ দিন পরে, ঐ ছোলা বাহির করিয়া প্রত্যহ প্রাতে একটী করিয়া ছোলা খাইবে। এক সপ্তাহেই বিশেষ উপকার দর্শিবে। দেড় মাস কাল খাইতে হইবে।

৫। দন্তশূল—হিঙ্ ঘৃতে ভাজিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া দন্তের বেদনা-স্থানে লাগাইবে। ক্রমে লালা নিঃসৃত হইয়া বেদনা কমিবে। তৎপরে গরম জল দিয়া মুখ ধুইবে।

৬। চক্ষু ওঠা—হাতিশুঁড়ের পাতার রস বা তেলাকুচা পাতার রস চক্ষে দিলে, যাতনার সহিত রক্তিমতা দূর হইবে।

৭। বমি—ইক্ষুচিনির সরবতের সহিত ১০।১২টী কচি আমপাতা রগড়াইয়া. ছাঁকিয়া ঐ সরবত খাইলে বমি নিবারণ হয়।

৮। টাকের ঔষধ—কাঁচা দুগ্ধের গাঁজলা (ফেনা) চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকে মালিস করিলে শীঘ্রই চুল উঠিবে।

৯। অম্লপিত্ত ও শূল—পুরাতন তেঁতুল গাছের ছাল ভস্ম করিয়া, তাহার ৩ রতি প্রমাণ এক একটী বটিকা করিয়া, সেই বটিকায় শুষ্ক কলি চূণের আবরণ দিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শীতল জল সহ সেবন করিবে। শূল প্রবল হইলে চূণের জল সহ একটী বটিকা সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ শূলের উপশম হইবে।

১০। বালকের দুধতোলা ও উদরাময়—আপাঙের শিকড় অতি অল্প মাত্রায় দুগ্ধ সহ বাটিয়া খাওয়াইলে শীঘ্র বিশেষ উপকার হইবে।
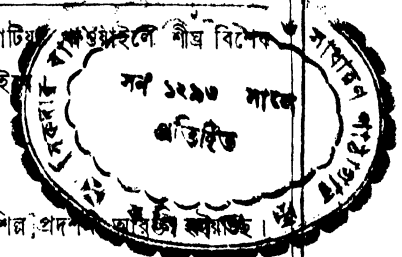
নূতন সংবাদ।

১। রেলপথে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি চুরি ও নানা বিপৎপাতে যাত্রীদিগের রেলপথে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে ভ্রমণ করা আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন হইতে রাত্রিকালে প্রত্যেক ট্রেণে একজন অতিরিক্ত গার্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রত্যেক ষ্টেসনে নামিয়া যাত্রীদিগের সুবিধা অসুবিধা ও তাঁহাদের জিনিষ পত্রাদির তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

২। টেলিগ্রাফ আফিসে কতকগুলি নূতন নিয়ম হইবার প্রস্তাব হইতেছে। চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম আর থাকিবে না। এখন হইতে দুই রকম টেলিগ্রামই চলিবে। অর্ডিনারি ছয় আনা এবং আর্জেণ্ট বার আনা।

৩। বিলাতে পুরুষদিগের সমান অধিকার পাইবার জন্য ইংরাজ-মহিলারা তাহাদের নিজ মত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সভা করিতেছেন এবং মন্ত্রিসভায় বক্তৃতা করিতেছেন। সম্প্রতি পার্লামেণ্ট সভায় অনেকগুলি মহিলা আপনাদের অধিকার লাভের দাবী করিতেছিলেন। পুলীশ তাঁহাদের দলপতিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, এবং অনেকগুলি মহিলাকে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৪। ১২ই নবেম্বর হইতে নাগপুরের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম নাগপুরেই শিল্পপ্রদর্শনী হয়। ইহার পর ভারতে নানা স্থানে নানা প্রকার প্রদর্শনী হইয়াছে। এই নাগপুর-প্রদর্শনীতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে শিল্পের যে অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

৫। কুচবিহারের মহারাজা কুচবিহারে একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করিতেছেন। ইহার পরিচালনের জন্য স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

৬। পঞ্জাবের মুক্তিফৌজ মিসনের পাদরী সাহেবদিগের তত্ত্বাবধানে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে বস্ত্রবয়ন-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য একটী বৈজ্ঞানিক বস্ত্র-বয়নশালা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পঞ্জাবের ছোট লাট অমৃতসরে এই বস্ত্রবয়নশালার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৭। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জষ্টীস্ সারদা চরণ মিত্র মহাশয় শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন শুনা যায়। বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া শীঘ্রই বিচারকার্য্য গ্রহণ করিবেন।

৮। বিলাতে অনেকগুলি কল বন্ধ

হওয়ায় বেকার লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা কার্য্যাভাবে যার পর নাই বিপন্ন হইয়া অবশেষে দাঙ্গা-হাঙ্গাম এবং লুট পর্য্যন্ত করিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট অধুনা তাহাদিগকে নৌ-বিভাগে ও অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আগামী বৎসরে তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

৯। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কোনও কালে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সেখানে ভীষণভাবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কাণপুর, লাহোর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ায় অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে।

১০। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য প্রদেশের শিল্পোন্নতির জন্য একজন ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডষ্ট্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা প্রদান করিবেন।

১১। বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের ২রা তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ঐ দিনে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারের পর হইতে ভারতবাসী এবং করদ ও মিত্ররাজগণ কিরূপ সুখস্বচ্ছন্দে আছেন, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কতকগুলি বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

১২। বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের ৭ই তারিখে কলিকাতা ওভারটুন হলে একটী বালক ছোটলাট বাহাদুরের প্রাণনাশের চেষ্টায় বন্দুক ছুড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই। বালক এক্ষণে বিচারাধীন আছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

চিন্তা-নির্ঝরিণী—শ্রীযুক্ত কুমারবিক্রম মজুমদার প্রণীত নূতন ধরণের পুস্তক। পুস্তকের নাম এবং প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার গভীর চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধনিচয়ের সুন্দর ভাব এবং রচনালালিত্যে পাঠকের মনে এক অপূর্ব্ব গভীর ভাবের উদ্রেক হয়। পুস্তকের অবতারণা যেমন মধুর, পরিসমাপ্তিও সেইরূপ।

বামারচনা

আবাহন।

ডাকিতেছি সকাতরে
দীনা অভাগিনী আমি
এসো এসো শূন্য হৃদে
হে করুণাময় স্বামী।

শূন্য রাখিও না নাথ!
এ হৃদয় সুখালয়;
শুনিয়াছি শূন্য গেহ
হয় ক্রমে দৈত্যালয়।

এ নীরস ধরাতলে
শান্তি যে মিলে না আর;
ভীষণ আঁধারে প্রভো!
ভরেছে হৃদয়াগার।

এসো নাথ! এসো এসো
শূন্য এ হৃদয়ে মোর;
দুরবহ এ জীবন
বহিতে পারিনে আর?

দাও শক্তি দাও বল,
মুছে দাও অশ্রুজল;
নিভাও যাতনারাশি
এ শোকার্ত্ত চিতানল।

সংসার-সৈকতে আমি
কেমনে রহিব একা,
এসো নাথ! শূন্য হৃদে
হ'য়ে নব হৃদিসখা।

"আসন" রেখেছি পেতে
শূন্য এ হৃদয়-কূপে;
এসো ওগো বিশ্বপতি!
প্রেম মৃত্যুঞ্জয় রূপে

মহাযাত্রা।

যুগল বরষ পূর্ণ? সম্ভব কি হয়?
একা আমি লুটিতেছি শ্মশানের গায়।
গৃহদীপ নির্ব্বাপিত, জ্ঞান ধর্ম্ম তিরোহিত,
ভীষণ ছায়া শমন তমসা ছড়ায়;
সত্যই কি দুই বর্ষ ছেড়েছ সবায়?

২

যুগল বরষ গত—সম্ভব কি হয়?
ফেলিয়া গিয়াছ সবে নির্ম্মম ধরায়?
সেই যে অমৃতবাণী, না জাগায় এ ধমনী,
সে শুভ্র মূরতি লুপ্ত ভীষণ চিতায়;
সত্যই কি দুই বর্ষ হেরি না তোমায়?

৩

সত্যই কি দুই বর্ষ, না হেরি তোমায়,
জীবনের নিত্য গতি ফিরিছে কোথায়?
ভাবিতে পারিনা হায়! তুমি নাই এ ধরায়,
একা আমি আছি বেঁচে শ্মশান-ধরায়,
দুই বর্ষ একা বেঁচে? বিশ্বাস না হয়।

দুই বর্ষ কেটে গেল এ অমা নিশায়,
এ শ্মশানে কে রাখিল এই অনাথায়?
বিশ্বাস সে ধর্ম্মবল, সব গেছে রসাতল,
মধ্যাহ্নে রাহুর গ্রাসে তপন লুকায়;
সত্যই কি দুই বর্ষ মিশেছ চিতায়?

৫

সত্যই কি দুই বর্ষ মিশেছ চিতায়?
আনন্দ-আশার প্রভা বিলীন ধরায়?
এতকাল লুটিতেছি সব আশা হারায়েছি,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গেছে মহা তমসায়।
শ্মশানের বহ্নি ব্যাপ্ত শ্যামলা ধরায়।

৬

যুগল বরষ পূর্ণ সম্ভব কি হয়!
এ সুরম্য স্থান তব ভরা তমসায়।
তরুতলে, গৃহকোণে বিধির আশীষগুণে,
কতই স্বরগসুধা ঢেলেছ তথায়;
দুই বর্ষ আর আলো জ্বলে না ধরায়।

৭

দুই বর্ষ পূর্ণ আজি—সম্ভব কি হয়,
সহিতেছি একা এই কালের প্রলয় ;
সেই আমি ভীরু প্রাণী, শমন অশনি হানি
নারিল জীবনধারা মরুতে মিশাতে ;
দুই বর্ষ লুটিতেছি শ্মশানের গায় ?

৮

যুগল বরষ আগে কত আশা লয়ে
ভাবিতাম শমনেরে দিব তাড়াইয়ে,
পৃথিবীর শক্তি যত ভাবিতাম নিজ হাত,
সেই শক্তি সেবা যত্ন একত্র করিয়া
ভাবিতাম শমনেরে দিব তাড়াইয়া।

৯

যুগল বরষ পূর্ণ ভেঙ্গেছে সে ভুল,
আঁধারে ডুবিয়া সদা পরাণ আকুল ;
সে কর্ম্মের কোলাহল, সেই ব্রহ্মশক্তিবল,
দেখালে জলন্ত ভাবে তবু মম ভুল—
মহা ভুল, অনুতাপে পরাণ আকুল।

১০

যুগল বরষ পূর্ণ বসন্ত না আসে,
এ শ্মশানে লুটিতেছি অনাথার বেশে।
সেই যে ধর্ম্মের কল নিশি দিবা প্রজ্বলিত,
সেই সৌরভেতে আজো চিত্ত বিমোহিত।
সেই পুণ্য এ সংসারে নহে তিরোহিত।

১১

না মা তুমি হেথা নাই ভাবিলেও পাপ ;
সহিবারে দাও বল—যত শোক তাপ।
বিধির আশীষ পেয়ে পুণ্য বিভা বিতরিয়ে,
অমর ধামেতে আছ স্বকার্য্য সাধিয়া,
আমি যে অতীব মূঢ় যাই তা ভুলিয়া।

১২

কি সাধ্য কালের তব ও প্রভা মুছায় ?
পুণ্য গাথা চিরাঙ্কিত রবে এ ধরায়।
যে বিধান বিধাতার রোধে তাহা সাধ্য কার ?
মৃত প্রাণে দাও বল এ অমানিশায়,
জীবন বহিছে শুধু ও পুণ্যপ্রভায়।

Fairy Hall.

ভাইফোঁটা।

আজি কেন উদ্ভাসিত
নব প্রেমে এ ধরণী ?
কি কুটীরে কি প্রসাদে
উঠেছে আনন্দধ্বনি।

মঙ্গল-কল্যাণ-গীতি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে,
ভগিনী পরাবে ফোঁটা
ভায়েরে হরষভরে।

ভারতের এই দিন
সুপবিত্র, নিরমল,
ভাই বোনে এই ভাব
থাক চির-অচঞ্চল।

সীমা ছাড়ি, গণ্ডী ছাড়ি,
জাতীয় জীবন সাথে,
ছুটুক অনন্ত মুখে
এ প্রেম, অনন্ত পথে।

২১১১ নম্বর মির্জ্জাপুর লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 544. December, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৪ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। ডিসেম্বর, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন ছোট লাট—বঙ্গের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সার এডওয়ার্ড বেকার তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

মৃত্যু—৺ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র পঞ্জাবের একাউণ্টাণ্ট-জেনারল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ৩রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, লাহোরে, ৪৫ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এই উচ্চ পদে তিনিই প্রথম অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তিদান করুন।

চীনের সম্রাট্ সান্‌টিন কংহসু গত ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধা রাজমাতা অনেক দিন হইতেই পীড়িতা ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুসংবাদের দুই দিন পরেই শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রাজপুত্র চুন স্বীয় দুই বৎসরের পুত্র পুইকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ছোট লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা—কলিকাতা ওভারটুন হলে বক্তৃতার সময় একটী যুবক বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়াছিল, কিন্তু বন্দুক খারাপ থাকায় গুলি বাহির হয় নাই, এবং আসামী গ্রেপ্তার হইয়া দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতি—শুনা যায় মাননীয় ডাক্তার রাসবেহারী ঘোষ মহাশয় আগামী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

বিহারে অশান্তি—শুনা যায়, বিহারে অনেক প্রজা নীলের চাষ পরিত্যাগ করিয়া ইক্ষুর চাষে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং

অনেকে আর নীলকরদের কার্য্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক প্রজাকে গেপ্তার করা হইতেছে।

নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি—ভারতে দেবোত্তর সম্পত্তি নামে দেবসেবা, অতিথি-সেবা ও শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সে সকল টাকার সদ্ব্যবহার না করিয়া অশিক্ষিত লোকেরা নিজেরা ব্যয় করিয়া থাকেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সকল দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষার জন্য এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে সুব্যবস্থা—আয়র্লণ্ডের ইংরাজ জমিদার এবং আইরিস প্রজাদিগের মধ্যে প্রায় অশান্তি ও গোলযোগ বাধে। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য আইন করিয়া ইংরাজ জমিদারদিগকে বাধ্য করিয়া আইরিস-দিগের নিকট তাহাদের জমিদারী বিক্রয় করাইতেছেন।

প্রতিবাদ সভা—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য টাউনহলে ভারতের সকল সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক বিরাট সভা করিয়াছিলেন। ভূপালের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মৌলভি আব্দুল জব্বর সিমনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দান - বাবু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের স্মরণার্থ এলবার্ট ভিক্টর হাঁস-পাতালে একটী রোগীর বাসের জন্য ৩০৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তুলসী নিজ পত্নীকে আপন ভবসাগর-পারের সহায় ও প্রথম গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, কেননা, প্রথমে পত্নীর ভর্ৎসনায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। পত্নীর সেই তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য তীক্ষ্ণধার কুঠারের ন্যায় তাঁহার মায়া-তরুর মূলে পতিত হইয়াছিল। তিনি সে কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন এবং পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। পতির সন্ন্যাসগ্রহণের পর তুলসীপত্নী অনুতাপে ও শোকে জীবন্মৃতা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক দেহপাত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সন্ন্যাসগ্রহণের বহুদিন পরে, তুলসী ঘটনাক্রমে শ্বশুরালয়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহ এরূপ শীর্ণ হইয়াছিল যে, তুলসী প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। পরে তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র দান করেন। তুলসীপত্নী তদবধি অপূর্ব্ব

শান্তিময় নব জীবন লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবন পরানন্দে অতিবাহিত করিয়া ছিলেন।

বজ্রলেপঘটিত সুদৃঢ় মায়া পাশ ছেদন করিয়া, অটল গিরিরাজের ন্যায় কৈবল্য-পথে দণ্ডায়মান হইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তুলসী গৃহত্যাগ করেন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সংশয় নাই। সে সময় তিনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তুলসী যব্ জগ্‌মে আয়ো, জগ হসে তোম্ রোয়্।
আইসে কর্ণি কর্ চালাকি, তোম্ হসো জগো রোয় ॥"

—হে তুলসী! তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে (মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে), তখন (সূতিকাগৃহে তোমাকে দেখিয়া) সকলে (আনন্দে) হাসিয়াছিল, কিন্তু তুমি রোদন করিয়াছিলে। এখন তুমি এমন কার্য্য করিয়া যাও যে, (তোমার প্রস্থানকালে) সকলে রোদন করে, আর তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার।

সত্য সত্যই তুলসী জগৎকে কাঁদাইয়া, স্বয়ং পরমানন্দে আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে যিনি নিত্য জাগরূক, তিনিই জীবিত, তিনিই অমর।

উল্লিখিত হইয়াছে, হনুমান্ তুলসীকে বলিয়াছিলেন—তোমার ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে তুমি বারংবার ভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিবে। হনুমানের সে আশ্বাস-বাণী সফল হইয়াছিল। সাধনার প্রথমাবস্থায় তুলসী বহুদিন রমণীয় চিত্রকূটে বাস করিয়াছিলেন। একদা তত্রত্য মন্দাকিনী নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া, তিনি চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন ও মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক অপূর্ব্ব শ্যামমূর্ত্তি শিশু তথায় উপস্থিত হইয়া অমৃতায়মানকণ্ঠে কহিল,—বাবাজি! আমি আপনাকে চন্দন মাখাইতেছি। তুলসী কহিলেন,—আচ্ছা। শিশু পরম যত্নে তুলসীকে চন্দন মাখাইতে লাগিলেন। সেই শিশু যে ছদ্মরূপী স্বয়ং রামচন্দ্র, তুলসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কেননা সে করকমলের স্পর্শমাত্রই কি এক অপূর্ব্ব আনন্দনির্ভরে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিমূঢ় হওয়ায় বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। হনুমান্ অলক্ষ্যভাবে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ সময় উঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, এ অবসর চলিয়া গেলে, হয়ত আর ঘটিবে না। হনুমান্ তখন শুক-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সমীপস্থ বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া সুব্যক্ত স্বরে কহিলেন,—

"চিত্রকূটকে ঘাটপর ভূঈ সন্তনকী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসে, তিলক দেত রঘুবীর ॥"

—অহো! আজি চিত্রকূটের ঘাটে, ভক্ত সন্তানের কি শুভদিন! তুলসীদাস চন্দন ঘষিতেছেন, রঘুবীর তাঁহাকে চন্দনের তিলক দিতেছেন!

হনুমান দুই তিন বার ঐ শ্লোক পাঠ করিলে, তুলসীর চৈতন্য হইল। তিনি

জানিলেন,—ইনিই রামচন্দ্র। তখন তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া ভগবানের চরণে পতিত হইয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন হনুমান্ তুলসীর নিকট আসিয়া কহিলেন,—হে ভক্ত সাধো! ভগবান্ তোমার ভক্তিডোরে বদ্ধ হইয়াছেন, তুমি বারংবার তাঁহার দর্শন পাইবে, এবং আমিও প্রয়োজনমত আসিয়া তোমার সহায়তা করিব।

তুলসীদাস একদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে আশ্রম হইতে বহুদূর গমন করিলেন। বনপথ দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে দেখিলেন,—অদ্ভুতমূর্ত্তি অসংখ্য বানর ও রাক্ষস সমবেত। তথায় মহাসমারোহে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক মহোৎসব হইতেছে। তিনি অবাক্ হইয়া ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—তত্রত্য লোক সকল সমবেত হইয়া আশ্চর্য্য বেশভূষা করিয়া এ স্থানে রামলীলা করিতেছে। অহো! কি আশ্চর্য্য অভিনয়। অভিনয় এত সত্য, এত অবিকল হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। তিনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কহিলেন;—অহো! কি আশ্চর্য্য রামলীলা দেখিলাম! আপনি কি এ রামলীলা দেখিয়া আসিলেন? ব্রাহ্মণটী বিস্মিত হইয়া কহিলেন;—গোঁসাইজি! আপনি দেখিতেছি, ক্ষেপিয়াছেন। রামলীলা আশ্বিন মাসে হয়, এসময় রামলীলা কোথায়? তুলসী কোনও উত্তর না করিয়া, হনুমানের বাক্য ও ভগবানের অচিন্ত্য লীলারহস্য ভাবিতে ভাবিতে, চিত্রকূট হইতে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।

তুলসী যে সকল খাদ্যাদি উপহার পাইতেন, তাহা অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রগণকে দান করিতেন। যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পরদিনের জন্য রক্ষা করিতেন। ৺কাশীধামে চৌরের ভয়ানক উপদ্রব। একদিন গভীর অন্ধকাররাত্রে তাঁহার আশ্রমে চৌর আসিয়াছিল। চৌর তাঁহার গৃহমধ্যে যেই প্রবেশ করিবে, অমনি সম্মুখে দেখিল,—এক তেজঃপুঞ্জ অপূর্ব্ব শ্যামবর্ণ পুরুষ ভীষণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান! তদ্দর্শনে সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া, "রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!" বলিয়া তুলসীকে আহ্বান করিতে লাগিল। তুলসী তাহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া চৌরকে অভয় দিয়া, এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া, বিদায় দিলেন। অনন্তর মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! আমি কি মূঢ়! আমি এই তুচ্ছ দ্রব্যের জন্য প্রভুকে এত ক্লেশ দিতেছি! তদবধি তিনি ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যই পর দিনের জন্য সঞ্চিত রাখিতেন না, প্রত্যহ সমস্তই দান করিয়া ফেলিতেন।

আর একদিন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে তুলসী একাকী কাশীর এক গলি দিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন। এমন সময়ে ভীষণ দস্যুদল তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল,

তাঁহার প্রাণবধের জন্য অস্ত্র তুলিল। তুলসী একান্তভাবে হনুমানকে স্মরণ করিলেন। পরক্ষণেই দস্যুগণের হস্তপদাদি অস্পন্দ হইল, মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। তাহারা কাতরভাবে প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। তুলসী বলিলেন—যদি তোমরা শপথ করিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা তাহা স্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তদবধি তাহারা দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া সাধু জীবিকা অবলম্বন করিল।

তুলসী পরোপকারের সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। তাঁহার যত্নে অসংখ্য দীনহীন অনাথের দুঃখমোচন হইয়াছিল। কোনও প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে হিন্দু, মুসলমান সকলেই তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত। ইহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা তিনি জনকপুরে গিয়া শুনিলেন, পাটনার মুসলমান সুবাদার এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বারখানি গ্রাম বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ সপরিবার অন্নাভাবে ঘোর দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে। উক্ত বারখানি গ্রাম, ঐ ব্রাহ্মণেরা রামচন্দ্রের রাজত্বকাল হইতে ব্রহ্মত্ররূপে ভোগ করিয়া আসিতেছে। ঐ ব্রাহ্মণেরা তুলসীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া, সপরিবারে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তুলসী সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলে, সুবাদার সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তুলসী তাহাকে পার্থিব বৈভবের অসারতা ও অধর্ম্মাচরণের ভীষণ পরিণাম এরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বুঝাইলেন যে, সুবাদার ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, তাহার পৈতৃক সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল।

জাহাঙ্গীর বাদসাহ পিতার নিকট এবং অন্যান্য লোকের নিকট তুলসীর অলৌকিক প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন। তিনি তুলসীকে দেখিবার জন্য এরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, স্বয়ং কাশীধামে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে প্রভূত সম্পত্তি দিতে চাহিলে তুলসী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে অসীম ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব দান করিয়াছেন। পরোপকারের জন্য এরূপ সুযোগ লাভ করা এ জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন ও দীনপালন দ্বারা ঈশ্বরের এই দুর্লভ দানকে সম্পূর্ণ সার্থক করুন। আপনার বিশাল ধনাগারে যে সকল মহামূল্য মণিরত্ন আছে, সে সকলের অপেক্ষা নির্ম্মল দয়ার্দ্র হৃদয়কেই আপনি অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিবেন। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের জলন্ত দৃষ্টি আপনার উপর সর্ব্বদাই নিবদ্ধ। আপনি সমস্ত সংসারকে ফাঁকি দিতে পারেন, কিন্তু সে সর্ব্বসাক্ষীর দৃষ্টির নিকট আপনার কোনও চাতুরী খাটিবে না। সর্ব্বত্র সমতা ও শুভ দৃষ্টিই রাজধর্ম্ম। পক্ষপাতী, লোভান্ধ রাজার রাজ্য ছারখার হয়। প্রজার সুখসমৃদ্ধিই

রাজার অভ্যুদয়।—"লোকাধারাঃ শ্রিয়ো রাজ্ঞাম্।" সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, তুলসীর অলৌকিক সাধুতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন।

তুলসী একদা বিঠুর হইতে আসিতেছিলেন। পথে শণ্ডিলনামক স্থানে, এক ব্রাহ্মণ, পত্নীসহ আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, এবং কাতর ভাবে কহিলেন,—প্রভু! আমরা পুত্রহীন। পুত্রের জন্য নানা দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও ফল পাইলাম না। তাই, বংশলোপভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি। শুনিয়াছি, ভবাদৃশ সাধুর কৃপায় অসাধ্যও সিদ্ধ হয়। এ শরণাগত ব্রাহ্মণদম্পতীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। তুলসী স্বহস্তে তাঁহাদিগকে দুইখানি রামকবচ লিখিয়া দিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক উহা ধারণ করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, "তোমরা শুদ্ধভাবে থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিও। তোমাদের বংশ অক্ষয় হইবে এবং সকলেই রামভক্ত হইবে।" আরও বলিলেন,—"এক বৎসরের মধ্যে তোমাদের একটী সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, এবং সেই সন্তান পরম ভক্ত ও মহাকবি হইবে।" বাস্তবিক তাহাই হইল। ব্রাহ্মণদম্পতী সংবৎসরমধ্যে অপূর্ব্ব পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। ঐ পুত্রের নাম বংশীধর; তিনি "কবীশ্বর বংশীধর" নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বংশপরম্পরা অদ্যাপি বর্ত্তমান; সকলেই ভগবদ্‌ভক্ত, সুশীল ও আতিথেয়। ঐরূপ পর্য্যটনকালে তিনি জৈরামপুর নামক গ্রামের সন্নিহিত এক বিস্তীর্ণ মাঠ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, অত বড় মাঠে একটীও বৃক্ষ নাই। গ্রীষ্মকালে তথায় পথিকদিগের বিশ্রামলাভের কোনও উপায় নাই। তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন;—ঐ স্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা শুকাইয়া যায়, জলসেকও নিষ্ফল হয়। এই জন্য ঐ স্থান মরুভূমির ন্যায় পতিত রহিয়াছে। তিনি ঐ কথা শুনিয়া, একটী জীর্ণশীর্ণ বটশাখা লইয়া ঐ স্থানে স্বহস্তে রোপণ করিলেন। বলিয়া দিলেন;—"এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইলে, ইহার নাম "বংশীবট" রাখিও। প্রতি বর্ষে এই স্থানে রামলীলা উৎসব করিও।" স্বল্পকালেই সেই জীর্ণশাখা অপূর্ব্ব বৃক্ষে পরিণত হইল। সেই বংশীবট অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অসংখ্য শ্রান্ত পান্থকে অমৃততুল্য ছায়া দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছে। প্রতিবর্ষে সেই স্থানে রামলীলা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নীতিস্তবক।

১। মানুষের চক্ষুদুটী এমন স্থানে বসান আছে যে, মানুষ সকলেরি মুখ দেখিতে পায়, কেবল নিজের মুখ দেখিতে পায় না। অর্থাৎ অন্যের মুখে যে সব দোষ আছে, তাহাই দেখিতে পায়, নিজের মুখাকৃতির দোষ তাহার চক্ষে

পড়ে না। কিন্তু যাহার জ্ঞানচক্ষু আছে, সে অগ্রে নিজের দোষ দর্শন করে।

২। শাস্ত্রে আছে;—"ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরার্থে নিজ ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ আত্মবিসর্জ্জনে শিক্ষিত হয় নাই, তাহার নিকট শাস্ত্রের কথা উপকথা।

৩। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস অটল, ঈশ্বর তাহার সঙ্গেই থাকেন। কোটি কোটি শত্রুও তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। সে অশেষ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসিগণের নিত্য সহায়।

৪। যাহার হৃদয় দয়ায় ও সরলতায় পূর্ণ, ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

৫। যে ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাঁহার অনুসন্ধান করে, সে অযাচিতভাবে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ করে।

৬। ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের মধ্যে ঈশ্বরকে পাইবে না, পবিত্র আত্মার মধ্যে অনু সন্ধান কর, সে নিধি মিলিবে।

৭। মানবকে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহার তেজে পাপরাশি দগ্ধ ও তাহার প্রেমচন্দ্রিকায় জগৎ শীতল হইবে।

৮। সংসারের সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত বিদ্যমান। বিশ্বাসী ব্যক্তি জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্তের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন।

৯। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

—"নহীশ্বর' হীশ্বর চেষ্টিতং জগৎ"।

১০। কাহারও কোনও উপকার করিয়া, "আমি করিলাম"—এ অভিমান বৃথা। ঈশ্বরই করেন, তুমি—আমি নিমিত্ত-মাত্র।

১১। যে স্ত্রী আপনার স্বামীর মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই, যাঁহার স্বামীর মন পরস্ত্রীদর্শনে আকৃষ্ট হয়, তিনি আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপত্নী স্বামীর মন এতদূর অধিকার করেন যে, তাঁহার স্বামীর মন অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না।

১২। ধর্ম্মগুরু কবীর বলিয়াছেন;—পুত্ আর মৃত্ এক স্থান হইতে আসিয়া থাকে। যে পুত্ পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল না করে, সে পুত্ নহে, সে মৃত্।

১৩। যে প্রভুকে তাহার অনুজীবি-গণ ভক্তিশ্রদ্ধা না করে, যাহাকে আত্ম-রক্ষার্থ সদাই রক্ষিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়, সে প্রভু দস্যুমধ্যে গণ্য।

১৪। মানুষ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করে।

১৫। যাহার হৃদয় শিশুর ন্যায় কোমল ও সরল, যে ধরণীর ন্যায় সহিষ্ণু, গিরির ন্যায় অটল, তাহাকেই বীর বলে।

১৬। যে মানব সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সহিত নিজ প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, সে কখনও অসুখী হয় না।

১৭। তোমার অন্তরের নিগূঢ়তম

স্থান ও সর্ব্বসাক্ষীর অগোচর নহে। আমার এ কার্য্য কেহ দেখিল না, যে মনে করে, সে বড়ই ভ্রান্ত।

১৮। মানবমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। সকলকেই সৈনিক হইতে হইবে। অধর্ম্মের সহিত যুঝিতে যুঝিতে যে সেই বিজয়লক্ষ্মী ঈশ্বরকৃপা অধিকার করিবে, সেই রণজয়ী বীর।

দেবী—না মানবী!

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মালব প্রদেশের সিংহাসনে এক ধর্ম্মশীলা হিন্দুমহিলা অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁহার নাম অহল্যা বাই। ভারতের অতীত ইতিহাসে যে সকল মহিলার পবিত্র কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে অহল্যাবাইয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মালবপ্রদেশের রাজা কণ্ডীরাওএর সহিত অহল্যাবাইএর বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামিসুখভোগ তাঁহার ভাগে বেশী দিন ঘটে নাই। পতির মৃত্যুর পরই একমাত্র পুত্র মালরাও অতি অ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মালরাওএর মৃত্যুর পর অহল্যা বাই স্বয়ং মালবের অধীশ্বরী হইলেন পতি ও পুত্র হারা হইয়া তিনি কিছুকাল কন্যা মুক্তাবাইকে লইয়া শান্তির অন্বেষণে ব্যস্ত রহিলেন। কিন্তু শোকসন্তপ্ত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর, গঙ্গাধর যশোবন্ত নামক একজন রাজপুরোহিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজপুরোহিত গঙ্গাধর অহল্যাবাইকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইনি ভাবিয়াছিলেন যে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তিনি স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান হইয়া থাকিতে পরিবেন। কিন্তু অহল্যাবাই পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাজ্যের যাহাতে প্রণষ্ট গৌরব ফিরিয়া আইসে যাহাতে রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তাই তিনি গঙ্গাধরের প্রস্তাবে বিনীত ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে গঙ্গাধরের হৃদয়ে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য রাঘব দাদাকে অহল্যা বাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরের পরামর্শে রাঘব শীঘ্রই অহল্যা বাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন।

অযথা নর-রক্তপাতের আশঙ্কায় ধর্ম্মশীলা অহল্যা বাই একটু বিচলিত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রের রাজা মধুরাওকে আপনার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া একখানি অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। মধুরাও আপন পিতৃব্য রাঘব দাদাকে নিরস্ত করায় যুদ্ধসজ্জা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

গঙ্গাধর যশোবন্ত বড়ই বিপদে পড়িলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি পুনরায় অহল্যা বাইয়ের শরণাপন্ন হইলেন। অহল্যাবাই তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিলেন। তকাজী হুলকার নামক অহল্যা বাইয়ের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিল। অহল্যা বাই স্বয়ং মহীশূরে থাকিয়া শাতপুরা পর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ সকলের রাজস্ব আদায় করিতেন এবং তকাজী দক্ষিণ প্রদেশে থাকিয়া হুলকারের অধীনস্থ প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এদিকে নিমাড়, মালব ও দক্ষিণ অঞ্চলের রাজস্বও তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত।

অহল্যা বাই কখনই প্রজার রক্ত শোষণে ব্যস্ত ছিলেন না। তাই তিনি শ্রীহীন সামান্য গ্রাম ইন্দোরকে একখানি সমৃদ্ধিশালী প্রসিদ্ধ নগর করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি দুই কোটি টাকা হুলকার রাজ্য হইতে পাইয়াছিলেন। এই সকল টাকাই তিনি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইলে পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত সঞ্চিত থাকিত। ভারতবর্ষের সকল রাজার প্রতিনিধি আসিয়া রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং অহল্যা বাইয়ের প্রতিনিধিগণ হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপত্তন, পুণা, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া সেই সকল স্থানের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অহল্যাবাই বহু অর্থব্যয়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরে জাম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করান। পরে ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটী দুর্গ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে অহল্যা বাইয়ের বিশেষত্ব ছিল। তিনি রাজসভায় মন্ত্রিগণ ও পারিষদবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। হিন্দুমহিলার ন্যায় তিনি চব্বিশ ঘণ্টা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহার জীবনপ্রণালী অতীব শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে শিবপূজায় নিযুক্ত রহিতেন। পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্ম-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। তৎপরে পাঠান্তে নিজ হস্তে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং আহার করিতেন। আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় রাজসভায় উপস্থিত হইতেন এবং সায়ংকাল পর্য্যন্ত রাজ্যের অভাব অভিযোগ বিচারান্তে সায়ংকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালীন ভোজন করিতেন। ভোজনের পরও তিনি কিছুকাল পুনরায় রাজদরবারে বসিতেন। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" এই কথাটী রাণী অহল্যা বাইয়ের চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অহল্যা বাই ধর্ম্মশীলা ও অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর্ত্তের অশ্রুজল ও কাঙ্গালের হৃদয়বেদনা তিনি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেন। তাঁহার ন্যায় দয়াবতী রমণী জগতে দুর্ল্লভ,সন্দেহ নাই। তাঁহার স্থাপিত কীর্ত্তিসমূহ অদ্যাপি জগতে হিন্দুরমণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রতি বৎসর শত শত নর নারী হিন্দুতীর্থ কেদারনাথে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে গমন করিয়া থাকেন। অহল্যা বাই যাত্রীদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কুণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মশালা আজিও মন্দরনামক স্থানের উত্তরাংশে পুণ্যবতী অহল্যাবাইয়ের চরিত্রচিত্রের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা ও কূপ, মালব ও মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে অদ্যাপিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কীর্ত্তি হিন্দুতীর্থ—শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্রাবিড়, প্রভৃতি স্থানে শত শত যাত্রীর অভাব অভিযোগ দূর করিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা গয়াতেই অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু-পদ-মন্দির ও লাটমন্দির অদ্যাপি বিদেশীয় চিত্রকরদিগের বিস্ময়াকর্ষণ করিতেছে। ইদানীন্তন যে সকল নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক মাতৃভূমির অবমাননা করিয়া ভারতের কলাবিদ্যার দরিদ্রতা সপ্রমাণ করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা একবার—Indian Antiquary পাঠ করুন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর গ্রিফিথ সাহেব ভারতের চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"When I saw long delicate carves drawn without faltering with equal precision upon the horizontal surface of ceiling, where the difficulty of execution is increased a thousand fold—it appeared to me nothing less than miraculous" (Indian Antiquary, Vol. III, p. 26.)

আমাদের নিজের দেশের খবর আমরা রাখিনা বটে—কিন্তু গুণগ্রাহী ইংরেজ-সমাজ সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আগ্রহভরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির এবং লাটমন্দির দেখিলে অতীত গৌরবকাহিনী মানসপটে উদিত হইয়া নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার হয়। মন্দিরের কারুকার্য্য যেন বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে করিয়াছেন। মানবের তুলিকাস্পর্শে এত মনোরম—এত রমণীয় চিত্র চিত্রিত হইতে পারে—এ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মন্দিরের উপরিভাগ এমনই নিপুণ হস্তে খিলান যে, দেখিলে মনে হয় যেন শূন্যমার্গে উহা আপনা হইতেই ঝুলিয়া রহিয়াছে। মন্দিরটী দেখিলে নয়নের স্বভাব বলিয়া মনে হয়; দুটী মাত্র চক্ষু দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

বাল্যকাল হইতেই অহল্যাবাইয়ের হৃদয়ে

প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। গয়ার একটী দেবমন্দিরে এই ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী সতীর একখানি পবিত্র চিত্র আছে। মন্দিরমধ্যে রাম সীতার যুগল মূর্ত্তি,—নিকটে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, শিবভক্তা অহল্যাবাই ভক্তিগদগদচিত্তে শিবপূজায় নিযুক্তা রহিয়াছেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মশীলা অহল্যাবাইয়ের পবিত্র আত্মা পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে প্রগাঢ় ধর্ম্মপ্রাণতার দ্বারা তিনি সমগ্র হিন্দুনারী-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল যে ভারত ইতিহাসে প্রগাঢ় ভক্তিভরে কীর্ত্তিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার ত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রত্যেক দেবালয়ে দান করা হইত। দারিদ্র্যের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিত। তিনি শীতকালে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান এবং গ্রীষ্মকালে পথিকদিগের নিমিত্ত স্থানে স্থানে অন্নসত্র ও জলসত্রের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পশু পক্ষীর প্রতিও তাঁহার দয়া সমভাবে ছিল। ক্ষেত্রে কৃষকেরা পাখী বসিতে দিত না,—তাই অহল্যাবাই কৃষকদিগের নিকট হইতে শস্যক্ষেত্র ক্রয় করিয়া পাখীদের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা, রাজসাহী।

আমি।

(১)

মাটীর পুতুল আমি
তোমার হাতেতে গড়া,
তোমারি খেলনা নাথ!
তোমারি বসন পরা।
সকলি তোমার দেওয়া—
প্রেমময়—দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

(২)

আমি কে? তোমারি দাস,
তোমারি চরণধূলি,
তোমারি মুখেতে বলি
তোমারি শিখান বুলি;
তোমারি সকল প্রভো!
প্রেমময়! দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

জাপানের অভ্যুদয়।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

১৮৯৪-৯৫ সালের China-Japanese war-এর পর হইতে (the great expansion of national resources after the close of the C. J. war) শিল্প-

বিদ্যার মূল্য জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল। সেই সময় হইতে technical স্কুল অতি শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শিল্প-শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। কৃষিবিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য স্কুল স্থাপন করা হইল। এক্ষণে জাপানে ২৭,১৫১টী Elementary School—এ ৫১৩৫৪৮৭ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। শিক্ষোপযোগী বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৯১¼ ছাত্র শিক্ষা লাভ করে। ৫৭টী Normal স্কুলে ১৯১৯৪ ছাত্র অধ্যয়ন করে। শিল্পশিক্ষার জন্যsupplementary স্কুলসংখ্যা ৬৩০ এবং তথায় ৩১০১৩ ছাত্র অধ্যয়ন করে। Technical শিল্পবিদ্যালয় class এবং Apprentice স্কুলের সংখ্যা ৯৯, এবং সেখানে ৬৫১০ জন ছাত্র। ২৫৮টী Middle School—ছাত্রসংখ্যা ৯৫,০২৯। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার স্কুল ৮০, ছাত্রীসংখ্যা ২১৫২০। গভর্ণমেণ্ট Higher Normal School ৩টী—ছাত্র ১০০০। Industrial School ও Technical School of class A ১৩০, ছাত্র ২০৩৩। Imperial University ২টী—ছাত্রসংখ্যা ৪০৪৬। Private ও Public college. সংখ্যা ৫০, ছাত্র ১৬৯৬০। Government Teacher's Training Institute ৮টী—ছাত্র ৩১৯। Blind ও Dumb School গবর্ণমেণ্ট ১টী ৩১৮টী private ও public. Library ৬৭। Private ও Public Miscellaneous School ১৬৫৭টী। রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে যদিও এসিয়ার পূর্ব্বে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি জাপানের বিদ্যালোচনা স্থিরভাবে চলিতেছে; ইহাতে উৎসাহ কম হওয়া দূরে থাকুক, ছাত্র ও শিক্ষকগণ উৎসাহে ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেছেন। যদিও রাজ্যের অন্য বিভাগের খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবমত কম করা হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের খরচে আদৌ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জাপানে শিক্ষাকে জাতীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির প্রধান উপকরণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অতীব দুর্ব্বল বা রোগাক্রান্ত না হইলে কাহারো মূর্খ থাকিবার অধিকার নাই। আজি সেই শিক্ষার বলে সকলে এক উদ্দেশ্যে দেশের উন্নতিকল্পে ও দেশ-রক্ষার্থে স্বীয় জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতেছে। ইহাদের যদি উন্নতি না হইবে ত হইবে কাহার? জাপানী স্ত্রীলোক-দিগের "শিক্ষা, পারিবারিক পরিচর্য্যা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোনও গভীর অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্ন।" পুত্র কন্যাকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাঁহারা জানেন।"

জাপানের জননীরা পুত্রকন্যাদিগকে কখনও তীব্র ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ করিলে স্নেহ মমতার স্বরে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে। এই জন্যই জাপানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে অতিশয় কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন দেখা যায়। চারি

বৎসরের শিশুর নিকট মাতারা যে সব বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, উহা তাহার ধমনী মজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যায়। শিশুরা অতি শৈশবকাল হইতেই এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। জাপানে ছেলেদের ক্রীড়া ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের শিল্প-কার্য্য ও উদ্যানভ্রমণ। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অতি শৈশবকাল হইতে যেরূপ স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ করে, সেখানে সেরূপ নয়। জাপানে ১৭।১৮ বৎসরের বালক ১৪।১৫ বসৎরের বালিকা স্ত্রী পুরুষে বিভিন্নতা কচিৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত এমন পবিত্র ও স্বাধীনভাবে মিলিত পারে যে ভারত-বাসীর পক্ষে ইহা অদ্ভুত দৃশ্য বলিয়া বোধ হইবে। জাপানের মেয়েরা ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে কিম্বা কোন শিল্পশিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করেন, এবং যে পর্য্যন্ত কোন প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষায় পারদর্শী না হন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে সাংসারিক জীবনের অযোগ্য মনে করেন, সে পর্য্যন্ত শিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, জাপানের প্রায় প্রত্যেক বয়স্থা কন্যা জানেন,—পরিজনের প্রতি, স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি। সেই জন্যই জাপান এত উন্নত।

শ্রীকরালী চরণ হাজরা।

কবীর

কবীর পান্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কবীর কাহার পুত্র অথবা কোন জাতীয়,তৎসম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। মুসলমানেরা বলেন কবীর মুসলমান ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জাতি কুল ও জন্ম বিষয়ে নানারূপ অলৌকিক বর্ণনা আছে। সেগুলি অবিশ্বাস্য বোধে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—তিনি তন্তুবায়ের ঘরে জন্মিয়াছিলেন,সুতরাং তিনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। প্রথমে কবীর জাতীয় ব্যবসায়ানুসারে বস্ত্র-বয়ন করিতে শিখেন, পরে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—এ সংসার অসার, এ জীবন পদ্মপত্রে জলের মত। কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করিবে?

একদিন কবীর কতকগুলি সাধুর নিকট যাইয়া আপন মনোভাব জানাই-লেন। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই? কি চাস্?" তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তন্তুবায়, রামা-নন্দের শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।" বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া কহিল, 'তুই ম্লেচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে?' তখন কবীর নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হওয়ায় তিনি পুনরায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনোবেদনা

জানাইলেন। এবারও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। তিনি অস্থিরচিত্তে কাশীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি বলিতে পার গুরু রামানন্দ কোথায় ?" এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিন একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া বলিল,—"গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রিশেষে বহির্দ্বার খুলিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হন। তুই রাত্রি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে যাইয়া শুইয়া থাকিস্। যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন, তাঁহার পদ তোর অঙ্গে লাগিবে। তৎকালে তিনি যে নাম উচ্চারণ করিবেন, তাহাই তুই গুরুমন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। ইহা ভিন্ন রামানন্দের শিষ্য হইবার অন্য কোন উপায় নাই।" কবির বৈষ্ণবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন। শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন। রাত্রিশেষে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কুশ তিল লইয়া স্নানার্থে যেমন বাহির হইবেন, অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবিরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া চুম্বন করিলেন। রামানন্দ ম্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই ?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সেই অবধি কবীর 'রাম নাম' সার করিলেন। তিনি স্তব স্তুতি কিছুই জানিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া অপরাপর বৈষ্ণবের মত কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল। একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া বলিল,—রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস্? কে তোরে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিয়াছে। কবীর নিতান্ত শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "সত্যই বলিতেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই আমি এমন হইয়াছি।"

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল। রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, প্রভো! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রামনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি। সেই দিন হইতে নিয়তই রামনাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই দিন হইতে কবীরকে সকলে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল ভক্ত ছিলেন, তাহা

নহে; অত্যন্ত দয়ালু বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। একদিন একখানি বস্ত্র লইয়া তিনি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, তখন শীতকাল; পথে জনৈক বৃদ্ধ শীতার্ত্ত হইয়া বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর তখনই অম্লানবদনে তাহাকে বস্ত্রখানি দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সংসারের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। আজ যে তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া গৃহে যাইবেন? তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ হইল, বস্ত্রখানি বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ তো পাইতাম না। কবীর গৃহে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। কবীর জননীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"সে কি কবীর তুমিই যে লোক দিয়া আমাকে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।" তখন কবীর ভক্তি-গদ্‌গদ ভাবে মাতাকে কহিলেন,—"ভগবৎ-কৃপাতেই এ সকল আমরা পাইয়াছি।" এই মত দৈব উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি ও দান সম্বন্ধে কবীরের অনেক খ্যাতি ও অলৌকিক বর্ণনা আছে। সে সকল বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কিছুদিন পরে কবীর নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ শিকন্দর লোদী রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্ট লোকেরা যবন-রাজকে জানাইল যে কবীর নামে এক দুষ্ট জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে, এরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত। সিকন্দর কবীরকে ধরিবার আদেশ করিলেন। কবীর ধৃত হইলেন, এবং শুনিলেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবনরাজসমীপে কবীর আনীত হইলে রাজপুরুষগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?" তখন যবনরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যমুনার অগাধ জলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন, রাজ-পুরুষেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে যমুনার অগাধ জলে ফেলিয়া দিল, কিন্তু তিনি কোনও উপায়ে তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন। সেই কথা সকলে যবনরাজকে জানাইল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও যখন কবীরকে বধ করিতে পারিলেন না এবং সকলে কবীরের প্রশংসা করিতে লাগিল দেখিলেন, তখন সিকন্দরের মন টলিল। তিনি কবীরকে ডাকিয়া সাদরে কহিলেন, "সাধো আমার দোষ ক্ষমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি বুঝিতে পারিলাম।" কবীরের সিকন্দর কর্ত্তৃক এই বধচেষ্টার সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক বর্ণনা আছে; সে সকল নিষ্প্রয়োজন বোধে ঐ স্থলে পরিত্যক্ত হইল।

তথা হইতে কবীর কাশীধামে আসিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইলেন। এই কাশীতেও চারি দিকে তাঁহার বিপক্ষ

ঘুরিত, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু ভগবানের কৃপায় কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। যুগে যুগে সাধুগণের প্রতি অত্যাচারের পরিণাম যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইত। শেষে তাহারা আপনাদিগের কুকার্য্যের জন্য আপনারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। কাশীবাসি মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এমন কি একটী বারবিলাসিনীও দূর হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উদ্ধার পাইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এইরূপ জানা যায় যে, একদিন তিনি মণিকর্ণিকার পরপারে আসিয়া ঐ স্থানে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় মৃত্তিকোপরি শয়ন করেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল। শিষ্যেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করে। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ আর তিনি উঠেন নাই। কিন্তু শিষ্যেরা বস্ত্রমধ্যে আর তাঁহার মৃতদেহ পায় নাই। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহার দেহের সংকার লইয়া অনেক বিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু বস্ত্রমধ্যে তাঁহার মৃতদেহ প্রাপ্ত না হওয়ায় সে বিবাদের কোন মীমাংসা হয় নাই।"

(ভক্তমাল গ্রন্থ ১৮০-১৮৫ ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি যে জাতীয়ই হউন, তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অনুসন্ধান কর হৃদয়ে দেখিতে পাইবে। এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রামেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার পীর। তিনি জপ পূজা স্বীকার করিতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—

"মনকা ফেরত জনম্ গয়ো গয়ো নাও
মনকা ঢেফ।
কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর্ মন্‌কা ফের॥"

জপ-মালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না; তাই বলি,—হাতের গুটি ছেড়ে মনের গুটি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বচনে পাওয়া যায়—

সব্‌গে হিলিয়ে সব্‌গে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে
নাঁও।
হাঁজী হাঁজী সব্‌গে কিজিয়ে বসে আপন
গাঁও॥

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে, হাঁজী হাঁজী সকলেই বলিবে, কিন্তু আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন—

"বামহন্ টামন মুরখ ভয়ে স্থত্র পড়ে গীতা
ঠগ্ ঠগর বন্দ আচ্ছা খাবে দুঃখ পাবে
পণ্ডিতা॥

সাঞ্চাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস্ গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ
বিকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান্ পহরে
খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকো
তামাসা॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীরা তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ১২০৫ সম্বতে কবীর টক্সার শাস্ত্র প্রকাশ করেন, এবং ১৫০৫ সম্বতে মগর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ কবীরের পরমায়ু হইয়া পড়ে। ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, তিনি যে সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিকন্দর ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য পান; অতএব এই সময়ে যে কবীর বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যায়। শিখদিগের ধর্ম্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সৎনামী, সাধু, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদাদিগের গ্রন্থেও কবীরের বচন পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন।

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের বেশ সজ্জা ও আচার ব্যবহার প্রায় একরূপ, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলে। ইঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় বেশ-ভূষা করেন এবং হাতেও তুলসীর মালা ধারণ করেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন এ সবই বৃথা আড়ম্বর মাত্র। বাস্তবিক ইহাঁরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন না। কবীরপন্থীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ দুই দল,—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী; গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত আচারাদি অবলম্বন করেন। কেহ আবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুর দেব-দেবীরও পূজা করেন। সন্ন্যাসীরা নয়নের অগোচর কেবল কবীরেরই ভজনা করেন। তাঁহাদের গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা কেবল ধর্ম্ম গান করাকেই উপাসনা মনে করেন। সকলেই ইচ্ছানুরূপ বেশ ভূষা করেন। কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাদের মহন্তেরা মাথায় টুপী পরেন। উক্ত দুই দল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত। ঐ ১২ শাখা ব্যতীত আরও কতকগুলি শাখা আছে। ইঁহারা অপর স্থানাপেক্ষা বারাণসীর কবীরচৌর নামক স্থানকেই প্রধান তীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত জানা যায় না, তবে হিন্দুধর্ম্ম হইতেই যে উক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে কবীরধর্ম্মই সত্য, অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। সংসারত্যাগ ও

গুরুভক্তিই ইঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড দিতে পারেন না।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করেন। ইঁহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপদ্রবশূন্য ও নিতান্ত ভাল মানুষ। ইঁহাদের উদাসীনেরা অপরাপর সন্ন্যাসীর মত দুরন্ত-স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না। কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর-পন্থী আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ তথাকার কবীরপন্থীদিগের আহারাদির জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চেৎসিংহ কবীর পন্থীদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫ ০০০ কবীরপন্থী সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীসরোজিনী দেবী।

নারীর গৃহধর্ম্ম।

মানবশিশু নারীজাতির কোমল হস্ত-গঠিত। পুণ্য-জ্যোতি-বিভাসিত গার্হস্থ্য জীবনকে নিয়ত উন্নতির পথে পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ নারীজাতির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেশ বিদেশের সহস্র মহৎ লোকের পুণ্যময় জীবনী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সভ্যতার প্রাদুর্ভাবের সহিত বঙ্গগৃহে বিষম পরিবর্ত্তনের বন্যা অশাসিত ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র জীবনাদর্শ গৃহে অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা একান্তই আশঙ্কাজনক ও ভারতনারীর অগৌরবের কারণ। আমি সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি. অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহই যেন ইহা মনে না করেন। নিষ্ঠা, সংযম, ভগবানের করুণায় প্রগাঢ় বিশ্বাস, সাধুতা কোন সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। গৃহই পুরুষগণের সর্ব্ব-বিধ সুখ শান্তি ও আরামস্থল। এই রাজ্যটীতে স্নিগ্ধ শান্তি, শুদ্ধতার বিমল স্রোত প্রবাহিত করার সম্পূর্ণ ভার নারী-জাতির হস্তে। আমরা সেই পরম নিষ্ঠাবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমার পবিত্র স্মৃতি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও উপকৃত হই। তাঁহারা সংসারের মহাপ্রতিকূল অবস্থায় ঘোর রোগ শোকের তুফানে, যে প্রকার বীর নারীর ন্যায় সংগ্রাম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন সংসারকে ধর্ম্মের বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আজ ত তাহা স্মরণ করিয়া কত উপকৃত হইতেছি। সংসারের অগণিত কঠোর ও জটিল কর্ত্তব্য সংসাধনে তাঁহারা জীব-নের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিতে কদাচ বিন্দু পরিমাণে ইতস্তত করেন নাই। এত

কর্ম্মকোলাহলে ডুবিয়াও স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠান ভুলিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। আমাদের কোমল শৈশব হৃদয়ে উপকথা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলিয়া যে ভাব উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারি না। ঘোর-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখনই তাঁহারা গভীর নিশীথকালে বিরামদায়িনী নিদ্রার কোল আশ্রয় লইতে গমন করিতেন, আমরা এতগুলি আবদারে সন্তান গল্প বলিবার জন্য তাঁহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। দৈনিক জীবনে তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবণ হৃদয়ের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই অসীম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাদিগকে পূজা করিত। এই উচ্চ স্থানই নারীর আরাধ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ভাবের অনিবার্য্য প্রবাহে ভারতের গৃহে গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মবিহীনতা ও অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া মিতাচারপূর্ণ বাঙ্গালীর গৃহ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ করিয়াছে। এখনকার মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা ও মামীগণ অনেকেই আমার ঠাকুরমাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গৃহের মধ্যে সন্তানাদির হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আশা করি, এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনাপূর্ব্বক আধুনিক মহিলাগণ ভবিষ্যংবংশীয়দের অগঠিত হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সতত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা সহকারে যত্নবতী হইবেন।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

দৃষ্টান্তে উপদেশ।

খৃষ্টধর্ম্ম-গুরু যিশুখৃষ্ট অনেক সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা মহা মহা উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। তিনি এক সময় বলিলেন, কোনও কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে গেলেন। তিনি যখন বপন করিলেন, তখন কতক বীজ রাস্তার ধারে আসিয়া পড়িল, তাহা পক্ষীরা ভক্ষণ করিল; কতক বীজ ভূমিতে পড়িল; সেখানে অল্প মাটি থাকায় অঙ্কুর শীঘ্র উৎপন্ন হইল, কিন্তু যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন সে সকল ঝলসিয়া গেল; কারণ তাহাদের শিকড় জন্মে নাই, সুতরাং অঙ্কুর শুকাইয়া গেল। কতকগুলি বীজ কণ্টক বনে পড়িল এবং কণ্টক গাছ বাড়িয়া তাহাদিগকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। কিন্তু কতকগুলি বীজ উত্তম ভূমিতে পড়ায় তাহা হইতে বৃক্ষ সকল জন্মিয়া ফল উৎপাদন করিল। কোন বৃক্ষে শত গুণ, কোন বৃক্ষে ষাটি গুণ, কোন বৃক্ষে ত্রিশ গুণ ফল ফলিল। তিনি শিষ্যদিগকে গোপনে ডাকিয়া ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। সে অর্থ এই— স্বর্গরাজ্যের কথা যখন কোনও ব্যক্তি শোনে এবং বোধগম্য না করে, তখন

তাহার অন্তঃকরণে উপ্ত বীজ সয়তান আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রাস্তার ধারে পতিত যে বীজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ। প্রস্তরময় ভূমিতে যে ব্যক্তি বীজ পাইল, সে উপদেশবাক্য শুনিল এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল না। এই জন্য ধর্ম্মের জন্য যখন তাড়না বা উৎপীড়ন উপস্থিত হইল, তখন সে ধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিল না, বিরক্ত হইয়া তাহা ছাড়িয়া দিল। যে ব্যক্তি কণ্টকের মধ্যে বীজ পাইল, সে উপদেশ শুনিল; কিন্তু সংসারের ভাবনা চিন্তা এবং অর্থের মায়াতে, ধর্ম্মের অঙ্কুর বাড়িল না এবং তাহা হইতে কোনও ফল উৎপন্ন হইল না। কিন্তু উত্তম ভূমিতে বীজ কে পাইল? যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, তাহারই হৃদয়ে ইহার ফল ফলিল,—কোথাও শতগুণ, কোথাও ষাটি-গুণ, কোথাও ত্রিশ গুণ ফলিল।

ম্যাথিউ—১৩ অ ২৫ অ।

(ক্রমশঃ)

চরিত্রের প্রভাব।

আমরা দেখি এ জগতে সকলেই এক উদ্দেশ্যে ধাবমান। সেটী কি? সুখ। সুখের জন্য আমরা কি না করিতেছি? কিসে সকলের অপেক্ষা অধিক ধন ও মান লাভ করিব, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানের অধিকারী হইব, এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব লইয়া আমরা প্রতি নিয়ত ঘূর্ণায়মান। ধন, মান ও সুখের লালসায় আমরা কতশত অন্যায় কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতেও সুখ লাভ হয় না; কারণ প্রকৃত সুখ এক-মাত্র সচ্চরিত্রতায়। আমরা সকলেই সুখের জন্য লালায়িত সত্য; কিন্তু এক একটী করিয়া চরিত্রের দোষ ও ত্রুটিসকল খণ্ডন পূর্ব্বক প্রকৃত চরিত্র লাভে সচেষ্ট নই। পরম পিতা পরমেশ্বরের রাজ্যে আমরা সকলেই সমানরূপ সম্পত্তি লাভপূর্ব্বক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকেই আপন আপন বৃত্তিগুলিকে সতত ন্যায় পথে পরিচালনা করিয়া আদর্শ চরিত্র লাভ পূর্ব্বক প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে। সচ্চরিত্রতার মহিমা অপার। ইহা ইহকালে মানবকে দেবত্বে পরিণত করে এবং পরকালেও অনন্ত সুখের অধিকারী করে। জগতে এমন কিছু নাই, যাহার সহিত এই দুর্ল্লভ রত্ন উপমিত হইতে পারে। পশুতুল্য ব্যক্তিও এই মহারত্নের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে না। এ সংসারে সকলে সমান জ্ঞানী বা ধনী হয় না, কিন্তু চরিত্র উৎকৃষ্ট হইলে জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্য বহুদূর প্রসারিত হয় সন্দেহ নাই। ইহার নিকট ধন, মান, জ্ঞান, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতা, বিনীত ব্যবহার যাহাই হউক না কেন কিছুই সমকক্ষতা

লাভ করিতে পারে না। চরিত্র প্রভাবে একদিকে যেমন লোক মণ্ডলীর শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালবাসা লাভ অনিবার্য্য, অপর দিকে তদ্রূপ বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। চরিত্রবিহীনতায় মানুষকে এরূপ ঘৃণিত করে যে তাহার নাম মাত্র শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। হাজার যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও হৃদয়ের এ স্বাভাবিক ভাব দূর করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ চরিত্র সুগঠিত হইলে এ জগতে ভীষণ প্রতিযোগিতা এবং ঈর্ষ্যার মধ্যেও আবাল বৃদ্ধ বনিতার শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র হইয়া আদর্শ জীবন লাভ করা যায়।

ব্যক্তিনিষ্ঠ সচ্চরিত্রতা প্রত্যেক জাতি ও সমাজের আশা ভরসা। যে দেশবাসী যে পরিমাণে চরিত্রবান্, সেই দেশ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে।

সমস্ত জাতির সমাজে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-চরিত্র কার্য্য করে। স্ত্রীলোক গৃহরাজ্যের রাণী। সুতরাং গৃহরাজ্যের সুখ, শান্তি ও সুনিয়মের মূলে স্ত্রীচরিত্র কার্য্য করে। পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নানা আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া সন্তানচরিত্র গঠিত হয়। সন্তানগণের চরিত্র এবং জীবনের উপরেই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি বা অবনতি দণ্ডায়মান। সন্তানচরিত্রই দেশীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি।

রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ সুকোমল ও প্রেম-পরিপ্লুত। কিন্তু কেবল কোমলতাগুণে সংসারে শান্তি সংস্থাপন বা মহত্তর উদ্দেশ্য সংসাধন অসম্ভব। প্রলোভনের আক্রমণ নিবারণার্থ নারীহৃদয় বজ্রবৎ সুকঠিন আবরণে আবৃত রাখা আবশ্যক। যেহেতু রমণীগণ যদি হৃদয় হইতে বিকৃত সৌন্দর্য্য-স্পৃহা সংযত করিয়া, সত্য, ন্যায় ও প্রেমের সুকোমল শাসন শক্তি বিস্তারে যত্নবতী হন, তবে পরিবার ও প্রতিবেশিমণ্ডলে সদ্ভাব ও সুখলাভ সহজ হইয়া উঠে। শালীনতা স্ত্রী-চরিত্রের ভূষণ। সাধুভাব ও বিনয় প্রভাবে জগতে স্ত্রীজাতি অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কারণ, পবিত্র চরিত্রের নিকট জগৎ পরাজিত। অহঙ্কার দ্বারা অনেক সময় আমরা কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হই এবং আমাদের আত্মা ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে। বৃথা সময় ক্ষেপণ করিলে চরিত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া যায় এবং প্রগল্‌ভতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নানা দোষে চরিত্র ক্রমে ক্রমে কলঙ্কিত হইতে থাকে। পুষ্প যেমন সৌরভরাশি বিস্তার পূর্ব্বক মানুষের মন মুগ্ধ করে, চরিত্রও তদ্রূপ নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া জীবনের সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি করে। চরিত্ররূপ চারা গাছ সদ্ভাব-রাশি দ্বারা এ ভাবে বেষ্টন করিতে হইবে, যেন কেহ পদদ্বারা নষ্ট করিতে না পারে, অথবা অঙ্কুর ছাগল প্রভৃতিতে বিনষ্ট করিয়া না ফেলে। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া গেলে, সদ্ব্যবহার স্বতঃ প্রবাহিত হয়। যাহার হৃদয় পবিত্র তাহার বাক্য কখন নীচ হইতে পারে না। যিনি যথার্থ বিনয়ী এবং যাঁহার স্বভাব প্রেমপূর্ণ, তাঁহার ব্যবহার বা বাক্য কখন কর্কশ হইতে

পারে না। অথচ তাঁহার ব্যবহারে বা বাক্যে তোষামোদের লেশমাত্র থাকে না।

আমরা চরিত্র সুসংগঠন অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জনকে বিদ্যাভ্যাসের মূল কারণ বলিয়া মনে করি; কিন্তু প্রকৃত চরিত্র লাভ না করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন সত্বেও মানব কখনই যথার্থ সুখী হইতে পারে না।

অনেক স্ত্রীলোক বিশ্বকর্ত্তার বিধানে সন্তুষ্ট না হইয়া স্ত্রীজীবনকে অধিকতর দুঃখজনক মনে করেন। মঙ্গলময় মহাপ্রভুর আদেশ পালনের পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া অসন্তুষ্ট ও অলসভাবে জীবনকে দুঃখময় করেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে? স্ত্রীজাতি তাঁহার চরিত্র-প্রভাবে জগতে কিনা করিতে পারেন? তাঁহাদের সংশিক্ষা ও সদ্ব্যবহারই সন্তান চরিত্রের ভিত্তিভূমি। এক একটী সন্তান সংসারে কি মহৎ কার্য্য না সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কত অনাচারী, বিপথগামী, দুর্দ্দান্ত পতি, পত্নীর পবিত্র প্রেমে পরাজিত হইয়া সংপথাবলম্বী হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? বিবেকের প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ফলাফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিলে, এই সংসারেই স্বর্গ-সুখ মিলে। ফলতঃ চরিত্র জীবন নৌকার মাস্তুল বিশেষ। চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে ধর্ম্মভাব স্বতঃ সন্দীপিত হয়। স্বর্ণাভরণের উপরে চাকচিক্য, গোলাপের মধ্যে সুগন্ধ এবং সুশোভন দৃশ্যের উপর সূর্য্য-কিরণ যেরূপ মনোমুগ্ধকর, চরিত্রের মধ্যে ধর্ম্মভাব সেইপ্রকার উজ্জ্বল ও হৃদয়রঞ্জক। চরিত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় পরম রমণীয়। আত্মজ্ঞান লাভ জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য। ধর্ম্ম-কার্য্যও গৃহকার্য্যের মধ্যেই গণনীয় বটে; কিন্তু সাংসারিক বাহ্যকার্য্যের অতীত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভও জীবনের একটী কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিদ্যা, সময় ও শক্তির প্রয়োজন। আমরা সাংসারিক কার্য্যে এত মুগ্ধ ও ব্যস্ত যে, মুক্তি-সাধনরূপ মহৎকার্য্য বিস্মৃত হইয়া থাকি। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে অধিকতর উদাসীন। শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ বশতঃ স্ত্রী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহারা সমান। উভয়ের মধ্যে পরমাত্মা সমভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভে উভয়েরই সমান যত্ন থাকা আবশ্যক।

আত্মা অবিনশ্বর এবং ইহার অলঙ্কারও তদনুরূপ হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা হীরকের জ্যোতিতে কি হৃদয় জ্যোতিষ্মান্ হইতে পারে? মুক্তা-জ্যোতিতে কি বিবেক-বুদ্ধি জ্যোতিষ্মতী হয়? জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদে কি চরিত্রের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? আত্মার যথার্থ অলঙ্কার সত্য, পবিত্রতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, আশা, প্রেম, আনন্দ ও নম্রতা। পরিণামদর্শিতা, তিতিক্ষা, শিষ্টতা এই সকল হৃদয়ের অলঙ্কার। এই সকল গুণ দ্বারা মানুষের অন্তর শোভিত হয়।

ঈশ্বরে ভক্তি চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুকুট।

ইহার অভাবে কোন গুণই বাঞ্ছনীয় বা মনোহারী হইতে পারে না। ধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা মানুষ অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। অপরকে সংশিক্ষা দানে যত্ন করে। দিবানিশি সাধুকাজে ব্যস্ত থাকিতে ভাল বাসে, আত্মার অবিনশ্বরত্বের আশায় তাহার জীবনের দিন সকল উজ্জ্বলতর হয় এবং ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইলে প্রফুল্লহৃদয়ে পরজীবনে গমন করিতে পারে।

শ্রীবিনোদিনী সেন।

সাঙ্কেতিক ভাষা।

আজ বামবোধিনীর পাঠকপাঠিকা দিগের নিকট একটী সাঙ্কেতিক ভাষা উপস্থিত করিলাম। ইহা অতিশয় আমোদজনক; এবং শিক্ষা করাও সহজ। যাঁহারা ইহা শিক্ষা করিবেন, তাঁহারা সহস্র লোকের মধ্যে থাকিয়াও কথাবার্ত্তা করিতে পারিবেন, অথচ অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা মুখে কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় না; কেবল ইঙ্গিতে কার্য্য হয়। ইহাতে দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে আলোক সমক্ষে কথাবার্ত্তা চলিবে। অন্ধকারের জন্য পৃথক্ সঙ্কেত আছে; তাহা বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

শিক্ষাপ্রণালী—

শিক্ষার্থিগণ নিম্নলিখিত পদ্যটী মনে রাখিবেন।

"অহিকুম্ভ চক্রসহ ধরহ টঙ্কার।
তরবারি পাখা যাঁতা ক্রমবর্গ সার॥
বর্গ মতে সংখ্যা ধরি অঙ্গুলি তুলিবে।
যুক্তবর্ণকালে তাহা কুঞ্চিত করিবে॥"

এক্ষণে ইহার অর্থ লেখা যাইতেছে।

অহি=সর্প।

কুম্ভ=মাটির ছোট ভাঁড়।

চক্র=গোলাকার অস্ত্র বিশেষ। বা কুম্ভকারের চাক।

টঙ্কার=ধনু।

তরবারি=অস্ত্র।

পাখা=যাহাতে বাতাস করা যায়।

যাঁতা=যাহাতে ডাল কলাই ভাঙ্গা হয়।

ক্রমবর্গসার=বর্গক্রমে অহিকুম্ভাদি ব্যবহার করিতে হইবে।

যথা—

অহি অর্থে স্বরবর্ণ বুঝায় ও অনুস্বার বুঝায়;
কুম্ভ অর্থে কবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
চক্র অর্থে চবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
টঙ্কার অর্থে টবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
তরবারি অর্থে তবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
পাখা অর্থে পবর্গের সমস্ত বর্ণ বুঝায়;
যাঁতা অর্থে য র ল ব শ ষ স হ বুঝায়।

মনে করুন,—"আমি ভাল আছি" এইটী ইঙ্গিতে বলিতে ইচ্ছা করি।

"আমি"—

"আ" অহি মধ্যে পড়িয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ হস্তকে সর্পের চক্রের আকার

করিতে হইবে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে স্বরবর্ণ বলা হইতেছে। তারপর দুইটী অঙ্গুলি দেখাইতে হইবে, তাহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ বলা হইতেছে; সুতরাং "আ" পাওয়া গেল।

"মি"—

"ম" পবর্গের পঞ্চম বর্ণ। সেই জন্য হস্ত দ্বারা পাখায় বাতাস করার ভাব করিতে হইবে, তাহা দ্বারা বুঝা গেল যে পবর্গের কোন বর্ণের কথা বলা হইতেছে, তারপর পাঁচটী অঙ্গুলি দেখাইলেই বুঝা গেল যে পবর্গের পঞ্চম বর্ণ বুঝাইতেছে। এই আমরা ম পাইলাম বাকি "ি"। ই স্বরবর্ণ মধ্যে; সুতরাং হস্তকে সর্পাকার করিতে ও ইহা স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ বলিয়া তিনটী অঙ্গুলি তুলিতে হইবে। ই পাওয়া গেল। এই "ই" যে "ম" র সহিত যোগ হইবে ইহা জানাইবার জন্য একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ বক্র করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে এই "ই" "ম"র সহিত যোগ হইল।

"ভাল আছি"—

এইরূপে ভ পবর্গের মধ্যে সুতরাং হস্ত দ্বারা বাতাস করার ন্যায় করিতে হইবে, এবং ভ চতুর্থ বলিয়া চারিটী অঙ্গুলি দেখাইতে হইবে। এই ভ পাওয়া গেল। তারপর হস্তকে সর্পাকার করিতে হইবে এবং দুইটী অঙ্গুলি তুলিতে হইবে। তাহা হইলে "আ"কার পাওয়া গেল। এই আ যে "ভ"র সহিত যোগ হইবে ইহা দেখাইবার জন্য আকার দেখাইয়াই একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিবে। যে কোন বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত করিতে হইবে, সেই বর্ণ বলিয়া অঙ্গুলি কুঞ্চিত করিবে।

এইরূপে সমস্ত বর্ণমালা বলিতে পারা যায়। কবর্গের বর্ণ হইলে হস্তকে কুম্ভের মত আকার করিবে।

চবর্গের বর্ণ হইলে একটী অঙ্গুলি কুম্ভকারের চাকা ঘুরাইবার মত করিবে। পরে বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

টবর্গের বর্ণ হইলে ধনু হইতে শর নিক্ষেপের সময় হস্ত যেরূপ করা হয়, সেই রূপ করিবে। এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি দেখাইবে।

ত বর্গের বর্ণ হইলে—কোন দ্রব্য কাটিবার সময় অস্ত্র যেরূপ ভাবে ধরা হয়, হস্তকে সেইরূপ ভাবে রাখিবে, এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

পবর্গের বর্ণ হইলে পাখার দ্বারা যেরূপে বায়ু সঞ্চালন করা হয়, হস্ত দ্বারা সেইরূপ ভাব করিবে, এবং বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিতে হইবে।

যখন "য" অন্তস্থ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত কোন বর্ণ বুঝাইতে হইবে তখন বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিয়া তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাঁতা বুঝাইল। তাহার পর বর্ণসংখ্যা অনুসারে অঙ্গুলি তুলিবে।

এ কথাটী যেন মনে থাকে যে যুক্তবর্ণের সময় অন্য নিয়ম। মনে করুন—"ম" এর সহিত ব যোগ করিতে ইচ্ছা করি "ম্ব" তখন ম বলিয়া তাহার পর "ব"র

সঙ্কেত করিয়াই একটী অঙ্গুলী বক্র করিবে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে ব" ম"র সহিত যুক্ত হইল।

এই সঙ্কেত দ্বারা দিবাভাগে ও রাত্রি-কালে আলোকে কথা কহা চলিবে। অন্ধ-কারে কথা কহিবার পৃথক্ নিয়ম, সেও সহজ। আগামী বারে উহা প্রকাশ করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকঙ্গালীচরণ হাজরা।

গৌরী।

রামপ্রসাদের কবিত্ব অসাধারণ, কল্পনা অতুলনীয়। একটী উপায়ে বিশ্বমোহিনী বিশ্বমাতার কোটিচন্দ্রনিভাননের ঐশ্বর্য্য-রাশি বুঝাইলেন, কন্যার আবদার মিটাই-লেন, আর স্বামীর দ্বারা সহধর্ম্মিণীর বিরতি ঘুচাইলেন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে কন্যার বিবাহ-চিন্তা পিতার মনে সমুদিত হইল, তিনি গৌরীকে সংপাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দেবগণের নিদেশানুসারে মহর্ষি নারদ শিববিবাহের ঘটকতা করিবার জন্য গিরিপুরে উপস্থিত হইয়া গিরিরাজের নিকট তাঁহার কন্যা গৌরীর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেব পাত্র—এ কথাও তুলিলেন। গিরিপতি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। পার্ব্বতীও বাল্যাবধি মহাদেবকে স্বামিত্বে বরণ করিবার কামনায় পঞ্চতপাদি কঠোর তপশ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কবির বর্ণনায় তাহা পাঠ করুন :—

সুকুমারী সুশোভনা, শশিমুখী ত্রিলোচনা,
হর লাগি হৈল তপস্বিনী।
ত্যজি মা বাপের কোল, না শুনিয়া কারো বোল।
পুণ্যারণ্যে রহে একাকিনী॥
নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, ব্যাঘ্রাজিন পরিধান,
বিভূতি-ভূষণ কলেবর।
ভূষিতা রুদ্রাক্ষমালে, গ চন্দন ফোঁটা ভালে,
মৌনব্রত হয়ে ভাবে হর॥
যোগশাস্ত্র অনুসারে সকলি ত্যজিয়া দূরে,
শীর্ণ পর্ণ রহিল আহার।
তাহা ত্যাগ হৈল যবে অপর্ণাখ্যা হয়ে তবে,
পবন ভক্ষণ কৈল সার॥
শীতেতে আকণ্ঠ জলে, নিদাঘে পঞ্চাগ্নি জ্বলে,
বৃষ্টিকালে ভিজে অনুক্ষণ।
মুদিত করিয়া আঁখি, ঊর্দ্ধপদে ঊর্দ্ধমুখী,
ভাবে গৌরী ভবের চরণ॥
মহামন্ত্র জপে মনে, ধ্যান করি ত্রিলোচনে,
লোচনে বহিছে প্রেমধারা।
ভনে দ্বিজ রামেশ্বর, চঞ্চল হইল হর,
চণ্ডীরে দেখিতে আইলা ত্বরা॥

শিবায়ন।

গৌরীর তপস্যা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের বর্ণনা—

তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান মাত্রা দিবসে দিবসে॥
এক পদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ।
মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥
দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিল তাম্বূল তৈল ভূষণ চন্দন॥
দুই উপবাস করি করিলা পারণা।
মহেশ স্বামী হেতু কৈল ধ্যান ধারণা॥
চিন্তিল শিবের পদ মুদিত লোচনে।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়মে॥
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
ঊর্দ্ধমুখ দিয়া রৈল অরুণমণ্ডলে॥
কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল শেষে সবে তিন গ্রাস॥
অন্ন ত্যজি খান মাতা কোপিথ বদর।
কত কাল পান কৈল কেবল পুষ্কর॥
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভোজন।
শিবপদ ধ্যান গৌরী করে অনুক্ষণ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ত্যজি অন্ন-পান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজ বেশধর।
জিজ্ঞাসিলেন শিব, গৌরী দিলেন উত্তর॥

হিন্দু শাস্ত্রের মতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনই পূর্ব্ব জন্ম হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, বিবাহও তদ্রূপ। তবে যে কাহার কাহার চিরকৌমার্য্য ঘটিয়া থাকে, আদৌ বিবাহ হয় না, তাহা অতি বিরল এবং তাহাও বিধিনির্দ্দিষ্ট। যদি তাহাই হয়, তবে আর তাহার জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন—পাত্র পাত্রী যদি পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত থাকে, তবে আর তপস্যাদির প্রয়োজন কেন—ইহা কেবল কর্ত্তব্য পালন বই আর কিছুই নয়। অদৃষ্টে যাহা আছে, অদৃষ্টবাদীকে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিয়া লইতে হইলেও চেষ্টা ও যত্ন চাই। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না, মনস্তৃপ্তির জন্য চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন হয়. বিশেষতঃ অদৃষ্ট অজ্ঞাত—ভবিতব্যতার বিষয়ে কেহই নিশ্চিত হইতে পারে না, সুতরাং অভীপ্সিতের সিদ্ধি জন্য নানা উপায় দেখিতে হয়। তজ্জন্যই গৌরীর তপস্যা। তিনি আপনার ভবিতব্যতা অবগত ছিলেন না, অথচ তাঁহার ঐকান্তিকী কামনা শিবকে তিনি স্বামিরূপে প্রাপ্ত হয়েন।

হিন্দুর পতি-পত্নীত্ব দুই দিন, দশ দিন বা দুই এক বৎসরের জন্য নহে। হিন্দুর এই সম্বন্ধ জীবনে মরণে অবিচ্ছিন্ন। যাঁহাদের এ সম্বন্ধ চুক্তির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, মনে করিলেই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, তাঁহারা যখন বিবাহসম্বন্ধ সংস্থাপনের পূর্ব্বে পতি পত্নীর মনোভাব যথাসম্ভব অবগত হইবার জন্য সচেষ্ট, তখন হিন্দুর তাহাতে নিবৃত্ত থাকা কখন সম্ভবপর নহে। তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের যতটা বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি, হিন্দুর ততটা নহে। দেবাদিদেব অলক্ষ্যজন্মা এবং স্থবির হইয়াও গৌরীর বরমাল্য লাভ সুকৃতিজনক না ভাবিয়া যখন তাঁহার পতিনিষ্ঠার পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ

দর ছিল, মনে করিলেই যে কেহ তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

গৌরীর একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য মহাদেব স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তপস্যানুরতা পার্ব্বতীর সম্মুখীন হইলেন, এবং নিম্নোক্ত প্রকারে শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন,—

কহ লো নিরূপমা, কাহার রোষে রামা
ইচ্ছিলা বুড়া জটাধরে।
হইয়া সুনারী, ভজহ ভিখারী,
দরিদ্র বর দিগম্বরে॥
কহ লো রূপবতী, দেহের হেম পুতি,
মাণিকরুচিরদশনা।
তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলে হেন বরে,
হইবে বিভূতিভূষণা॥
গলায় হাড়মাল, বসন বাঘছাল,
উত্তরী যার বিষধর।
প্রেত ভূত সঙ্গে, চিতাধূলি অঙ্গে,
ইচ্ছিলে কেন হেন বর॥
কাহার পুত্র হর, না জানি কোথা ঘর,
না দেখি ভাই বন্ধু জনে।
বরিয়া শূলপাণি, হইবে দুখিনী,
দারুণ দৈব কারণে॥
শুন লো চন্দ্রমুখি! তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর,
ইচ্ছিলে বুড়া বর কেনি॥
দরিদ্র পতি যার, বিফল জন্ম তার,
দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।
শুন লো গুণময়ি, তোমারে আমি কই,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে॥
থাকিয়া হরশিরে, ভিক্ষুকের ঘরে,
মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে।
শুন লো গুণময়ি! তোমারে হিত কই,
দরিদ্রে কেহ না আদরে॥

কবিকঙ্কণ।

ভারতচন্দ্র গৌরীর তপস্যা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে শিবের গৌরী পরীক্ষা কিছুই বর্ণনা করেন নাই। তবে রামেশ্বর যেরূপ ঐ দুইটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

পশুপতি পাবো পতি পুষ্ট করি পুণ্য।
কেবল কঠোর তপ করি এই জন্য॥
হি হি করি হাসিল ব্রাহ্মণ ইহা শুনি।
বাসনা করেছ বিদগধ জানি॥
সে শিবকে সমর্পিবে সোণা পারা দে।
হাতে তুলি বিষ খেতে বলে দিল কে॥
শিবের সংবাদ কিছু শুন নাই পারা।
বিকট বদন বড় বিপরীত ধারা॥
ভক্ষণ ভাঙ্গের গুঁড়া ভস্ম বিভূষণ।
সদাই শবের প্রায় শ্মশানে শয়ন॥
প্রেত ভূত প্রমথ পিশাচ লয়ে সঙ্গ।
গায়ের যোগীয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ॥
বেড়ে সাপ গাময় গলায় হাড়মালা।
জটায় জাহ্নবী যায় কুম্ভীরের বেলা॥
করে ব্রহ্মকপাল, কপালে দাবানল।
মদন মরিল পুড়ে হইয়া বিকল।
কোমলাঙ্গী কেমনে তিষ্ঠিবে তার কোলে।
জীবন্তে জ্বলিবে যেন জ্বলন্ত অনলে॥
শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে সুন্দর।
দেখিতে সে দারুণ দরিদ্র দিগম্বর॥

গঙ্গাকে গৌরব করি ধরেছিল শিরে।
গড় করি গেল সেই রত্নাকরনীরে॥
লক্ষ্মীছাড়া ললাটে লাগিয়া শশধর।
অর্দ্ধভাবে অপূর্ণ আছেন দিগম্বর॥
দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর।
সত্বগুণ থাকিলে সকল তার মার॥
নির্গুণ নিষ্কাম বাম—পথে অবস্থিতি।
কে জানে কি জাতি কার পুত্র কার নাতি॥
বুড়া কত কালের বলিতে নারে কেহ।
চলে যেতে ঢলে পড়ে অতি বৃদ্ধ দেহ॥
বড় বলি বাসনা করেছ বড় বরে।
ভিক্ষা মাগি খায় ভুঞ্জে ভাঙ্গ নাহি ঘরে॥
জ্বলিবে জঠরানল জীবে কতকাল।
এক মুখে পঞ্চমুখ বড়ই জঞ্জাল॥
কি দেখি পড়েছ ভুলে ভূপতির ঝি।
মোরে বল ভাল বরে আমি এন্যা দি॥
কুমারী বসেন কিছু কন্যা নাঞি আর।
গড় করি গোসাঞি তোমাকে পরিহার॥
বুড়ালে ব্রাহ্মণকুলে ব্রহ্ম নাহি জান।
কহি কিছু কৃপা করি কাণ পাতি শুন॥

শিবায়ন।

ব্রাহ্মবেশে গৌরীকে শিবের ছলনায় উভয় কবিই বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ছন্দ এবং পদবিন্যাস গুণে প্রথমোক্ত কবিতা বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে। উভয়েই আদর্শ মহাকবি কালিদাস এবং কবিতা দুইটীই কালিদাসের কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী-পরিণয়ের ছায়া। পতিপ্রাণা আদর্শ সতী গৌরীর প্রত্যুত্তর উভয়ত্রই সমান। তবে কবিকঙ্কণ অল্প কথায় সারিয়াছেন, আর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুন, ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
শিবনাম করিলে সন্তাপ যায় দূর॥
কুশলার্থ কৃতার্থ করুণাময় নিধি।
ব্রহ্মবীজ বিশ্বনাথ বিধাতার বিধি॥
চন্দ্রচূড় বিনা চিরজীবী নহে কেহ।
কাল পেয়ে মরেন, ধরেন মত দেহ॥
শুদ্ধসত্ব শিবমূর্ত্তি সদানন্দময়।
ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয়॥
শিবব্রহ্ম শিবব্রহ্ম শিবব্রহ্ম সার।
শিবসম সুখসেব্য সুরে নাহি আর॥
শিব হৈতে সকল, সকলে সদাশিব।
মায়াতে মোহিত হয়ে জানে নাই জীব॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যত হয় রাজা।
সবাকার সম্পদে শিবের করি পূজা॥
রাজা রাম রাবণে বধিল যার বলে।
হেলায় বান্ধিল সেতু সমুদ্রের জলে॥
রামে বর দিয়া রামেশ্বর অভিধান।
তুষ্ট তূর্ণ অপূর্ণ কামের পূর্ণ কাম॥
ভীষ্মক ভূপের বেটী ভক্তি করি ভবে।
ভামিনী ভবনে বসি ভগবান্ লভে॥
বাণে বর দিয়া বাণেশ্বর অভিধান।
লোকগুরু কল্পতরু প্রভু ত্রিনয়ন॥
অমঙ্গলশীল কিন্তু মঙ্গলের মূল।
সেজন সুকৃতি শিব যারে অনুকূল॥
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি আছে করতল।
শুভদাতা সদাশিব সেবকবৎসল॥
যোগেন্দ্র পুরুষ জন্ম জরা কৈল জয়।
তেঁই তাঁর দাসী হতে অভিলাষ হয়॥

শিবায়ন।

কবিকঙ্কণ এতটা বিস্তার না করিয়া অল্প কথায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও গৌরীর মনোভাব বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্ট সিদ্ধি।
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥
ত্রিভুবনে দেখি যার পরম সম্পদ।
কেবা সেবা নাহি করে মহেশ্বর পদ॥
ত্রিভুবন রাখিলা করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন॥

গৌরীর উত্তর পাইয়া ছদ্মবেশধারী শিব গৌরীর দৃষ্টির উপরেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর দান সমাপ্ত হইবামাত্র পার্ব্বতী দেখিলেন, যে ব্রাহ্মণের সহিত তিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনি আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন, স্বয়ং শিব। কবিকঙ্কণ কিন্তু তাহা না করিয়া গৌরীকে কিয়ৎকালের জন্য স্থানান্তরিত করিয়া পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বলেন দেখা হবে দুয়ে একে।
তথন ত্রিপুরা তাঁকে ত্রিলোচন দেখে॥

শিবায়ন।

তপস্বীর দেখি কিছু চঞ্চল অধর।
সেই স্থান ছাড়ি গৌরী চলে অন্যত্তর।
এমন সময়ে হর নিজ রূপ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারী॥

কবিকঙ্কণ।

যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্র যিনি সুরনরকিন্নরাদি যে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহে সক্ষম, তাঁর ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ জন্য পার্ব্বতীর নয়নান্তরালের প্রয়োজন কি? এইখানেই প্রকৃত প্রস্তাবে হরগৌরীর পরিণয় কার্য্য সমাধা পায়; পার্ব্বতী শিবগলে বরমাল্য অর্পণ করেন।

এই বিবাহ উৎসবে পরিণত করিবার জন্য সমুচিত আড়ম্বরের অনুষ্ঠান হয়। শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া দেবগণ পশুপতি-পরিণয়ার্থে কৈলাসক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া মহা আড়ম্বরে বর লইয়া হিমাদ্রিশিখরে উপনীত হয়েন। তথায় হিমগিরিপতির দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সকলেই বিবাহসভা পবিত্র করেন। দেবাদিদেব দেবকুল প্রথানুসারে পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলে দেবগণ পরমানন্দ লাভ করেন।

বিবাহস্থলে শিবের দিগম্বরমূর্ত্তি ধারণ উপলক্ষ্য করিয়া কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর এবং ভারতচন্দ্র তিনজনেই একটা রহস্যের তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের প্রবণতা প্রদর্শন জন্য মেনকাচরিত্রে প্রাকৃত ভাবের আরোপ করিয়াছেন—জামাতার দিগম্বরমূর্ত্তি দর্শনে তিনি ভীতা, চকিতা এবং কিয়ৎকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। পরক্ষণেই জামাতার অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্য দর্শনে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

গৃহচিকিৎসা—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আঞ্জনীতে। আকন্দ গাছের আঠা, ডান চক্ষে হইলে বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠে এবং বাম চক্ষে হইলে ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠে দুই ফোঁটা লাগাইলে আঞ্জনী ফাটিয়া যাইবে।

২। চাতুর্থক জ্বরে অর্থাৎ ২ দিন অন্তর জ্বরে। জ্বরের দিবস প্রাতে শ্বেত অপরাজিতা ফুলের লতা, পুরুষের ডান হাতে এবং স্ত্রীলোকের বাম হাতে অনন্তের ন্যায় পরাইয়া দিলে আর জ্বর হইবে না।

৩। স্বপ্নচ্যুতিতে। প্রতি রোজ রাত্রিতে শয়নকালীন কাবাব চিনি চূর্ণ ৵০ আনা ও কাশীর চিনি ৵০ আনা একসঙ্গে সেবন করিলে উপকার হইবে।

৪। বাধকবেদনায় ঋতুর তিন দিন প্রত্যহ চাটিম কলা গাছের শিকড়ের রস চিনি সহ একবার করিয়া সেবন করিলে ব্যথা নিবারণ হইবে।

৫। কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি স্ফোটকাদি রোগে নূতন অবস্থায় কণকচাঁপা ফুল কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ কিম্বা পটী দিলে বসিয়া যাইবে।

৬। বিকচ অর্থাৎ কাউর ঘায়ে। নূতন ঝাউপাতা, বেতের ডগা, গুঁড়ি কচুর ডাটা সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া এবং তদুপরি কদম পাতা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে আরোগ্য হইবে।

৭। নেত্ররোগে। কবুতরের বিষ্ঠা মধু দ্বারা মাড়িয়া অঞ্জন দিবে।

৮। বাগীতে। কুক্কুটডিম্বের কুসুম ও মেটেসিঁদূর একত্র করিয়া নেকড়ায় মাখিয়া বাগীর উপর বসাইয়া দিলে বসিয়া যাইবে।

৯। সূতিকা রোগে, কমই গাছের মূল ১ তোলা বাটিয়া অপর মস্‌লার সহিত ৭টী কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাইবে। খই খাইতে যখন তিক্ত বোধ হইবে তখন বুঝিবে যে রোগ আর নাই।

নূতন সংবাদ।

১। নাগপুরে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত তত্রত্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। তথাকার অধিবাসিগণ এই দুর্ব্বৃত্তদিগের নীচ কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং একটী নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

২। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর আনন্দ চালু দেহত্যাগ করিয়াছেন।
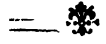
৩। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষোন্নতি সভা আগামী বৎসরে দুইটী ১০০৲ টাকার, পাঁচটী ৫০৲ টাকার ও দশটী ২৫৲ টাকার বৃত্তি প্রদান করিবেন এবং জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইবার জন্য কতকগুলি জাহাজ ভাড়া দেওয়া হইবে। ৩০ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃত্তিপ্রার্থিগণকে উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের নামে ৬নং ওল্ড্ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

৪। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নৈতিক সাধন জন্য ও আর্থিক অবনতির কারণ দূর করিবার নিমিত্ত এক সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। রুষিয়ানিবাসী ইস্মাইল খাস ব্রিনস্কি এই প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই সভার প্রথম অধিবেশন মিশর কাইরো নগরে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৫। বঙ্গীয় কারাগারসমূহে কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটায় কর্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালী জেলার ও ওয়ার্ডার্স পরিবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে ইংরাজ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

৬ হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ সহরে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৭। লক্ষ্ণৌ সহরে পার্দ্দানশীন মহিলাদিগকে কলা ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য ছোটলাটপত্নী লেডী হিউয়েট এই বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

বামারচনা।

আশীর্ব্বাদ।

স্নেহের পুতুল তুই স্নেহ-পারাবার,
ত্রিদিবের সুখ শান্তি করি অবহেলা,
কেন এ কণ্টকাকীর্ণ ভব-কারাগার,
তার মাঝে? খেলিবারে? সমরখেলা

অমরাবতীর শোভা! মন্দার কুসুম!
মন্দাকিনী-লহরীর সম নিরমল,
গোলাপের আভা তুই—কস্তুরী কুঙ্কম,
দেববালকের সম সুন্দর সরল।

নব কিশলয় সম কোমল বিমল,
কোকিলের কুহুতান সম স্নিগ্ধ তুই,
মকরন্দ ভরপুর নলিনীর দল;
সন্ধ্যার রজনী-গন্ধা প্রভাতের জুঁই।

আসিলি কি সবাকারে সুখী করিবারে,
কিম্বা দুদিনের তরে ফাঁকী দিতে শুধু,
চাহেনা পরাণ তোরে ভালবাসিবারে,
চাহেনা লভিতে তোর সরলতা মধু।

স্বরগের ভালবাসা মান অভিমান,
আদর সোহাগরাশি, পুণ্য পবিত্রতা
ওঁয়া ওঁয়া কান্না, হাসি সুধার সমান,
লয়ে আয়, বুকে আয় স্নেহমাখা লতা

দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়ে মাথায়,
অতিথি! আইস গৃহে লয়ে সুমঙ্গল,
তোর স্পর্শে গৃহ তোর শান্তির আলয়,
শান্তিকণা! ঢাল বঙ্গে শান্তি সুবিমল।

সুরুচিবালা সেন।

বিষাদে। *

মরমের দীর্ঘশ্বাস,
পরাণের হা হুতাশ,
বুকভরা দুঃখোচ্ছ্বাস
কেহতো বোঝেনা হায়!
বহে তপ্ত অশ্রুজল,
শতধারে অবিরল,
ভেসে যায় হৃদিতল,
কেহ তো দেখেনা তায়।

কেহ তো বোঝেনা মোর,
প্রাণে কি বেদনা ঘোর,
কারো তো নয়নলোর,
ঝরেনাকো মোর তরে।
কেহ তো আসে না হেথা,
জানাইতে সম ব্যথা,
কহেনাকো দুটী কথা,
মোর সনে স্নেহভরে।

দারুণ সংসার পায়,
দলিত হইয়ে হায়!
হৃদয় টুটিয়ে যায়,
প্রাণ জ্বলে যাতনায়;
অনাদর অপমান,
বিষময় বাক্যবাণ,
করে হৃদি শতখান,
তবু বেঁচে আছি হায়

সংসারের উপেক্ষায়,
সতত কম্পিত কায়,
ত্রাসে বুক ফেটে যায়
আকুল ব্যথিত প্রাণ
শুধু তব আশে হরি!
তব পদ হৃদে ধরি,
তোমারে স্মরণ করি,
আছি আজো ভগবান্!

যেন দেব এই ভাবে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে
জীবন কাটিয়া যায় কর্ত্তব্য মাথায় লয়ে।

* কোন উৎপীড়িতা বিধবার আক্ষেপ।

২১।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 545. January, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৫ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৫। জানুয়ারি, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিচারপতির বিদায় গ্রহণ—কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত জষ্টিস সারদা চরণ মিত্র মহোদয়ের কার্য্যকাল বিগত ১০ই ডিসেম্বর শেষ হইয়াছে। এদিকে বীরভূমের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় মহাশয়ও কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান্ বিচারকের আরও কিছুকাল ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

টেলিগ্রাফের মাশুল—আগামী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে কেবল দুই শ্রেণীর টেলিগ্রাফ চলিবে। ১ম "এক্সপ্রেস" বা দ্রুতগামী, ২য় "অর্ডিনারি" বা সাধারণ। "এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফে ১২ কথা এক টাকায় যাইবে এবং তদরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য দুই আনা হিসাবে লাগিবে। "অর্ডিনারি" টেলিগ্রাফে ১২ কথায় ছয় আনা এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত কথায় অর্দ্ধ আনা দিতে হইবে।

কাপড়ের কল—দেশীয় মূলধনে, কারিকরের পরিশ্রমে পরিচালিত বাঙ্গালায় প্রথম কাপড়ের কল—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। সম্প্রতি "গণেশ ক্লথ মিলস্ লিমিটেড" নামে আর একটী কাপড়ের কল হাওড়ার নিকটবর্ত্তী লিলুয়া ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ কলের বহুল প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়াছে।

ধন্যবাদ সভা—ভারতীয় শাসন-সংস্কারে গভর্ণমেণ্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত দাদাভাই বলিয়াছেন যে তিনি এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ের জন্য পরিশ্রম

করিয়াছেন, ইহাতে তাহার কতকাংশ সফল হইয়াছে।

কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন দুই স্থানে হইবার কথা চলিতেছিল—নাগপুরে ও মান্দ্রাজে। নাগপুরের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছে। কেবল রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে এবার কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে।

মাহিলা-শিল্পাশ্রম – বিগত ৪ঠা পৌষ শনিবার ছোটলাটমহিষী লেডি বেকার শিবনারায়ণ দাসের লেনে মহিলা-শিল্পাশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মহিলাবৃন্দের কারুনৈপুণ্য সন্দর্শনে লাটপত্নী প্রীত হইয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা—এদেশে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এখনও ভারত-গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এ বিবেচনায় সুফল ফলিবার আশা করা যায়।

রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ—এবার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন—শ্রীযুক্ত নব গৌরাঙ্গ বসাক এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এম, এ। উভয়েই দুই বৎসর কাল বাৎসরিক চৌদ্দ শত টাকা বৃত্তি পাইবেন। যদি ইতিমধ্যে কাজ ভাল দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে বৃত্তিকাল আরও বাড়িয়া যাইবে। বসাক মহাশয় পদকও পাইয়াছেন।

লাটকন্যার পরিণয়—বড়লাট-দুহিতা লেডি ভাইলেট ইলিয়টের পরিণয়কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কন্যার শ্বশ্রূ লেডি ল্যান্সডাউন নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও উপঢৌকন লইয়া ভারতে আসিতেছেন।

দ্বারবঙ্গে পর্দ্দানশীন ফণ্ড—পর্দ্দানশীন দুঃস্থ মহিলাগণের সাহায্যের জন্য দ্বারবঙ্গে একটী ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই ফণ্ডের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত বিগত ২২শে ডিসেম্বর জেলাজজ মিঃ ফিটির সভাপতিত্বে একটী মহতী সভা হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ সুন্দরলালের চেষ্টায় ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইগারটনের সহানুভূতিতে এই সভায় অনেক টাকা উঠিয়াছে। সঙ্কল্প সাধু।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।

৺কাশীধাম বহুতর দণ্ডীর বাসস্থান। দণ্ডীরা বৈষ্ণবগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী দণ্ডীর কথা স্বতন্ত্র; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কাহাকেও দ্বেষ করেন না। বৈষ্ণবদ্বেষী দণ্ডীরা তুলসীদাসের প্রভাব ও প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া

স্বতঃ পরতঃ তাঁহার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেন। একদা কতকগুলি দণ্ডী তুলসীদাসের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন;—আপনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। কোনও বাহ্য পদার্থে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীর পক্ষে লোকসঙ্গ, দানগ্রহণ, আতিথ্যপালন প্রভৃতি বিষবৎ পরিহার্য্য। কিন্তু আপনি সর্ব্বদা জনসঙ্ঘে বেষ্টিত থাকেন; কেহ দান করিলে, প্রত্যাখ্যান করেন না। আতিথ্যের জন্য ভাণ্ডার সজ্জিত রাখেন। এ সকল আপনার পক্ষে নিতান্ত অকার্য্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তুলসী তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, দীনভাবে কহিলেন;—আপনারা যাহা কহিলেন, সত্য। সন্ন্যাসীর অর্থে ও জনসঙ্গে প্রয়োজন নাই। ভোগবাসনা সন্ন্যাসীর পক্ষে যথার্থই হলাহল। আমি মূঢ়, বুদ্ধিবিবেকহীন, আপনাদের পদধূলির যোগ্য নহি, অচিন্ত্যশক্তি, অবাঙ্মনসগোচর পরাত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব আমি কি বুঝিব? আমার সামান্য জ্ঞানে ঈশ্বরের দুইটীমাত্র বিভূতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। সেই দুই বিভূতি—দয়া ও মঙ্গলভাব। তিনি দয়াময় ও মঙ্গলময়, এইমাত্র জানিয়াই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাঁহার অসীম দয়া ও মঙ্গলভাব দর্শন করি। যে পদার্থেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখিতে পাই,—সেই করুণাসিন্ধুর অবিচ্ছিন্ন কৃপারাশি সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ। জড়, চেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম, চরাচর, সর্ব্বত্রই সেই বিরাট্ পুরুষের করুণামূর্ত্তি জাজ্বল্যমান! বিশ্বকাণ্ডের উপাদান পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি-অপ্-তেজ মরুদ্-ব্যোম) নিরন্তর কেবল পরোপকারে নিযুক্ত। ভূতকল্যাণই পঞ্চভূতের প্রকৃতি, এ জন্য সাধুগণ পরোপকারকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

—কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জ্জন, দয়া, দান, ইহাই সাধুর সনাতন ধর্ম্ম। যিনি কর্ম্মক্ষেত্র পরিহারপূর্ব্বক, একাকী বিজনে যোগানন্দ উপভোগ করেন, তিনি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি লোকমধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমাধানপূর্ব্বক, অনাসক্তভাবে জীবকল্যাণ সাধন করেন, ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ নিজ আনন্দকে শত শত নিরানন্দ জীবগণমধ্যে বিতরণ করেন, তিনি অধিকতর ভাগ্যবান্। ভূমানন্দের ন্যায় মিষ্ট পদার্থ আর নাই। "একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত"—মিষ্ট একা খাইতে নাই। আনন্দকে যতই বণ্টন করিবে, আনন্দের মর্য্যাদা, পরিমাণ ও সাফল্য ততই বর্দ্ধিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে বণ্টনকারীর আত্মপ্রসাদ উচ্ছলিত হইবে। বিপুল জলরাশি তড়াগগর্ভে আবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ জলাভাবে সন্নিহিত শস্যক্ষেত্র সকল বিশুষ্ক হইতেছে, ইহা অতি শোচনীয় দৃশ্য। সেই জলরাশিকে সমন্তাৎ বিকীর্ণ করিয়া, মৃতপ্রায় শস্যসকলকে উজ্জীবিত ও ফলশালী করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। পরার্থে যিনি জীবন দান করেন, ভগবান্ স্বহস্তে তাঁহার

সৎকার করেন। মহাত্মা জটায়ু, দয়াবীর জীমূতবাহন, দানবীর শিবি দধীচি প্রমুখ সাধুগণ পরার্থে দেহ দান করিয়া, যে মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, কোটিকল্প তপস্যা দ্বারা তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈত ভক্তিযোগে সর্ব্বভূতের কল্যাণসাধনকে আমি সার ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছি।

আমি জ্ঞানহীন। আপনারা আমার গুরু। এ দাসকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই দীনদয়াল পতিতপাবন রামচন্দ্রকে নিমেষার্দ্ধও বিস্মৃত না হই।

দণ্ডিগণ তুলসীদাসের তাদৃশী ভক্তি ও দীনতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তদবধি তাঁহার প্রতিকূলাচরণে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা তুলসীদাসের কথাগুলি সার সত্য। স্বার্থের জন্য দান গ্রহণ যেমন বিষতুল্য, পরার্থে দান গ্রহণ তেমনি অমৃততুল্য। শ্রদ্ধাদত্ত দান গ্রহণ পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা অনশনমুমূর্ষুর প্রাণরক্ষা বা বিপন্নের বিপদুদ্ধার, গৃহী ও সন্ন্যাসীর সমান কর্ত্তব্য। যে সুধাময় আলোক দ্বারা চন্দ্রমা ভুবনমণ্ডলকে আলোকিত ও পুলকিত করিতেছেন, পৃথিবীকে সরস করিয়া উদ্ভিজ্জ জগৎকে জীবিত ও জীবের প্রাণনাড়ীকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, সে আলোক তিনি সূর্য্যের নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশ্বহিতে সে দানগ্রহণ করায় চন্দ্রমা কি নিন্দনীয়? স্বয়ং নিস্পৃহের পক্ষে দান গ্রহণ করা বা না করা একই কথা; তাঁহার পক্ষে পঞ্চমান্নভোজন ও শুষ্কপর্ণভক্ষণ একই কথা; তাঁহার পক্ষে অট্টালিকায় মহার্হ শয্যা বা গিরিগুহায় প্রস্তরশয্যা একই কথা। তাঁহার পক্ষে কাচ-কাঞ্চন, পুরীষ-চন্দন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সম্রাট্ দরিদ্র, সকলি সমান।

ভক্তিসুধাদানে পাতকীর পরিত্রাণ, অন্নজলদানে ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণার্ত্তের ক্ষুৎপিপাসাশান্তি, নামামৃতসেচনে সকলের সর্ব্বপাপক্ষালন,—এ সকলের জন্য সন্ন্যাসীর লোকসহবাস দূষণীয় নহে। ঈশ্বরে কর্ম্মফলসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা বনে গিয়া বাস করিলেও, তাঁহাদের নানা দোষ ঘটিয়া থাকে; তাঁহাদের তপঃসাধন হয় না। পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া, গৃহে বাস করিলেও, তপঃসিদ্ধি হয়। ফল কথা,—যিনি বীতরাগ হইয়া সদাই পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাঁহার পক্ষে গৃহই তপোবন।

সদুদ্দেশ্যে ঈশ্বরকৃপায় নির্ভর করিয়া কর্ম্ম না করিলে, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ভগবান্, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, সৎকার্য্যের জন্যই, মানবকে দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য দানকে সার্থক করাই মনুষ্যত্ব। পরোপকার যে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, তাহা অচেতনেরাও প্রতিপন্ন করিতেছে। দেখ! জীবলোককে অন্ন দিবার জন্যই ওষধীরা আত্মপোষণ ও

আত্মবিনাশ স্বীকার করিতেছে (১)। চন্দ্রমা দেবলোককে অমৃত দিবার জন্যই আত্মাকে ক্ষয় করিয়া থাকেন (২)। দীপ-বর্ত্তিকা পলে পলে আপনাকে দগ্ধ করিয়া, লোককে আলোক দিয়া থাকে। চন্দন-তরুকে তুমি যতই ছেদন কর, ভেদন কর, পেষণ কর, বা দহন কর, সে তোমাকে ততই অপূর্ব্ব পরিমল দানে তৃপ্ত করিবে। সাধুরা প্রাণান্তেও পরোপকার ব্রত ত্যাগ করেন না।

দান করা ও গ্রহণ করার ফলাফল, দাতা ও গৃহীতার হৃদয়ভাবের উপর নির্ভর করে। পরার্থে দান গ্রহণ করিতে হইলেও প্রথমে দাতার হৃদয় পরীক্ষা করা উচিত। তিনি যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত দিতেছেন কিনা, দেখা উচিত।

"অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যৈচিৎলীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাৎ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ॥"
(রামায়ণ।)

—অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় কাহাকেও দান করিতে নাই। অবজ্ঞায় দান করিলে, তাহা দাতার বিনাশের কারণ হয়।

ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণপূর্ব্বক, ভগবৎ-প্রীতিকামনায় দান করায়ও দান গ্রহণ করায়, উভয়েরি মঙ্গল। ব্রহ্মই দাতা এবং ব্রহ্মই গৃহীতা, আমি উপলক্ষমাত্র; যাঁহার প্রীতিতে বিশ্বের প্রীতি, সেই বিশ্বপ্রাণ—বিশ্বের হৃদয়ানন্দ ভগবান্ এই কার্য্যে প্রীত হউন,—এই ভাবে দানাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহাকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে। কূর্ম্মপুরাণে ব্রহ্মার্পণের কথা এইরূপ আছে;—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সম্প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥"

—যাহা কিছু দিবার, তাহা আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি; আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলি ব্রহ্ম,—এইরূপ জ্ঞানকে ব্রহ্মার্পণ বলে। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন—এই-রূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন। এই কার্য্যে সেই সনাতন ঈশ্বর প্রীত হউন,—সতত এইরূপ বুদ্ধিতে কার্য্য করাকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। কর্ম্মফল ব্রহ্মেই অর্পণ করিলাম,—ইহাকে সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। "অহং করোমীতি বৃথা-ভিমানঃ"—আমি করিতেছি, এ অভিমান

(১) 'ওষধী'—ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্। "ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ" অর্থাৎ ফল পাকিলে যাহারা মরিয়া যায়, সেই সকলকে ওষধী বলে; যথা ধান্য, কলাই প্রভৃতি। ধান ও কলাই পাকিলেই গাছ মরিয়া যায়।

(২) পুরাণে কথিত আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্রের এক এক কলা ভক্ষণ করেন। দেবকৃপায় শুক্লপক্ষে চন্দ্রমা আবার পূর্ণ হন।

বৃথা। ঈশ্বর কখনও দাতার বেশে আসিয়া হাত তুলিয়া দান করিতেছেন, আবার কখনও গৃহীতার বেশে আসিয়া হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার অচিন্ত্য লীলা! মূঢ় মানব কি বুঝিবে?

পাপী তাপী যাঁহার প্রাণের বন্ধু, পাপী তাপীকে দেখিলে, যাঁহার করুণাসাগর উদ্বেলিত হয়, ভগবানের জগন্মঙ্গল নামামৃত দান করিয়া, ভগবৎকথা শুনাইয়া, যিনি অগণিত তাপিতের দগ্ধ হৃদয় শীতল করেন, অমৃতময় নব জীবন দান করিয়া লোকের রোগ, শোক, ভয়, উৎকণ্ঠা, জরা, মৃত্যু হরণ করেন, তিনি নররূপী ঈশ্বর, সকলের নমস্য ও উপাস্য। ঈশ্বর স্বয়ং অনাদি, অবিনাশী, অবিকারী, অরূপ, নির্লেপ হইয়াও, অধর্ম্মের সংহার ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা জন্য স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিবলে বিশুদ্ধা, উর্জ্জিতা, সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ-চৈতন্য-খৃষ্টাদিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। লোকসমাজে এক একটী বিপ্লব ঘটিলে, তাহার শান্তিবিধানই ভগবানের এরূপ জন্ম-কর্ম্ম স্বীকারের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রবল এই দুই বলের সামঞ্জস্যভাবে সম্মিলনেই লোকসমাজ রক্ষিত হয়। এই সামঞ্জস্য ভগ্ন হইলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। যখন ক্ষত্রিয় বল ব্রহ্মবলকে পদদলিত করিয়া নরসমাজকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, তখন ভগবান্ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রিরূপে উদিত হইয়া, সে বিপ্লব নিবারণ করিলেন। যখন বীভৎস তান্ত্রিকতার অত্যাচারে সুরাপান, ব্যভিচার, জীবহিংসা প্রভৃতি মহাপাপের স্রোত প্রবাহিত হইল, মনুষ্যত্ব পিশাচত্বে পরিণত হইল, অধিক কি? দিবাভাগে প্রকাশ্য স্থানে নরবলি হইত, এবং সেই নরমাংস প্রকাশ্য ভাবে বিক্রীত ও ভক্ষিত হইত। তখন দয়াময় ঈশ্বর বুদ্ধশরীরে অবতীর্ণ হইয়া সে পাপস্রোত নিবারণ করিলেন। এইরূপে জগতে যে যে সময়ে ধর্ম্মের পতন ও অধর্ম্মের উত্থান হয়, ভগবান্ দেশ, কাল ও অবস্থার অনুরূপ মূর্ত্তি ও বিভূতি সহ প্রকটিত হইয়া বিপ্লব-নিবারণপূর্ব্বক সমাজকে গন্তব্য পথে পরি-চালিত করেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে॥"

—এ ভগবদ্‌বাক্য অব্যভিচারী নিত্য সত্য। এ আশ্বাসবাণীতে যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ঘোরতর বিপ্লবেও বিচলিত হন না। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া সংযতভাবে ও নিঃশব্দে কর্ত্তব্য পালন করেন। অনাবৃষ্টি-কাতর কৃষক যেমন যথাবিধি ক্ষেত্র কর্ষণাদি পূর্ব্বক সতৃষ্ণনয়নে জল-ধরের প্রতীক্ষা করে, তাঁহারাও তেমনি সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া একাগ্র হৃদয়ে সেই সঙ্কটহারীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করেন।

চৈতন্যদেব ও তুলসীদাস এ উভয়ের আবির্ভাব প্রায় পঞ্চ শতাব্দীর কথা। সে সময় সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ নবদ্বীপ, বারাণসী প্রভৃতি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান

সমূহে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য। কঠোর শাস্ত্রানুশাসন ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। দুর্ব্বলেরা প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম হইলে, জাতিচ্যুত হইত। সে সময় ভারতের সর্ব্বত্র যবন সম্রাটের আধিপত্য। রাজবলে বলীয়ান্ যবনেরা ছলে বলে হিন্দুগণকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম, জাতিভ্রষ্টগণের অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। আড়ম্বরপূর্ণ, নীরস, কর্কশ তার্কিকতার ও দাম্ভিকতার আধিপত্যে লোকের ভক্তিভাব বিশীর্ণ হইতেছিল। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—পণ্ডিত সম্প্রদায়ে ঠিক্ ইহার বিপরীত ফল দৃষ্ট হইত। সমাজে বিচারমল্ল দাম্ভিক পণ্ডিতগণের সমাদর অধিক হইত। যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ, অথচ তার্কিকতায় অক্ষম, এরূপ পণ্ডিতের সমাদর অল্পই ছিল। অনেকে আপনাকে "সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অভ্রান্ত" বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই ধর্ম্মবিপ্লবকালে, করুণাময় ঈশ্বর, প্রেমভক্তিবিমুখ জনগণের পরিত্রাণের জন্য, ভারতের দুই প্রধানতম কেন্দ্রে দুই মহাপুরুষকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাই – ভগবান্ চৈতন্যদেব ও ভগবান্ তুলসীদাস।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল ১৫৪২ সংবৎ। তুলসীদাসের আবির্ভাবকাল ১৫৮৯ সংবৎ। চৈতন্যদেবের লীলাকাল ৪৮ বৎসর। অতএব এ ভূলোকে উভয়েই যুগপৎ এক বর্ষকাল বিদ্যমান ছিলেন। সমকালে একের উদয় ও অপরের অস্তগমন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।"
—নিশাশেষে নিশানাথ চলিছে চরমাচলে,
নব ছবি ধরি রবি উদিছে গগনতলে!

চৈতন্যচন্দ্রের পার্থিব মূর্ত্তি অস্তমিত হইল বটে, কিন্তু তিনি ধরাতলে যে অপার্থিব, প্রেমময় বিগ্রহ স্থাপন করিলেন, তাহার চরণে জগতের নরনারী অনন্তকাল বিলুণ্ঠিত হইবে। ভক্তিপুষ্পে হৃৎপাত্র ভরিয়া তাহার পূজা করিবে। প্রেমাশ্রুধারায় নিত্য তাহার অভিষেক করিবে, এবং সেই বিগ্রহের পদতলে আত্মবলি দিয়া, ভক্তেরা মহানির্ব্বাণলাভ করিবে।

(ক্রমশঃ)

রাজপুত রাজগৃহের একটী পারিবারিক চিত্র।

মিবারের অধীন সাধরীর সামন্তরাজ স্বীয় শয়ন প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম সুখ সেবা করিতেছেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। রাজপুরী নীরব নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিবর্গের গগনভেদী বিকট চিৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

নিম্নভাগে পরিখারূপিণী কৃষ্ণবেণী কলকল শব্দে প্রকৃতির সেই গহন গম্ভীর

নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সৈনিকের কোলাহল নাই; অশ্বের হ্রেষা রব নাই; সমরাস্ত্রের ঝনঝনা নাই। সকলেই নিদ্রাক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু সাধরীরাজ এখনও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই। মিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁহাকে এখনও জাগরিত রাখিয়াছে। শৌর্য্য বীর্য্য এবং অধ্যবসায়ে সামন্তগণ মিবারপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; আবার সাধরীরাজ সকলের অগ্রগণ্য। তিনি মিবারের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন; আজীবন মহারাণার সেবায় স্বীয় বীরবপু নিয়োজিত রাখিয়াছেন। সেই জন্যই সাধরীরাজের এত চিন্তা তাঁহার কার্য্যের বিশ্রাম নাই। মনের শান্তি নাই। দুর্দ্দান্ত যবন সম্রাট্ হইতে কিসে মিবারের শান্তি রক্ষা হইবে, কিসে মিবারপতির বিপুল মান অব্যাহত থাকিবে, এই তাঁহার অহরহঃ চিন্তা। পিতৃপুরুষগণের বীরচরিত মনে উদিত হইতেছে সাধরীরাজের শত শত বীরবালা যাঁহারা জহর ব্রতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে অমনি বীরহৃদয়ে কর্ত্তব্যতার ফোয়ারা বহিতেছে। সহসা প্রকোষ্ঠ দ্বার উন্মোচিত হইল। রাণী সরোজ কুমারী চঞ্চল চরণে গৃহ প্রবেশ করিলেন।

সরোজের সতেজমূর্ত্তিতে কমনীয়তার অভাব ছিল না; কিন্তু কোমলতার ন্যূনতায় সেই প্রফুল্ল কমল নেত্র তৃপ্তিকর ছিল না। সে লাবণ্যে নয়ন ঝলসিয়া উঠিত, মনে ভয়ের সঞ্চার হইত।

সরোজকুমারীর সাহঙ্কার ব্যবহারে সাধরীরাজ মধ্যে মধ্যে বড়ই বিরক্ত হইতেন। তিনি মিবারেশ্বর মহারাণার দুহিতা এই গর্ব্বে পতিকুলের সকলকেই তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। অধিক কি, স্বীয় স্বামী সাধরীরাজও পদমর্য্যাদায় তাঁহা অপেক্ষা হীন, এইরূপ ভাবও মধ্যে মধ্যে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ে উদিত হইত। তাই এরূপ সাহঙ্কার পদক্ষেপ; সগর্ব্বে প্রবেশ। সাধরী সহসা প্রণয়িনীকে আগমন করিতে দেখিয়া চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। যেন নির্জীব দেহে জীবন সঞ্চার হইল; শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। মিবারের ভাবী চিন্তায় যে হৃদয় নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, তাহাতে সহসা শত চন্দ্রের আলোক উদ্ভাসিত হইল।

সাধরী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া রাজকুমারীকে সমীপে বসাইলেন। পতির আদরে প্রণয়িনী পরিতুষ্টা হইলেন বটে, কিন্তু কপোলবিম্বিত গর্ব্বরেখা একবারে মুছিয়া গেল না। সাধরীর তাহাতে লক্ষ্য নাই। তাঁহার প্রেম তরল; সরল হৃদয়ে পত্নীর প্রেমপ্রবলতায় অনুমাত্র অবিশ্বাস নাই। জীবনসর্ব্বস্ব পতি, পত্নীপ্রেমগত পতির প্রতি কোন্ রমণী অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারে? সাধরীর হৃদয়ে সে চিন্তা আদৌ স্থান পাইল না। তিনি পিপাসায় আকুল। বহুক্ষণ প্রগাঢ় চিন্তায় কণ্ঠশোষ হইয়া সাধরী বারিপানে ব্যগ্র হইয়া কহিলেন;—"রাণাবংজি * একপাত্র জল

* উদয়পুরের মহারাণা কুমারীকে সম্বোধন করিতে হইলে রাণাবংজি বলিতে হয়।

দাও।” গর্ব্বিতা সরোজকুমারীর কঠোর হৃদয়ে সে আদেশ বজ্রসম প্রবেশ করিল। তিনি অহঙ্কারে বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! মনে রাখিবেন আমি মিবারেশ্বর মহারাণার দুহিতা, আপনার ন্যায় শত শত সামন্ত মিবারপতির প্রসাদলাভে ব্যগ্র রহিয়াছে। মিবাররাজনন্দিনী কাহাকেও জল দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

কথাগুলি সাধরীর হাড়ে হাড়ে বিধিয়া গেল, মর্ম্মে যাতনা দিতে লাগিল। এ কঠোর কথা রাজপুতপ্রাণে সহ্য হইবার নহে। সাধরীর নয়নে অনলকণা ছুটিতেছে; হৃদয়ে দাবাগ্নি জ্বলিতেছে; হস্ত অসি অন্বেষণে প্রসারিত হইতেছে; সাধরী আত্মহারা। সরোজকুমারী প্রাণভয়ে আকুল হইয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষমা ও ধৈর্য্যের অবতার সাধরীরাজ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—“অবলা পলায়ন করিও না; সাধরী এত পাষণ্ড নহে যে, অবলার প্রতি বল প্রকাশ করিবে। কিন্তু আজি হইতে আমাদের পতি-পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। যে রমণী পিপাসাতুর পতিকে জল দিতে অপমান জ্ঞান করে সে পত্নীর অযোগ্যা, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই শ্রেয়ঃ। তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তোমাকে আমার অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে।”

সরোজকুমারীর গর্ব্বিত হৃদয় এইবার গলিয়া গেল। পতির সগর্ব্ব ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিল। সাধরীরাজকে তখন তাঁহার রাজরাজেশ্বর বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি প্রিয় পতির অসির আঘাতে মরিতে পারিতেন তবে তাঁহাকে যাতনার তীব্র বিষে পুড়িতে হইত না। বাস্তবিক সাধরী যদি এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন না করিয়া পত্নীর প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সরোজকুমারীর এত যাতনা হইত না; তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ের অহঙ্কার স্রোত আরও উথলিয়া উঠিত। সরোজকুমারী পাগলিনী।

রজনী অবসান হইতে না হইতেই সরোজকুমারী উদয়পুরে প্রেরিতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ঘটনাব্যঞ্জক লিপিও প্রেরিত হইল। মহারাণা অবনত মস্তকে লিপি পাঠ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত নয়নে কালিমা-রেখা পড়িল, প্রফুল্ল বদন বিবর্ণ হইল। অবিলম্বে বৃহৎ দরবারের আদেশ প্রদত্ত হইল। সভাস্থলে জনসাধারণের আমন্ত্রণ হইল।

দেখিতে দেখিতে দরবারের নির্দ্দিষ্ট দিন আগত হইল। শত শত সামন্ত নৃপতি সভাগৃহ আলোকিত করিলেন। রাজসভা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। আজি মিবারের জনসাধারণ সভাতলে সমাগত। মহারাণা সর্ব্বোপরি তারকা-বেষ্টিত শশধরের ন্যায় রত্নাসনে উপবিষ্ট। উভয় পার্শ্বে সামন্তবৃন্দ তারাকারে রাজসিংহাসন বেষ্টন করিয়া আছেন। সম্মুখে প্রজাসাধারণ। উপরে যবনিকামধ্যে নারীগণ।

সভার অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলে মোহিত। কিন্তু আর একটী ইহা অপেক্ষাও অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলে মুহ্যমান হইয়াছে, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছে, এবং স্তম্ভিত হইয়াছে। মিবারের ভাবী যুবরাজ, সাধরীরাজের পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু কাহারও সাধ্য হইতেছে না যে. মহারাণাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। মিবারের চিরন্তন প্রথা এই যে, সভায় প্রবেশ করিতে হইলে সকলকে নগ্নপদে প্রবেশ করিতে হয়। সামন্ত ভূপতিবর্গ নগ্নপদে প্রবেশ করিলে রাজ-প্রহরিগণ সযত্নে তাঁহাদের পাদুকা রক্ষা করিয়া থাকে। অদ্য সেই নিয়মে প্রহরি-বর্গ সামন্ত রাজাবলীর পাদুকা রক্ষা করি-তেছে। কিন্তু সাধরীরাজের পাদুকা-রক্ষণে স্বয়ং রাজকুমার নিযুক্ত হইয়া-ছেন। কুমার ভগ্নীপতির সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। অবোধ ললনাকুলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; প্রজাবর্গ বিমর্ষ হইয়াছে। সকলেরই মুখে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অবশেষে সাধরীরাজ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহারাণার দক্ষিণে অতি সম্ভ্রান্ত আসনে সমাসীন হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছেন বটে, কিন্তু রাজপুত্রের শোচনীয় দশা দেখিয়া তাঁহার সে গৌরব বিষাদময় হইয়া উঠিল। তাঁহারই পরি-ত্যক্ত পাদুকা কুমারের মস্তকে দেখিয়া, দুঃখে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল! তিনি মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া বলি লেন—দরিদ্রপালক! অধমের ত্যক্ত পাদুকা যুবরাজের মস্তকে দেখিয়া আমরা হৃদয়ে আঘাত পাইতেছি। সাধরীর সবিনয় নিবেদনে মহারাণা সস্নেহে কহি-লেন,—সাধরীরাজ! দুর্ব্বিনীতা তনয়াকে শিক্ষা দিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কি আছে? আমি তোমায় যোগ্য পাত্র জানিয়া কন্যা দান করিয়াছি। মোগলবংশে কন্যা দান করিয়া যখন রাজ-বারার সমস্ত প্রধান ভূপালগণ যবনদোষে দূষিত হইয়াছেন, তখন তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্র আর কে আছে? শৌর্য্য, বীর্য্য এবং আভিজাত্যে কোন্ ভূপতি তোমার সমতুল্য? তুমি পদমর্য্যাদায় হীন হইলেও আর সকল বিষয়েই তোমার সমকক্ষ দুর্ব্বি-নীতা কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বামী পাইয়াও স্বামীর সম্মাননা করিতে শিখিল না। তাই তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্যই এই দরবারের আহ্বান।

মিবারের অযোগ্যা কন্যা দেখুক মিবারের ভাবী মহারাণা স্বীয় ভগ্নীপতির সম্মান-রক্ষায় কতদূর অগ্রসর। আমি অন্যান্য প্রহরীর ন্যায় কুমারের প্রতি তোমার পাদুকারক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি সর্ব্বসমক্ষে উহা মস্তকে ধারণ করিয়া হৃদয়ের উচ্চতা প্রকাশ করিয়াছেন, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; স্বীয় ভগ্নীর ভাবী মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

আজি তাঁহারই সাধু ব্যবহারে আমার সম্মান রক্ষা হইল। যাও, তোমার পত্নীকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে যাও; আর সে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতে আপনাকে লঘু জ্ঞান করিবে না।

সামন্তরাজ অবনতমস্তকে রাণার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন—উন্মাদিনী সরোজ-কুমারী চরণতলে বিলুণ্ঠিতা। এ,সে, গর্ব্বিতা, কঠোরা মিবাররাজনন্দিনী নহে। সরলা স্বামিপ্রেমভিখারিণী কোমলা সরোজ-কুমারী।

আনন্দে বিষাদ।

(স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র দত্ত পিতৃদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে।)

১

সেই দিন—আহা! যেই শুভক্ষণে
তুমি এলে পিতঃ! এ ধরাতলে,
কোথা ছিনু মোরা জানেন বিধাতা,
আজি তা' নিরখি কল্পনা বলে।

২

সেদিন আকাশে তরুণ তপন
আরো রাঙা হাসি ঢালিয়াছিল,
প্রদোষের কোলে সোণার চাঁদিমা,
আরো সুধা যেন মাখিয়া দিল।

৩

সেদিন প্রকৃতি পরিলা কুন্তলে
দিগন্ত-উজল কুসুমমালা,
স্বরগ-সমীর বহিল ভূতলে,
মন্দার সুবাস যাহাতে ঢালা!

৪

সেদিন বিহঙ্গ আরো মধু মেখে
গেয়েছিল গীতি তমালশিরে,
আরো পবিত্রতা উঠিল উথলি,
কলুষ-হারিণী-জাহ্নবী-নীরে।

৫

শান্তি অমরতা আপনা বিকা'তে
সাধিল নরের দুয়ারে পশি,
প্রসন্ন বিধির করুণাপ্রবাহ,
ত্রিদিব হইতে পড়িল খসি।

৬

দীন, দুঃখী, মূক, ব্যথিত পরাণে
আনন্দ আরাম সহসা পেলে,
বঙ্গজননীর বিশুষ্ক হৃদয়ে,
কেহ যেন দিল চন্দন ঢেলে।

৭

ভারত বামার বাম-আঁখি পাতা,
নাচিল, পুলকে পূরিল হিয়া,
ঘুমন্ত বালক হাসিল স্বপনে,
অমৃত উছলে অধর দিয়া!

৮

সেই শুভ দিনে মাতা বসুমতী
তোমারে প্রথম লভিলা বুকে,
অলক্ষ্যে দেবতা দিলা শুভাশীষ,
এ মর ধরণী ভরিলা সুখে।

৯

অদৃশ্যে "অমৃত" ষোড়শ মাতৃকা
শিশু-মুখে স্নেহে করিলা দান,
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, কনক আসনে,
সে শিশু হৃদয়ে লইলা স্থান।

১০

শুভ পৌষ মাস সিত নবমীতে,
পুণ্যবতী দেবী জননী তব,
কত জনমের সাধনার ফলে,
পাইলা তনয় "উমেশ" নব।

১১

—সেই ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর,
—সেই আত্মজয়ী, গৃহস্থ-যোগী,
সেই ভূতপতি—অগতির গতি,
সেই অনাসক্ত অথচ ভোগী।

১২

আজি কোথা তুমি কোথা "কর্ম্মভূমি"
কোথা তব যত স্নেহের ধন,
কোথা আদরিণী সে "বামাবোধিনী"
কোথা তব প্রিয় সুহৃদ্গণ ?

১৩

কোন দেবদেশ আলোকিছ আজি,
আঁধারি তোমার সাধের গেহ—
তবু বুকে বুকে উঠিছে উছলি,
মন্দাকিনীধারা ও পূত স্নেহ!

১৪

যদিও যদিও জনমের মত,
এ দেশে তোমারে পাব না মরি!
তবুও পূজিব তবুও কাঁদিব,
তবুও ডাকিব পরাণ ভরি।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ
পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

প্রণতা কন্যাগণ।

৺ নলিনীবালা।

Remember thee ?
Yes ! While there's life,
In this heart,
It shall never forget thee,
First flower of my heart !
And first gem of the sea !

2

Yes ! while there's life,
In this heart,
It shall never forget thee,
I might hail thee
With prouder, with happier brow
But could I love thee
More deeply ? Than now ?

কেন ? ওরে ক্ষণপ্রভা!
এ কাল নিশায়
চমকিয়া মিশে গেলি
আচম্বিতে হায়।
ভুলিবনা তোর আলো ওলো ক্ষণপ্রভা!
চিদাকাশে অমানিশা তবু হেরি আভা।

স্বর্গীয়া নলিনীবালা।

যত দিন শুভ্র ফুল ছিলে এ সংসারে,
সুধাধারা ঢালিয়াছ দীনে অকাতরে
পরসেবা করেছিলে, জীবনের সার,
তাহা স্মরি, পাইতেছি অশনিপ্রহার।
তোমার সে স্নিগ্ধ আভা, অতুল সুষমা,
নয়নসম্মুখে ভাসে, লো দেবী-প্রতিমা!

চমকিস্ সদা তুই এ আঁধা হিয়ায়।
আঁধারেতে আলো সম শ্মশান চিতায়।
ভুলিবনা চিত্র সেই সহসা উদিয়ে
চিরতরে লুকাইলি আঁধারে ডুবায়ে;
এ চূর্ণ মানস এবে অন্ধকূপ হায়!
মা নলিনী! কোথা তুমি কেবা বলে দেয়।

ভগবানের কৃপাহিল্লোলে মানবাত্মার যখন পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন তাহার সৌরভ ও সৌন্দর্য্য ধরাধামে অমরার সুষমা প্রদর্শন করিয়া মানবপ্রাণ বিমোহিত করে এবং পৃথিবীর নিম্ন ভূমি হইতে মানবের সঙ্কীর্ণ সংসারাসক্ত স্বার্থপর হৃদয়কে স্বর্গের পথে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের উদ্যানের এইরূপ পবিত্র কুসুমের রূপ ও গন্ধ কি পবিত্র ও মনোহর! আমার হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন প্রাণের নলিনী এই আদর্শ কুসুম (কলিকা) ছিল, এ কথা জননীর স্নেহাসক্তিসম্ভূত অত্যুক্তি নহে। এই কন্যা জন্মাবধি ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বক্ষে ও স্বর্গগত পুণ্যবান্ পিতার প্রভাবমধ্যে বর্দ্ধিতা হইয়া অল্পস্থায়ী জীবনেই যে আত্মার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের অসংখ্য বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তাহার সাক্ষ্য দিবেন। নলিনীবালা আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান বলিয়া জন্মগ্রহণাবধি আজীবন অতুল আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহার কার্য্য-ব্যস্ত পিতা তাহার লালন পালনের জন্য সুশিক্ষিতা দেশীয় ও বিদেশীয় ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, স্বয়ং শিশু-পালন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ এবং বিখ্যাত ডাক্তারগণের ব্যবস্থাগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার শিশুজীবনের ব্যবস্থা স্থির করিতেন। নলিনী অতি ক্ষুদ্রকায়া হইলেও মনোহররূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া জন্মিয়াছিল। সদ্যপ্রসূতা বালিকার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের ১১ নং সাউথ সার্কুলার রোডবাসী অসংখ্য বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমার সহোদর হইতেও স্নেহশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী স্বর্গগত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে দর্শন মাত্র স্ত্রীজাতির কত উচ্চ আদর্শ এ বালিকা জীবনে সম্পন্ন করিবে তাহা জলন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া আমার প্রাণ উচ্চ আশায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমেরিকার দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধন জন্য শ্রীমতী ষ্টোই নাম্নী একটী মহিলা "Uncle Tom's Cabin" নামে এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া আমেরিকার অধিবাসী-গণের হৃদয়ে উন্মাদিনী শক্তি বিদ্যুৎপ্রবা-হের মত ছুটিয়াছিল। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন জন্য ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ার পর হতভাগ্য কাফ্রিগণের অবস্থার শুভ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। গাঙ্গুলী মহাশয় নলিনীর প্রথম জন্মোৎসবে তাহার সুন্দর হাতে বাঁধান "Uncle Tom's Cabin" উপহার দেন। তাহাতে লিখিয়া দিয়া-ছিলেন—"This present is given to dearest Nolinee with a hope that she will be equal to Iva if not excel in goodness." জ্ঞান প্রাপ্ত হবামাত্র আমি নলিনীকে এই বহির গল্প

মুখে মুখে বলিতাম এবং গাঙ্গুলী মহাশয় যে মহোচ্চ আদর্শে তাহার কোমল জীবন গঠিত দেখিতে ব্যাকুল, তাহার উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিতাম। সরলা বালিকা চিত্রার্পিতের ন্যায় ইহার কাহিনী শ্রবণ করিত। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে নলিনী ঠিক্ ইভার মত পরদুঃখকাতরতা, স্বার্থবিহীনতা ও সেবার স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়া গত বৎসর ৯ই অক্টোবর অমরলোকে গমন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রমাণ-পঞ্জী।

(প্রাচীন ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক।)

প্রাচীন ভারতের গৌরবপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিতে হইলে বেদের প্রমাণ বা সাক্ষ্য সর্ব্বপ্রথম গ্রহণীয়। প্রতীচ্য-প্রদেশীয় সুধীগণ কর্তৃক বেদ, মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, হারীতসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থসমূহের কাল নিরূপণ বিষয়ে যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত ও ভ্রান্তি-শূন্য নহে। তাঁহাদের মুখের কথার (১) উপর নির্ভর করিলেও বেদ খৃষ্টদেবের প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং মনুসংহিতা প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য কতিপয় প্রত্নবিদ্ পণ্ডিতগণের অনুমান যে খৃষ্টের আবির্ভাবের দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে বৈদিক-সূত্রনিচয় গ্রথিত হইয়াছিল। আবার ঋগ্বেদই বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বা বয়োবৃদ্ধ। সেই অতিবৃদ্ধ অডিসী, ইলিয়ড, জেন্দ আবেস্থা, বাইবেল ও কোরাণ সরিফের আদি পুরুষ অভ্রান্ত আদিপুরুষবাক্য বেদের সাক্ষ্যই আমরা প্রথমে গ্রহণ করিব।

বেদের সাক্ষ্য।

৪৮ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে প্রাচীন ভারতের ধনাকাঙ্ক্ষায় সমুদ্রযাত্রার পরিচয় লইয়া আশ্বস্ত হওয়া যাউক ;—

(ক) "উবা সোধা উচ্ছাচ্চনু দেবী জীরায় যানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিবে সমুদ্রেণ শ্রবস্যবঃ॥"

ধনৈশ্বর্য্যদাত্রী উষার নিকট সম্পৎ প্রার্থনা পুরঃসর সমুদ্রযাত্রা দ্বারা ধনলাভের কথায় বৈদিক ভারতবাসিগণের বাণিজ্যার্থে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? "প্রাচীন-কালে উষা বাস করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন, ধনলুব্ধ ব্যক্তি যেরূপ সমুদ্রে নৌকা লইয়া যায়, উষার আগমনে যে বাসসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে

(১) সার উইলিয়ম জোন্সের অভিমত।

পাঠাইয়া দেন।” এখানে ধনলোভী ব্যক্তির সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ কি জন্য বলিব? বাণিজ্যব্যপদেশে ধনলাভের আকাঙ্ক্ষাই সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবিত ও বিশ্বাসযোগ্য কারণ।

৮৮ স্থক্তের ৩য় মন্ত্রে সমুদ্রযাত্রার দ্বিতীয় পরিচয় গ্রহণ করা যাউক;—

(খ “আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্রযং
সমুদ্রমীর যাব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চ যাব প্রপ্রেংখ্য ঈংখ
যাবহৈ শুভেকাং॥”

“যখন বরুণের সহিত আমি জলযানে আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে সেই যান সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপর গমনশীল জলযানে অবস্থিতিকালে সেই আরামজনক নৌ-দোলায় আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।” বৈদিক ভারতের নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রার এই ছুইটী প্রমাণে সন্তোষ লাভ না কর আরও কতিপয় প্রমাণ দর্শাইতে প্রস্তুত আছি।

যে ঋগ্বেদের বয়সের গাছ পাথর নাই, সেই ঋগ্বেদ এক স্থলে (২) সাগরবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—“বণিক্‌গণ লাভাকাঙ্ক্ষায় তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ সমুদ্রে আপনাপন অর্ণবপোত সকল ভাসাইতেছেন। অন্যত্র (৩) বলিতেছেন নরপতি তুগ্র কোন দ্বীপস্থিত শত্রুগণের উপর রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, তাহাদিগের বিরুদ্ধে রণ ঘোষণা-পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র ভুজকে বহুসংখক সৈন্যসামন্তসহ এক সুবৃহৎ অর্ণবপোতযোগে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে রণযাত্রী রাজকুমারের রণবহর ভীষণ ঝটিকাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজকুমার রক্ষা পান। এই রণপোতখানি শত দাঁড় যুক্ত ছিল। ইহা দ্বারা জানা যায়,—বৈদিক হিন্দুগণ নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রা উভয় বিষয়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। বৈদিককালের নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রমাণ পর্য্যাপ্ত নহে। নিম্নে ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল হইতে আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম;—

“মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আতনুধ্বং
নাব মরিত্র পবনীং কৃণুধ্বং।
ইষকৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং
প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা যক্ষায়ঃ॥” ২

গম্ভীর স্বরে স্তব কর; অরিত্র সহযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর, অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর;—হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

বৈদিক যুগে দেবযানপথই বণিক্‌গণের বাণিজ্যার্থে গমনাগমনের সুগম ও প্রশস্ত পথ ছিল। উক্ত পথ সম্বন্ধে বৈদিক বণিক্ বলিতেছেন,—

“স্বর্গ ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী যে সকল দেবযান পথ আছে, ঐ সকল পথ জল ও বরফশূন্য হউক, তাহা হইলে ঐ পথে

---

(২) ঋগ্বেদ,—১ম অষ্টক, ১০ম অনুভক, ২১ বর্গ, ৮ শুক্ত।

(৩) ঋগ্বেদ,—১ম অষ্টক, ৭ম অনুভক, ৮ বর্গ, ৫ শুক্ত।

যাতায়াতপূর্ব্বক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধন লাভ করিতে পারিব।

আর এক স্থলে বলিতেছেন ;—

"ইন্দ্র মহ বণিজং চোদয়ানি,
স ন এতু পুর এতা নো অস্তু।
নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং
স ঈশানো ধনদা অস্ত মহ্যম্॥" ৪৪২পৃঃ

আমি দেবযানপথে ইন্দ্রের সমীপে পণ্য দ্রব্য অথবা সহযোগী বণিক্ প্রেরণ করিব। তিনি আমাদিগের হউন এবং পথিমধ্যস্থ দস্যুতস্কর প্রভৃতি শত্রু ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বিনাশপূর্ব্বক আমাদিগের অগ্রগামী নেতা হউন। তিনি প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহাতে আমরা (ব্যবসায় দ্বারা) ধনলাভ করিতে পারি, তিনি তাহা করুন।" নাগবীথি পথ হইতে আদি দেবলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেবযান পথ যে বৈদিক যুগে আর্য্য হিন্দুগণের বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুগম পন্থা ছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। কি জলপথে বাণিজ্যপোতাবলম্বনে, কি স্থলপথে রথ্যাশকটাদি আরোহণে বৈদিক হিন্দুগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিপুল ধনাগম করিতেন।

ঋগ্বেদে "শতা বিত্রাং নাবং" - শত পতত্র বা পতাকা বিশিষ্ট পোতের উল্লেখ কি তৎকালীন আর্য্যহিন্দুজাতির পোতনির্ম্মাণ ও সমুদ্রযাত্রাবিষয়ক অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করে না?

ঋঃ সংহিতা ২৫ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে বেদ "নাব সমুদ্রিয়" অর্থাৎ সমুদ্রগামী নৌকা বা পোতের উল্লেখে বৈদিক যুগে আর্য্য জাতির শিল্পকুশলতা ও বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাতায়াতের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥" (সামবেদী সন্ধ্যা প্রয়োগ) প্রভৃতি বৈদিক বচন দ্বারা তৎকালীন ভারতের নৌশিল্প ও সমুদ্রযাত্রার বিষয় নিশ্চিত প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় "প্রাচীন ভারতের জলযান" (Ships and boats) শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ;—

"That in the time of the vedas and for sometime afterwards, the Hindus were familiar with ships adapted for sea voyages is a fact which is now no longer doubted. The frequent mention, in ancient Sanskrit literature, of pearls, which could not have been produced without the aid of boats that could brave the ocean wave, is of itself sufficient evidence on the subject. But others are not wanting. Allusions to the ocean and to ships are numerous even in the Sanhita of the Rig Veda."

বৈদিক যুগে বস্ত্র শিল্পের বিস্তৃত প্রচলন সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ লইব। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ বেদের সূত্রনিচয় তৎকালীন

ভারতবাসীর বস্ত্রবয়ন শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতার উত্তম নিদর্শন দিতেছে। সে সময়ে ভারতবাসী যে, সাধারণ ব্যবহার্য্য মাত্র বস্ত্রোৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে, পরন্তু তাহারা বিলাসের উপযোগী উৎকৃষ্ট বসন সকলও উৎপাদন করিত, তাহার বহুল প্রমাণ বিরল নহে।” তৎকালীন বয়নশিল্পের পরিচায়ক ঋগ্বেদের কয়েকটী সূত্রের তৎকৃত, অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

“Enwrapping the extended world like a woman weaving a garment.”—A Hymn to the Apris makes “night and day interweave, in concert, like two famous female weavers.”—“The extended thread to complete the web of the sacrifice”—এবং “The fathers, who wove and placed the wrap and the woof.”

(ক্রমশঃ)

গাছেদের বুদ্ধি।

১। সূচনা।

গাছেদের কি বুদ্ধি আছে? এ প্রশ্নের আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি না। তবে এই মাত্র, বলিতে পারি যে, জীবজন্তুদের যেরূপ বুদ্ধি আছে, ইহাদের সেরূপ বুদ্ধি নাই। কিন্তু অনেক সময় ইহাদের কাণ্ড-কারখানা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বনে নানা গাছ আছে। গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেসি হইয়া সেস্থানে তাহাদিগকে বাস করিতে হয়। বায়ু ও সূর্য্যকিরণ উদ্ভিদের নিতান্ত আবশ্যক। বায়ু ও সূর্য্যকিরণ না পাইলে উদ্ভিদ্‌শরীর সুস্থ অবস্থায় থাকে না। জীবজন্তু যেরূপ আহার করে, উদ্ভিদ্‌গিকেও সেইরূপ আহার করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়। উদ্ভিদের কতক আহার মাটীতে থাকে, কতক আহার বায়ুতে থাকে। ভূমিতে উদ্ভিদের যে আহার থাকে, তাহা তাহারা মূল দিয়া সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মূল কঠিন বস্তু আহার করিতে পারে না। জলের সহিত আহার দ্রবীভূত হইয়া তরল হইলে তবেই উদ্ভিদ্ তাহা শিকড়দ্বারা শোষণ করিতে পারে। সেজন্য ভূমিতে সর্ব্বদা রস থাকা আবশ্যক। জীব জন্তু যেরূপ নিশ্বাসের সহিত বায়ু গ্রহণ করে, ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, গাছেরাও সেইরূপ করে। এই উপলক্ষে আমি কতকগুলি বাজে কথা এ স্থানে বলিব। পাঠকগণ আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

মাছ যেরূপ জলের ভিতর ডুবিয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি। এই বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ

করিয়া জীব জীবিত থাকে। বায়ু না পাইলে জীব ক্ষণকালের মধ্যে মরিয়া যায়। যে বায়ু আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহা একরূপ, আর যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করি, তাহা অন্যরূপ। যে বায়ু আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তাহা বিশুদ্ধ। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করি, তাহা দূষিত বিষময় বায়ু। ছোট একটী ঘরে দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া যদি অনেক লোক বাস করে, তাহা হইলে সে ঘরের বিশুদ্ধ বায়ুটুকু সকলের নিশ্বাস গ্রহণে শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়, এবং প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যক্ত দূষিত বায়ুতে ঘরটী পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ ঘরে অধিকক্ষণ থাকিলে মানুষ মারা পড়িতে পারে। মারা পড়ুক না পড়ুক, মানুষের শরীর অসুস্থ হয়।

পাঠিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা আমার উদ্দেশ্য। সেজন্য গাছের কথা বলিতে বলিতে আমি অন্য কথা আনিয়া ফেলিলাম। আমি এ বিষময় বায়ুর কথা ও পরে বরফের কথা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু বলা আবশ্যক, সে জন্য বলিতে বাধ্য হইলাম।

সেদিন (পৌষ ১৩১৫) কলিকাতা চিনেবাজারে একটী লোক ঘরের ভিতর শয়ন করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিল। সকালবেলা তাহার শরীর অসুস্থ হইল। সমস্ত দিন তাহার গা বমি বমি করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে চৈতন্যবিহীন হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার শরীর আরও অধিক অসুস্থ হইল। ফল কথা, সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। কোনরূপে সে হাঁসপাতালে গমন করিল। সে স্থানে তাহার অসুখের কারণ ধরা পড়িল। অতি কষ্টে তাহার প্রাণরক্ষা হইল।

তাহার অসুখের কারণ কি? কেন সে অসুস্থ হইয়াছিল? আমরা প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু পরিত্যাগ করি, লোকটী নিশ্বাসের সহিত সেই বায়ু গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। কিন্তু সে ঘরে সে একলা শয়ন করিয়াছিল। এক জনের প্রশ্বাসে ঘর দূষিত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয় না। তবে কোথা হইতে এত দূষিত বায়ু আসিল?

কথা এই যে, আমাদের প্রশ্বাসের সহিত যে দূষিত বায়ু বাহির হয়, কাঠ ও কয়লা পোড়াইলে অথবা কোন দ্রব্য পচিলে সেইরূপ দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়। কাঠ পোড়াইলে যত হউক না হউক, কয়লা পোড়াইলে এই ভয়ঙ্কর বাষ্প অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আবার পাথুরে কয়লা অপেক্ষা কাঠের কয়লার বাষ্প অতি ভয়ানক। ফরাশি দেশে লোকে এই উপায়ে আত্মহত্যা করে। ঘরে কাঠের কয়লা জ্বালাইয়া, দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, আত্মঘাতী শয়ন করে। কয়লার ধূমে শীঘ্রই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ইহজীবনে আর কখন তাহার চৈতন্য হয় না।

আশ্চর্য্য কথা এই যে, লোক জানিতেও পারে না যে, তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

আমি নিতান্ত মূর্খ নই। কিন্তু একবার আমি নিজে এই বিপদে পড়িয়াছিলাম। একবার শীতকালে আমার জ্বর হইয়াছিল। শীত আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। একখানি বড় কড়াতে আমি গুল জ্বালাইলাম। গুলের বাঁষ্প যে কি ভয়ানক তাহা আমি জানিতাম। সে জন্য গুল ঘরের বাহিরে জ্বালাইলাম। তাহার ধূম বাহির হইয়া গেল। তাহার পর গুলের আগুন রক্তবর্ণ হইয়া গন্ গন্ করিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম যে, এখন কড়াখানি ঘরের ভিতর লইয়া গেলে আর কোন ভয় নাই। আগুন ঘরের ভিতর লইয়া যাইলাম। শীতকাল। কাজেই দ্বার জনালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। খানিক রাত্রিতে সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়া দেখি যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। উঠিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। উঠিতে যাই, আর মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। ঘরে আর একজন ছিল। তাহাকে জাগরিত করিলাম। সেও উঠিতে পারে না। সেও উঠিতে যায় আর মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। যাহা হউক অতি কষ্টে আমরা ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম। তখন বাহির হইতে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া ঘরের দূষিত বায়ুকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিল। তাহাতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়া গেল। আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাই আমাদের প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। কয়লার বাষ্পে লোকের শরীর বিষাক্ত হইলে প্রায় লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। প্রায় লোক জানিতে পারে না, যে সে মরিয়া গেল।

তবেই দেখ, বাহির হইতে গুল কি কয়লা ভালরূপে ধরাইয়া তাহার পর ঘরের ভিতর আনিলেও রক্ষা নাই। ঘরের ভিতর গোড়া হইতে কাঁচা গুল কি কয়লার আগুন করিলে যে বিষম বিপদ ঘটে সে কথা আর বলা বাহুল্য। কলিকাতার আতুঁড় ঘরে এখন অনেকে গুলের আগুন রাখে। তাহাতে অনেক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু কি জন্য মরিল, লোকে তাহা জানে না। বাড়ীর লোকে মনে করে যে. কোনরূপ আতুঁড়ে রোগে শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কয়লার আগুনে সর্ব্বদাই লোকের বিপদ ঘটে। আর দুইটী ঘটনার কথা এ স্থানে আমি বলিব। একবার হিমালয় পর্ব্বতে আমি বাস করিতেছিলাম। একজন বড় সাহেব ভল্লুক শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চৌদ্দ জন কুলি ছিল। কুলিদের জন্য সাহেব ছোট একটী তাঁবু দিয়াছিলেন। রাত্রিতে কুলিরা তাঁবুর ভিতর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইত। শীতকাল। হিমালয়পর্ব্বতের শীত। গরম জলে আমি স্নান করিতাম, আর সে জল এক হাত গড়াইয়া যাইতে না যাইতে জমিয়া বরফ হইয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলা কুলিরা দুই ঝুড়ি কাঠের কয়লা পাইয়া-

ছিল। তাঁবুর ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে তাহারা একটী গর্ত্ত করিল। সেই গর্ত্তের ভিতর আগুন করিয়া তাহার উপর সেই দুই ঝুড়ি-কয়লা তাহারা ঢালিয়া দিল। কয়লা গন্ গন্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। আগুনের দিকে মাথা করিয়া চতুর্দ্দিকে গোল হইয়া কুলিরা শয়ন করিল। রাত্রিতে অনবরত আকাশ হইতে বরফ পড়িল। আকাশ হইতে যে বরফ পড়ে তাহা শিলের মত নহে, খুব সাদা তুলার মত। নিঃশব্দে পড়িতে থাকে। প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, সমুদয় পৃথিবী সাদা হইয়া গিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখিবে, কেবল সাদা—সাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। ভূমি সাদা, পথ ঘাট সাদা, ঘর সাদা, গাছ সাদা, এমন কি কাকগুলি পর্য্যন্ত সাদা। এমন উজ্জ্বল সাদা যে, বরফের উপর অধিক-ক্ষণ চাহিয়া দেখিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। সকালে উঠিয়া সকলে এইরূপ ধৌত-বসনা বিচিত্রবরণা পৃথিবীকে দর্শন করিল।

কাকের গায়ে ক্রমাগত বরফ পড়িয়া ভারি হইলে, পাখা নাড়িয়া কাক তাহা ঝাড়িয়া ফেলে। গাছের উপর অনেক বরফ জমা হইলে, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঘরের ছাদের উপর অনেক বরফ জমা হইলে, তাহা দূর করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা না করিলে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। মাটিতে পড়িবার পর, বরফ আর পূর্ব্বরূপ তুলার ন্যায় কোমল থাকে না, তখন পরিষ্কার বিলাতি লবণের ন্যায় কঠিন হয়। তাহার উপর দিয়া মানুষের গতায়াতে বরফ আরও কঠিন হইয়া কাচের ন্যায় মসৃণ ও পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। এইরূপ বরফের উপর চলিতে চলিতে আমি যে কত আছাড় খাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। লূনের ন্যায় তুষার লইয়া ছেলেরা খেলা করে। পাঁচ ছয় মুষ্টি বরফ লইয়া অনায়াসে গোলাকার বর্ত্তুল করিতে পারা যায়। বরফের ভাঁটা তাহারা লোকের গায়ে ছুড়িয়া মারে। তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। বরফের গোলা মানুষের গায়ে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ গুঁড়া হইয়া যায়। সুতরাং কোন রূপ অনিষ্ট হয় না। গোলা নিক্ষেপ করিয়া ছেলেরা হাসিয়া উঠে। যাহাকে তাহারা মারিল, সেও হাসিয়া উঠে। এরূপ একটী বরফের গোলা মাটিতে ফেলিয়া তাহাকে পা দিয়া আমি গড়াইয়া লইয়া যাইতাম। ঘরের বাহিরে এক রতি ভূমিও বরফ শূন্য নাই। সুতরাং গোলাটী বরফের উপর দিয়া আমি গড়াইয়া লইয়া যাইতাম। গোলাটীর চতুর্দ্দিকে আরও বরফ লাগিয়া যাইত। যাইতে যাইতে তিলটী ক্রমে তালের মত হইত, তাহার পর তালটী হাঁড়ির মত হইত, তাহার পর সেই হাঁড়িটী বৃহৎ একটী জালার মত হইত। অবশেষে যখন বিপর্য্যয় এক বরফের গোলা হইত, তখন আর তাহাকে নাড়িবার আমার শক্তি হইত না।

কোন কোন দেশে পৃথিবীর উপর কুড়ি হাত উচ্চ হইয়া বরফ জমা হয়। সেই গভীর বরফ জমা বাঁধিয়া যায়। তাহার ভিতর গহ্বর করিয়া সেই গহ্বরের

ভিতর শীতকালে লোকে বাস করে। আমেরিকা মহাদেশে এক স্থানে পনর হাজার হাত উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া রেল গিয়াছে। সেই রেলপথে শীতকালে সর্ব্বদা দশ হাত বার হাত, পনর হাত গভীর হইয়া বরফ জমা হয়। কাজেই তখন গাড়ির চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অধিক দিন বন্ধ থাকে না। রেলপথ হইতে তুষাররাশি দূর করিবার নিমিত্ত আমেরিকাবাসীরা এক কল করিয়াছে। দশ সহস্র অশ্ববলে সেই কল বরফের সহিত যুদ্ধ করে। দিনের পর দিন তুমুল যুদ্ধ করিয়া তবে কল বরফকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। এই পর্ব্বতের মাথার কয়েক স্থানে অনেকগুলি রেলের কর্ম্মচারী ও কুলি মজুর বাস করে, সুতরাং দোকানি পসারিও সে স্থানে আসিয়া জুটিয়াছে; সুতরাং সে স্থানগুলি ছোট ছোট নগরে পরিণত হইয়াছে এবং লোকজনের যাতায়াতের নিমিত্ত সে স্থানে পথ ঘাটও হইয়াছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া, বিপর্য্যয় আসুরিক বল প্রয়োগ দ্বারা রেলপথ হইতে বরফ দূরীভূত করিতে হয়। কিন্তু এত টাকা খরচ করিয়া পথ ঘাট হইতে কে আর বরফ দূর করে? সমস্ত শীতকাল পথে দশ পনর হাত গভীর বরফ জমা হইয়া থাকে। এ বাড়ী সে বাড়ী বেড়াইতে না গেলে চলে, কিন্তু দোকানে না গেলে লোকের চলে না। সে জন্য বরফের ভিতর সুড়ঙ্গ করিয়া লোক গমনাগমন করে।

জার্ম্মানি দেশের রাজধানী বার্লিন নগরে একবার আমি বরফে আটক পড়িয়াছিলাম। পৌষ মাস, ইংলণ্ডে বরফ পড়িয়াছিল, কিন্তু খুব অধিক নহে। সমুদ্র পার হইয়া আমি হলাণ্ড দেশে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আসিয়া দেখিলাম যে দেশ বরফে আচ্ছাদিত হইয়াছে। কিন্তু খুব গভীর ভাবে নহে। বেলজিয়ম ও ফরাশি দেশও সেইরূপ। তার পর যখন বার্লিনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি দিন বরফ পড়িয়া সমুদয় দেশ সাত আট হাত গভীর বরফে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তার ছিঁড়িয়া গেল, রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া গেল। যখন পুনরায় রেলপথ পরিস্কৃত হইল, তখন আমি বার্লিন হইতে বাহির হইতে পারিলাম। জার্ম্মাণি পার হইয়া অষ্ট্রিয়া দেশে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, সমুদয় দেশ অতি গভীর ভাবে তুষারে আবৃত হইয়া আছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই বরফ, বরফ ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহার পর, আল্পস্ পর্ব্বতের তো কথাই নাই। আল্পস্ পর্ব্বত পার হইয়া যখন ইতালি দেশে রোম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমি বরফের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। এক্ষণে পুনরায় আবার সেই কুলিদের কথা আরম্ভ করি।

হিমালয় পর্ব্বতের উপর সাহেব শীতকালে ভল্লুক শিকার করিতে গিয়াছিলেন। চৌদ্দ জন কুলি একটী তাঁবুর ভিতর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তাঁবুর মাঝখানে

গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে কয়লার আগুন করিয়া, সেই আগুনকে ঘিরিয়া কুলিরা শয়ন করিয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে দেখিল যে, দেশ বরফে আচ্ছাদিত হইয়াছে। আরও সকলে দেখিল যে, তাঁবুর কাপড় ও ভূমি এই দুইয়ের মাঝখানে যে অল্প ফাঁক থাকে বরফে সে ফাঁক বুজিয়া গিয়াছে।

আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। এবার কেবল আমি প্রবন্ধের সূচনা করিয়া রাখিলাম। পরে অন্যান্য কথা বলিব।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রত রহস্য।*

কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রপ্রচলিত কতকগুলি ব্রত নিয়ম গ্রহণ করিলাম। ভগবদ্গীতার উপাসিকা আমি,—আবাল্য নিষ্কাম কার্য্য অভ্যাস করিবার শিক্ষা পাইতেছি, সকাম ব্রতাদি কার্য্যে আমার তেমন আস্থা ছিল না। এবং উহাদ্বারা কেবল কামনাবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা তখন বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু তথাপি লৌকিক আচারের বশবর্ত্তিনী হইয়া কেবল ব্রত গ্রহণ করিলাম। মনে আবার সন্দেহ হইতে লাগিল, কামনামূলক ব্রতপূজাদি যে শাস্ত্র হইতে প্রচলিত, ভগবান্ নিষ্কামধর্ম্মের উপদেষ্টা হইয়া সকাম শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে আদেশ করিলেন কেন? অবশ্যই ইহার কিছু গূঢ় অর্থ আছে। নহিলে শাস্ত্রও মিথ্যা হইতে পারে না, ভগবদ্বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে। ইহার মধ্যে এমন রহস্য আছে যাহা সকাম ও সাকার উপাসনাকারী শাস্ত্র এবং নিষ্কাম ও নিরাকার উপসনার উপদেশক গীতার সহিত একমত হইয়া মিলিয়া যায়। কিন্তু তাহা জানিব কিরূপে?

বাসনা কখনই বিফল হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। মানুষ কায়মনোবাক্যে যাহা প্রার্থনা করে, শীঘ্রই হউক, অথবা বিলম্বেই হউক, সে বাসনা তাহার পূর্ণ হইবেই হইবে। এইরূপে আমার অনেকগুলি বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া আশা ও উৎসাহ বাড়িয়াছিল। তাই আবার ব্রতরহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কে আমার মনের সন্দেহ দূর করিবে? অন্তঃপুরাবদ্ধা রমণী আমি,—পণ্ডিতসমাজে গিয়া যে এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া আসিব, তাহার উপায় নাই। শিক্ষিতা ভগিনীগণের সহিত এ বিষয়ের তর্ক করিলেও যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া জিতিতে পারিব, আমার সে আশা এবং ক্ষমতাও নাই। কোনও ধর্ম্মমূলক সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া বক্তাগণের উপদেশেও যে আমার মনের সংশয় নিবারিত করিব, হিন্দুকুলকন্যা

---

* লেখিকার 'সাধনার সিদ্ধি' নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

আমি—সে সুযোগেও বঞ্চিতা। তবে কিরূপে এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিব? আবার আমার এত বিদ্যা শক্তিও নাই, যাহার ফলে সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলনপূর্ব্বক গীতার সহিত মিলাইয়া লইতে পারি। কিন্তু এত প্রতিবন্ধক সত্বেও মন কিছুতেই মানিতে চাহে না যে গীতা আর শাস্ত্র বিভিন্ন, কারণ তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হইয়া যায়, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, অথবা শাস্ত্র মানিলে গীতাকেই মিথ্যা বলিতে হয়। সে যে বড় বিষম ব্যাপার, ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী আমি,—শাস্ত্র বিষয়ে বাদানুবাদ ও ধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলন করিলে সেই তর্ক বিতর্কের প্রবল ঝটিকায় বহুক্লেশে আমি যে বিশ্বাস ও ভক্তি-চারাটুকু এত দিনের তপস্যায় হৃদয়কাননে রোপণ করিয়াছি তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। সেই ভয়ে সে কথা আর কাহাকেও ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইত না।

তখন মনে হইল যিনি আমার সকল সংশয়নিবারিণী, যিনি ধর্ম্মপথে আমার একমাত্র উপদেষ্টা, সেই ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হই, তিনি ভিন্ন আর ত কেহ আমার শিক্ষক উপদেশক নাই। তাই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, সকল বিদ্যার শিক্ষয়িত্রী সেই জগজ্জননীর কৃপায়, এবং শাস্ত্রদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের উপদেশে অবশেষে আমার সে সংশয় দূর হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে, দীর্ঘকালানুপালনীয়-সংকল্পো ব্রতমিতি। স্বকর্ত্তব্যবিষয়ে নিয়তঃ সঙ্কল্পো ব্রতমিতি। দীর্ঘকাল পালনীয় সংকল্পের নাম ব্রত। স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়ত সঙ্কল্পের নাম ব্রত। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥

অর্থাৎ ব্রতের দ্বারা দীক্ষা—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দীক্ষার দ্বারা দক্ষিণা,—অর্থে কৃত সাধনাদির ফলপ্রাপ্তি হয়। দক্ষিণা হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি,—এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই সত্য বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধা ব্যতীত নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হয় না, ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা লাভের জন্য ব্রত ধারণের প্রয়োজন। নিয়ম এই ব্রতের নামান্তর। আমরা দেখিতে পাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ব্যাপারই নিয়মের অধীন, যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত হইতে বিশ্ব পদার্থের সৃষ্টি ও পালন হইতেছে, যথাকালে সেই নিয়মানুসারেই পদার্থের বিনাশ ঘটিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। জড়জগৎ হইতে জীবজগতের সমস্ত প্রকৃতিই নিয়মের অধীন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র হইতে জল, স্থল, অনিল, অনল প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই নিয়মের বশীভূত থাকিয়া দৃষ্ট হয় ... পন কার্য্য করিতেছে। ... মিথ্যা, যাগ বস্তুতেই প্রকৃতির নিয়ম... মনে করিয়া হ্রাস, বৃদ্ধি, স্থিতি ...। প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, কেহ তাহা ... করিলে, এখনও পারে না। দে... পুণ্যফল আমরা প্রাপ্ত

ও শৃঙ্খলার সহিত বিশ্বরাজ্য পালন করা যেন মহামহিমাময় বিশ্বস্রষ্টার ব্রত বা সংকল্প। আবার সংসারেও দেখিতে পাই, সংসারের যাহা কিছু প্রার্থনীয় ভোগ্য বস্তু, সুখ, সমৃদ্ধি হইতে সিদ্ধি মোক্ষ প্রভৃতি সমস্তই নিয়মবানের প্রাপ্য। অনিয়মিত ব্যক্তির বিঘ্ন বিপদ পদে পদে ঘটে। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে মানবের সাংসারিক ও পারমার্থিক যাবতীয় কার্য্য নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রকথিত নিয়ম আমরা কয়জন শ্রদ্ধার সহিত পালন করি? পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দৃঢ়ব্রতের পক্ষে ত্রিভুবনে কিছুই অপ্রাপ্য নাই, দৃঢ়সংকল্প না হইলে কোন কার্য্যেরই সাফল্য লাভ করা যায় না।

বস্তুতঃ পশু, পক্ষী, তরু লতা, কীট পতঙ্গাদি সমস্ত জীব জগতে আহার বিহার প্রভৃতি শরীরধারণ উপযোগী তাবৎ কার্য্যই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী করিয়া থাকে, কেবল যথেচ্ছাচারী অসংযতেন্দ্রিয় মনুষ্য এই নিয়মপালনে অশক্ত হইয়া নানাবিধ রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিকিৎসকেরাও কহিয়া থাকেন, মা... নিয়মে শরীর রক্ষা করিতে পারে না, ভগ... র নিয়মানুসারে শরীরকে নহে। ইহার মধ্যে... র, তবে কখনও তাহাকে সকাম ও সাকার উ... গ করিতে হয় না। নিষ্কাম ও নিরাকার ... ছি, মনুষ্যশরীর যেমন ..., সেইরূপ মনোরাজ্যের অধ্যাত্ম নিয়ম সমূহও মানুষকে নিয়ত বশীভূত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষ কেবল কাম ক্রোধাদি আসুর ভাবের বশীভূত হইয়া পরিচালিত হয় না, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক প্রভৃতি দেবভাবও মনুষ্যহৃদয়ে বিদ্যমান আছে। মানবের মনোরাজ্যে প্রতিনিয়তই এই দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। ক্রোধে উত্তেজিত উন্মত্ত হইয়া, যে মানুষ অপকারী বা শত্রুকে হত্যা করিয়াও প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে, সময়বিশেষে সেই মানুষই আবার শত্রুর জীবন রক্ষা করিয়া প্রাণের দয়া ও করুণা বৃত্তিকে সার্থক করিয়া থাকে। সচরাচর আমরাও আজ যাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিলাম, কাল আবার তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতেছি। শত্রুবৎ বোধে বিরক্ত হইয়া আজ যাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছি, কাল হয়ত আবার তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য লালায়িত হইতেছি। মোহের বশীভূত হইয়া আজ যে সংসার-সুখকে অমৃতবৎ মনে করিতেছি, ক্ষণমাত্র বিবেকের উদয়ে তাহাই আবার বিষের মত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বস্তুতঃ মনুষ্য কোন একটী ভাবে মন স্থির করিয়া রাখিতে পারে না। তাই মানবের ব্রতধারণের আবশ্যক, ব্রতধারণ না করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। মনোরাজ্যে আসুর ভাবকে পরাজয় করিয়া দেবভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রতের প্রয়োজন।*

* লেখিকার 'সাধনার সি...

হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল ব্রতের বিধি আছে, ব্রহ্মচর্য্য—শৌচ, সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সন্তোষ ও দেবপূজা—সেই সকল ব্রতের প্রধান অঙ্গ। সকল কার্য্যে নিষ্ঠা ও ব্রত ধারণপূর্ব্বক দেবভাব লাভ করিয়া মানবজন্ম সফল করাই হিন্দুশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি-মার্গের সমুদয় ব্যাপারকে হিন্দুগণ সংযমের পথে নিয়মিত করিয়া দেবভাব উপার্জ্জন করেন, তাহারই নাম ব্রত।

শিল্প, বিজ্ঞান, কল কৌশল প্রভৃতি আজকাল যেমন কেবল প্রবৃত্তিমার্গের বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, অনন্ত ভোগকাল হইতে আর্য্য ঋষিগণের সমস্ত চেষ্টা সেইরূপ নিবৃত্তি-মার্গের ত্যাগ ও মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে দিব্য সম্পদের কথা বলিয়াছেন, মানুষ দেবপূজা ব্যতীত ইচ্ছা করিলেই কি সেই দৈবসম্পদ্ প্রাপ্ত হইতে পারে? তাই দেবপূজা ও দেবপ্রসাদের প্রয়োজন; এই জন্য দেবতাকে আবাহন করিয়া সকল ব্রতেরই সঙ্কল্প করিতে হয়। দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমাদের মত মোহান্ধ দুর্ব্বলচিত্ত লোকে সহজে কি দুর্দ্দম মন ও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতে পারে? সেই জন্যই এখনকার ব্রত সংকল্পহীন, শাস্ত্র বিশ্বাসহীন, হিন্দুসমাজে যথেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমাজকে এমন অলস ও অধঃপাতিত করিতেছে।

অধুনা আমরা যে সকল ব্রতকার্য্য পালন করিয়া থাকি, তাহা কেবল অহঙ্কারের বশে। শাস্ত্রানুসারে ব্রতের উপকরণাদির অনুষ্ঠান করি বটে; কিন্তু যে উদ্দেশে ব্রত, নিয়ম, যাগ যজ্ঞাদি প্রচলিত হইয়াছে, সেই দেবপ্রসাদ আমরা লাভ করিতে পারি না। কারণ আমাদের মন কেবল বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে একবারও দৃষ্টিপাত করে না, যে ব্রতজনিত উপবাস ও দেবপূজা আমাদিগকে পবিত্র করিল কি না, চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইয়া আমাদিগকে সন্তোষ দান করিতেছে কিনা। কিন্তু আমরা দেখি কেবল, কিরূপ আড়ম্বরের সহিত ব্রত করিলে লোকে ধন্য ধন্য করিবে, কি অনুষ্ঠানের ত্রুটি ঘটিলে লোকে নিন্দা করিবে।

দেবতা পূজাগ্রহণে প্রীত হইলেন কি না, দেখিবার পূর্ব্বে আমরা দেখি, লোকে আমার ব্রতের কথা জানিল কি না, ইত্যাদি চিন্তা আমাদিগকে কেবল গর্ব্বিত করে মাত্র। এখন আমরা লৌকিকতা ও যশের জন্য ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকি, তাই ধর্ম্মকার্য্যের ফলও তদনুরূপ প্রাপ্ত হই। ইহাতে আমাদের অন্তরস্থ দেবভাবের বৃদ্ধি না হইয়া আমাদিগকে অধিকতর আসুরভাবাপন্ন করিয়া তুলে। সেই জন্যই ধর্ম্মকার্য্যের ফল সচরাচর দৃষ্ট হয় না বলিয়া আমরাই আবার শাস্ত্র মিথ্যা, যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজাদি সব মিথ্যা মনে করিয়া অশ্রদ্ধায় ত্যাগ করিতেছি। প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া, ঐ সকল পুণ্যকার্য্য করিলে, এখনও নিঃসন্দেহে তাহার পুণ্যফল আমরা প্রাপ্ত

হইতে পারি। গীতায় দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ বা নিষ্কাম কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কর্ম্মই ব্রহ্ম, যে কর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, তাহাই কর্ম্মযোগ। আর যে কর্ম্ম জীবকে পরমাত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন করে, তাহা অকর্ম্ম। সংসারে বিষয়াসক্ত হইয়া অহঙ্কারের বশে আমরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা সমুদয়ই অকর্ম্ম, কারণ ইহাতে পরমাত্মা হইতে আমরা নিজেকে পৃথক্ ভাবে ভিন্ন করিয়া লই। মানব যতদিন ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের বশীভূত থাকে, যতদিন তাহার বিষয়ে আসক্তি ও ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত না হয়, ততদিন সকাম কার্য্যে সাকার দেব দেবীর পূজা বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা মানুষের পক্ষে প্রশস্ত বিধি। দেবদেবীর পূজার দ্বারা মানুষ যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকে, যখন সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্য ও বিরক্তির উদয় হয়, মনের সকল পাপবৃত্তি ক্ষয় পাইয়া, প্রকৃত জ্ঞানের ও ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন মানবাত্মা আপনা হইতেই নিষ্কাম কার্য্যের দ্বারা, নিরাকার উপসনায় নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই শাস্ত্রোক্ত সকল ধর্ম্ম কার্য্যের চরম লক্ষ্য। সমস্ত দেব দেবীর পূজা প্রকারান্তরে সেই পরমাত্মাতেই সমর্পিত হয় কেননা তাহাই পরম ব্রহ্মের সগুণ ও সাকার রূপ। শাস্ত্র সেই জন্যই সমস্ত দেবলোক, পিতৃলোক, ভূতলোকের পূজার্চ্চনার মধ্যে সেই পরমাত্মার পূজাই নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। অবশ্য অন্য সর্ব্বপ্রকার পূজার্চ্চনা হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম, এবং তাহা ব্যতীত মোক্ষ হয় না। কিন্তু আমাদের মত মায়ামোহিত সাধারণ ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত কিছুতেই একেবারে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিবার অধিকারী হয় না। ব্রত, পূজা, যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা, সেই পরমাত্মাই আমাদিগকে সংযম ও পবিত্রতা দান করিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইবার উপযুক্ত করিয়া লন। অন্যথা তাঁহার নিরাকার রূপ সহজে আমরা ধারণা করিতে সমর্থ নহি।

সাধনারচরিত্রী।

দাগীচোর।

১

সকলেই বলিল, "দেশে থেকে খোকা কিছুতে আরাম হবে না,—উহাকে নিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাও।" কথাটা মনে লাগে বটে, কিন্তু টাকা কই? উনি সামান্য যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষেও প্রচুর নহে,—তার উপর আজ এক বৎসর যাবৎ খোকার জ্বর, যকৃৎ ও প্লীহা এই তিনটী কঠিন রোগের তাড়নে যায় যায়!

কত কবিরাজ, কত ডাক্তার এবং কত অবধূতকে যে দেখাইয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। কেহ কেহ কিছু নিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই আমাদের দারিদ্র্য জানিয়া, কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এমন কি কেহ কেহ কৃপাপরবশ হইয়া ঔষধ পর্য্যন্ত বিনা মূল্যে দিয়াছেন।

আমাদের আর সন্তান নাই, একাকী খোকা আমাদের সাত রাজার ধন, সাগর-সেঁচা মাণিক! "খোকা কার মত হইয়াছে." বলিয়া দু জনে যে কত ঝগড়া করিয়াছি, "কে খোকাকে বেশী ভালবাসে," এই এই কথা উপলক্ষে যে কত পলকে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সে সব কথা শুনিলে তোমরা বোধ হয় হাসিয়া ঢলিয়া পড়িবে. এবং আমাদিগকে পাগল মনে করিবে। যদি আমি কখনও বলি যে, "খোকা একটা দাগীচোর; সে তার বাপের চোক মুখ যেন সিঁদ কাটিয়া চুরি করিয়াছে, তা' নাই বা হইবে কেন'—কেমন লোকের বেটা! —" তাহ'লে আর রক্ষা থাকে না, অমনি মুখের কাছে কত ছাঁদে হাত ঘুরাইয়া উনি বলিবেন,—"জানি গো! জানি, আর সাধুপনা জানাইতে হ'বে না,—একবার নিজের বুকে হাত দিয়া দেখ.—কে চোর, তার বিচার পরে হবে। খোকা আর তার বাপ, মাটির দেওয়ালে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে, তাতে আর তেমন বাহাদুরী কি আছে?—আমি অনেকের কথা জানি,—তাদের কারো নাম বল্‌তে চাই না.—কারণ তাহ'লে এখনি একটা লম্বা লম্বি ঘট্‌বে,—যে যার মনে বুঝে দেখুক,—আমি এখন অনেকের কথা জানি,—যারা বাতাসে ফাঁদ পাতিয়া পরের মন প্রাণ ধরিয়া আনে আর ঘরে বসিয়া তাই নিয়ে বিনা সূতায় ঘুড়ি উড়ায়! খোকা তা'দেরি কারো পেটে হ'য়েছে কি না,—তাই তেমনি করিয়া সেও লোকের মন, প্রাণ চুরি করিয়া বেড়ায়।" রাত্রিতে খোকা কা'র কাছে শোবে, তাই নিয়া যে কত ঝগড়া, কত টানাটানি হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব? শেষকালে ভোট নেওয়া হইত, আমাদের দুজনের ভোট অবশ্যই যার যার নিজের দিকে পড়িত, অবশেষে খোকা বাবুর "কাষ্টিং" ভোটে নির্ব্বাচনক্রিয়ার সমাধা হইত। খোকা প্রায়ই তার বাপের পক্ষে ভোট দিত, কারণ একবার ঘুমাইয়া পড়িলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। এক এক দিন হয় ত ঘুমের ঘোরে সবটুকু লেপ আমি টানিয়া নিয়াছি, খোকা শীতে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তার পর উনি উঠিয়া কখন যে খোকাকে নিজের কাছে তুলিয়া নিয়াছেন, আমি তাহা টেরও পাই নাই। ওঁর কিন্তু ভারী সতর্ক ঘুম, ভাঙ্গতে কখনও এক ডাকের বেশী দুই ডাক্ লাগে না। খোকার "কাষ্টিং" ভোটেও আমার কিন্তু নিস্তার ছিল না, তাতেও আমাকে দু কথা শুনিতেই হইত,—"ওগো! দেখেছ গো! দেখেছ, এই বয়সেই ছেলেটা তার মামাদের গুণ পেয়েছে, মনে এক রকম, মুখে আর এক রকম,—মনে মনে তোমাকেই ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে আমাকেই

সোহাগ জানাইয়া, আমার মন রক্ষার জন্য আমার কাছে শুইতে রাজী হইল!" বলিতে কি, আমি ভাল মন্দ কিছুতেই তাঁর সঙ্গে কথায় জিনিতে পারি না। সব কাজেই একটা না একটা কল্পিত খুঁৎ বের ক'রে আমাকে দু কথা শুনিয়ে দিবেই দিবে! যদি খোকার ভাত আগে দিই—যদি ভাল মাছখানা খোকাকে দেই, তবে বল্লে,—"দেখেছ গো! কেমন এক চো'কো,—আজ ছেলে পেয়ে ছেলের বাপকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করা হ'চ্ছে, গুরু লঘু পর্য্যন্ত জ্ঞান নাই, আমায় না দিয়া আগেই আমার ছেলেকে দেওয়া হ'চ্চে! ঘোর কলি গো! ঘোর কলি!" আবার যদি কোন দিন খোকাকে দিবার আগে উঁহাকে দেওয়া হয়, তবে আর যাবি কোথায়, "ওমা, দেখেছ, দেখেছ, কেমন পাষাণ প্রাণ, একটু খানি দুধের ছেলে, এত বেলা কিছু খায়নি, ক্ষুধায় মুখ খানা ছোট হ'য়ে গেছে. তবু কিনা তা'কে ফে'লে আমি বুড়ো মানুষ, আমায় আগে দেওয়া হচ্ছে, এমন পাষাণ প্রাণ ত কারো দেখি নাই। কাল মাস কাবার গেছে কি না—(সেদিন হয় ত মাসের ২০শে তারিখ. তবু "মাস কাবার" বলে খোঁটা দিতে কসুর নাই।) এক মুঠো টাকা এ'নে হাতে দিয়েছি, তাই আমার খোসামোদ করা হ'চ্ছে। ধিক্ এমন নীচতায়! আমি বাক্যবাণে জর্জ্জর হ'য়ে এক এক দিন রাগ ক'রে "ভাত খাবনা." বলে গিয়া শু'য়ে পড়েছি। তাতেই কি নিস্তার আছে,—ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নাই,—হয় ত ঠাণ্ডা হাত খানা আমার পিঠে দিয়া, "আহা! তাই ত গো! রাগে মেরুদণ্ডটা পর্য্যন্ত গরম হ'য়ে উঠেছে, একটু ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেই,—" মাথা দিয়ে ঘাম প'ড়ছে, একটু বাতাস করি," —এই বলে অমনি নিজের পা হ'তে এক খানা ষ্টকিং খুলে, তাই নিয়া মুখের কাছে হাওয়া করার মত ঘুরা'তে আরম্ভ করলেন। ২।৪ টা পদরজ হয় ত নাকে মুখেই পড়ে গেল,—তখন "ভিক্ষা থাক্, তোর কুকুর ঠেকা"র মত আমাকে "বাপের সুকন্যা" হ'য়ে উঠে ভাত খেতে হয়েছে!

২

—যাক্।—কি বল্‌তে বল্‌তে কোথায় এসে পড়েছি! সকলেই বলিল, "দেশে থে'কে খোকা কিছুতে আরাম হ'বে না, উঁহাকে পশ্চিম নিয়া যাও।" আমাদেরও যে সে কথা মনে হ'তো না, তা নয়,—কিন্তু টাকা কই? উনি সংসারের ধার প্রায় ধারেন না,—সকালে প্রাইভেট পড়াইতে যান, ৯টা ৯½টার সময় ফিরে, খোকার সঙ্গে ২।১টা কথা ব'লেই স্নানাহার অন্তে আফিসে চ'লে যান। আবার সন্ধ্যার আগে আফিস থেকে এসেই, হাত মুখ ধুয়ে একটুখানি যাহা কিছু দিয়ে [illegible] খেয়ে, চৌধুরীদের আড্ডায় দাবা পাশা তাস খেলার শ্রাদ্ধের জন্য যাত্রা। সবাই বলে যে, উনি না গেলে নাকি আড্ডা মোটেই জমে না;—অমন মিছরীর মত তীব্র শ্লেষ বাক্যও কেহ বলিতে পারে না, খেলায় বা গল্পেও কেহ অমন তন্ময় হ'য়ে সকলকে

আমোদিত করতে পারে না। আমি ঘরে যা দিয়া যা করি, কোন কথা নাই,—মাসকাবারে টাকা কয়টি এনে আমার হাতে দিয়েই খালাস! তার জমা খরচ দেনা পাওনা কোন কিছুই জিজ্ঞাসা নাই।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আগামী বৎসর লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

২। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরাজি ভাষায় কবিতা লিখিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের গত বন্যায় বিপন্ন দুঃস্থগণের সাহায্য ও সেবা করিয়া নব বর্ষের উপাধিবর্ষণ উপলক্ষে ইনি প্রথম শ্রেণীর কাইসর ই-হিন্দ্ স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। অমৃতসরের মুসলমান-শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত বৎসর স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটী নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে এক্ষণে ৮০টী ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। এই স্কুলটী শীঘ্রই কলেজে পরিণত করিবার সঙ্কল্প হইতেছে।

৪। বিগত বকরীদ উপলক্ষে কলিকাতার উপকণ্ঠে টিটাগড়ের হিন্দু ও মুসলমান কুলীদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ২৪ পরগণার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সাময়িক প্রতিকারের ব্যবস্থায় গোলযোগ শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

৫। সুপ্রসিদ্ধ ক্রিকেটবীর প্রিন্স রণজীৎ সিংহের সহিত ভারতের কোন বিখ্যাত রাজপুত্রার পরিণয় স্থির হইয়াছে।

৬। ইটালির মেসিনা নগরে ভীষণ ভূমিকম্পে প্রায় দুই লক্ষ নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অসংখ্য ব্যক্তি নিরাশ্রয় হইয়াছে। দুইটী নগর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। দুঃস্থ প্রজাগণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

৭। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নাদিয়াদে এক লক্ষ টাকা মূলধনে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৮। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতশাসনভার গ্রহণাবধি এ দেশে ইংরাজ রাজত্ব অর্দ্ধশতাব্দী অতিক্রম করায় গভর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ টাকার অনধিক বেতনপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্ম্মচারীকে তাহাদিগের এক সপ্তাহের বেতন পুরস্কার মঞ্জুর করিয়াছেন।

৯। ভারতগভর্ণমেণ্ট দেশীয় সিপাহিদিগের দুই টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কাবুলের আমিরও তাঁহার সৈন্যগণের বেতন এক টাকা হারে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

১০। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাটের প্রাণরক্ষার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর "কে, সি, আই, ই" এবং মিঃ বারবার প্রথম শ্রেণীর কাইসার ই-হিন্দ্ সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১। স্বর্গারোহণ। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, বঙ্গকবিকুলগৌরব অসীম প্রতিভাশালী নবীন চন্দ্র সেন ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিনাবধি নানা রোগে শয্যাগত ছিলেন। দয়াময় তাঁহাকে নিজ শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। তিনি পেন্‌সন্ লইয়া অধিকতর আনন্দে ও উৎসাহে সাহিত্যসেবায় নিমগ্ন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যাকাশে "নবীন চন্দ্র" নবীন চন্দ্র ছিলেন। সে চন্দ্রের নবীন নবীন জ্যোতি লাভ করিয়া বঙ্গভাষা আলোকিত ও পুলকিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার অমূল্য ও অক্ষয় সম্পত্তি। নবীন চন্দ্র প্রতিভার জ্বলন্ত চিত্রে নিজ কাব্যে সার্ব্বভৌমিক মহাসম্মিলনের উপদেশ দান করিয়াছেন। যদিও তাঁহার গ্রন্থাবলীই কীর্ত্তিস্তম্ভ, তথাপি সেই স্বর্গীয় কবিবরের প্রতি সমূচিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য তাঁহার কোনও স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। সাদা ও রক্তামাশয়ে। আপাঙের শিকড়, আমের আঠীর শাঁস ও চিনী প্রত্যেক সমান, আমআঠীর শাঁসের রস দ্বারা পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। প্রতিদিন সকালে জল সহ সেবন করিবে। ঔষধসেবনের ২ ঘণ্টা পরে বেলের সরবত খাইতে হইবে। ৩ দিনে রোগ দূরীভূত হইবে।

২। বিছা ও বোলতায় কামড়াইলে। কেরোসিন তৈল অথবা চূণ ও নিশাদল দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হইবে।

৩। সাদা ও রক্ত আমাশয়ে অপর যোগ। শ্বেত ধুনা ।০ আনা ও কাশীর চিনী ।০ আনা প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিবে।

৪। বাধকে ঋতুকালীন মেথী চূর্ণ ।০ আনা ও কাশীর চিনী ।০ আনা মাত্রায় একসঙ্গে প্রতিদিন ৩ বার সেবন করিবে। অপর যোগ —আপাঙের শিকড় ২ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিতে হইবে, ইহাও ঋতুকালীন দিনে ১ বার সেবন করিতে হয়।

৫। শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদরে। দূর্ব্বা ঘাস (সমস্তাংশ) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ, নরম গৈরিমাটী, ও আতপ চাউল চূর্ণ প্রত্যেক সমান। জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। প্রতিদিন ১ বার মধুসহ সেব্য। ৭।৮ দিনে উপকার হইবে।

.৬। শ্বাস কাসে। ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম।০ আনা, পিপুল চূর্ণ ৵০ আনা, বয়ড়ার শাঁস চূর্ণ ৵০ আনা একসঙ্গে মধু সহ সেব্য।

৭। সুখ-বিরেচক-যোগ। সোণামুখী পাতা চূর্ণ, কিস্‌মিস্‌ ও মিছরী—প্রত্যেক সমান এক সঙ্গে বাটিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে। রাত্রিতে শয়ন কালীন গরম দুগ্ধসহ সেবন করিলে সকালে দাস্ত হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিচরণ দাস গুপ্ত কবিরত্ন।

বামারচনা।

সমদুঃখিনী। *

কে গো বসি একাকিনী, ম্লানমুখী বিষাদিনী?
জানিনে কোথায় তুমি চিনিনে তোমারে।
শুনি ও বিষাদ-তান, ব্যথিত আমার প্রাণ,
সাধ হয় কাছে গিয়া আঁখি মুছাবারে।
করি দোঁহে গলাগলি, মরমের কথা বলি
বলি—দিদি! এ সংসার বড় স্বার্থময়!
তাপীতে করিতে স্নেহ, এ দেশে নাহিক কেহ
ব্যথিতে সান্ত্বনা দান এ দেশের নয়।
শুনিতে প্রীতির ভাষা, হেথায় কোরো না আশা,
তাহলে হতাশা শুধু দহিবে পরাণ।
দিদি গো! সংসার হায়! ভরা শুধু যাতনায়,
অপমান তিরস্কার পাবে হেথা দান।
যাতনা ভরিয়া বুকে, ব্যথা সহি হাসি মুখে
চল বোন! সংসারের কাজ সেরে যাই।
তুচ্ছ এই যাতনায় যেন গো না ভুলি তাঁয়
বিভুর চরণে মতি রহুক সদাই।
অন্তিমে সান্ত্বনা দান, করিবেন ভগবান্
জ্বালাময় হৃদি যেন জুড়াইয়ে যায়।
তাহলে সংসার-জ্বালা, করিবেনা ঝালা-পালা
লভিব অনন্ত শান্তি তখন তথায়।

তোমার কোন বিধবা ভগ্নী।

অভিনন্দন।

হে বর্ষ!
আবার এলে যে ফিরে
আবার গেলে যে ঘুরে
তুমি বর্ষ! চির নিয়ন্ত্রিত;
সাধনা আমার হায়
পুরালেনা দয়াময়!
(আছি) আজও যেন নহি পরিচিত।
যার তরে গণি দিন,
যে চিন্তায় রহি লীন,
সে আশা কি হবে সুনিশ্চিত?
কত দিবা কত রাতি
জ্বালিয়া নিরাশা-বাতি
থাকি আমি হয়ে চমকিত।

---

* গত সংখ্যার "বিষাদে" কবিতার প্রত্যুত্তরে।

এ বিশ্বের পরপারে,
সুখময় শান্তিপুরে,
ইচ্ছা হয় করিতে প্রেরিত —
কুশল বারতা তার
আনহে মিত্র আমার!
যার লাগি সদা আকুলিত।

আসা যাওয়া সদা কর,
সুখ দুখ বুকে ধর,
মানবের জীবন-বাঞ্ছিত;
(এ) মিনতি তব পদে,
ঘুচাইয়া অবসাদে,
হে কল্যাণ দেও চিরহিত।

মহাপরীক্ষা।

মহাপরীক্ষার দিন হেরি সমাগত—
দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও নিরঞ্জন!
ভীষণ তমসাবৃত জীবনের পথ—
আলোক আমার শুধু ও দুটী চরণ।

উত্তাল-তরঙ্গ-সম অনন্ত বিপদ,
ঘেরিয়াছে চারিধার—কোথা নাহি কূল—
যুগল চরণ তরী আমার সম্পদ—
আমার সম্বল-বল-উদ্ধারের মূল।

সহস্র কৃপাণ ওই হেরি উত্তোলিত!
ক্ষণিক চাঞ্চল্যে হবে জীবন সংশয়।
বিষময় যাতনায় হবে বিদারিত,
ভগ্ন—হৃৎপিণ্ড ইহা জেনেছি নিশ্চয়।

অনন্ত-আঁধার পূর্ণ নয়ন আমার,
লক্ষ্যহারা আজি আমি কি হবে উপায়?
আঁধারে আঁধারে ছুটে জগত সংসার।
এ আঁধারে পথ আমি পাইব কোথায়?

ভীষণ তমসাবৃত ভবিষ্য গগন,
নিরাশা নীরদ ঘন ছুটে রাশীকৃত।
না ফুটে আলোক, হাসি, না চলে পবন,
শুধুই নেহারি গাঢ় কালিমা আবৃত।

কভু কি ভেবেছি আসিবে এমন দিন?
ভ্রুকুটী-ভঙ্গিমা করি চাহিবে আমারে?
মুহূর্ত্তে জীবন-তন্ত্রী করিয়াই ক্ষীণ,
ফেলিয়া চলিয়া যাবে জগত-কান্তারে॥

জ্যোতির্ম্ময় তব পদ একান্ত ভরসা,
দরিদ্রের একমাত্র জীবন সম্বল;
উহাই আমার শুধু একমাত্র আশা,
উহাই আমার শুধু অন্তিমের বল।

ওই পাদপদ্ম হৃদে করিয়া স্মরণ,
বিপদ অঙ্কুশাঘাতে না হই বিকল;
অবলা নারীরে বল দিও নারায়ণ!
করো না তাহার নাথ! জীবন বিফল।

শ্রীমতী সরলা সুন্দরী মিত্র।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, টডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 546. February, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৬ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩১৫। ফেবরুয়ারি, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এম এ পরীক্ষা ফল—এ বৎসর এম, এ পরীক্ষায় শ্রীমতী হৃদয়বালা বসু দর্শন-শাস্ত্রে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

শুভ পরিণয়—বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের কন্যা লেডী ভাইলেট ইলিয়টের সহিত ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের পুত্র লর্ড চার্লস ফিট্জ মরিসের শুভ পরিণয় গত ৭ই মাঘ কলি-কাতা সহরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধি-বেশন আগামী ১৬ই ও ১৭ই মাঘ রাজসাহি রামপুর বোয়ালিতে হইবে। সুবিখ্যাত ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই উপলক্ষ্যে প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

ব্রাহ্মোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের উনা-শীতিতম সাম্বৎসরিক মহোৎসব ১লা হইতে ১৮ই মাঘ পর্যন্ত কলিকাতা উপনগর ও অন্যান্য স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে।

মৃত্যু—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি বঙ্গের সুবিখ্যাত কবি নবীন চন্দ্র সেন গত ২৩শে জানুয়ারী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ইনি চিরজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ইঁহার অভাবে বঙ্গভাষা একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি সুবিখ্যাত প্রফেসর ডি, এন দাস মহাশয় পদতলে জুতার পেরেকের ক্ষতে মলম লাগাইবার সময় রক্ত বিষাক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা, নির্ম্মলচরিত্র লোক

ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

নির্ব্বাসন—স্বদেশসেবক শ্রীযুক্তঅশ্বিনী-কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, ভূপেশ চন্দ্র নাগ, পুলিন-বিহারী দাস ও শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রমুখ নয় জনকে গবর্ণমেণ্ট আদেশে, নির্ব্বাসিত করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইয়াছে।

ডাক বিভাগের সংস্কার—কলিকাতা বাসীরা যাহাতে সহজে পত্রাদি ডাকে দিতে পারেন, তাহার সুবিধার জন্য ডাকবিভাগ হইতে প্রত্যেক বাড়ীতে একটী করিয়া বাক্স দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই বাক্সের দুইটী থাম থাকিবে। একটী পত্র ডাকে দিবার এবং অপরটীতে পত্র থাকি-বার ঘর থাকিবে। বাৎসরিক ১২৲ টাকা দিলেই এইরূপ বাক্স দেওয়া হইবে।

প্রমাণ-পঞ্জী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কার্পাসজাত বস্ত্র-শিল্পের আদিম জন্মভূমি এই ভারতভূমি। ঋগ্বেদে তন্ত্রস্থিত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দেখিয়া সে সময়ে কার্পাস-বস্ত্রের নির্ম্মাণ ও প্রচলন সম্বন্ধে নিঃসন্দি-হান হইতে হয়। আসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকা হইতে এতদ্বিষয়ক একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ;—

"India is according to our knowledge the accredited birth place of cotton manufacture. In one of the hymns of Rig Veda said to have been written fifteen centuries before era, reference is made to "cotton in the loom there", at which early date therefore it must have acquired some considerable footing—Vol. XVII. Journal of the Royal Asiatic Society.

"কৌষেয়বসনং তথা" (ক্ষৌমবস্ত্র পরি-হিতা,—যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যা প্রযোগঃ) এবং "রক্তাবাসাস্ত্রিনেত্রা" (রক্তবসনা ত্রিনয়না —গায়ত্রীহৃদয়ম্) বচনদ্বয় বৈদিক যুগের বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র-শিল্পের পরিচায়ক।

বৈদিক ভাষায় (ঋগ্বেদে) "সূচী" ও "সীবন" (needle and sewing) প্রাচীন কালের পরিচ্ছদ প্রস্তুত কালের সাক্ষ্য দিতেছে। বৈদিকযুগে দেশে পশম, রেসম ও তুলাজাত বস্ত্রাদির বিশেষ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। তাৎকালিক ব্যাকরণকার পাণিনীর ব্যাকরণে "কৌষিক" কথার বিশেষ সংজ্ঞা দেখিয়া এতদ্বিষয়ক প্রমাণে সন্তোষ লাভ করিতে হয়। তখনকার ব্যবহার্য্য সূচীশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গরাখা, জামা, পায়জামা ও বর্ম্ম প্রভৃতির যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

পণ্ডিত ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্রও এ বিষয়ে অভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

জাতিভেদ-প্রথার উল্লেখজনিত অপরাধে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত মতানৈক্যে (৪) আধুনিক বলিয়া কথিত হইলেও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীর যুক্তি, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা তাহার প্রাচীনতা গ্রাহ্য হইয়াছে। উক্ত সূক্তাবলীতে ছুতার (তক্ষা), কামার, বৈদ্য, রথনির্ম্মাতা, বয়নকারী তাঁতি, রসারসি, চর্ম্ম এবং জল বহনার্থ মসক বা ভিস্তি ছতি। প্রভৃতির উল্লেখও নেহায়েৎ মন্দ সাক্ষ্য নহে। ঐতিহাসিক মুর সাহেব তদীয় Sanskrit Texts নামক পুস্তকে ইহার পোষকতা করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য বিষয়েও প্রমাণাভাব নাই। ঋগ্বেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল ও ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত পাত্র ও অস্ত্র সকলের উল্লেখ আছে। এখানে শ্রুতির মূল বচন উদ্ধৃত না করিয়া এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র কৃত সটীক অনুবাদটী প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম ;—

"The Rig Veda alludes to golden cups and silver, copper, brass and bronze which were wellknown and used in the formation of weapons were it is to be presumed, not neglected."

বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞবেদী সমূহের নির্ম্মাণ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে উহারা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইত। সুতরাং তৎকালে হার্ম্ম্যশিল্প অর্থাৎ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদি ছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়।

বৈদিককালে বৃহৎ যুদ্ধাদি উপলক্ষে রথীতে রথীতে, পদাতিকে পদাতিকে যে ভীষণ সম্মুখযুদ্ধ হইত তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া কথিত হইত। বিবিধ মনিরত্নাদি-ভূষিত বীরসজ্জায় সজ্জিত বর্ম্মকবচধারী রথিবৃন্দ ধনুর্ব্বাণ সহ ধ্বজা পতাকা শোভিত রথারোহণপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয়গণের সমক্ষে উপস্থিত হইত। যুদ্ধস্থলে রথারূঢ় সেনাপতির পার্শ্বে অতিরিক্ত (reserve) রথও প্রস্তুত থাকিত। একখানি রথ ভগ্ন অথবা অকর্ম্মণ্য হইলে সেনাপতি অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। আর্য্যগণ যে, এ সময়ে যুদ্ধকালে রথ ব্যবহার করিতেন ঋগ্বেদের ৫ ৬২-৬, ৬-২৯-২ ও ১৬-২ ইত্যাদি স্থল তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। এতদ্বিষয়ে পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অভিমত ও অনুকূল। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"Driving was perhaps more fashionable than riding, for the principal heroes always appeared in battle, as among the ancient Assyrians and Egyptians, on chariots and prized themselves on being rathis or owners of cars. Mounted troops, however, were more common, and in the Rig Veda Agni is in one place invoked "to come mounted on a rapid courser" and in

another place is likened to a riderbearing steed." The Aswins made Pedu "mount a swift charger."

* * * * *

"The ancient chariots were highly prized, and great pains were taken to embellish them in a manner befitting the rank of the owner. In the Rig Veda, they were frequently described as of "gold" or "golden." One is described as ornamented with "three metals" supposed to have been gold, silver and copper; others as having gold fellies or wheels, and golden trappings."

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য শকট বা যানের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ
স্বস্তি বাহং রথমিৎ কৃণুধ্বং ॥ ৭ ”

ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর; ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করিতে পারে, এতাদৃশ রথ বা যান প্রস্তুত কর।

"আতুষিং চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে
—বাসী ভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়িভিঃ।
পরিষ্বজং দশকক্ষ্যাভিরুভে
ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্তং ॥ ১০
উভেধুরৌ বহ্নি বাপিব্দমানো—
—হ্নত যৌমেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থা পয়ধ্বং
নিযুদধি ধ্বমখনংত উৎসং ॥ ১১ ”

কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদ্বর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারদ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশাঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ কর। বহনকারী পশু রথের ধুরাদ্বয় শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে। যেন দুই ভার্য্যার স্বামী ক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত শকটে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিও না অর্থাৎ শকট যেন আধারভ্রষ্ট না হয়। বৈদিকযুগের এই রথ শকটাদি প্রয়োজনীয় শিল্পসংক্রান্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশের সর্ব্বজনবিদিত প্রত্নবিদ্ পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের অবগতির জন্য বেদ হইতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"The Rig Veda makes mention of waggons; so do the great national epics; and the lexicon of Amara Sinha gives distinct names of covered conveyances of several kinds, as also for open carts for the carriage of goods."

বৈদিককালের হিন্দুগণ, কি বস্ত্রশিল্প, কি ধাতুশিল্প, কি নৌশিল্প, কি সমুদ্রযাত্রা দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনাগম প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এখনও পাশ্চাত্য জগতের ভ্রান্তি অপনোদিত হয়

নাই,—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত অনেক ভারতবাসীরও উহাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত সুদৃঢ় আস্থার তিলমাত্রও হ্রাস হয় নাই। আজিও পাশ্চাত্যজাতি ফিনিসীয়গণকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম পোতনির্ম্মাতার গৌরব ও সম্মানজনক আসন দিতে চাহে, আজিও ভারতসন্তান তাহাদের দারুণ পক্ষপাতিত্বকে অভ্রান্ত সত্য স্বরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লয়। পৃথিবীর নিরপেক্ষ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধানে, আলোচনায়, সদ্বিচার ও সদ্বিবেচনায় প্রাচীন হিন্দুগণের সর্ব্ব প্রথম পোতনির্ম্মাণ বিষয়ক উদ্ভাবনীশক্তি সেই প্রতিষ্ঠাজনক পদবীর সম্মান প্রাপ্তির জবরদস্ত হকদার স্বরূপে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রহিবে। বেদের হীরকখচিত উজ্জ্বল সূক্তপটল ও মনু-সংহিতার সুবর্ণলিপিমালা যাবং বিদ্যমান থাকিবে, তাবং পৃথিবীর বক্ষ হইতে ভারত-সন্তানের শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক গৌরব গরিমা মুছিয়া ফেলিবার শক্তি কাহারও নাই।

আর একটী কথা বলিয়া বেদের অভ্রান্ত সাক্ষ্য আদায় শেষ করিব। বেদকে আর একবার সাক্ষ্যমঞ্চে উপস্থিত করিব। আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ে বৈদিক হিন্দুগণ অনভিজ্ঞ ছিল না, তাহা "প্রাচীন হিন্দুগণের আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ ও বারুদাদি ব্যবহার" বিষয়ক পৃথক্ প্রসঙ্গে আলোচনা করিব বলিয়াই এখানে তদ্বিষয়ক বিবরণ বা প্রমাণের উল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। আগামীবারে বৌধায়নের সাক্ষ্য গ্রহণ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যানিধি।

পুত্র ভিক্ষা।*

১

দৈত্যরাজ!
নহি আমি "রাজরাণী"
জগতের কাঙ্গালিনী,
দরিদ্র প্রজার নারী সেও ভগ্যবতী,
আমি দীনা অশরণা,
বিধাতার বিড়ম্বনা,
"কয়াধু"র পোড়াভালে এতই দুর্গতি?

২

জগতের ইতিহাসে,
হেন দিন কার আসে,
কাহার দুধের ছেলে প্রাণদণ্ড পায়,
পরশিলে পুত্র-দেহ,
কার না উছলে স্নেহ,
চুম্বিতে সে চাঁদমুখ কে না গ'লে যায়?

৩

জানি তব রাজ-করে,
ন্যায়দণ্ড শোভা করে,
তবুও বুকের মাঝে জাগিছে তো প্রাণ,
আছে দয়া মায়া তা'য়,
অশ্রু আছে বেদনায়,
অভাগীর আশা তাই করিছে আহ্বান।

* হিরণ্যকশিপু নিকটে প্রহ্লাদের জীবন রক্ষার্থে মহিষী কয়াধুর প্রার্থনা।

৪

ভিখারিণী মাগে আজ,
দেহ ভিক্ষা মহারাজ !
দাসীর নয়নতারা হৃদয়ের সার,
অবোধ শিশুর প্রাণ,
দুঃখিনীরে দেহ দান,
ত্রিভুবনে ধন্য হোক তব মহিমার।

৫

সে যে শিশু খেলা ঘরে,
ছেলে খেলা নিত্য করে,
সে বোঝেনা রাজবিধি রাজদণ্ড-ভয়,
"ধর্ম্মদ্রোহী" বলি তারে,
বিনাশিবে কি বিচারে,
প্রতিহিংসা গ্রাসিয়াছে ও পিতৃ হৃদয় ?

৬

আজো বাছা ঘুম ঘোরে,
জড়াইয়া ধরে মোরে,
আজিও লাগিলে ক্ষুধা করে অভিমান,
একটী ধমকে মম,
যমুনা জাহ্নবী-সম,
আঁখি জলে ভেসে যায় সে চাঁদ বয়ান !

৭

মিলি যত সখা সাথী
কি উল্লাসে উঠে মাতি,
দিগন্ত কাঁপায়ে ছুটে আনন্দের রোল,
চাহি তার মুখ পানে,
কি যে সুখ জাগে প্রাণে,
মরমে ফেণায়ে উঠে সুধার হিল্লোল।

৭

সে মোর প্রভাত-রবি,
সায়াহ্ন-চাঁদের ছবি,
সে যে মোর নবস্ফুট বসন্তের ফুল,
আ মরি সে চন্দ্রানন,
জীবন যুড়োনো ধন,
সে যে আঁচলের নিধি, জগতে অতুল !

৯

তারে নাকি—হরি ! হরি !—
কহিব কেমন করি,
তারে নাকি লুটাইবে করি-পদতলে,
শিলা বাঁধি তার গলে,
ডুবাইবে সিন্ধুজলে,
তারে নাকি পোড়াইবে অভিচারানলে ?

১০

—নানা—সবে মিছা কয়,
মহারাজ ! তা'কি হয়,
ননীর পুতলী মম সোণার প্রহ্লাদ,
জনক—পালক তারে,
কভু কি নাশিতে পারে,
হিয়া তো অশনি নহে—
নহ তো নিষাদ !

১১

শিশু-মুখে "হরি" নাম,
যেই দিন শুনিলাম,
নীরবে হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া,
হোক হরি তব অরি,
তবু শুন শ্রুতি ভরি,
পাপের আসক্তি সব যাইবে ঘুচিয়া।

১২

না গো না—সে "ভক্তি-দোষে"
পড়িয়াছে রাজ-রোষে,
অভাগিনী মাগে ভিক্ষা পাতিয়া অঞ্চল,
নাহি চাহি রাজ্যধন,
নাহি অন্য প্রয়োজন,
প্রহ্লাদে ফিরায়ে দেহ প্রাণের সম্বল।

১৩

সুখে রাজ্য কর তুমি,
তৃপ্ত হোক দৈত্যভূমি,
দূরে থাকি দিব নিত্য শত নমস্কার,
অবোধ শিশুর প্রাণ,
দেহ আজি ভিক্ষা দান.
ত্রিভুবনে জয় হোক তব করুণার।

লেখিকা
শ্রীমা—

ভারতীয় আর্য্য সহধর্ম্মিণীর দায়িত্ব।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ংপুরুষোবিরাট্।
তাং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ।

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। সেই প্রভু আপন দেহ দুই খণ্ড করিয়া অৰ্দ্ধাংশ পুরুষ ও অৰ্দ্ধাংশ নারী হইলেন। এই উভয়ের সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিলেন, আমাকে সেই সর্ব্বস্রষ্টা মনু বলিয়া জানিবে।

মানবদিগের আদি পুরুষ বেদার্থপ্রকাশক ভগবান্ মনু উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভগবানের শরীর হইতে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হইয়া এই জগতের সমস্ত মানবদিগের আদি পুরুষ মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতে অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী পুরুষ লইয়াই সংসার। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকলও তন্মতের পোষকতায় প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়া থাকে।

যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ দুইয়েরই সহযোগে সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি সংসারনির্ব্বাহ কার্য্যও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন। কেবল মর্ত্তভূমিতে মানবদিগের সংসারনির্ব্বাহ কথাটী বলিলে ঠিক্ হয় না। স্বর্গে দেবতাগণের দেবত্বনির্ব্বাহ এবং দেবকার্য্যও দেবীগণ সহ সম্মিলনাত্মক। তাই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীসহ ব্রহ্মা, গোলকে লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৈলাসে উমামহেশ্বর বিরাজিত থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। স্ত্রী ও পুরুষরূপী পরমাত্মা সমভাবে অর্চ্চনার যোগ্য, তাই ভক্তগণ মাতৃভাবে ও পিতৃভাবে পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে জানেন। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির মাহাত্ম্য অধিক, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বুঝি অগ্রে রাধার নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের নাম, অগ্রে সীতার নামোচ্চারণ করিয়া পরে রামের নাম ও অগ্রে উমার নামোচ্চারণ করিয়া পরে মহেশ্বরের নামোচ্চারণের অনুশাসন শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে। পুরাণ ও সংহিতায় কীর্ত্তিত আছে যে যদি

মাতা ও পিতা একত্র বর্ত্তমান থাকেন, তবে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ এক অঙ্গ। সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রেও দ্বন্দ্ব সমাস প্রকরণ বলিবার সময় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক পদের মধ্যে স্ত্রীবাচক পদটী পূর্ব্বে প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকাতে স্ত্রীজাতির পূজিতত্বই প্রকটিত হইয়াছে। তন্ত্রবিশেষে লিখিত আছে,—ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তিই সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তিই পালন করেন, রুদ্রের রুদ্রাণী শক্তিই নাশ করেন। ঐ সকল শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র শব্দতুল্য। দেবগণের দেবত্বই যখন দেবিগণসহ মিলনভাবাত্মক এবং আমাদিগের নানা শাস্ত্রের নানা প্রকারের মতানুসারে স্ত্রীজাতির মাহাত্ম্য এতই উৎকর্ষ-পরিচায়ক, তখন নারীদিগের সমবেত শক্তি ভিন্ন যে এই সংসারে নরত্ব অপূর্ণ থাকে, তাহা বলা বাহুল্য।

যত দিন মনুষ্য বিবাহিত না হয়, তত দিন শাস্ত্রানুসারে ও সমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাহাকে অপূর্ণ বা অর্দ্ধশরীর ধরা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত মথুরা প্রভৃতি স্থানে, কোন কোন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে তাহাদের পরিচয় প্রদানের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করুন,—কাহারা তিন ভাই বা চারি ভাই এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিবাহ করে নাই। সেই ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা কয় ভাই? তদুত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে,—আমরা আড়াই ভাই বা সাড়ে তিন ভাই। এখানে এ কথা বলা বাহুল্য যে, অবিবাহিত ভাইটীকে অর্দ্ধেক ধরিয়া তাহারা ঐরূপ পরিচয় দেয়। যদিও ভারতের সর্ব্বত্র ঐরূপ পরিচয় প্রদানের রীতি নাই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অবিবাহিত ভ্রাতাটী অর্দ্ধ শরীর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পত্নী ভিন্ন যে গৃহস্থ সংসারধর্ম্ম পালনের অযোগ্য, মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধনের অযোগ্য, সুতরাং মনুষ্য নামের অযোগ্য এ বিষয়ে শাস্ত্রে যথেষ্ট অনুশাসন আছে। শকুন্তলা হস্তিনাপুরীতে দুষ্মন্তের নিকটে উপস্থিত হইয়া যখন বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা দুষ্মন্তের মনে নাই, তখন তিনি বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গক্রমে উহা বুঝাইবার জন্য পত্নীর উপযোগিতা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন :

অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ স ভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ॥

আদিপর্ব্ব।

অনুবাদ। মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল, ভার্য্যাই সংসার

তারণের মূল। যাহাদের ভার্য্যা আছে, তাহারাই আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতে পারে, যাহাদের ভার্য্যা আছে, তাহারাই লক্ষ্মীবান্। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শ দান করে বলিয়া সখাতুল্য, ধর্ম্মকর্ম্মে পিতার তুল্য অর্থাৎ পিতা যেমন সন্তানের পালন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তেমনি পত্নীও পতির ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করে। ভার্য্যা পীড়িতাবস্থায় সেবা শুশ্রূষা করে বলিয়া মাতার তুল্য। ভার্য্যা দুর্গম কান্তারে পথিক স্বামীর বিশ্রামস্থল। যাহার ভার্য্যা আছে, তাহাকেই সকলে বিশ্বাস করে, অতএব মনুষ্যের ভার্য্যাই পরমা গতি।

দেশবিশেষে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোন কোন দেশে পুরুষ, স্ত্রীকে কেবল দাসীর ন্যায় ভাবে। কোন কোন দেশে স্ত্রী, বেশ্যা প্রভৃতির ন্যায় কেবল উপভোগসামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন কোন দেশে স্ত্রী, যুক্তিবদ্ধ হইয়া বা লেখ্য পত্রাদি দ্বারা রাজগোচর করাইয়া স্বামী গ্রহণ করে, আবার কারণ প্রদর্শন দ্বারা সেই যুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিবাহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্নও হইতে পারে। কোন কোন দেশে স্ত্রীলোক গতযৌবনা হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় বা বৃদ্ধত্বের সমকালে উত্তরাধিকারিণী হইবার অভিপ্রায়ে বা সেই প্রৌঢ়াদি অবস্থায় প্রতিপালিত হইবার কল্পনায় স্বামী মনোনীত করিয়া লয়। ঐ সকল দেশে প্রকৃত বিবাহের উদ্দেশ্য ও স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যথারীতি ভাবে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না। হিন্দুদিগের মতে বিবাহকালে মন্ত্র পাঠ সংস্কারে যে প্রতিজ্ঞা করা হয় পতি ও পত্নীর সেই ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধরূপ যুক্তিই লেখ্যপত্রাদি দ্বারা রাজগোচররূপ যুক্তি হইতে বহুগুণে দায়িত্বপূর্ণ। আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যরীতি অনুসারে স্ত্রীর সহিত স্বামীর বহুপ্রকার সম্বন্ধ আছে। কৈকেয়ীর মুখে রাম-বনবাসরূপ নিষ্ঠুর প্রার্থনা শুনিয়া মহারাজ দশরথ কৌশল্যার গুণ সকল উদ্দেশ করিয়া কৈকেয়ীকে এইরূপ বলয়াছিলেন ;—

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥
সততং প্রিয়কামার্থে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ম্বদা।
ন ময়া সংকৃতা দেবি! সংকারার্হা কৃতে তব॥

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

অনুবাদ। যখন যেরূপ ভাবে সেবা করা প্রয়োজন হইত, তখন তখনই কৌশল্যা আমাকে দাসীবৎ, সখীবৎ, ভার্য্যাবৎ, ভগিনীবৎ ও মাতৃবৎ সেবা করিত। আহা! আমি তোমার জন্য সতত প্রিয়কামা, প্রিয়পুত্রা, প্রিয়ম্বদা ও সংকারযোগ্য সেই দেবীকে সংকার করি নাই।

সীতাহরণের পর শ্রীরামচন্দ্র জানকীর গুণাবলী স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া চ ধাত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা
রহঃ সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে॥

মহানাটকম্।

ভাবানুবাদ। লক্ষ্মণ! আমার সেই প্রিয়া জানকী কার্য্যকলাপে সৎপরামর্শ দান দ্বারা মন্ত্রিতুল্যা, বহু সেবা কার্য্য দ্বারা তুষ্টি বিধান করিয়া, দাসীতুল্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহ সম্পাদনে সহকারিণী থাকিয়া, প্রকৃত পত্নী, বহু দোষে ক্ষমা করিয়া সর্ব্বংসহা-ধরিত্রী তুল্যা, বিবিধ প্রকার স্নেহ প্রকাশ দ্বারা মাতৃতুল্যা, শয়নকালে মনোরঞ্জন বিধান দ্বারা বারাঙ্গনা এবং হাস্য পরিহাস ও বিশ্রাম্ভালাপে সখীতুল্যা।

স্ত্রী কর্ত্তৃক এইরূপ বহু প্রকারের বহু প্রয়োজন সাধিত হয় বলিয়া এবং প্রকৃত সুশিক্ষা ভিন্ন ঐ সকল প্রয়োজন সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে পুরুষ অপেক্ষা কিছু পৃথক্ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার উচ্চ ধরণের রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। আপন আপন গৃহে প্রত্যেক গৃহস্থই রাজা, প্রত্যেক গৃহিণীই রাণী ও প্রত্যেক গৃহস্থালয় একটী ক্ষুদ্ররাজ্য এরূপ নির্দ্দেশ করিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রাজ্যে গৃহস্থ সর্ব্বদা অর্থ-চিন্তাদি বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, স্ত্রী অন্তঃপুররাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন। পুরুষের অর্থ চিন্তাদি বাহিরের কার্য্য অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অন্তঃপুরের কার্য্য বিভাগ অনেক বিষয়েই অধিক দায়িত্ব-পূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

ভাগবতুপাখ্যান।

উদ্ধবসংবাদ।

হে উদ্ধব! তুমি শ্রৌত বিধি ও স্মার্ত্ত বিধি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহীর আত্মারূপ আমার শরনাপন্ন হও, তাহা হইলে মদ্ভাব প্রাপ্ত্যন্তর অকুতোভয়ে, সর্ব্বদা বিচরণ করিতে পারিবে। এখানে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকেও সেই উপদেশই দিয়াছেন, ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে একই কথা বলিতেছেন। "সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। আমাতে মন অর্পণ কর আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। আমার মতন হইয়া আমার ভক্ত হও। ভক্তি সাধন নহে, ইহা সাধ্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া আত্মাকে আমাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানযোগে রত থাকিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ, অভিমান ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মম ও শান্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইতে পারিলে তবে আমার ভক্ত হওয়া হয়। এই যে বিশুদ্ধা ভক্তি, ইহাই জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ।" উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! মনুষ্যেরা বিষয়

সকলকে অনিত্য ও বিপদের আধার স্বরূপ জানিয়াও কেন তাহাতে আবদ্ধ হয়? কুক্কুর যেমন কুক্কুরীতে আসক্ত হয়, তিরস্কৃত হইলেও পলাইতে পারে না, গর্দ্দভ রজকের প্রদর্শিত তৃণমুষ্টি ভোজনান্তে যেমন ভার বহন করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও বিষয় সকল বন্ধনের কারণ হইলেও কেন তাহার উপভোগে প্রবৃত্ত হয়? তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, সনকাদি ঋষিগণ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহার উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি পরম-হংসরূপে তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলি শ্রবণ কর। মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, সকলই আমি এবং এই ইন্দ্রিয়াদিও আমার সত্তা ও শক্তি ভিন্ন কিছুই গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারে না। অন্তঃকরণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, বিষয় সকলও অন্তঃকরণকে অধিকার করে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে ঐ বিষয় ও অন্তঃকরণ উভয়ই মদাত্মক জীবের সত্ব, রজ, তমোগুণান্বিত বহিরঙ্গ মাত্র। অতএব পুনঃপুনঃ বিষয় সেবাদ্বারা তৎসংস্কারবশতঃ বিষয়ে আবিষ্টচিত্ত এবং বাসনারূপে চিত্ত হইতে সম্ভূত বিষয় সকলও আমার বাহ্যস্বরূপ হইলেও ইহা জীবের অভ্যুদয় হেতু বিবর্ত্ত মাত্র। জীবের চৈতন্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা জীবকে মোহিত করে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধির বৃত্তি হইলেও ইহারা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য, জীব ইহাদের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান হইয়াও তাহাদিগের হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবনা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ দুঃখে ভাগী হয়। যত দিন না জীবের আত্ম-অনাত্ম জ্ঞান যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়; ততদিন অজ্ঞান প্রযুক্ত জীবের যে জাগ্রত অবস্থা তাহা স্বপ্নদেহে জাগ্রদবস্থার ন্যায়। আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অসত্ত্ব হেতু দেহাদির বর্ণাশ্রমাদিরূপ যে ভেদ এবং ভোগাদিরূপ সুখ দুঃখ এ সমুদায়ই আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় মায়িক বা মিথ্যা জানিবে। যিনি জাগ্রতকালে বাহিরে ক্ষণিক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বিষয়-সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করেন, এবং স্বপ্নকালে হৃদয়ে জাগ্রত বাসনাময় পদার্থ সকল ভোগ করেন, তিনিই সর্ব্বাবস্থায় স্মৃতি দ্বারা আত্মানুসন্ধান করেন, এবং এই জন্যই ত্রিগুণবৃত্তির দ্রষ্টামাত্র সাক্ষীস্বরূপ হয়েন। অতএব বিচার দ্বারা গুণাধান মনের যে তিন অবস্থা তাহা আমার মায়া দ্বারা কল্পিত জানিয়া সকল সংশয় হইতে মুক্তি লাভ কর। যতদিন এই প্রারব্ধ দেহ থাকিবে, ততদিন আমার বশতাপন্ন হইয়া প্রাণধারণ করত দেহ প্রতীক্ষা করিবে, কিন্তু স্বপ্ন-প্রবুদ্ধের ন্যায় সমাধিযোগে আরোহণপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চ সংসারে আসক্ত হইবে না, ইহাই সাংখ্যযোগ, কিন্তু যাঁহারা আমাতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সকল ভোগ বাসনায় নিরপেক্ষ হইয়াছেন, তাঁহাদের অপ্রাপ্য আর কিছুই নাই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে

দৃঢ়ভক্তি তাহা চণ্ডালকেও জাতি ও গুণ-দোষ হইতে পবিত্র করে। সত্য ও দয়া সহকৃত ধর্ম্মাচরণ বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে কৃতার্থ ও পবিত্র করিতে পারে না। ভক্তিই চিত্তকে শুদ্ধ এবং দ্রব করে, তাই আমার ভক্ত আমার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মননে গদগদ বাক্য এবং দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন করেন এবং ভয় ও লজ্জাশূন্য হইয়া আমার গুণগান ও আমার নামে নৃত্যাদি দ্বারা জগৎকে পবিত্র করেন। হে উদ্ধব! যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে আপনার প্রাপ্তি হইতে পারে, তবে কি নিমিত্ত ভক্তিযোগ কহিতেছেন তাহার কারণ বলি শ্রবণ কর। জ্ঞান চিত্তের মদাকার পরিণাম বিশেষ। ফল স্বভাবতঃ পরিপক্ক হইলেই মিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাকে যদি অস্বাভাবিকরূপে পাকান হয়, তবে সেরূপ সুমিষ্ট হয় না। সেইরূপ কঠোর তপস্যাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সরসতা থাকে না। ভক্তিই জ্ঞান ও রসের একাকারত্ব। হে উদ্ধব! তুমি আমার একান্ত অনুগত, তাই যতক্ষণ না তোমার সংশয় দূর হইয়া আমাতে দৃঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ আমি তোমাকে উপদেশ দিতে নিরস্ত হইব না। সাংখ্যাদি যোগ শাস্ত্র, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা ইহারা ধর্ম্মাঙ্গ হইলেও চিত্তকে পবিত্র ও আমাতে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্যই বলি তুমি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যধর্ম্ম হইয়া আমাকে ভক্তি কর, এক আমার ভক্তিতে তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। আমার ভক্ত আর কোন সিদ্ধি চাহেন না, কেবল আমাতেই প্রীত হইতে চাহেন। আমি আমার ভক্তের বাসনা কখন অপূর্ণ রাখি না। ভক্তের প্রীতিতে আমি প্রীত হই, ভক্ত খাইলে আমি খাই, ভক্ত দেখিলে আমিই দেখি, ভক্ত শুনিলে আমিই শুনি, এবং ভক্তের আহার বিহার সকলি আমার জন্য। আমার মায়া, আমার লীলা ভক্ত ভিন্ন আর কেহই ধারণা করিতে সক্ষম নহে। আমি ভক্তের দাস, আমি ভক্তের সখা, আমি ভক্তের পুত্র ও পরিবার, আমি ভক্তের দেহ, মন, প্রাণ সকলি। ভক্তের সকল ভারই আমি বহন করিয়া থাকি। ভক্তেরই জন্য আমি সংসারে অবতীর্ণ আছি।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

চৈতন্য ও তুলসী উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও, তুলসীর কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তীর্ণ। মহাপ্রভু বঙ্গদেশীয়, তাঁহার সাধন-ভজনাদি সমস্তই বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হইত। এজন্য, বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে সকলের

রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীয়েরা স্বভাবতঃ কঠোরপ্রাণ, উদ্ধতস্বভাব; কোমলপ্রকৃতি বঙ্গবাসীর ন্যায় তাহারা সহজে নত হইবার নহে। চিরন্তন বিশ্বাস হইতে তাহাদিগকে বিচলিত করা সহজসাধ্য নহে। কঠিন কাচকে ভেদ করিতে যেমন হীরকই সক্ষম, হিন্দুস্থানীয়ের কঠোর হৃদয়কে ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত করিতে তেমনি তুলসীই সক্ষম ছিলেন। নিষ্ঠুরতম হিন্দুস্থানীয় দস্যুরাও, তুলসীর সঙ্ঘর্ষে আসিবামাত্র ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। তুলসীর প্রভাবে দস্যুরা শপথ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাধুজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে, এরূপ ঘটনা তুলসী-জীবনে অনেকবার ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিন্দুস্থানের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনেক অধিক। স্বল্পকালেই ঐ বিশাল জনপদমধ্যে তুলসীর প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, যে, দিল্লীশ্বর হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলে তুলসীর দর্শন লাভ করিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত। জগতে যত প্রকার শক্তি আছে, ভক্তির শক্তির নিকট সকলেই অবনত। ভক্তবৎসল ভগবানের আকর্ষণ অপেক্ষা ভক্তের আকর্ষণ অধিক। দেখ! চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাদিসমন্বিত অনন্ত বিশ্বমণ্ডলকে যিনি আত্মমধ্যে আকর্ষণ করেন, সেই বিরাট্ বিশ্বনাথও ভক্তের অকর্ষণে চালিত হন। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে সরলা গোপবালার প্রেমে আকৃষ্ট দেখিয়া নারদ বলিতেছেন;—

"যস্য তনূরুহকুহরে
নটনং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাম্।
তমিমং গোপকৃশাঙ্গী
লোচনভঙ্গী বিঘূর্ণয়তি॥"

—যাঁহার প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর,
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে নিরন্তর;
কৃশাঙ্গী গোপের বালা দেখ! বারেবারে,
নয়নের ভঙ্গীমাত্রে ঘুরাইছে তাঁরে!

সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনা ভিন্ন দুরবগাহ জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ সম্ভাবিত নহে। কলিযুগের মানবেরা দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু, বহুকালসাধ্য সুদীর্ঘ তপস্যায় অশক্ত। কলি মানবের পক্ষে সুগম, সুখসেব্য ও আশু ফলপ্রদ ভক্তিমার্গই ভগবানের অভিপ্রেত। এ বিষয়ে ব্যাসদেবের সহিত মহর্ষিগণের সংবাদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

ঘোর তামসযুগ কলিকালের আগমনে ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যবাসী লোকহিতৈষী মহর্ষিগণ সমবেত হইলেন, এবং কি উপায়ে লোকের পরিত্রাণ হইবে তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বতত্বজ্ঞ, ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট গমন করিলেন। বেদব্যাস তখন স্নানার্থ জাহ্নবীর সলিলে অবতরণ করিয়াছেন দেখিয়া, ঋষিমণ্ডলী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব অবগাহনকালে,—"কলিঃ সাধুঃ" —এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিলেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে

অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ;— "ভগবন্! ঘোর তামসযুগ উপস্থিত ; আমরা ভীত হইয়া আপনার নিকট আসিলাম। এখন হইতে লোকের পরমায়ু ও শক্তি সংক্ষিপ্ত হইতে চলিল। সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন, কঠোর তপস্যা, অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ, গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত, এ সকল সাধনা কলিমানবের পক্ষে কি সম্ভব ? এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, জানিবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের ভয়ভঞ্জন করুন।" সর্ব্বার্থদর্শী মহর্ষি দ্বৈপায়ন ইষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ; — তোমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াই আমি "কলিঃ সাধুঃ" বলিয়াছিলাম। কলিযুগের উপর ভগবানের বড় দয়া ! এ যুগের মানবেরা দুষ্কর তপস্যাদিসাধনে অশক্ত হইবে জানিয়া, করুণাময় হরি সকলের মুক্তিলাভের জন্য অতি সুখসেব্য ভক্তিমার্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুত্রবৎসল মাতা পিতা যেমন নিজ সন্তানের কল্যাণচিন্তায় নিযুক্ত, করুণাময় নারায়ণ তেমনি সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত। তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের পক্ষে যখন যাহা আবশ্যক, অন্যের ভাবিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। এখন হইতে মানবেরা ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে, তাঁহার নাম ও কথার আলাপ করিলে, সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। (১)

"কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যো হরিস্মরণমাত্রতঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

—মানবেরা হরিস্মরণমাত্রেই, নরকযাতনাকর, অতিভীষণ কলিকলুষরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"
(ভাগবত)

—হরি হে ! আতপ-তাপিতের পক্ষে যেমন সুশীতল পানীয়, ভবতাপদগ্ধের পক্ষে তেমনি তোমার কথালাপ—অপূর্ব্ব অমৃত ! এ অমৃতের নামমাত্রেই সর্ব্বতাপের শান্তি। যাঁহারা স্বর্গমোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই শুক নারদাদি জীবন্মুক্ত যোগীরাও তোমার কথামৃত সাদরে পান করিয়া থাকেন, পুলকিত গাত্রে মুক্তকণ্ঠে এ অমৃতের গুণকীর্ত্তন করেন। যাঁহারা জীবলোককে এ অমৃত দান করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ দাতা—তাঁহারাই জীবলোকের জীবনদাতা।—ফলতঃ ভগবৎকথার ন্যায় সর্ব্বতাপহারিণী—পতিতপাবনী—মৃতসঞ্জীবনী—সর্ব্বজীবসেব্যা সুধা আর কি আছে, জানি না। হা মানব ! তোমার গৃহমধ্যেই অমূল্যনিধি চিন্তামণিধন

১। "কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"
শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন,—হে রাজন্! কলি সর্ব্বদোষের আধার হইলেও, ইহার একটী মহৎ গুণ এই যে, এ কালের লোক হরিকীর্ত্তনেই ভববন্ধনমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে।
(ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৩ অধ্যায়, ৪৩)
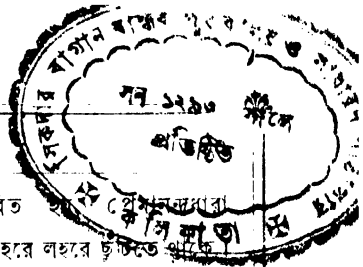
বিদ্যমান, তুমি সে ধন ছাড়িয়া, তুচ্ছ কাচের আশায় ঘুরিয়া মরিতেছ! হায় রে!—

"জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া॥"
—বিষয়তৃষ্ণায় বৃথা গেল রে জীবন,
বেচিনু কাচের মূল্যে চিন্তামণিধন।

ভক্তিমার্গের ন্যায় ভগবৎকৃপালাভের এমন মধুর, এমন প্রাণারাম উপায় আর নাই। দর্শনমীমাংসাদি-প্রতিপাদ্য জ্ঞান কাণ্ড ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় হইলেও, ঐ সকল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া সাররত্ন সঙ্কলন করা অল্প সাধনার কার্য্য নহে। দর্শনাদি শাস্ত্র মতভেদে ও তার্কিকতায় এরূপ জটিল ও দুর্ভেদ্য যে, অসামান্যধীসম্পন্ন মনীষিগণও যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়া প্রকৃততত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন না। ঐ সকল তর্কব্যূহ ভেদ করিয়া যিনি প্রকৃত সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ করিতে অসামান্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি বা বিচারশক্তির প্রয়োজন হয় না। আত্মশোষণাদি কঠোরতার প্রয়োজন নাই। সুদীর্ঘ তপঃসাধনের প্রয়োজন নাই। সাধুসঙ্গে পরমানন্দে স্বল্পকালেই ভবরোগের শান্তি হয়। কটু-তিক্ত কষায় ঔষধে ও উপবাসে সুদীর্ঘকালে যে ব্যাধির শান্তি হয়, সেই ব্যাধি যদি সুপেয় শর্করাসলিল সেবন দ্বারা অচিরেই নিবারিত হয়, তবে কাহার না শর্করাসলিলে আগ্রহ হয়?

ভক্তির এমনি প্রভাব, এমনি মহিমা, যে, হৃদয়ে ভাবাবেশ হইবামাত্র, অমৃতরসে সর্ব্বেন্দ্রিয় প্লাবিত হয়, প্রেমানন্দধারা শিরায় শিরায় লহরে লহরে ছুটিতে থাকে, সে তরঙ্গে পাপ তাপ, রোগ শোক, জরা-মৃত্যু, ভয়োৎকণ্ঠা তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়া যায়, মানব ভূলোকে থাকিয়া ও দেবদুর্লভ চিদানন্দ সম্ভোগ করে।

তুলসী ভক্তিযোগে সিদ্ধ। ভক্তির মহিমা ও প্রভাব আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া, স্বয়ং আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তাপদগ্ধ জীবলোককে সে আনন্দ দান করাই তাঁহার মুখ্য ব্রত ছিল। স্বকৃত ভক্তিগ্রন্থ বিতরণ তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। স্বকৃত রামায়ণাদি গ্রন্থের বহুসংখ্যক হস্তলিপি তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করেন। তাঁহার হস্ত-লিখিত রামায়ণ ও বিনয়পত্রিকা (১) প্রভৃতি গ্রন্থ বহুতর দেবালয়ে, মঠে ও ভক্ত-গৃহে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভক্তগণ কর্ত্তৃক বংশপরম্পরাক্রমে ঐ সকল পুঁথি, ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন-তুলসী-নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপচারে পূজিত হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্তেরাও তৎকালে তদীয় গ্রন্থ ও দোঁহাবলীর বহুসংখ্যক হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলেও, ঐ সকল হস্তলিপি দ্বারা তদীয় গ্রন্থাবলীর প্রচার হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ রামায়ণ বিষয়ে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার রামায়ণ রচনাকালে স্বয়ং হনুমান

(১) তুলসীকৃত গ্রন্থাবলীর নাম ও প্রতিপাদ্য সহ তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

আবির্ভূত হইয়া, সময়ে সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। এরূপ প্রবাদ যে,— হনুমান্ স্বয়ং সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়া, তাহা নখ দ্বারা শিলাগাত্রে খোদিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি তুলসীর রামায়ণ দেখিয়া, স্বরচিত রামায়ণকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া তাহা বিনষ্ট করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে, চিত্রকূটে রামায়ণের শ্লোকাঙ্কিত অনেকগুলি শিলাখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল শিলা-লিপিগুলি কালজীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত ও লুপ্তপ্রায় হওয়ায়, তাহার পুনরুদ্ধার হয় নাই। অধুনা তুলসী-রামায়ণের যে সকল হস্তলিপি বিদ্যমান আছে, তাহার কোনও কোনও পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়;—

"কলৌ সর্ব্বজনৈঃ সেব্যং রামব্রহ্মকথাশ্রয়ম্।
ভাষারামায়ণং বেদং চকার তুলসী বিভুঃ॥"

—কলিযুগে প্রভু তুলসীদাস, রামরূপী ব্রহ্মের চরিত্রকথাকে সর্ব্বসাধারণের সেবনীয় করিবার জন্য দেশী ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।

তুলসীর স্বহস্তলিখিত স্বকৃত রামায়ণের কিয়দংশ অদ্যাপি তদীয় জন্মস্থানে রক্ষিত আছে। বান্দাজেলায়, রাজাপুর গ্রাম তুলসীর জন্মস্থান। তদীয় ভদ্রাসন যমুনাকূলে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপে স্থাপিত। তাঁহার সময়ে গঙ্গাও ঐ স্থানে প্রবাহিতা ছিল। কিন্তু কালবশে গঙ্গা সে স্থান হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলন হয়, সেই সেই স্থানকে "অন্তর্ব্বেদি" বলে। অন্তর্ব্বেদি অতি পবিত্র তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্ত প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থকারেরা তুলসীর জন্মস্থানকে "অন্তর্ব্বেদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তুলসীর জন্মস্থানে তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে তুলসীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়; মূর্ত্তিটী অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ জনশ্রুতি যে, ঐ স্থানে কোনও মন্দিরমধ্যে তুলসীর স্বহস্তলিখিত তৎকৃত সমগ্র রামায়ণ রক্ষিত ছিল। কোনও ব্রহ্মচারী ঐ রামায়ণপুঁথি হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। স্থানীয় লোকেরা ঐ সংবাদ পাইয়া পুস্তকাপহারীর অনুসরণ করায়, তিনি পুঁথিখানি যমুনাজলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। লোকেরা নানা উপায়ে জলমধ্যে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া ঐ রামায়ণের এক কাণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ কাণ্ডখানি তত্রত্য জমিদারের গৃহে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। তুলসীর হস্তাক্ষরদর্শনার্থী হইয়া অনেকে ঐ স্থানে গিয়া উহা দর্শন করিয়া থাকেন। তুলসীর হস্তলিপির প্রতিলিপি লইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রতিলিপি লইতে দেওয়া হয় না। দর্শকেরা কেবল উহা দর্শন, পূজা ও নমস্কার করিয়া আসেন।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যিনি এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া নশ্বর ভৌতিক দেহ দিয়া অনশ্বর, অভৌতিক যশোরাশি সঞ্চয় করিয়া যান, তিনিই অমর। কতকাল হইল, তুলসীর সেই ভৌতিক কলেবর পঞ্চভূতে লয় পাইয়াছে, কিন্তু নানা স্থানে তদীয়

অগণ্য পুণ্যচিহ্ন তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। নানা দেশ পর্য্যটনকালে তিনি কত স্থানে যে কত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার বহুতর কীর্ত্তিচিহ্ন কালগর্ভে বিলীন হইলেও, অদ্যাপি যাহা বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারা তদীয় মহিমার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অলৌকিক সাধুগণের আকৃতি তাঁহাদের গুণানুরূপিণী হয়। তাঁহার শান্ত, পাবন, অভয় মূর্ত্তি দেখিয়া, শোকমগ্ন, রুগ্ন, বিপন্ন জনগণ আশায় ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইত। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি"— এ মহাজনবাক্য সত্য। অলৌকিক পুণ্য-প্রভাবে যাঁহারা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, সেই বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই অলৌকিকমূর্ত্তি-সম্পন্ন। যাঁহার শক্তি-প্রভাবে আমেরিকা, ইংলণ্ডের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া, উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াসিংটন গুণানুরূপ মূর্ত্তিসম্পন্ন ছিলেন। কবিবর ড্রাইডেন্ তাঁহার মূর্ত্তি বিষয়ে লিখিয়াছেন ;—

"Mark his majestic fabric! He's a temple
Sacred by birth, and built by hands divine;
His soul's the deity that lodges there; Nor is the pile unworthy of God."

—ওহো! উহাঁর প্রভাবশালিনী মূর্ত্তি লক্ষ্য কর! উনি আজন্মশুদ্ধ একটী দেবমন্দির; ও মন্দিরটী ঈশ্বর স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ও দেহমন্দিরে উহাঁর আত্মা-রূপ দেবতা প্রতিষ্ঠিত।

সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিধি ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই করেন, তাহার কোন দিকে কোনও ত্রুটি রাখেন না।

(ক্রমশঃ)

দাগীচোর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু এইবার সেই চিরপ্রসন্ন সদানন্দময় মুখে কালিমার সঞ্চার দেখিয়া আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল! খোকা যে তাঁহার কত প্রিয়, আগে বুঝি আমিও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। খোকার অসুখের অল্পদিন পরেই প্রাইভেট পড়ান ছাড়িয়া দিয়াছেন, চৌধুরীদের আড্ডাতে আর মাসান্তেও যাইতে পারেন না, কেবল আপিসের সময় দায়গ্রস্তের মত আপিসে যান, আর সারা দিনরাত্রি কেবল খোকাকে নিয়াই থাকেন! খোকার সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে আমিও অনেক সময় ক্লান্তি বোধ করিয়াছি, তাহার কান্না শুনিতে শুনিতে আমিও অনেক সময় ত্যক্ত হইয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ বা বিরক্তি কদাচ দেখিতে পাই নাই। কিসে খোকা একটু ভাল থাকিবে,— কিসে তার মন একটু প্রফুল্ল হইবে কেমন

করিলে সে একটু ঘুমাইবে, অবিরাম কেবল সেই চেষ্টা!

যে ভাল হয়, ভগবান্ বুঝি তার সবই ভাল করেন, নতুবা যাঁর তীব্র শ্লেষবাক্য ও পরিহাসরসিকতাপূর্ণ গল্প শুনিয়া লোকে মোহিত হইত, যাঁর তাস, পাশা, দাবা-খেলায় একান্ত একাগ্রতা দর্শনে লোকে অবাক্ হইত,—যাঁহার মুখে পরের প্রশংসা ভিন্ন পরের নিন্দা কেহ কখনও শুনিতে পায় নাই,—যাঁহার মুখে মৃদু হাস্য ভিন্ন ঘৃণা বিরক্তির চিহ্নমাত্র কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই,—আজকাল তাঁহাকেই এমন সব ফেলিয়া, কেবল ছেলের সেবা শুশ্রূষায় নিরন্তর নিযুক্ত দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইতেছে! তাঁহার শত্রু বোধ হয় জন্মায় নাই,—তাঁহার অনিষ্টকামনা বোধ হয় কাহারও মনে স্থান পায় না। যে একবার তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তাঁহার চিরবন্ধু হইয়াছে। আমরা যদিও দরিদ্র, তবু কেবল তাঁহারই গুণে, ছোট বড় সকলেই আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

—কি লিখিব ছাই, সব কথাতেই কেবল উঁহার কথা আসিয়া পড়ে! তাই খোকার কথাও ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছি না,—আমি যেন তাঁহাতেই ডুবিয়া গিয়াছি,—তাই যে দিকে তাকাই, যে কথা ভাবি, তাহাতেই কেবল উঁহার কথা মনে পড়ে!

এতদিন তিনি রোজগার করা ভিন্ন, খরচ পত্র, দেনা পাওনা, সঞ্চয় কিছুরই ধার ধারিতেন না। আমিও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু পারি আমাদের ক্ষুদ্রসংসারের কাজ এক রকমে নির্ব্বাহ করিতাম, কদাচ তাঁহাকে অকারণ সে সব ঝঞ্ঝাটে ফেলিতাম না, কিন্তু এতদিন পরে, আজ তাঁহার মুখে প্রথম শুনিলাম, "সুরমা! তোমার হাতে কি কিছু আছে? খোকাকে বুঝি বাঁচাইতে পারিলাম না! ভগবান্ কেন এই দরিদ্রের ঘরে এমন অমূল্য রত্ন দিয়া আবার ফিরাইয়া নিতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না!" আমি অভাগিনী, কি লিখিব,—চাহিয়া দেখিলাম সেই চির-হাস্যময় মুখচন্দ্র মলিন,—সেই নীলিমনয়ন বহিয়া জল পড়িতেছে! যাতনায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মনে মনে ভগবান্‌কে বলিলাম, "হে ভগবান্! কি দিলে আবার সেই দিন ফিরিয়া পাওয়া যায়?—আমার পরমায়ু, আমার স্বাস্থ্য, আমার সর্ব্বস্ব লইয়াও যদি খোকাকে রক্ষা করা যায়, তবে হে দীনহীনের দেবতা! তুমি তাই কর,—তুমি তাই কর,—আবার আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে সেই সুখের দিনগুলি ফিরিয়া আসুক!" কিন্তু দেবতা এই অভাগিনীর প্রার্থনা শুনিলেন না,—খোকা দিন দিনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

৩

অবশেষে আমার হাতের বালা ও উঁহার পুরস্কার পাওয়া সোণার মেডেল ও সোণার ঘড়ি, চেইন বন্ধক দিয়া ২০০৲ দুই শত টাকার সংস্থান করিয়া গিরিডি যাওয়া স্থির করিলাম। সংসারে আর আমাদের কেহ

ছিল না, শুধু বুড়ী ঝি হরিমতি এবং গোয়ালে দুইটী দুগ্ধবতী গাভী। গাভী দুইটী এবং সামান্য তৈজস পত্রাদি যাহা ছিল, তাহা চৌধুরীদের বাড়ী রাখিয়া, দুয়ারে তালা দিলাম, এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা গিরিডি যাত্রা করিলাম। হরিমতিও আমাদের সঙ্গে চলিল।

নন্দ বাবুকে আগেই চিঠি লেখা হইয়াছিল, তিনি আমাদের জন্য মধুপুরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন। ভোর হয় হয় সময় আমরা মধুপুরে অবতীর্ণ হইলাম, এবং ষ্টেশনের কলের জলে হাত মুখ ধুইয়া ৭ টার সময় গিরিডির ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে উঠিলাম। ১০ টার আগেই আমরা নন্দবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

নন্দবাবুর স্ত্রী কমলা ও আমি মিস্‌নীদের বোর্ডিং স্কুলে একত্র পড়িতাম—বিবাহের পর আর দুজনে দেখা হয় নাই। তবে চিঠি পত্র লেখা চলিত বটে। অনেক দিনের পর সাক্ষাতে দুজনেই বড় আনন্দিত হইলাম,—কিন্তু খোকার অবস্থা দর্শনে কমলাও যেন একটু দমিয়া গেল।

কমলার ২টী মেয়ে, বড়টীর বয়স ৩ বৎসর, আমাদের খোকার ৪ বৎসরের ছোট, অপর কন্যাটী কোলে। মেয়ে দুটী যেন পরীর মত সুন্দরী। নন্দবাবু নিজে সুপুরুষ, কমলা ত বিদ্যালয়ে তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাতই ছিল, সুতরাং তাঁহাদের কন্যা দুইটী যে সুন্দরী হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নন্দবাবু গিরিডিতে এক দোকান করিয়া বার মাস তথায় বাস করেন, দোকানের আয়েই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। প্রতি বৎসর পূজার সময় একবার তিনি বাড়ী যান, এবার তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের মত তাঁহারও দেশে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নাই, সে জন্য দেশের প্রতি তাঁহার মমতাও কম। আমার স্বামীর তিনি বাল্যবন্ধু, এবং সেই সম্পর্কেই আমরা নন্দবাবুর বাসায় উঠিয়াছি। তাঁহার বাসাটী "বরাকরের" পারে একটী অতি সুন্দর উচ্চ ভূমিতে শালবনের পার্শ্বে অবস্থিত। বরাকরের তলদেশে রজতরেখার ন্যায় সামান্য একটু জল তরতর বেগে বহিয়া যাইতেছে, দুধারে বালুকাময় চড়া। অপর পারে বড় সুন্দর সবুজ ধান্য জন্মিয়াছে, যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল ধান, যেন কে একখানা সবুজ বর্ণের গালিচা দেশময় পাতিয়া রাখিয়াছে! দূরে দূরে কত ছোট বড় পাহাড়। স্থানে স্থানে কয়লার খনিতে কাজ হইতেছে,—চিম্‌নী হইতে ধুম বাহির হইতেছে,—ছোট ছোট ইঞ্জিন গুলি কয়লা টানিয়া লইয়া যাইতেছে,—বাসায় দাঁড়াইয়া এ সব পরিষ্কার দেখা যায়। যদি খোকার অসুখ না থাকিত, তবে বোধ হয় এমন সুন্দর স্থানে আসিয়া আমরা দু জনে কত সুখী হইতাম,—কিন্তু খোকার অসুখে কিছুতেই আমাদের মনে আনন্দ হইতে ছিল না। এক এক সময় আমার আপনা আপনি কান্না আসিত,—সংসার যেন অসার মনে হইত, আবার বহু কষ্টে,

খোকার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া সে অশ্রু রোধ করিতাম।

কমলাদের বাসায় ৪ খানা ঘর, খোলার চাল, ভিত্তি পাকা। তাহারই একখানায় আমাদের স্থান হইল। হরিমতি কোন দিন আমাদের সাঁওতালী ঝি "নীলখিয়া"র সঙ্গে শুইত, আবার খোকার অসুখ বৃদ্ধি পাইলে এক এক দিন আমাদের ঘরেও থাকিত। আমরা কমলাদের সঙ্গে একত্র আহার করিতাম,—দুই বেলাই দু জনে এক সঙ্গে গল্প করিতে করিতে রান্না করিতাম,—আর গৃহান্তরে উনি নন্দবাবুর সঙ্গে দাবা, পাশার শ্রাদ্ধ করিতেন।

প্রত্যহ সকালে হাত মুখ ধুইবার পর, এবং বিকালে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা শালবনে ও "বরাকরের" বালুচরে কিয়ৎকাল হাঁটিয়া বেড়াইতাম। নিকটবর্ত্তী আরও অনেক বাসা হইতে অনেক মেয়ে ছেলে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কৌতুক হাস্যে ও গল্পগুজবে সে সময় টা বড় সুখে অতিবাহিত হইত। তবু খোকার অসুখের জন্য এক একবার আমার মনটা যেন খালি খালি বোধ হইত,—এবং আমি দমিয়া পড়িতাম। খোকাও আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইত, কিন্তু বেশী দূর হাটিতে পারিত না। হরিমতি ও নীলখিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইত।

৪

গিরিডিতে আসিয়া প্রথম কয়দিনে খোকার শরীর যেন একটু ভাল বোধ হইল, সে একটু শক্তি পাইতে লাগিল, জ্বরও কমিয়া গেল। আমি আশার আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলাম। উনিও বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং আবার তাঁহার সেই পূর্ব্ব হাস্য যেন ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল। একদিন দেখিলাম, তিনি একটী কবিতা লিখিয়া নন্দবাবুকে শুনাইতেছেন,—কবিতাটী ছোট হইলেও তিনি যে প্রাণে অনেকটা শান্তি পাইয়াছেন, এবং চিন্তার ভার যে অনেক কমিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গিরিডি।

আঁধারে আলোক ফোটে যাঁর করুণায়,
যাঁর করুণায় বহে যমুনা জাহ্নবী,
পাহাড়ে এ পুষ্পবন তাঁরি মহিমায়,
চরণে প্রণাম তাঁর করে দীন কবি।
প্রকৃতি আপন করে প্রেম-তুলিকায়,
আঁকিয়া রেখেছে এই চারু চিত্রপট,
ভাসিছে শান্তির রাজ্য সৌন্দর্য্যবন্যায়,
লাবণ্যের লীলাভূমি "বরাকর" তট।
গিরিডির গিরিশৃঙ্গে দেববালাগণ,
প্রতিদিন আসে যায়, মাখিয়া চরণে,
সায়াহ্নরবির রক্ত অলক্ত-কিরণ,
ভাসে তাই চারিদিক্ কাঞ্চন বরণে।
এ সৌন্দর্য্য, এ লাবণ্য হেরি কতবার,
আনন্দে ফিরিতে চিত্ত নাহি চায় আর॥

নন্দবাবু ত কবিতাটি শুনিয়া "ওহে তোমার পেটে এত বিদ্যা ছিল, আগে ত তাহা টের পাই নাই, সাক্ষাৎ মা সরস্বতী

যেন তোমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, রবি বাবু, নবীন বাবু, এবার সকলেই গলায় দড়ী দিবেন!” ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শাল্মলী বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া নন্দবাবুর সহজে নিষ্কৃতি হয় নাই। “সঙ্গীতসাহিত্য-রসানভিজ্ঞ বিষাণপুচ্ছশূন্য” জন্তুবিশেষের সহিত নন্দবাবু ত উপমিত হইলেনই, অধিকন্তু কমলাও “অমন জন্তুর সঙ্গে কেমন করিয়া এতকাল একত্র বাস করিতেছে,” তাহার সদুত্তর দিতে বাধ্য হইল, কারণ কমলারও একটু কবিতা লেখা রোগ ছিল।

কিন্তু আমাদের এ আনন্দ বিধাতা দীর্ঘ স্থায়ী হইতে দিলেন না, ১৫।১৬ দিন অতীত হইতে না হইতেই খোকার অসুখ আবার খুব বাড়িয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে যে ঔষধ সঙ্গে আনা হইয়াছিল, তাহাতে কোন উপকারই হইল না। গিরিডিতে ভাল চিকিৎসক কেহ নাই, জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁহারা আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহ কেহ খোকাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু গিরিডিতে টাট্‌কা ঔষধ না পাওয়াতে সে সব ব্যবস্থায়ও কোন ফল হইল না।

৫

মনে আছে, সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের ৫ই তারিখ, শনিবার। বিকাল বেলায় একটুখানি মেঘ হইয়াছে, পাহাড় দেশে প্রায়ই এইরূপ হয়। খোকার জ্বরটা সে দিন হঠাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যার পর হইতেই সে অজ্ঞানবৎ প্রলাপ বকিতে লাগিল। তাহার এমন অবস্থা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই,—আমি যেন দশ-দিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। নন্দ বাবু তাড়াতাড়ি পরেশ বসু ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার বাবু খোকার নাড়ী, বক্ষ, কক্ষ, মাথা, পেট, পিঠ সব পরীক্ষা করিয়া নন্দবাবুর নিকট চুপে চুপে কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। নন্দবাবুও গম্ভীর ভাবে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমার মনে কত যে অমঙ্গল আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ই জানেন!

কিছুকাল পর নন্দবাবু তাঁহার শয়নগৃহ হইতে “উপেন” “উপেন” বলিয়া ডাক দিলে উনিও উঠিয়া সেই ঘরে গেলেন। খোকার কাছে আমি, কমলা, নীলখিয়া এই তিনজনে থাকিলাম। হরিমতি তখন সকলের জন্য রান্না ঘরে রুটী প্রস্তুত করিতেছিল।

রাত্রি ১০টার পর খোকার ঘুম হইল, প্রলাপও থামিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানার একধারে ঘুমাইয়া পড়িলাম, কমলাও তাহার ছোট মেয়েটী লইয়া সেই খানে শুইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কাহারও আহার হইল না। হরিমতি তাহার রুটীগুলি চাপা দিয়া রাখিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল। নন্দবাবুর ঘরে উনি ও পুঁটি (কমলার বড় মেয়ে অরুন্ধতীকে সকলে আদর করিয়া পুঁটি বলিয়া ডাকিত) শুইলেন।

এইভাবে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম। ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু সহসা কি যেন্ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে সকলেই নিদ্রিত, একটা লণ্ঠনে আলো জ্বলিতেছিল। আমি খোকার গায় হাত দিতে গিয়া দেখিলাম, যে তথায় খোকা নাই কমলা নীরবে ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইলাম না; মনে করিলাম যে আমাদের ঘুমের ঘোরে খোকা হয়ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তখন উনি আসিয়া খোকাকে ঐ ঘরে তুলিয়া নিয়াছেন। তথাপি মনটা যেন কেমন করিতে লাগিল, সেজন্য হরিমতিকে বলিলাম, "বাবুকে ডাকিয়া দে।" তিনি দুয়ারের কাছে আসিয়া, "কি খোকা এখন কেমন আছ?" জিজ্ঞাসা করিলে, আমি "ও কেমন রঙ্গ, নিজে আসিয়া কখন খোকাকে নিয়াছ, তবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে খোকা কেমন আছে?" বলিবামাত্র উনি "সে কি কথা?" বলিয়া ব্যস্ত ভাবে একবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি দ্রুত হস্তে কমলের গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া তাহাকে তুলিয়া দিলাম। গোলমাল শুনিয়া নন্দবাবুও দৌড়িয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকলেই আছে, কেবল খোকা নাই! ব্রহ্মাণ্ডও যেন ঘুরিতে লাগিল, আমার পায়ের নীচ হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। আমি পাগলিনীর ন্যায় একবার কমলের গলা জড়াইয়া, একবার উঁহার হাতে, আবার নন্দবাবুর পায় ধরিয়া "ওগো! আমার খোকাকে আনিয়া দেও," বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হরিমতিও ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল! নন্দবাবু তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে খুজিতে লাগিলেন, এবং কিয়ংকাল পরে আসিয়া বলিলেন, "নীলখিয়া কোথায়? তাহাকেও ত দেখিতে পাইতেছি না।"

নীলখিয়ার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে খোকার নিরুদ্দেশের সম্বন্ধ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। খোকার গলায় একছড়া সোণার সরু হার ও কয়েকটী সোণার মাদুলী ছিল। ঘরে সেই হার ও মাদুলী খুলিতে গেলে পাছে খোকা কাঁদিয়া উঠে, সেই ভয়েই যে নীলখিয়া আমার বাছাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি আর মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না। বিশ্বসংসার যেন আমার নিকট ডিমের খোসার মত শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল! হায়! হায়! কেন আমি বাছাকে লইয়া গিরিডি আসিয়াছিলাম, কোথা হইতেইবা কাল নিদ্রা আসিয়া সেদিন আমার চক্ষে ভর করিয়াছিল! আহা! আমার বাছাকে কি আর ডাকিনী এখনও জীবিত রাখিয়াছে। হয়ত শীতের মধ্যে কোন্ শালবনে নীলখিয়া তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, আর আমার অঞ্চলের নিধি তথায়,—না,—আর ভাবিতেও পারি না!

৬

সাত দিন অতীত হইয়াছে, আমার বাছার বা নীলখিয়ার কোন সন্ধানই পওয়া

যায় নাই। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, চতুর্দ্দিকে যত ভদ্রলোক জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আগত হইয়াছেন, তাঁহারাও নানাদিকে বহু দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বাজারে যত সাঁওতাল ফুল বেচিতে, কাঠ বেচিতে, তরকারী বেচিতে বা অপরাপর কারণে যাতায়াত করে, তাহাদের সকলকে নানা প্রকারে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই নীলখিয়া বা খোকার কথা কিছুই জানা স্বীকার করিল না! নীলখিয়ার কোন বাড়ী ঘর আছে কিনা, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে নন্দবাবুর সংসারে বহুদিন যাবৎ চাকরাণীর কাজ করে, সেই খানেই খায়, সেই খানেই থাকে। চাকরী লইবার পর সে কখনও কোথায় যায় নাই। তাহার আর কে আছে, এবং তাহার বাড়ী ঘর কোথায় তাহা নন্দবাবু বা কমলা কখনও ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই, নীলখিয়াও সে কথা কখন বলে নাই।

সাতদিন অতীত হইল, খোকার কোন সন্ধানই মিলিল না। আর কি করিতে গিরিডিতে থাকিব? আর কার জন্য গিরিডিতে থাকিব? গিরিডিতে বাস করা অসহনীয় হইয়া উঠিল, অথচ মনকে প্রবোধও দিতে পারি না! খোকাকে যে আর ইহজন্মে পাইব না, এ কথা কিছুতেই মনকে যেন বুঝাইতে পারি না! মনে হয় যেন, বাছা আমার নিকটেই কোথায় আছে, একদিন হঠাৎ তাহার সঙ্গে দেখা হইবে! আমি যেন চিন্তায় আত্মহারা হইতে লাগিলাম। অবশেষে আমার স্বামীর আগ্রহাতিশয়ে হরিমতিকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। হায়! কি লইয়া আসিয়াছিলাম, কি লইয়া ফিরিয়া যাইব। আমি পাছে আরও বিহ্বল হইয়া পড়ি, এই ভাবিয়া যে কত কষ্টে উনি আত্ম সম্বরণ করিয়া আছেন, তাহা এত কষ্টের মধ্যেও আমার বুঝিতে বাকী থাকিল না। এখানে থাকিলে পাছে উহাঁর কোন গুরুতর অসুক হয় এই ভাবিয়া আমি আর গিরিডিতে থাকা শ্রেয়স্কর মনে করিলাম না। কাঁদিয়া আমার বুকের ভার তবু কতক লাঘব হইয়াছে, কিন্তু উনি যে এই অভাগিনীর ভয়ে কাঁদিতেও পারিতেছেন না। তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম!

৭

অগ্রহায়ণ মাসের ১০ই তারিখ রবিবার; নন্দবাবু আমাদিগকে লইয়া মধুপুর চলিলেন। আমরা বেলা ২½টার সময় বোম্বে মেলে কলিকাতা হইয়া বাড়ী যাইব, এই ইচ্ছা করিয়াছিলাম। স্নানাহার অন্তে ১০টার সময় গিরিডি ত্যাগ করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় মধুপুর উপস্থিত হইলাম এবং ষ্টেশনের নিকট এক শালবনে বসিয়া বোম্বে মেলের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

মেইলগাড়ী আসিবার আর ১৫ মিনিট মাত্র বাকী আছে,—আমরা ওভারব্রিজ দিয়া ডাউন প্লাট ফরমে যাইতেছি, এমন সময় ডাক বাঙ্গালার দিকে আমার দৃষ্টিপাত

হইল। সহসা দেখিলাম, নীলখিন্নার মত কে যেন একটী ছেলে কোলে করিয়া ষ্টেশনের দিকে আসিতেছে! তখন ষ্টেশন ভরা লোক, কেহ আসিতেছে, কেহ কেহ যাইতেছে, কেহ বসিয়া আছে। কিন্তু আমার তখন যেন বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া গেল, আমি দেশ কাল সব বিস্মৃত হইলাম, এবং "ঐ আমার খোকা," বলিয়া চীৎকার করতঃ ওভারব্রিজের উপরেই পড়িয়া গেলাম। তারপর যে কি ঘটিল, তাহা স্মরণ হইতেছে না!

ক্রমশঃ

শ্রীমতী শৰ্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বালবিধবা।

তোমরা কি নহ তবে স্বষ্টি বিধাতার?
চিরদিন এ অতৃপ্তি চির হাহাকার—
তোমাদের ক্ষুদ্র বুকে
চিরদিন মনোসুখে
নির্ম্মম দানব মত করিতে বিহার?
আমাদের কত আছে
তোমরা তাহার পাছে
অন্ধ মত—ফের বার বার।
তোমরা কি নহ তবে স্বষ্ট বিধাতার?

২

চিরদিন অভিশপ্ত
নীরব ব্যাকুল স্তব্ধ
রঙ্গময় বিশ্বকোণে পড়ি শতদিন
একটা রহস্য মত
দিবস যামিনী যত
বৃথা ফুটি উঠ চোখে বৃথা হবে লীন!
প্রতিদিন কত হাসি
নিতি বাজে কত বাঁশি
কত গান ঝঙ্কারিয়া বাজে কত বীণ্
কেবল অনাথা মত
আন মনে অবিরত
চেয়ে থাক মুখপানে নেত্র দীপ্তিহীন!

৩

কত কথা কাণাকাণি
সোহাগের কত বাণী
আমরা বলিয়া যাই—নাহি তার অধিকার
এ সংসারে এত দুঃখ জগদীশ! বিধবার
(জগদীশ)
কি মহা উদ্দেশ্য তব
কিবা কার্য্য অভিনব
হবে নাম সম্পূরণ, পায়ে দলি শতবার
তোমার পবিত্র করে গাঁথা যেই পুষ্পহার!
জীবনের একদিনে
সুখের বসন্ত সনে
না ফুটিতে ফুলকলি—কথা না কহিতে হায়!
ভেঙ্গে গেল এক স্বপ্ন—এক মহাঝটিকায়।

৪

তারপর কতদিনে
চাহি দূরে শূন্য মনে
নিরালা আঁধার বহি কত দৃঢ় সাধনায়
একাকী এ সিন্ধু-পারে
বালুগৃহ স্তরে স্তরে
গড়িয়াছ ভেঙ্গে গেছে সমাজ-তরঙ্গ-ঘায়!
কতদিন! কতযুগ! চলিবে এমনি হায়!

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ।

কৃষিকার্য্য।

ধান্য, গোধূম, যব প্রভৃতি শস্য খাইয়া কোন কোন লোক প্রাণধারণ করে। এই সমুদয় শস্য ঘাসের বীজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতি প্রাচীনকালে এই সকল ঘাস মাঠে ও জলায় আপনা আপনি জন্মিত ও যথাকালে ফুল ও ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যাইত। বন্য অবস্থায় ঘাসে অধিক ফল হয় না। মানুষ দেখিল যে, যদি ভূমি কর্ষণ করিয়া এই সমুদয় উদ্ভিদ্‌কে রোপন করা যায়, ও সাবধানে তাহাদিগকে রক্ষণা-বেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে অধিক শস্য লাভ হইতে পারে। মানুষ তাহাই করিল। এই পরিশ্রমের ফলে পূর্ব্বে যে ভূমিতে একজন লোক প্রতিপালিত হইত। এখন সেই ভূমিতে দশ জন লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। আবশ্যকীয় উদ্ভিদ্‌কে সাবধানে প্রতিপালন করাকে কৃষিকার্য্য বলে।

উদ্ভিদের জীবন আছে। জীব জন্তুর ন্যায় ইহারাও জন্মগ্রহণ করে, পরিবর্দ্ধিত হয় ও অবশেষে মরিয়া যায়। অন্য জীব জন্তুর ন্যায় ইহারাও আহার করে। ভাল আহার পাইলে ইহাদের শরীরও সবল হয়। সবল উদ্ভিদে অধিক ফল হয়। কি ভাবে ভূমি কর্ষণ করিলে, কিরূপ আহার প্রদান করিলে উদ্ভিদ্ হইতে অধিক ফল লাভ হয়, কৃষিকার্য্য করিতে হইলে সে সমুদয় বিষয় বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক।

এই সম্বন্ধে ইংরেজেরা অনেক নূতন জ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাদের দেশে পূর্ব্বে যে ভূমিতে পাচ জন লোকের আহার উৎপন্ন হইত, এখন সেই ভূমিতে দশ জন লোকের আহার উৎপন্ন হইতেছে। ভারতের লোককে এই সমুদয় নূতন জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা অনেকগুলি কৃষিবিদ্যা-লয় স্থাপিত করিয়াছেন। জীবের প্রধান প্রয়োজন আহার। যে মহাত্মাগণ নানা জ্ঞান প্রদান করিয়া ভারতবাসীর আহারের সংস্থান করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিশেষরূপে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

জল না পাইলে উদ্ভিদ্ মরিয়া যায়। নীরস শুষ্ক ভূমিতে উদ্ভিদ্ জন্মে না। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ভূমি জল অভাবে পতিত হইয়াছিল। সেই মরু প্রান্তরে সর্ব্বদাই বালুকারাশি ধুধু করিয়া উড্ডীয়-মান হইত। ইংরেজেরা খাল কাটিয়া সে স্থানে এক্ষণে জল আনয়ন করিয়াছেন, যে স্থানে পূর্ব্বে একটী তৃণও জন্মিত না, এখন সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ মন গোধূম উৎপন্ন হইতেছে। যে স্থানে পূর্ব্বে একজন লোকেরও বাস ছিল না, এখন সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ কৃষকের বাস হইয়াছে।

বিদেশ হইতে নানা প্রকার নূতন বস্তু আনিয়া ইংরেজ আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। গোল আলু পরম উপকারী বস্তু। গোল আলু না হইলে আমাদের

এখন একদিন চলে না। কিন্তু শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে গোল আলু ছিল না। গোল আলু, বাঁধা কপি ও ফুল কপি ইংরেজ এ দেশে আনিয়াছেন।

আমাদের বনে চায়ের গাছ আপনা আপনি জন্মিত। তাহার কেহ চাষ করিত না, তাহা হইতে এ দেশের লোক এক কপর্দ্দকও লাভ করিত না। ইংরেজ এখন সেই চা গাছের চাষ করিয়া কোটি কোটি টাকা বিদেশ হইতে এ দেশে আনয়ন করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ অন্নক্লিষ্ট নরনারীগণ এখন সেই টাকায় প্রতিপালিত হইয়া সুখে দিনপাত করিতেছে। যে সমুদয় নিবিড় বনে কেবল বাঘ ভল্লুকের ভীষণ গর্জ্জন ও হস্তী বরাহের আস্ফালন ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইত না, এখন ইংরেজের প্রভাবে সেই সমুদয় স্থানে জনাকীর্ণ নগর, উপনগর ও গ্রাম সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। আরব দেশ হইতে ইংরেজ কাফি নামক এক প্রকার উদ্ভিদ্ এ দেশে আনয়ন করিয়াছেন। ভারতের উত্তর খণ্ডে যেরূপ চা, দক্ষিণ খণ্ডে সেইরূপ কাফির চাষ করিয়া বহুসংখ্যক লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

এ দেশে নানা স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে। সহস্র সহস্র লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক পরিশ্রম করিয়া ইংরেজেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম জীবাণু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়, এবং এক জাতীয় মশক এই জীবাণুকে এক মনুষ্য-শরীর হইতে অন্য মনুষ্য শরীরে লইয়া যায়। অনেক স্থানে ইংরেজ নানা উপায়ে এই মশককুলকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, ও সেই অবধি সেই স্থান হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্তর্হিত হইয়াছে। সিন্‌কোনা নামক এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল ও তাহা হইতে প্রস্তুত কুইনাইন নামক দ্রব্যের গুণে শরীর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু দূরীভূত হয় ও মানুষ এই রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে। পেরু নামক দেশ এই বৃক্ষের জন্মস্থান। পূর্ব্বে সেই দেশ হইতে এই মহৌষধ এ দেশে আনীত হইত ও এত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত যে, সাধারণ লোকে ইহা ক্রয় করিতে পারিত না। ইংরেজ এখন এ দেশে সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষ করিয়াছেন। তাহা হইতে এখন রাশি রাশি কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই মহৌষধের প্রভাবে এক্ষণে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা হইতেছে।

এইরূপে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ইংরেজের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আমরা চমকিত হই। এই প্রাচীন আর্য্যভূমি পুনরায় সুখ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইবে সেই উদ্দেশেই বোধ হয় জগদীশ্বর ইংরেজকে এ দেশের কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৺ নলিনীবালা জীবনী।

আমার আনন্দ দেহে তমসা ঢালিয়া।
শুভ্র কিরণের ছটা গিয়েছ নিভিয়া।
বধূ বেশে যেই দেশ আলো করেছিলে,
তাতেও তমসা ঢেলে কোথায় লুকালে ?
সর্ব্বদা স্মরিছি তব মহিমা প্রকৃত।
অঙ্কিত এ মর্ম্মতলে ও মধু মূরতি॥
অই নাম মধুরতা সদা কাণে ঢালে।
দগ্ধ হৃদি স্নিগ্ধ হয়, শান্তির সলিলে॥

নলিনী বালার ১০ মাস বয়সের সময়ে আমাদের ১১ নং সাউথ সার্কুলার রোডের গৃহে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার নামকরন কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই আনন্দজনক শুভ কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। কোমল বালিকা দীর্ঘ-কাল ব্যপি উপাসনা সময়ে প্রফুল্লভাবে আচার্য্যদেবের কোলে বসিয়া হাসি বিতরণ করিয়া সমাগত আত্মীয় বন্ধুগণের অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। আচার্য্য দেবও নিজ স্বভাব সিদ্ধ ঋষি তুল্য গম্ভীরতা বিস্মৃত হইয়া যে ভাবে সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ ও রহস্য পূর্ণ সদালাপ করিতে করিতে ভোজনাদি করিয়া গভীর রজনী পর্য্যন্ত আমাদের আলয়ে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় নামকরণ উপলক্ষে, এই নূতন মনোহর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

"আয়রে শিশু!—

আয়রে কোলে জুড়াই জীবন।
দেখে দেখে প্রাণ ভরে ও সুধাংশু বদন॥
মধুর তনুর রুচি, হস্ত পদ কচি কচি,
কচি মুখে কাঁচা হাসি কি সুন্দর দরশন॥
আহা কি মধুর বুলি, আধ আধ কথাগুলি,
নিয়ত এ কর্ণে যেন করে সুধা বরষণ॥
ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি, মাতৃ অঙ্কে শির রাখি
নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে শিশু ঘুমাত যখন।
দুরাশা দুঃস্বপ্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
ভাঙ্গেনা করিতে নিশি, অশ্রুজলে উত্থাপন,
পবিত্রতা দেহ মাখা, এখনো কলঙ্ক রেখা
পড়েনি কোমল অঙ্গে যেন পড়েনা কখন।
বুঝিলাম দগ্ধ প্রাণ, এই জুড়াবার স্থান
দম্পতী-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অভাব তোর, সে গৃহে শ্মশান ঘোর
অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহা--
রতন

নলিনীবালার এই কন্যারত্নের জন্মাবধি তাহাকে নিজের মহান্ উন্নত ও পবিত্র আদর্শে গঠিত করিতে অনুক্ষন সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার জীবনের অসাধারন দুর্লভ শক্তিগুলি প্রিয়তমা কন্যা নলিনী বালার শৈশব জীবনেই এতদূর পরিস্ফুট হইতে-ছিল যে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাদের ধর্ম্ম-বন্ধুগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার কোলাহল ধর্ম্মজীবন গঠন পক্ষে একান্ত প্রতিকূল বোধ হওয়াতে আমরা দমদম

"Fairy Hall" নামে একটী পরম সুন্দর উদ্যানবাটিকা ক্রয় করিয়া তথায় আড়ম্বরবিহীন ধর্ম্মসঙ্গত জীবন যাপন করিতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হই। এই সময় নলিনীবালার বয়স ৪-৬ মাস। সুধাংশু মোহনের বয়স ২ বৎসর ও সরোজ মোহন ১০ মাস বয়স্ক ছিল। আমরা অতীব সৌভাগ্যবলে অতর্কিত ঘটনাবলে এই পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকার অধিকারী হইয়াছিলাম। সিন্ধু দেশের আমীরকে পরাজিত করিয়া ইংরেজরাজ তাঁহার অসংখ্য অনুচরসহ এই "Fairy Hall"এ সুদীর্ঘকাল বন্দীভাবে রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ সিপাহীযুদ্ধে নিহত সার হেনরী লরেন্সও অনেক কাল "Fairy Hall" বাস করিয়াছিলেন। অতীতের এত অলৌকিক কাহিনীপূর্ণ ভবনে বাস করিয়া সন্তানগণ সহ অতীব আনন্দ, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম ভাব পূর্ণ জীবন যাপন পূর্ব্বক আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জানাইতাম। ঐ বাটীতে গমনের ৪।৫ দিন পরই বন্ধু মহাশয় ফৌজদারী মোকদ্দমা উপলক্ষে প্রায় এক বৎসর মেদিনীপুর ও কাঁথিতে বাস করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। আমার একটী কর্ম্মঠ মান্দ্রাজী ভৃত্য ও একজন হিন্দু চাকর মাত্র সম্বল ছিল। ব্রহ্মদৈত্যের বাড়ী বলিয়া কলিকাতার ১৫।১৬ জন ভৃত্যদের কেহই প্রাণের ভয়ে "Fairy Hall" এ যাইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই।

এই ঘোর নির্জ্জনতাপূর্ণ জীবনে প্রিয়তমা নলিনীবালাই আমার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। অল্পদিনের চেষ্টায়ই তাহাকে বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদি অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে শিখাইয়াছিলাম। সে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়া "সখা সাথী" ও সরল বাঙ্গালা বই পাঠ করিতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। কেবল তাহাই নয়, শিশু ভ্রাতা সুধাংশুকে মুখে মুখে অনেক কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিত, সংবাদপত্র ও বইর গল্পাদি তাহাকে এমন সরল ভাষায় বুঝাইত যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। ৪॥ বৎসরের কোমল বালিকা অসীম ধৈর্য্য সহকারে প্রাণের আগ্রহে প্রতিদিন এই কাজ করিতে ভুলিত না। জননীর সে অঞ্চলের নিধি ছিল। ঐ নির্জ্জনতার রাজ্য প্রকৃতির ক্রীড়াকাননে নলিনী জননীর সহিত একত্র স্নানাহার ভ্রমণ ও বৃহৎ বাগানের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিয়া পাখীর মত সুললিত গান করিতে করিতে জীবন কাটাইত। তাহার কোমলতাপূর্ণ শৈশব-প্রকৃতিতে মাতৃভাব, নিঃস্বার্থ ভাবের স্রোত, দীনতা ও বিনম্র ধর্ম্মভাব আপনা হইতে স্বর্গের অতুলনীয় শোভায় তাহাকে ভূষিত করিয়াছিল। তাহার প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ পক্ষে মানুষের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, স্নেহপ্রবণ পিতা তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই। অতি শৈশব কাল হইতেই নলিনী ও সুধাংশুকে গভীর রাত্রিতে শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক মুখে মুখে দুরূহ গণিত শিক্ষা দিতেন। আমার

স্বর্গগত পিতৃদেব ভগবান্ চন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রাতা জগদীশ তাহাদিগকে বলিতেন,—এত রাত্রে পড়িতে যাইও না। চুপ করে শুয়ে থেকো। সত্যপ্রিয়া নলিনী উত্তর দিত,—না! জাগিয়া কি করে উত্তর না দিব?"

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। দাহে শতধৌত ঘৃত বা নিমের পাতার রস ফেনাইয়া গাত্রে মাখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রদাহ নিবারিত হয়। আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবারিত হয়।

২। কফজ্বরে কাস, শ্বাস, হিক্কা এবং প্লীহা যকৃৎ থাকিলে পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। ইহা বালকদের পক্ষে প্রশস্ত।

৩। কণ্টকারী, ব্যাকুড় (বৃহতী) শুঁঠ, ধনে, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেক ।৵২ ছয় আনা দুই রতি, জল ৷৷০ অর্দ্ধসের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পুয়া। ইহা সেবনে সকল প্রকার জ্বর নিবারণ হয়।

৪। জ্বরে অরুচি হইলে সৈন্ধব লবণের সহিত গরম আদার রস, অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত ছোলঙ্গ নেবুর কেশর মুখে ধারণ করিলে রুচি হয়।

৫। অর্শে—রক্ত চিতামূলের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা একটী কলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। শুষ্ক হইলে ঐ কলসীতে দধি পাতিয়া অথবা ঘোল প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়।

৬। রক্তার্শে—পদ্মকেশর, মধু, দধির টাট্‌কা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একসঙ্গে সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারিত হয়। আপাঙের বীজ চালুনীর জলে বাটিয়া পান করিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৭। স্ত্রীলোকের বাম হস্তে এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত রোগ হয় না।

৮। রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরীচচূর্ণ বাসি জলের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসে বসন্ত প্রশমিত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। ভূমিকম্প—গত ১৭ই জানুয়ারি ১০টা ২০ মিনিটের সময় মজঃফরপুরে ভূমিকম্প হয়। ঐ রাত্রেই ১০টা ৩২ মিনিটের সময় মুঙ্গেরে, এবং ১০টা ৩৫ মিনিটের সময় ভাগলপুর ভূমিকম্প হইয়াছিল। ফোরবেশগঞ্জ এবং আরারিয়া

হইতেও ১৭০।৮০টার সময় ভূমিকম্প হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এসিয়া মাইনর প্রদেশেও পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইতেছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রত্যুষে স্মার্ণায় ভূমিকম্পে বহু গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। পোর্টোরিকো সহরেও বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারির সংবাদে জানা যায় ঐ দিন আবার আসিয়া মাইনরের শিবাজ পল্লীতে বিষম ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহাতে ৪৩০ খানি বাটী একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ৪৪২ খানি বাটী আংশিক রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২৩শে জানুয়ারি বিলাতের ভূমিকম্প-জ্ঞাপন যন্ত্রাদিতে প্রকাশ হইয়াছিল যে আড়াই হাজার মাইল দূরে পূর্ব্ব দেশে ঐ দিন কোথাও ভূমিকম্প হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ ভূমিকম্প পারস্য দেশের মুষ্টিশান প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পে ৬০খানি গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি গ্রাম ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। ইটালী মেসিনার ভূমিকম্পের পর ভূমিকম্প স্রোত যেন প্রবাহিত থাকিল।

২। বোম্বাই বিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিষয়িণী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর সার জর্জ্জ ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্‌ভোকেশন' উপলক্ষে বলিয়াছেন,- বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিষয়িণী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাণিজ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী এক জন ইংরেজ অধ্যক্ষ ও দুই জন দেশীয় অধ্যাপকের নিয়োগ আবশ্যক। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে অন্যূন তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কয়েকজন ভারতবাসী লণ্ডনের "স্কুল্ অফ্ ইকনমিকস্" নামক বিদ্যালয়ে বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এই জন্য চারি পাঁচটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা বাণিজ্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিলে, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতর দুই জন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইবেন। আগামী শরতে বাণিজ্য-বিদ্যায় বিশারদ এক জন ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। তিনি কিছু কাল ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থার আলোচনা করিয়া অভিজ্ঞ হইয়া বাণিজ্যশিক্ষার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিবেন। বোম্বাই নগরের একজন বদান্য নাগরিক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য ইতিমধ্যেই দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব এই সম্বন্ধে যে দুই জনের বাঙ্গলা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, চৈতন্য লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দুইখানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডন-ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

বামারচনা।

অভিতপ্ত।

দাঁড়ায়ে মোরা
আজও রয়েছি যে পথে,
কতই যায় কত আসে
দিবানিশি বর্ষশেষে,
রেখেছে সম্বন্ধ তারা সংসারের সাথে।

মুখে মুখে মনে মনে,
ডাকিতেছি সংগোপনে,
বহিয়া অসহ্য ভার দুরবল মাথে।
নীরবে চাহিয়া বিশ্ব,
হেরিতেছে দশা নিঃস্ব,
কহেনা আশার বাণী আসেনা নিকটে।
ভিখারী আমি গো পান্থ,
নিরাশায় মতিভ্রান্ত,
চিরতরে সর্ব্বস্বান্ত পড়েছি বিভ্রাটে।

দাঁড়ায়ে আছি গো পথে,
হয় যদি তব সাথে,
একবার পরিচয় আবার জগতে।
তুলে লব মাথা পেতে,
জীবনের সুপ্রভাতে
আশীর্ব্বাদী পুষ্প সম ভক্তি পূর্ণ চিতে।

পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
অতীতের স্মৃতি দিয়া,
বহিতেছি অভিতপ্ত প্রাণ এ মহীতে।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
বহায় নয়নধার,
খুঁজে খুঁজে পথ নাহি পাই চারি ভিতে।

সর্ব্বজ্ঞ আছেন যিনি,
পথিক-সহায় তিনি,
ভিখারীর ধন তুলি দেন হাতে হাতে।
আজও তাহারি আশে রয়েছে পথে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

মরমের উপহার

প্রকৃতি লো! খুলে দিছি?
মরমের গুপ্ত অভিধান,
মুকুলিতা আশা-লতা
হয়ে গেছে শুষ্ক ম্রিয়মাণ।

নিয়মের কি পরিবর্ত্তন!
কি আবর্ত্তে যেতেছে ছুটিয়া,
মানেনা সে বাধা বিঘ্ন,
কোন্ স্রোতে যায় গো ভাসিয়া।

প্রকৃতি! তোমারি বক্ষে
অতীতের সেই চুমু দান—
অতীতে বিলীন কিন্তু
মরমের নহে অবসান।

রেখেছিনু লুকাইয়া
মরমের গুপ্ত আরাধনা,
পরিণামে সাথী হ'ল
কলঙ্কিত দুঃখ আবর্জনা।

ধর দেবি! সুরঞ্জিত
প্রণয়ের প্রীতি উপহার,
এ আরব্ধ জীবনের
শুদ্ধ মৃদু ঝিল্লীর ঝঙ্কার।

বাজিবে এ ভাঙ্গা বীণ,
আকণ্ঠ পূরিত মৃদু গান,
চরণে সাধিবে তব
প্রণয়ের মান অভিমান।

বাজিবে পঞ্চমে দূর
সুখময়ী বাঁশরীর তান,
মরমের মাঝামাঝি
করি এক নব ব্যবধান।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

ভিক্ষা

বিভু!
সত্যই ভাঙিবে যদি
ক্ষুদ্র এই নারী-হৃদি
যাতনা সহিতে তবে দাও গো শকতি?
ভাঙ এ সংসার-কারা
মুছে ফেল অশ্রুধারা
মরম ভরিয়া দাও বিশ্বাস ভকতি।
পাপের কলঙ্কছায়া
আবরিছে হীন কায়া
নাশো গো এ তমোময়ী অন্ধকাররাশি,
সাধের সে মালা গাঁথা
সুখময়ী প্রেমগাথা
সুদূর অনন্ত মাঝে গিয়াছে গো মিশি।

ভেঙ্গে দাও ক্ষুদ্র হৃদি
ওগো দয়াময় বিধি!
মুছে ফেল কলঙ্কের কালিমা পশরা,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-কূপে
বিরাজিও ধ্রুব রূপে
এ পূজার উপহার প্রেম-অশ্রুধারা।
শুধু এই ভিক্ষা নাথ!
থেকো তুমি সাথ সাথ,
বিপদে সম্পদে যেন নাহি হই হারা,
তব প্রেমামৃত পানে
মরে বেঁচে থাকি প্রাণে
নাশ গো এ মরমের তিমির-পশরা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

২১।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 547. March, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৭ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩১৫। মার্চ, ১৯০৯। | ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিল্পবিদ্যালয়—দিঘাপতিয়ার মহারাজা রাজসাহিতে রেশম বুনান ও রঙ্গনের শিক্ষা দিবার জন্য এক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

ভূতপূর্ব্ব বড়লাটের দান।—ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন আগরার তাজমহলের জন্য মিশরের নির্ম্মিত একটী আলোকাধার উপহার দিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট উক্ত আলোকাধার স্থাপন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

অনাথাশ্রম—মিঃ কে ভেঙ্কাটারাও নামবেলারী প্রদেশস্থ জনৈক উকীল অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য এক আশ্রম নির্ম্মাণার্থ দশ হাজার টাকা মূল্যের জমী ও বাড়ী এবং নগদ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা—বিলাতের গত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায়—২৫টী ভারতবাসী যুবক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিল্পপ্রদর্শনী—যশোহর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে নলডাঙ্গার রাজাবাহাদুর স্বহস্তে নির্ম্মিত একখানি মোটর গাড়ী ও লৌহপিঞ্জর প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজাবাহাদুর স্বহস্তে অনেক জাহাজের কল ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ পারদর্শী।

ধর্ম্মসংঘ—কলিকাতা টাউন হলে আগামী ৯ই, ১০ ও ১১ই এপ্রেল গুড-ফ্রাইডের অবকাশ সময়ে ধর্ম্মসংঘের অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে নানা স্থানের ধর্ম্মনেতাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভূগর্ভে কামান—পূর্ব্ববঙ্গ কামার গাঁ গ্রামে এক কৃষক হলকর্ষণের সময় ভূগর্ভ-মধ্য হতে ৭টী কামান পাইয়াছে। উক্ত

কামানের গায়ে ইসা খাঁর, নাম লিখিত আছে।

খাসিয়া পাহাড়স্থ ব্রাহ্ম মিসন— খাসিয়া পাহাড়ে প্রায় কুড়ি বৎসর হইল পার্ব্বত্য খাসিয়া জাতির কল্যাণার্থ একটী ক্ষুদ্র মিসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় অশেষ ক্লেশ এবং অসুবিধা স্বীকার করিয়া এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টাতে অনেক লোকে ভূতপ্রেতের পূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তিন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় খুলিয়া তাহা হইতে তিনি ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। একজন খাসিয়া যুবক কলিকাতাস্থ ডাক্তার এম্ এম্ বসুর হোমিওপ্যাথিক স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই চিকিৎসালয়ের ভার লইয়াছেন। সে দেশে চিকিৎসার বিশেষ উপকার না থাকাতে এই চিকিৎসালয়ের দ্বারা লোকের অশেষ উপকার হইতেছে এবং ঔষধ লইবার জন্য ১৫।২০ মাইল দূর হইতে লোক, আসিতেছে। কতকগুলি স্ত্রীলোককে সামান্যরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের দ্বারা অপর স্ত্রীলোকদিগের উপকার হইতেছে। বালকবালিকাদিগকেও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহারা মদ গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। নীলমণি বাবুর চেষ্টায় অনেক স্থানে মদ বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। নীলমণি বাবু দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করাতে শিক্ষাবিভাগের অনেক প্রকার সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি এই পাহাড়ে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং বিস্তার সম্বন্ধেও চেষ্টা করিতেছেন। দুর্ভাগ্য লোকের ওলাউঠায় ও অন্যান্য বিপদ ও অত্যাচারের মধ্যে তিনি সর্ব্বদা তাহাদের সহায়তা করিতে যত্ন করিয়াছেন। চারিজন খাসিয়া যুবক তাঁহার সহকারীরূপে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সকল কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন; কিন্তু একটী জাতির উন্নতি সাধনের জন্য আরও কার্য্য করিবার লোক এবং অর্থের প্রয়োজন। চারিদিক হইতে লোক আসিয়া আপন আপন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু তিনি অর্থাভাবে কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারিতেছেন না। খাসিয়ারা ভারতবাসী, আমাদেরই স্বদেশীয়। তাহাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা নীতি এবং ধর্ম্মের বিস্তার হয় এবং অন্যদিকে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই জাতির কল্যাণের জন্য এ মিশন স্থাপন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আশা করি, নীলমণি বাবুর নিঃস্বার্থ কার্য্যে বিস্তার ও উন্নতির

জন্য সকলে অর্থসাহায্য করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট অথবা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্, এর নিকট ১৬নং রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্ কলিকাতায় সাহায্য পাঠাইতে হইবে।

বড়লাটের খাসমজলিসে ভারতীয় সদস্য—আমাদের বড়লাটের অধীনে দুইটী মজলিস অর্থাৎ সভা আছে, একটী খাস, অন্যটী সাধারণ। খাস মজলিসে বড়লাটকে লইয়া ভারতশাসনের সকল গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া থাকেন; এই মন্ত্রণানুসারে সকল শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। প্রস্তাব হইতেছে যে, বড়লাটের এই খাস মজলিসে একজন ভারতবাসী সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে নূতন প্রস্তাব করা হয়; যে, একজনের স্থানে দুইজন ভারতবাসী একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান নিযুক্ত হউন। মুসলমানদের এই প্রস্তাবের উত্তরে লর্ড মর্লি বলেন—বড়লাটের খাস মজলিসে একজন ভারতবাসী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, ইরাজি শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে যোগ্যতা ও পটুতা দেখিয়া একজন ভারতবাসীকে এই পদে নিযুক্ত করা উচিত। বড়লাট লর্ড মিণ্টো একজন শিক্ষিত হিন্দুকেই সদস্যপদে নিযুক্ত করিতে চাহেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

তুলসীদাস শৈশবাবধি সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অসত্য বা অপ্রিয় বাক্য প্রাণান্তেও তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত না। তিনি জন্মমাত্র মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে; নৃসিংহদাস স্বামী নামে এক সাধু তাঁহাকে আনিয়া পালন করিয়াছিলেন। নৃসিংহদাস বলিতেন;—সহস্র নির্যাতনের ভয়েও, এ বালকের মুখ হইতে মিথ্যা বা কপটতা বহির্গত হইবার নহে। সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা এ শিশুর আজন্মসিদ্ধ। নৃসিংহ দাসের অনেকগুলি ছাত্র ছিল। অপকর্ম্ম করিয়া কেহ আত্ম-দোষ গোপনের চেষ্টা করিলে, আচার্য্য, তুলসীর মুখে প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া অপরাধী ছাত্রকে শাসন করিতেন। ইহাতে ছাত্রেরা তুলসীর উপর ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু সেই সরল শিশুর অমায়িক মধুর ব্যবহারে তাহারা এরূপ মুগ্ধ হইত যে, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

সঙ্গীত, বাল্যাবধি তুলসীর বড় প্রিয় পদার্থ। তদীয় কণ্ঠস্বর স্বভাবতই সুমধুর। কালে তাহা উচ্চতায়, গভীরতায় ও বিস্তারে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি অল্প বয়সেই হিন্দিভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত ও শ্লোক রচনা করিতেন। নব যৌবনে তিনি প্রাণাধিকা পত্নীর চিত্ত-

রঞ্জনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি রচনা করিতেন। অনন্তর যখন ভগবৎকৃপায় তিনি জগৎপাবন নব জীবন লাভ করিলেন, তখন সেই সঙ্গীতশক্তি অনন্ত প্রেম-সাগরে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। তদীয় ভজনসঙ্গীতগুলি ভক্তিরসের ও জ্ঞান-বৈরাগ্যের উৎস। রাগ-রাগিণী, তান-লয় প্রভৃতি কোনও অংশেই সে সকলে অণুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। সর্ব্বপ্রকার ছন্দেই তাঁহার যে অসাধারণ, ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা তদীয় রামায়ণ. বিনয়পত্রিকা এবং দোঁহাবলী প্রভৃতি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় (১) স্থানান্তরে তদীয় গ্রন্থাবলীর তালিকা ও প্রতিপাদ্য প্রদত্ত হইবে, এজন্য এ স্থলে তাহা লিখিত হইল না।

রাণী মিরাবাই ও তুলসীদাস, উভয়ে ভক্তি-সঙ্গীতের রচনায় ও গানে সিদ্ধ ছিলেন, উভয়েই সমসাময়িক ও পরস্পরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর নিজ বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্যগণকে লইয়া বৃন্দাবনধামে গিয়া মিরা ও তুলসীর ভজন সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। ভক্তিসঙ্গীতের রচনায় বঙ্গভাষায় যেমন সাধক রামপ্রসাদ, হিন্দিভাষায় তেমনি তুলসীদাস।

ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত সঙ্গীত শাস্ত্রে নাদব্রহ্মের যে অলৌকিক প্রভাব ও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহাতে পার্থিব আবিলতার নাম গন্ধ নাই। তাহা মহাযোগের এক অদ্ভুত সিদ্ধিক্ষেত্র। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ, নারদ, ভরত, বাল্মীকি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ এবং হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ নাদ-ব্রহ্মের প্রবর্ত্তক ও সাধক। নারদসংহিতায় রাগের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে ;—

"শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরমপ্রেমসাগরঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরাদ্রতরোঽভবৎ॥"

—সঙ্গীতরাগ সাক্ষাৎ শিব-শক্তি, পরম-প্রেমসাগর। দেবর্ষি নারদের মুখ হইতে ইহার উৎপত্তি। ভগবান্ নারায়ণ, দেবর্ষির মুখে প্রথমে উহা শ্রবণমাত্রে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। তাহাতেই ত্রিলোকতারিণী দ্রবময়ী সুরধুনীর উৎপত্তি হয়। ফলতঃ সঙ্গীতের শক্তি যে অত্যদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়, তাহাতে সংশয় নাই। ভগবৎপ্রাণ ভক্তের বদনচন্দ্রনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা, শ্রোতৃগণকে ধৃত-পাপ করিয়া, তাহাদের হৃদয়ে যে আনন্দ দান করে, তাহা ব্রহ্মানন্দের সহোদর। আমরা সচরাচর যে সঙ্গীত শ্রবণ করি, তাহা প্রকৃত সঙ্গীত নহে, সঙ্গীতের ব্যভি-চার মাত্র। প্রকৃত সঙ্গীত মহোযোগীর ব্রহ্ম-সমাধির আনন্দময় ফল। সে ফলের স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যোগিগণেরও বাক্য মন হারি মানে। নারদসংহিতার একটী বচন অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে,

---

(১) তুলসীর বিনয়পত্রিকা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উহাতে বহুতর ভজনসঙ্গীত, সুললিত ও সুদীর্ঘ ছন্দে বিরচিত দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক ভজনের রাগ-রাগিণী ও তাল প্রভৃতির নাম উহাতে লিখিত আছে।

প্রাচীন সাধকগণ কাহাকে সঙ্গীত বলিতেন এবং তাহার প্রভাবই বা কিরূপ।

নারদ বলিতেছেন ;—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

—পরম ব্রহ্মের জপ অপেক্ষা ধ্যানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। ধ্যান অপেক্ষা লয়ের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। লয় অপেক্ষা গানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। অতএব, গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই। 'লয়' অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হওয়া; তাহা হইতেও গানের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা আপাততঃ প্রলাপ বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে ইহা ভক্তিতত্ত্বের সার কথা। ভক্ত স্বয়ং আনন্দ হইতে চায় না, সে অহর্নিশ অবিরাম আনন্দ উপভোগ করিতে চায়। এজন্য বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, "আমি চিনি হইতে চাই না, চিনির মাধুর্য্য ভোগ করিতে চাই"। প্রথমতঃ জপকার্য্যে সাধকের নাসা, কণ্ঠ, উর, তালু, জিহ্বা, দন্ত প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে। কিন্তু ধ্যানে তাহা নাই। ধ্যানে শুধু অন্তরিন্দ্রিয় মনেরই যোগ। বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয় মন প্রধান। এজন্য জপ অপেক্ষা ধ্যানের অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তার উৎকর্ষ অধিক। লয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া বা ব্রহ্মের সহিত একত্বভাব, ইহাতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়, ভোক্তা ও ভোজ্য, জীব ও ব্রহ্ম, এ উভয়ে পার্থক্য থাকে না। কিন্তু গানে, গেয় ও গায়কে বা গেয় ও শ্রোতায় পার্থক্য থাকে। একটী সেই নাদরূপী ব্রহ্মানন্দ, অপরটী সেই ব্রহ্মানন্দের ভোক্তা। ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন তুমি জগতে আর যাহা কিছু ভোগ করিবে, ভোগ করিতে করিতে ক্রমেই তোমার ভোগলালসা নিস্তেজ হইবে। ক্রমে তাহা আর রুচিকর হইবে না। মন আবার নূতন চাহিবে, বিরাম চাহিবে, বৈচিত্র্য চাহিবে। কথায় বলে, ক্রমাগত খাইতে খাইতে অমৃতেও বিতৃষ্ণা হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধকের ভগবৎসঙ্গীত যে আনন্দ দান করে, তাহা অনন্তকাল অবিরাম উপভোগ করিলেও, বুভুক্ষার নিবৃত্তি নাই, প্রত্যুত ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে, পলকে পলকে, লহরে লহরে, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রসাস্বাদ দান করিয়া, ভোক্তাকে চিদানন্দসাগরের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে, নিমজ্জিত করে। সে ভূমানন্দের স্তর-পরম্পরার সীমা নাই। তাহা অনন্তকাল অবিচ্ছিন্ন ভোগেও, প্রতিক্ষণে নব নব। এই জন্য শুক, সনাতন, নারদাদি যোগিগণকে এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণকে ভগবান্ মুক্তি দিতে চাহিলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। কেবল বলিয়াছিলেন;—"তোমাতেই আমার ভক্তি অচলা হউক।" ভাগবতে ভগবান্ বলিতেছেন।—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বম-প্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ"॥

—'সালোক্য' (ভগবানের সঙ্গে এক

লোকে বাস,) 'সাষ্টি' (ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ,) 'সামীপ্য' (ভগবৎসমীপে অবস্থান,) 'সারূপ্য' (ভগবৎস্বরূপ লাভ করা) 'একত্ব' (ভগবানে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া,) এই পঞ্চবিধ কল্যাণ আমি স্বহস্তে দান করিলেও, আমার ভক্তজন তাহা গ্রহণ করে না। আমার সেবানন্দ-সম্ভোগ ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। তাহার আর কিছুর প্রয়োজনও নাই। এই জন্য, 'লয়' অপেক্ষা ভক্তিসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা। এ স্থলে যে সঙ্গীতের কথা হইতেছে, তাহা ভক্তিযোগের পরাকাষ্ঠা।

তুলসী ভগবৎসঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। অযোধ্যা, বারাণসী, চিত্রকূট,বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থ সকল এবং ঐ সকলের নদ নদী, ভূধর-কন্দর, বন-উপবন, মঠ-মন্দির, আশ্রম, দ্রুম, শিলা প্রভৃতি একদা তদীয় ভজনসঙ্গীতে দ্রবীভূত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতে অচেতনেও চেতনা পাইত, মৃতও জীবিত হইত,। তুলসীর প্রিয় স্থান কাশীর অসীর ঘাট, যথায় তাঁহার মঠমন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান, যথায় তাঁহার ভৌতিক দেহের অবসান হয়। ঐ স্থানটীতে গমন করিলে, জ্ঞান হয় যেন, তাঁহার জ্বলন্ত দিব্য মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে,যেন অলক্ষ্য হইতে এক অপূর্ব্ব স্বরলহরী আসিয়া প্রাণকে উন্মত্ত করিতেছে। মন, প্রাণ, আত্মা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, ঢলিয়া পড়ে, ক্রমে বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

এই সেই।

(আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

মিত্রবরের সহিত বহুদিন একত্রে বাস করিলাম, উভয়ে উভয়ের মঙ্গল কামনা করিতাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে মত ও প্রকৃতির অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইত। কাহারও অকাল মৃত্যু বা আপদ বিপদ দেখিলে আমার হৃদয় আর্দ্র হইত, এবং তাহাতে ঈশ্বরের অবিচার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতাম, কিন্তু মিত্রবর এবম্বিধ ঘটনা দর্শনে হর্ষিত হইতেন ও মুহুর্মুহু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন। উঁহার এই প্রকার নির্দ্দয়তায় আমি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতাম, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিতাম না। মনের ভাব মনে থাকিয়া যাইত। ভাবিতাম, মিত্রবরের যেরূপ তেজোময় দেবাকৃতি, প্রকৃতি সেরূপ নয়।

একদিন গোদাবরীতীরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর নদীগর্ভে নিপতিত এক বৃহৎ অট্টালিকার ইষ্টকস্তূপের ভগ্নাবশেষের উপরে বসিয়া উভয়ে নানারূপ কথোপকথনে নিযুক্ত আছি,এমন সময় সহসা ক্রন্দনধ্বনি কর্ণগোচর হইল। বায়ু প্রতিকূল থাকায় কখন মৃদু কখন বা একটু উচ্চতর কান্নার শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে, আমি এক মনে

সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিলাম। শুনিলাম, এ রমণীকণ্ঠ; উঠিলাম, বলিলাম মিত্রবর! চল, দেখি,—কাহার কি বিপদ ঘটিল! কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখি -যাহা দেখিলাম, বলিতে কণ্ঠরোধ হয় ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক ষোড়শবর্ষীয়া পরমা-সুন্দরী বাতাহত কদলীতরুবৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া হা নাথ, হা নাথ, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিকটে এক ভীষণ শ্মশান। স্থানে স্থানে নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। নরদেহ ভক্ষণ লালসায় কুকুর ও শৃগাল পালে পালে বিচরণ করিতেছে ও কোলা-হল করিতেছে। নদীগর্ভে প্রোথিত এক-খানি বংশখণ্ডের, উপরে নরমাংস-লোলুপ একটী বায়স শ্মশানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকটী যুবক মাল-কোচা মারিয়া একটী চিতার আয়োজন করিতেছেন। ঐ চিতার পার্শ্বে একটী সুন্দর-কায় বিংশতিবর্ষীয় যুবকের মৃত দেহ শায়িত রহিয়াছে। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,হায় বিধি! এই কি তোমার বিচার! কেনই বা এই রমণীরত্ন সৃষ্টি করিলে, আবার কেনই বা ইহার সর্ব্বস্ব প্রাণেশ্বরকে অকালে কালসদনে পাঠাইয়া রমণীকে চির বৈধব্যযন্ত্রণা ভুঞ্জিতে রাখিলে? যে পথে উহার পতিকে পাঠাইলে, সেই পথে সতীকেও পাঠাও। আমার এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া মিত্রবর বলিলেন, "উহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা অবিধেয়। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বেশ হইয়াছে. চল, আমরা এখান হইতে যাই। উহার এইরূপ উক্তিতে আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম, কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস হইল না।

গোদাবরীর অপর পারে গোপাল বাবু নামে এক ব্যক্তি বাস করেন। গোপাল বাবুর পিতা অতি গরীব ছিলেন। তিনি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ছেলেকে নিজ পালের গরুগুলি চরাইবার ভার দিয়াছিলেন। পুত্র গরু চরাইত বলিয়া তিনি তাহার নাম গোপাল রাখিয়াছিলেন। গোপালের পিতা অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়া-বনত ছিলেন। গোপালও পিতৃগুণে অলঙ্কৃত হইলেন। অহঙ্কার, আত্মগৌরব কাহাকে বলে গোপাল তাহা জানিতেন না।

গোপালের পিতার মৃত্যুর পর গোপাল নিজ বুদ্ধিকৌশলে কৃষিকার্য্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, গোপালের পর্ণকুটীর অট্টালিকায় পরিণত হইল। গোপাল এখন গোপাল বাবু নামে পরিচিত হইতে লাগি-লেন, মিত্রবর বলিলেন,—"আজ গোপাল বাবুর বাটীতে অবিস্থান করিব"। আমরা নদী পার হইলাম। নদী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে গোপাল বাবুর বাটী। নদীর ঘাট হইতেই গোপাল বাবুর বিচিত্র অট্টালিকা আমার নয়নগোচর হইল। অল্পকাল মধ্যেই গোপাল বাবুর বাটীতে পৌছিলাম। বাটীতে দুইটী সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছে শুনিয়া গোপাল বাবু অন্দর বাটী হইতে দ্রুত গমনে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

সায়ংকালে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া আমরা

ঈশ্বরের স্তুতি গান করিতে লাগিলাম। গোপাল বাবু আমাদের নিকট বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা শুনিতে লাগিলেন। গোপাল বাবু মধ্যে মধ্যে অতি বিনীত ভাবে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উহার কোন কোনটীর উত্তর দিলাম, কিন্তু মিত্রবর মৌনাবলম্বনে থাকিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে আমাদিগের আহারাদির জন্য গোপাল বাবু বিশেষ যত্ন করিলেন। আমাদের আহারের জন্য ফল, মূল দুগ্ধাদি আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। বাবুর আদেশে নিমেষমধ্যে স্বর্ণময় বাটী ও থালায় আমাদের জন্য আহারীয় আনীত হইল।

আমাদের আহারাদি শেষ হইলে গোপাল বাবু তাঁহার বিচিত্র হর্ম্ম্যের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সাদরে অভ্যর্থনা করতঃ আমাদিগকে লইয়া গেলেন। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে এক বহুমূল্য খট্টাঙ্গে সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভার্থ আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসীর ব্যাঘ্র চর্ম্মই আসন, ব্যাঘ্র চর্ম্মই শয্যা। গোপাল বাবুর অনুরোধটী রাখিতে পারিলাম না। আমি ভূতলে ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি শয়ন করিলাম, মিত্রবর মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট থাকিলেন। আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

গভীর নিশাভাগে বসুন্ধরা নিস্তব্ধা। শ্রান্তিনাশিনী নিদ্রা ক্রীড়াশীল সহচর স্বপ্নের সহিত জীবমণ্ডলে আবির্ভূতা। স্বপ্নের কুহকে অভাবনীয়, অদ্ভুত, অলীক ঘটনা সত্য স্বরূপ দৃশ্যমান লক্ষিত হয়। বৃক্ষমূলে বসুন্ধরাপৃষ্ঠে নিদ্রিত ক্লান্ত দীন পান্থ স্বপ্নের কুহকে রাজভোগ উপভোগ করে, রাজপ্রাসাদে সুকোমল শয্যায় সুষুপ্ত সসাগরা ধরার অধীশ্বর ক্রীড়াকুশল স্বপ্নের কুহকে পথের ভিখারীরূপে প্রতীয়মান হয়েন; বন্ধ্যা নারী ক্ষণ তরে পুত্রমুখ দর্শনসুখ অনুভব করেন, পুত্রবতী বন্ধ্যাত্ব জনিত মনস্তাপে দগ্ধীভূতা হয়েন; বিধবা রমণী সহর্ষে স্বামিসেবায় রতা এবং স্বামিক্রোড়ে নিদ্রিতা, রমা বীভৎস স্বপ্ন দর্শনে "হা নাথ" শব্দে কান্দিয়া বিহ্বলা!

এই ঘোর নিশায় এক অনুপমা সুন্দরী রমণীর সহিত মিত্রবরকে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। দেখিলাম মিত্রবর রমণীর সহিত অতি সঙ্গোপনে বাক্যালাপ করিতেছেন। বুঝিলাম, রমণী ব্যভিচারিণী। ক্ষণেক পরে, রমণী গোপাল বাবুর গৃহস্থ বহুমূল্য রত্নাদি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল, এবং মিত্রবর রমণীর এবম্বিধ কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ যেন পেঁচার স্বর আমার কর্ণগোচর হইল। অনতিবিলম্বে রমণী গৃহ হইতে বিনির্গতা হইল।

এবম্বিধ কার্য্য দর্শনে ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রভাতে আমি মিত্রবরের সহিত চোর বলিয়া ধরা পড়িব এই ভয়ে আমার ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলাম। মিত্রবর আমার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ইহার পরে মিত্রবরের সহিত লোকালয়ে যাইতে আমার সাহস হইত না। বন জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে, দেশ দেশান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে মধ্য বঙ্গে উপনীত হইলাম। বসন্তকাল আগত। শীতকালে বিটপিশ্রেণী বিমুক্তপত্র হইয়া ম্রিয়মান ছিল, এখন বসন্তের সমাগমে নূতন পল্লবে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন উহারা শীতের শিশিরে স্নাত হইয়া শিক্তবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করতঃ নূতন বেশ ভূষায় বিভূষিত হইতেছে। আস্রাবহ মলয়ানীল আসিয়া উহাদিগকে চামর ব্যজন করিতেছে। সুখের সখা অলিকুল গুণ গুণ প্রেমালাপে তুষিয়া মধুপানে মত্ত হইতেছে। বসন্তের দূত পিকবর কুহু কুহু রবে বসন্তের শুভাগমন ঘোষণা করিতেছে। বসন্তের রাজত্বে সকলেই প্রফুল্ল, সকলেই প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে, কেবল আমি—মিত্রবর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ যে গৃহস্থের ঘরের কোণে শেফালিকা ফুলের গাছ দেখা যাইতেছে, চল, উহার তলায় গিয়া বসি।" মিত্রবর আগে আগে আমি তাঁহার পশ্চাতে শিউলি ফুলের গাছের দিকে চলিলাম। বৃক্ষতলে বাঘা কুকুর শুইয়াছিল। আমাদের ভয়াবহ বেশ দর্শনে বাঘা কুকুর "ঘেউ ঘেউ" করিয়া উঠিল। মিত্রবরকে বাঘার দিকে রাখিয়া আমি তাহার পার্শ্বে থাকিলাম এবং মনে মনে বলিলাম—"খা এই পাষণ্ড দুরাচারকে খা"। আমাদের আকৃতি দেখিয়া বাঘা ভয়ে পলায়ন করিল। আমরা গিয়া বৃক্ষের তলে বসিলাম।

স্থানটী অতি মনোরম। ক্ষুদ্র একটী বনের ধারে ঘর। তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শেফালিকা ফুলের গাছ। গাছটী অগণনীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিভূষিত। এক একবার দক্ষিণানিলের হিল্লোল সদ্য বিকশিত পুষ্পের সৌরভ হরণ করতঃ শ্রান্ত ক্লিষ্ট জনকে দান করিয়া তদ্বিষয়ে সুযশ গ্রহণ করিতেছে। উহার নিকটে একটী জলাশয়। জলাশয়ের এ পার ও পার একটী বাঁশ পাতিয়া দিয়া সুদক্ষ গৃহস্বামী লোকের গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মিত্রবরের কৃত বীভৎস কাণ্ড সকল আমার অন্তরে নিহিত আছে। আমি সদাই ভাবি কি উপায়ে এই নরাধমের সঙ্গত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি!

মিত্রবর ধূম পান করিয়া কলিকাটী আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি কলিকাটী গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উহাতে মুখ বুলাইয়া কলিকা উঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম।

কলিকাটী ঝুলির মধ্যে সংস্থাপন করিয়া মিত্রবর বলিলেন,—'এখন কোন দিকে যাই।' আমি বলিলাম 'ঐ যে নূতন পথ দেখা যাইতেছে, এই সাঁকো দ্বারা জল পার হইয়া ঐ পুকুরধারে যাই'।

উভয়ে গাত্রোত্থান করত পথ ধরিয়া সাঁকোর উপরে উঠিলাম, যখন আমরা সাঁকোর উপরে জলাশয়ের ঠিক্ মধ্যস্থলে পৌঁছিয়াছি, তখন ভাবিলাম,—'এইবার নরাধমকে জলে নিক্ষেপ করি।' আমি

সজোরে উহাকে গলাধাক্কা দিলাম। পদস্খলিত হইয়া মিত্রবর সাঁকো হইতে নিপতিত হইলেন। ওঃ কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য দৃশ্য আমায় চমৎকৃত করিল! যে স্থানে এইমাত্র জলাশয় দেখিয়াছি, তথায় সমতল ক্ষেত্র দেখা দিল। আমার মিত্রবর সন্ন্যাসীর বেশধারী বন্ধু, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জ্যোতির্ম্ময় দেব পুরুষরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন। তাঁহার শিরোপরি জ্যোতির শিখা গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। আমি হতজ্ঞান! জানু পাতিয়া বসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সানুনয়ে জিজ্ঞাসিলাম,—দেব! আপনি কে? আমি অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত আপনাকে চিনিতে পারি নাই।

প্রভো! এ নরাধমের অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করুন। তখন জ্যোতির্ম্ময় দেবপুরুষ ভূতল হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে দাঁড়াইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভীত হইও না। আমি স্বর্গীয় দূত। তুমি শোক তাপে বিহ্বল হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করতঃ ধ্বংস পাইবার পথে অগ্রসর হইতেছ, দেখিয়া করুণাময় ঈশ্বর তোমার রক্ষার্থে আমায় প্রেরণ করেন"। তিনি আরো বলিলেন—

ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগীনঃ॥

এই মহাজনবাক্যে যে ষড়্ দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তোমাতে তিনটী বিদ্যমান।

১। তুমি ঘৃণী* অর্থাৎ দয়ালু, পরের দুঃখে তুমি বিগলিত হইয়া আত্মহারা হও এবং আত্মার অশান্তির সৃষ্টি কর। পরের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইবে এবং মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু তদ্দর্শনে আত্মহারা হইয়া ঈশ্বরদত্ত অমূল্য নিধি আত্মাকে কষ্ট দিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইও না। দয়া অত্যধিক হইলে অর্থাৎ কষ্টদায়ক হইলে উহা দোষমধ্যে গণনীয়।

২। তুমি অসন্তুষ্ট। ঈশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সন্তোষ সর্ব্ব সুখের আকর। সকল অবস্থায় যাঁহার মন প্রফুল্ল থাকে, তিনিই ধন্য। শোকে তাপে মনকে অটল রাখিতে অভ্যাস করিবে।

খনিজ লৌহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া বৃহৎ লৌহখণ্ডোপরি সংস্থাপিত ও মুগুর দ্বারা পিষ্ট হওত অস্ত্ররূপে পরিণত হইলে, অনুর্ব্বরা ভূমির কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া জমীতে সুফল ফলাইতে পারে, তদ্রূপ যে হৃদয় শোক তাপে দগ্ধীভূত ও যমদণ্ডাঘাতে পিষ্ট হইয়াছে, সেই মোহময় সংসারের বাধা বিঘ্ন কাটিয়া অন্তিমে মোক্ষ ফল ফলাইতে পারিবে।

৩। তুমি ক্রোধন অর্থাৎ অল্পেই ক্রুদ্ধ হও। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তোমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং ক্রোধে তুমি দিশেহারা হইয়া যাও। এই তো তুমি ঈশ্বরের

---

* ঘৃণা জুগুপ্সাকৃপয়োঃ (মেদিনী)।
অর্থাৎ ঘৃণা শব্দে কৃপা ও জুগুপ্সা বুঝায়।

কার্য্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন ঘটনা ঘটিলে সাম্য ভাবে চিন্তা দ্বারা ন্যায় অন্যায় বিচার করিবে। ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ কোন গর্হিত কাজ করিয়া বসিলে, পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। ঐ যে, তিনি বলিতে লাগিলেন. গোদাবরী-তীরে এক ষোড়শ-বর্ষীয়া রমণী পতিহারা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল; তুমি তাহার অবস্থা দর্শনে জ্ঞানহারা হইয়া ঈশ্বরের নিন্দাবাদ করিয়াছিলে; আমি তদ্দর্শনে বলিয়াছিলাম, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল. বেশ হইয়াছে." সে পূর্ব্ব জন্মে আপন স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া পরপুরুষে রতা ছিল. এ জীবনে রমণী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফলে আজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবে। জীব নিজ কর্ম্মদোষে দুঃখ ভোগ করে তজ্জন্য কি মঙ্গলময় ঈশ্বর দায়ী.?

দ্বিতীয়তঃ—সেই যে গোপাল বাবুর প্রাসাদে গভীর রজনীতে এক রমণীর সহিত আমাকে বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া তুমি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলে এবং রমণীকে গোপালবাবুর রত্নাদি হরণ করতঃ গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইতে দেখিয়াছিলে। সে স্বপ্নে, সেই রমণী লক্ষ্মী। গরিবের ছেলে গোপাল ধনগৌরবে মত্ত ও আত্মাভিমানী এবং ইন্দ্রিয়দোষ ও পানদোষে কলুষিত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়ায়, উহাকে প্রদত্ত ধন সম্পত্তি হরণ করতঃ উহার অহঙ্কার বিচূর্ণ করিয়া উহাকে পূর্ব্বদশাপন্ন করা হইয়াছে। সেই রাত্রে তুমি পেঁচার ডাক শুনিয়াছিলে। লক্ষ্মী পেঁচাবাহনে গোপালের ভবন হইতে বহির্গতা হইলেন। তুমি দেখিলে, রমণী রত্নাদি লইয়া গোপালের ভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু লোকে দেখিল ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় গোপাল গরিব হইয়া পড়িল। এখন গোপালের সে ধন নাই; এখন গোপাল বিনয়ী ও ঈশ্বরপরায়ণ।

সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর মঙ্গলময়, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে বুঝাইবার জন্য এই সমস্ত তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড় রিপু যাহাতে আত্মাকে অধিকার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। সংসারের কাজ কর, পুত্র কন্যা প্রতিপালন কর; কিন্তু পার্থিব নশ্বর পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া পরম পিতাকে ভুলিও না। এ সংসার তোমাদের প্রবাসস্থান, অন্তিমে পিতার সদনে যাইবার পথ পরিষ্কার রাখিবে। ঐ দেখ তোমার অভীষ্ট দেবতা আকাশপটে আবির্ভূত," বলিয়া দূত অদৃশ্য হইলেন।

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশপটে সৌম্যমূর্ত্তি পরম পুরুষের আকৃতি দর্শনে বিমোহিত হইলাম। সহসা আকাশবাণী হইল, "যাও বৎস! অদূরে তোমার শান্তি প্রবাস দেখিতে পাইবে; কিছুদিন তথায় বাস কর, পরে"—

এই সময়ে প্রস্ফুটিত কামিনীপুষ্পের

মধুপানে রত এক জোড়া ভ্রমর এককালে আমার মস্তকোপরি পতিত হইল। আমার মন সেই দিকে গেল। আমাকে অন্য মনস্ক দেখিয়া চিন্তা সখী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

আমার সম্মুখে একটী চূত বৃক্ষ। তদুপরি একটী কোকিল বসিয়া মধুর রবে দিক্ দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সহসা বামাকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ স্বর আমার কর্ণগোচর হইল। সেই দিকে মনোনিবেশ করিলাম। বামা কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—

কে তুমি কাননে বসি কুহু কুহু রবে,
বিরহিণী বধিবারে গাহিছ গরবে?
চূত তরু মুকুলিত, তব মন হরষিত,
বসন্তের চির সখা দুখ পেলে কবে.
তুমি কি বুঝিতে পার কেন কান্দি ভবে?
বহুদিন হতে পতি গেছে দেশান্তর,
দিবা নিশি তাঁর লাগি ব্যথিত অন্তর।
পিকবর! গাহিও না প্রেমমাখা গান,
জলে যায় পুড়ে যায় বিরহিণী প্রাণ।"

উঠিয়া দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিলাম. আলুলায়িতকেশা, ছিন্নভিন্ন মলিনবেশা এক রমণী কান্দিয়া বন কম্পিত করিতেছে। ইনি কে, ইঁহার খেদোক্তির কারণই বা কি, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। যদি প্রতিকারের কোন উপায় থাকে! বৃক্ষের অন্তরাল হইতে প্রকাশ্য স্থানে আসিলাম! এই কি সেই!—আমি যাহাকে সেই ঘোর অমানিশায় ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, এই কি আমার সেই প্রিয়তমা স্ত্রী! সে আজ এক যুগের কথা। যাই নিকটে গিয়া জানি।

রমণীর সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?" রমণী আমার দিকে নেত্র-পাত করিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলেন। আমি রমণীর শিয়রে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার ধূলায় লুণ্ঠিত মস্তক আমার উরুপরে স্থাপন করিলাম এবং কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাহার চখে মুখে দিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে রমণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—"সন্ন্যাসী! আপনি আমার গুরু। যদি আমার স্বামীর পদতলে এইরূপ মস্তক লুটাইতে পারিতাম তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত।"

আমি বলিলাম. "তবে আমি সেই।" প্রিয়তমা আমার মুখপানে চাহিয়া আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এবার অনেক যত্ন করিলাম, কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া চখে মুখে দিলাম. কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, আর চেষ্টা করা বৃথা। জীবনান্তের সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হইল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে অসাড় হইয়া পড়িল। কমণ্ডলুর জল মুখে দিলাম. কর্ণে হরিনাম শুনাইলাম। আমি বুঝিলাম এই শেষ!

আমার বনে বাসই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আমি কেন আবার প্রিয়তমাকে পাইব, আমি কেন আবার গৃহী হইতে পারিব। যাই ফিরে বনে যাই।

এই বনে প্রিয়তমার দেহ রাখিয়া গেলে, শৃগাল কুকুরে উহা ভক্ষণ করিবে, অতএব ইহার সৎকার করিয়া যাই। বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক পুকুর ধারে একটী চিতা রচনা করিলাম। প্রিয়তমার দেহ পুকুরের জলে ধৌত করতঃ চিতার উপরে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি সংযোগে প্রবৃত্ত হইলাম।

তখন বনমধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—হতাশ হইও না, ক্ষণ তিষ্ঠ, তোমার হৃদয়াকাশে শান্তি সূর্য্য পুনরুদিত হইবে। হরিনামে বা কমণ্ডলুর জলে কোন ফল হইবে না। স্বামী নারীর পরম গুরু তোমার বাম পদ উহার বক্ষে স্থাপন কর। তোমার প্রিয়তমা সংজ্ঞা লাভ করিবেন।"

প্রিয়তমার দেহ চিতা হইতে ভূতলে স্থাপন করতঃ বনদেবতার আদেশ পালন করিলাম। প্রিয়তমা সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঠিয়া আমার গলদেশ ধরিয়া নয়ন জলে আমার পৃষ্ঠ প্লাবিত করিলেন, আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। প্রিয়তমা আমাকে গৃহে লইয়া আমার ব্যাঘ্র চর্ম্ম দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং শুভ্র বস্ত্র পরাইলেন।

বাটীতে এবং পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলে কাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেহ বলে বাবা কেহ বলে মামা ফিরিয়া আসিয়াছেন। জনৈক প্রবীনা বলিলেন, আমাদের পালানে ফিরে এল! কনিষ্ঠা কন্যা বলিল, "কাকা সাবান আন," পড়সী ভ্রাতা সাবান আনিতে বাজারে গিয়া "দাদা ফিরিয়া ঘরে আসিয়াছেন, রাষ্ট্র করিয়া আসিল। সকলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিতে আমায় দেখিতে আসিল।

সাবান আনিত হইল। আমার এক যুগের যত্নে সঞ্চিত বিভূতি ও মাটী অঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত করা হইল। আমি দেখিলাম, এই আমার সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই পুত্র, সেই পরিবার এবং অন্য সকলেও দেখিল, এই সেই—

শ্রী বিপিনচরণ বসু।

দ্বারিকানাথ মিত্র।

দিন যায় দিন আসে, বসন্ত যায় বসন্ত আসে, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশের যে রত্নটি যায় সেটি আর আসে না; সে'টি তো আসেই না, তাহার মতনও আসে না। রাজা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, কেশব চন্দ্র সেন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রমেশ মিত্র, মনমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্যারি চাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী, মোহন লাল, নন্দকুমার, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, (আর কত নাম করিব?) প্রভৃতি যে কত রত্ন গেল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু যে সকল রত্ন গেল তাহার সমতুল্য একটা

রত্নও পাওয়া গেল না। যাহার স্থান শূন্য হয়, তাহার স্থান আর পূর্ণ হয় না। অসাধারণ প্রতিভাশালী, বহু গুণালঙ্কৃত বিচারপতি দ্বারিকানাথ অনেক দিন হইল ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় দ্বারিকা নাথ কেহই হয় নাই। এমন ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান্, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কয়টা জন্মে? পাঠক মহাশয় আসুন, আমারা একবার এই অসাধারণ নরপুঙ্গবের—জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর বাঙ্গালী পুরুষের—জীবনচরিত লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

সুপ্রসিদ্ধ দ্বারিকানাথ মিত্র, হুগলী জেলার অন্তর্গত আগুনসী গ্রামে কুলীন কায়স্থ বংশে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় বর্ষকাল কলিকাতা হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ধনবান্ বলিয়া গণ্য ছিলেন না, কিন্তু নানাবিধ গুণে ও কারণে সমাজে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল। মিত্র মহাশয়ের অভ্যুদয়কালে এনট্রান্স, এফ এ, বি, এ. প্রভৃতি পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। সে কালে জুনিয়ার ও সিনিয়র নামক দুই প্রকার পরীক্ষা ছিল, সিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইত। হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি উভয় পরীক্ষায় যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। সে কালে এই পরীক্ষাদ্বয় ব্যতীত আর একটা কঠিন পরীক্ষা ছিল; কলেজে না পড়িয়া সেই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইত, তাহার নাম লাইব্রেরী একজামীনেশান। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ এই পরীক্ষা দিবার অধিকারী হইত না। পরীক্ষক মহাশয়েরা যে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থ মধ্য হইতে প্রশ্ন করিতে পারিতেন; যতগুলি প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহার ষোল আনার মধ্যে বার আনা রকম উত্তর দিতে পারিলে ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইতেন। দ্বারিকানাথ এই পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং জুনিয়ার, সিনিয়র ও লাইব্রেরি পরীক্ষা ত্রয়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া ঘোষিত হয়েন ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষের ন্যায় বাবু দ্বারিকানাথ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাল গ্রন্থাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন, অথচ তিনি গ্রন্থকীট ছিলেন না অথবা ক্রমাগতঃ অধ্যয়ন জন্য দেহকে রোগপূর্ণ করেন নাই। তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি প্রায় তিন চারিটা বড় বড় লাইব্রেরিস্থ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন কত যে পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সমস্ত প্রকাণ্ড ওয়েবেস্‌টার ডিকশনারী (অভিধান) খানা তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল; দ্বারিকা নাথ নিকটে থাকিলে অভিধান দেখিবার আর কাহারও প্রয়োজন হইত না। জুনিয়ার পরীক্ষায় পাশ হইয়া তিনি ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং বার মাসের মধ্যে সিনিয়ার পরীক্ষায় সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া উত্তীর্ণ হয়েন (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)। এই

কঠিন পরীক্ষায় যতগুলি প্রশ্ন ছিল, তাহার মধ্যে একটা প্রশ্নের নাম এই—Write an essay on, "what man has done man may do." অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং কোন প্রকার পুস্তক সম্মুখে না রাখিয়া দ্বারিকা নাথ এই বিষয়ে এমন এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে তাহা পাঠ করিয়া সমস্ত সাহেব সম্প্রদায় তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী যুবা বলিয়া প্রশংসিত করেন, তখন মিত্র মহাশয়ের কুড়ি বৎসর ৭ মাস মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Educational Report এ এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং হিন্দু কলেজের তদানীন্তন ভুবনবিখ্যাত অধ্যাপক ডি, এল্ রিচার্ডসন সাহেব ইহা পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বিলাতের অক্‌স্ফোর্ড কলেজের ছাত্র এরূপ সুন্দর ইংরাজী ভাষায় এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারে কিনা সন্দেহ।" ঐ প্রবন্ধে প্রথমে দ্বারিকা নাথ কবি লংফেলোর Lives of great man all remind us এবং ওয়ার্ডশয়োয়ার্থ কবির Not fortune's slave is man ইত্যাদি কবিতা motto স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তৎকালের Literary gazette নামক সাহেব-সম্পাদিত ইংরাজি মাসিক পত্রে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন;—"দ্বারিকা নাথ মিত্র, সরস্বতীর বর পুত্র।" হুগলী কলেজের প্রিন্সিপালমহাশয় বলিয়াছিলেন, Dwarkanath is the son of the East. দ্বারিকা নাথের মৃত্যু সমাচার যখন কলিকাতায় পৌছে, তখন হাইকোর্ট, মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে বন্ধ ছিল। বিচারালয় খুলিলে পর, অনারেবল বিচারপতি লুই জ্যাক্‌শন সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ দিলাম। ইহাতে দ্বারিকানাথ সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

বক্তৃতার অনুবাদ।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে আমাদের সহযোগী ভ্রাতা দ্বারিকানাথের মৃত্যুতে আমি আপনাদের সম্মুখে হাইকোর্টের সমস্ত জজের গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভ্রাতা দ্বারিকানাথ মিত্রের অকাল মৃত্যুতে হাইকোর্ট এবং জনসাধারণ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বর্ণনার অতিরিক্ত। তাঁহার পরলোক গমনের কুসংবাদ আমি জজদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে নিতান্ত মর্ম্মবেদনার সহিত ঘোষণা করিয়া তাঁহার পরিবারস্থ জনবর্গের সহিত সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আমি দ্বারিকানাথের বন্ধুতায় বহুবর্ষকাল হইতে মুগ্ধ। তিনি আমার অনেক দিনের বন্ধু এবং এই বিচারালয়ে তিনি ও আমি একত্রে বসিয়া কার্য্য করিতেছিলাম। এমন প্রতিভাশালী, গুণবান্ ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ, বাঙ্গালীর মধ্যে আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যেমন সুগণ্য পণ্ডিত, তেমনি সুদক্ষ উকিল এবং তেমনি প্রসিদ্ধ

বিচারক। কলিকাতার সদর দেওয়াণী আদালতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণ্য হয়েন। এমন প্রতিভাশালী, সুযোগ্য ও প্রতাপশালী উকীল প্রায় দেখা যায় না। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর দ্বারিকা নাথ বাবুকে জজের পদে নির্ব্বাচিত করেন এবং বিলাত হইতে তাহা মঞ্জুর হইয়া আইসে। আমরা সার্দ্ধ ছয় বৎসর কাল মাত্র তাঁহার সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করিয়া জজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই ছয় বর্ষ কাল মধ্যে তিনি যে অসাধারণ যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভারতবাসী বা বাঙ্গালা জাতির গৌরব নহে, পরন্তু সমস্ত সভ্যজাতির সুশিক্ষার সৌরভ বলিয়া চিরদিন গণ্য হইতে থাকিবে। তিনি হাইকোর্টের অলঙ্কার ছিলেন, জজ ও ব্যবহারাজীবিগণের তিনি মূল্যবান্ ভূষণ ছিলেন। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে কেমন মহামূল্য রত্নের উৎপত্তি হইতে পারে, দ্বারিকা নাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওকালতীতেও তিনি অসাধারণ হইতে অসাধারণ ছিলেন। কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মোকর্দ্দমায় তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতা, পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। The great chastity case নামক বিখ্যাত মোকর্দ্দমায় তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ইউরোপেও যথেষ্টরূপে প্রশংসিত হইয়া গিয়াছে. অথচ অল্প বয়সে দ্বারিকানাথ ভবধাম হইতে লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অতুল অধিকার ছিল, অনেক ইংরাজ এত সুন্দররূপে তাহাদের মাতৃভাষাকে কহিতে বা লিখিতে পারে না। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সত্যের ঘোরতর পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনেক প্রকার চাকুরী খালি থাকিত, কোন কারণে এইরূপ বহু খালি পদের প্রার্থিগণের দরখাস্তগুলি গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। দ্বারিকানাথের অনেক কুটুম্ব, বন্ধুসন্তান ও পরিচিত লোক ঐ সকল পদের প্রার্থী হইয়া আবেদক হইত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দ্বারিকানাথ আমার এত বড় বন্ধু হইয়াও কখন কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করিতে আমাকে অনুরোধ করেন নাই। তিনি হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন এবং আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে তিনি বিশেষরূপে ভূষিত ছিলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বিদুরের খুদ।

(মহাভারতের কথা।)

দ্যূতপরাজিত পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস উত্তীর্ণ হইলেন। বিরাটরাজের ভবনে রাজকুমারী উত্তরার সহিত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইল। সেই বিবাহক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডব, সপুত্র দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ ও অন্যান্য রাজগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবেরাই সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, বিরোধ পরিহারের জন্য, পাঁচখানি মাত্র গ্রাম লইয়াই, কৌরবগণের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। তাঁহার তাদৃশ স্বার্থত্যাগে সকলেই বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। যাহাতে জ্ঞাতিবৈরে অসংখ্য লোকসংহার না হয়, যুধিষ্ঠিরের তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কুরুসভায় গিয়া, ঐরূপ সন্ধিপ্রস্তাবের ভার, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধিপ্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, সংবাদ পাইয়া, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনপথ বিবিধ উপচারে সজ্জিত হইল। সুবিস্তীর্ণ মার্গের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, বিচিত্র তোরণাবলী, ধ্বজ পতাকা ও যান বাহনাদি স্থাপিত হইল। পথের স্থানে স্থানে সর্ব্বভোগসম্পন্ন অপূর্ব্ব বিশ্রামশালা নির্ম্মিত হইল। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আমোদ ও উৎসবের ব্যবস্থা হইল। যান, বাহন, বস্ত্রালঙ্কার, মণিমাণিক্য প্রভৃতি প্রলোভনসামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র কোনও উপায়েরই ত্রুটি করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আগতপ্রায় জানিয়া, কৌরবগণ সপরিবারে রাজপুরীর বহির্দ্বারে পূজোপহার লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনমাত্র সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা, যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া, সুসজ্জিত রাজভবনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর অভিবাদন, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি শিষ্টাচার অনুষ্ঠিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন ;—আপনি এ কুরুকুলের পরমাত্মীয়। সম্পর্কে পাণ্ডবেরা ও আমরা আপনার তুল্য আত্মীয়। আপনি যখন পাণ্ডবগণের অন্ন সাদরে ভোজন করেন, তখন আমাদের অন্নও আপনাকে ভোজন করিতে হইবে। প্রত্যাখ্যান

করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য-মুখে কহিলেন ;—সত্য বটে, আমি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়, কিন্তু এ জগতে অন্ন ভোজনের দুইটী মাত্র স্থল আছে। প্রথম—প্রীতিদত্ত অন্ন, এবং দ্বিতীয়—আপদন্ন (১)। অর্থাৎ অন্যের প্রীতিদত্ত অন্ন ভোজন করিবে, এবং যখন অনশনে মৃত্যু উপস্থিত, সে অন্ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই, তখন অন্যের সে অন্ন ভোজন করিবে। ইহার নাম আপদন্ন। হে রাজন্! আমি পাণ্ডবের সখা বলিয়া, আমার প্রতি আপনার আন্তরিক প্রীতি নাই। আর, আমি এক্ষণে এমন কোনও বিপদেও পড়ি নাই, যে, আপনার অন্ন ভোজন না করিলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। কৃষ্ণের অখণ্ড্য যুক্তিযুক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন নীরব হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদির দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। কারণ, তাহারা কৃষ্ণের জন্য আহৃত সমস্ত ভক্ষ্য-পানীয়ে সুতীব্র গরল গোপনে মিশ্রিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত যে, কৃষ্ণ সহায় বলিয়াই পাণ্ডবদিগের এতদূর প্রভাব। কৌশলে কৃষ্ণকে নিপাতিত করিলেই, বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের হস্তগত হইবে। কিন্তু বিশ্বচক্রীর চক্রে যে, দুষ্টের চক্রান্ত চূর্ণ হয়, একথা তাহারা জানিত না।

এইরূপে সেই দীনদয়াল, ভক্তবৎসল কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের প্রদত্ত দুর্লভ রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্র বিদুরের গৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, এবং, তদীয় ভক্তিদত্ত-শাকান্ন ভোজন করিয়া অতুল তৃপ্তি লাভ করিলেন। তদবধি "বিদুরের খুদ" বলিলে ভক্তের অন্ন বুঝায়। ভক্ত ভগবানের এবং ভগবান্ ভক্তেরি। অভিমানে ত্রিদিবের সুধা ঢালিয়া দিলেও, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না।

(১) "সম্প্রীতিভোজ্যান্যন্নানি আপদ্‌ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্! ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্॥"
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯১ অধ্যায়)

প্রমাণ-পঞ্জী।

(প্রাচীন ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

বৌধায়ন সূত্র। আর্য্য হিন্দুগণের পঞ্চনদ প্রদেশে রাজ্য বিস্তার কালের অব্যবহিত পরে গ্রীক পণ্ডিত পিথোগরাসের প্রায় সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের আদিসূত্রকার বৌধায়ন আবির্ভূত হয়েন। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীকে অনেকে বৌধায়নের আবির্ভাব কাল বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

বোধায়ন স্থত্রে তৎকালীন দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য ও বিদ্যামন্দিরাদির বিবরণ ও দাক্ষিণাত্যের বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্টে বোধায়নকে অনেকে আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার বিশিষ্ট সম্ভ্রম থাকা সত্বেও দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য যে প্রদেশবাসী হউন না, তিনি যে একজন আদি স্থত্রকার তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই বোধায়ন স্থত্রের যে স্থলে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ আছে সেই স্থলের সংক্ষিপ্তানুবাদ হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক একটী প্রয়োজনীয় প্রমাণ দর্শাইতেছি,—

বোধায়ন বলিতেছেন,—পাঁচটী বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণে ব্যবহারিক প্রভেদ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণের প্রথার উল্লেখ করিতেছি ;—

(৪) "উত্তরের প্রথা এই যে পশুলোম ব্যবসায়, মদ্যপান, দন্তযুক্ত পশু বিক্রয়, অশ্ব বিক্রয় এবং সমুদ্রগমন আদৌ নিষিদ্ধ নহে।" (বোধায়ন—১ম, ১২,)

এইবার প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অকাট্য প্রমাণসমূহ উপস্থিত করিব। পুণ্যতোয়া সরস্বতী ও দৃষদ্বতী মধ্যবর্ত্তী আর্য্যজাতির শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র যে ব্রহ্মাবর্ত্তে সুখময় আর্য্য-শান্তি-নিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সেই আদিম সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের বিমল পরিমল পূরিত, সুকণ্ঠ বিহঙ্গগণের মধুর কাকলীধ্বনিত, সুমিষ্ট সলিলসিঞ্চিত উর্ব্বর সমতল পরিবৃত, সবুজ গালিচা বিছান শ্যামল শস্যক্ষেত্রের অপরূপ দৃশ্যময় পরম পবিত্র কুটীরমালাপরিবেষ্টিত স্থান, —যেখানে যোগমগ্ন ঋষিকুলকণ্ঠ-নিঃসৃত "সত্যং শিবং সুন্দরম্" রূপ অশ্রুতপূর্ব্ব উদাত্ত ধ্বনি মানবজাতিকে সর্ব্বপ্রথম চমৎকৃত ও উন্মাদিত করিয়াছিল, সেই আর্য্য মহাপুরুষগণের পুণ্যমন্দিরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সূতিকাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য্য উপনিবেশের অব্যবহিত পরেই বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সংহিতাযুগের প্রারম্ভেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার জন্মাহ সূচিত হয়।

সেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তদীয় ব্যবহারকাণ্ডে বলিতেছেন।

"সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম
কুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সম্বিদা
কৃতৌ"। ২৬২ ॥

যে সকল ব্যবসায়ী লাভের জন্য মিলিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রদত্ত অংশানুযায়ী ও লিখিত নিয়মানুসারে লাভালাভের অংশী হইবেন। ২৬২ ॥

"প্রতিসিদ্ধমনাদিষ্টং প্রমাদাদ্ যচ্চ
নাশিতম্।
স তদ্দদ্যাৎ বিপ্লবাৎ চ রক্ষিতাং দশমাংশভাক্।" ২৬৩ ॥

কোম্পানীর অংশীদারগণের কেহ সাধারণের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া অথবা সাধারণের অনুমতি অতিক্রম পূর্ব্বক অথবা

সতর্কতার অভাবে কোন ক্ষতির কার্য্য করিলে, সেই ক্ষতি তিনি স্বয়ং পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। আর যিনি কোম্পানার দ্রব্যাদি কোন বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তিনি অতিরিক্ত দশমাংশের একাংশ অতিরিক্ত লাভ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। ২৬৩॥

"অর্থপ্রক্ষেপণাৎ বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো-
হরেৎ।
ব্যাসিদ্ধং রাজযোগঞ্চ বিক্রীতং রাজগামি-
২৬৪॥

রাজা পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারক বলিয়া বিক্রীত দ্রব্যের লাভাংশ হইতে বিংশতি অংশের একাংশ শুল্কস্বরূপে লইবেন। রাজা কর্তৃক নিষিদ্ধ পণ্য অথবা রাজযোগ্য উত্তম দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনিলে তাহা স্বয়ং রাজা গ্রহণ করিবেন। ২৬৪॥

"মিথ্যা বদন্ পরিমাণং শুল্কস্থানাৎ অপা-
সরন্।
দাপ্যাস্বষ্টগুণং যশ্চ স ব্যাজক্রয়বিক্রয়ী॥"
২৬৫

পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী এবং মাশুল আদায়ের স্থান হইতে পলায়নকারী ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি পণ্য দ্রব্য সমুহ অপরাপরকে প্রতারণাপূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় করে, পণ্য সামগ্রীর মূল্য হইতে তাহার আটগুণ দণ্ড হইবে। ২৬৫॥

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্দাপ্যঃ পণান্
দশ।
ব্রাহ্মণ প্রাতিবেশানাং এতদেবানিমন্ত্রণে।"
২৬৬॥

নৌশুল্ক আদায়কারী স্থলোৎপন্ন পণ্যের শুল্কে হস্তার্পণ করিলে এবং সামর্থ্য সত্ত্বে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণে আহ্বান না করিলে তাহার পক্ষেও উপরোক্ত পরিমাণে দণ্ডের ব্যবস্থা। ২৬৬॥

"দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রবং দায়াদ-
বান্ধবাঃ।
জ্ঞাতযোবা হরেয়ুস্তদাগতোস্তৈর্বিনানৃপঃ।"
২৬৭॥

যৌথ-ব্যবসায়িগণের মধ্যে কোন অংশী দেশান্তরে চলিয়া গেলে, অথবা দেশান্তরে যাইয়া হইলে বা ফৌৎ হইলে, সেই অংশীদারের পুত্রপ্রমুখ দায়াদগন, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন বা জ্ঞাতি বন্ধু সকল, অথবা তদভাবে কৃত্রিম বন্ধু (অর্থাৎ ব্যবসায়ের অংশিগণ) এবং ইহাদের সকলের অভাবে স্বয়ং রাজাই ঐ ব্যক্তির ব্যবসায়ে ন্যস্ত অর্থ সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী হইবেন। ২৬৭॥

"জিহ্মাং ত্যজেয়ুর্নির্লাভং অংশেক্তোহন্যেন
কারয়েৎ।
অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিককর্ষককর্ম্মি-
ণাং।" ২৬৮॥

যৌথ ব্যবসায়ের অংশীগণ বঞ্চক অংশীদারকে, লাভের অংশ ত আদৌ দিবেন না, অপরন্তু তাহাকে ব্যবসায় হইতে বহিস্কৃত করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। কার্য্যভারপ্রাপ্ত অংশীদার স্বয়ং সকল কার্য্যের পরিদর্শনে অক্ষম হইলে অপর কোন যোগ্যতম কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই কোম্পানীর দৃষ্টান্ত

দ্বারা ঋত্বিক কৃষিজীবী ও শিল্পকর্ম্মোপজীবিদিগের নিয়মও উল্লেখ করিলাম। ২৬৮॥

এখন ভারতবাসীর যৌথ ব্যবসায়ের সংবাদ শুনিলে পাশ্চাত্য জাতি ঘৃণার সহিত faliure, faliure চীৎকারে, আত্মম্ভরিতার নিনাদে গগন বিদীর্ণ করে;—নিয়তই তাহার বিনাশের কামনায় নৈরাশ্য ব্যঞ্জক আক্ষেপের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। আবার ভারতবাসীকে প্রভুগণের কায়মনোবাক্যের প্রার্থনাও অভিসম্পাতের শিরে পদাঘাত পূর্ব্বক যোগ্যতার সহিত যৌথ কারবার চালাইতে দেখিয়া গাত্রদাহে সততই তাহার বিঘ্নোৎপাদনে ও সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় উদ্ভাবনে (৫) সতত সচেষ্টও দেখিতে পাওয়া যায়। ধন্য প্রভুগণের অপার লীলা! তোমরাও মস্ত অহম্মুক,—অতি বড় নিরেট মূর্খ,—তাই তাহাদের শ্রীমুখের বচনে, তাহাদের বদনকমলনিঃসৃত গালিমন্দে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হও। তোমার প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষগণ, প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ যাহাদিগকে তোমরা our-fathers fools প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া থাক তাহারাই যৌথ ব্যবসায়ে যে বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে, তাহার অমর্য্যাদায়, শিক্ষার দোষে, গোলামীর লোভে, প্রতীচ্যের পদলেহনে জীবন ও জন্ম সার্থক জ্ঞান কর। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় প্রাচীন ভারতের যৌথ ব্যবসায় বিষয়ক প্রাপ্ত পর্য্যাপ্ত প্রমাণ কি তোমার পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাণিজ্য বিষয়ক ভূয়সী উন্নতি ও বহুল বিস্তৃতির পরিচায়ক নহে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন;—"দ্বিজসেবা শূদ্রের ধর্ম্ম; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বাণিজ্য করিতে পারিবে, অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে ইত্যাদি। (১।১২০) ইহা দ্বারা জানা যায় তৎকালে শূদ্রজাতি মাত্র ব্রাহ্মণগণের সেবাদাস ছিলনা, পরন্তু তাহারা শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য সকল সম্পাদনও করিত।

আরও তোমরা প্রতীচ্য জাতির যৌথ ব্যবসায়ের উপযোগী দৃঢ়তা, অধ্যবসায়শীলতা, বিশ্বস্ততা, কার্য্যকরীবুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি তদ্বিষয়ক বিধিনিয়মাদির সুশৃঙ্খলতার বিবরণ, শ্রবণ ও পাঠ করিয়া বিস্ময়সহকারে তাহার বিশিষ্ট প্রশংসা বাদে রসনা পরিতৃপ্ত কর; কিন্তু তোমারই পূর্ব্বতন আর্য্য পিতৃপিতামহগণের সততা, সত্যপরায়ণতা, পরিশ্রমশীলতা, মিতব্যয়ীতা, যৌথ কারবারের নিয়মপ্রণালী ও

(৫) If private farms conducted their business in this way there would be soon an end o England's commercial supremacy. — D. Graphia — স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে বিলাতের এই দৈনিক প্রভু এই সতর্কতার দৈববাণী করিয়াছিলেন। প্রভুর সেই আতঙ্কাশঙ্কার গণনা এতদিনে সফল হইয়াছে।

সজীব কর্ম্মশীলতার দিকে ভ্রমেও চাহিয়া দেখ না। কি স্থলপথে কি জলপথে সুসভ্য আর্য্যহিন্দুগণের বাণিজ্যশকট ও মনোহর শিল্পপণ্যপূরিত শতপত্রবিশিষ্ট, শতাধিক দাঁড় যুক্ত বিশাল তরী সমূহ উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া দূরবর্ত্তী দেশ দেশান্তরে চালিত হইত। ফিনিসিয়া, মীসর; গ্রীস, তুরস্ক, জর্ম্মাণি, বলিভিয়া, পুরুভিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মার্কিন মুলুকের সর্বত্রই প্রাচীন হিন্দুগণের বাণিজ্যতরী গতায়াত করিত। ক্রমশঃ তাহার বহুল প্রমাণ দর্শাইব। স্বদেশের অতীত যুগের শিল্প বাণিজ্যেতিহাস পাঠ করিলে তোমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের বিষয় উপলব্ধি হইবে। তোমাদের এখন সুমতি হইয়াছে শুনিয়াছি, তাই আমরা এ হেন দুঃসাহসীকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; মান্ধাতার যুগের কীটদষ্ট ছিন্ন ভিন্ন ও জীর্ণ দলিলগুলি দর্শাইতে সাহসী হইয়াছি। তোমরা এখন তামাদী দলিল দস্তাবেজের খোজ লইতেছ;—প্রাচীন ভারতের উপর আপতিত বিভিন্ন বিধর্ম্মীগণের পদাঘাতে বিদলিত, পাশব উৎপীড়নে ও ভীষণ-অত্যাচারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন; বিপ্লব হুতাশনের দিগ্দাহী সমাধানে ভস্মীভূত জাতীয় ইতিবৃত্ত-ভাণ্ডার-জাতীয় অনুশাসন সংহিতার ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ;—দেখিয়া আমরাও সেই স্তূপীকৃত চিতাভস্মরাশির অন্তরালস্থিত তেজোবহ্নির পাংশুমণ্ডিত স্ফুলিঙ্গগুলির কতিপয় সংগ্রহ পূর্ব্বক তোমাদের আগামী উন্নতি ও উত্থানের ক্ষুরধার কর্ত্তব্যমার্গে অগ্রবর্ত্তী হইতে সহায়তা করিব।

গোভিলগৃহ্যসূত্র দশম কাণ্ডের উপনয়ন ব্যবস্থায় বলিয়া দিয়াছেন;—

"ক্ষৌম শাণ কাপাসোর্ণান্যেবাং বসনানি"

যাহাদিগের উপনয়ন দেওয়া হইবে তাহাদিগের পরিধেয় বসন, ক্ষৌম, শাণ, কাপাস * ও উর্ণাজাত হইবে। আর্য্য হিন্দুগণের ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপনের স্বল্পকাল পরেই গোভিল গৃহ্যসূত্র বিরচিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও গোভিল গৃহ্যসূত্র প্রায় সমবয়স্ক। তৎকালীন বস্ত্রশিল্পের ইহা অপেক্ষা বিশিষ্ট পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? উক্ত সূত্র পুনরপি বলিতেছেন,— "রমণীগণ তাঁহাদের শরীরের আবরণ পরিচ্ছদ বা পোষাকের উপর সর্ব্বদা একখণ্ড ওড়না বা বহিরাবরণ ব্যবহার করিবেন।" তৎকালে যে বস্ত্রশিল্প বিষয়ক বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যায়। এক্ষণে বাণিজ্য বিষয়ক আর একটী প্রমাণ গ্রহণ করিব। ঐ সূত্রের একাদশ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে রাজ ধর্ম্ম পালন বিষয়ক উপদেশ পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে;—

"কর্ষক বণিক পশুপাল কুসীদে কারবঃ
স্বে স্বে বর্গে।"

কৃষকগণ, বণিকগণ, পশুপালকগণ, কুসীদ ব্যবসায়িগণ ও শিল্পজীবিগণ, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবে। গোভিল ঋষির প্রমুখাৎ

তৎকালীন শিল্প বাণিজ্যের প্রমাণ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম।

বেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের "মনুর্বৈয়ৎ কিঞ্চিৎ বদৎ তদভেষজং ভেষজতায়াঃ" মন্ত্র মনুকে বৈদিক কালের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া পরিচয় দেয়। পণ্ডিতবর্গের আবার নানা মত। কেহ বলেন উহা প্রক্ষিপ্ত। কেহ কেহ বলেন মনু ঝুড়ি ঝুড়ি ছিল। যত মনুই থাকুন আমরা এইবার সংহিতা-কার মনুকে সাক্ষ্যমঞ্চে উপস্থিত করিব। মনুর সুদীর্ঘ এজাহার আমাদের বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপে গণ্য হইবে। মনুসংহিতার ৮।১।১৫ বিচার বিষয়ক উপদেশ পত্রে লিখিত হইয়াছে ;—

"তেষামাদ্যমৃণাদানং নিঃক্ষেপোহ স্বামি-
বিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্ত স্যানপকর্ম্ম চ ॥ ৪
বেতান সৈবচা দানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামি পালয়োঃ॥
৫"

প্রজাগণের মধ্যে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের মধ্যে পাঁচ জনে সম্মিলিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্যানুষ্ঠান, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনুতাপাদির বিবাদ ভঞ্জন বা বিচার প্রসঙ্গের সৎপরামর্শ দেখিয়া সে সময়ের যৌথ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নিঃসন্দি-হান হইতে হয়।

"কারুকান ৷শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপ-
জীবিনঃ।
একৈক কারয়েৎ কর্ম্মং মাসি মাসি মহী-
পতিঃ॥"

বেদাধিকারী আর্য্য বৈশ্যগণ বিলাস-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যবসায় ও শিল্প-কার্য্য বৈশ্য হইতে ভিন্নতর শঙ্কর জাতিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতে চলিল। আর্য্যগণ তখন আত্মিক জগতে চিত্ত পরি-চালনের অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শিল্প ব্যবসায়ের কার্য্য পরিচালনের ভার শঙ্কর জাতিগণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে মনুর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক বর্ণনায় আর্য্য হিন্দুগণের সাগর পারে যাওয়া নিষিদ্ধ প্রবাদের প্রতিবাদ করিব ;—

সমুদ্র যান কুশলা দেশ কালার্থ দর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সাতত্রাধিগমং
প্রতি॥" ৮।১৫৭॥

যাঁহারা সমুদ্র ও স্থলপথে বিদেশে যাইয়া ব্যবসা করিতে পটু এবং কোন্ দেশে কিরূপ সময়ে যাইলে কি পরিমাণে লাভ হইবে ইহা উত্তমরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাতায়াতের জন্য যানাদির যেরূপ ভাড়া নিরূপণ করিবেন যান স্বামী তাহাই পাইবেন। সমুদ্র পথে বহির্বাণিজ্য বিষয়ক বিবরণে আশ্বস্ত হই-লাম। পরন্তু বিদেশের স্থানে স্থানে গিয়া কোথায় কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার মূল্যের ক্রম নিরূপণ প্রস্তাব প্রতীচ্য জাতির উদ্ভাবিত বলিয়া তোমরা যে ভ্রান্ত ধারণার পোষণ করিয়া আসিতেছ, তাহাকে দূরীভূত করিয়া দাও এবং তাহার প্রাচীনতা বিষয়ে অভ্রান্ত হও। অতি প্রাচীন কালে, মনুর সময়ে, আর্য্যশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতযুগের উপরি কথিত সাধু

প্রসঙ্গগুলি পাঠ করিয়া তৎকালীন ব্যবসায়িগণের উপরই মনুর রাজকর নির্দ্ধারণ বিষয়ক শাসন বাক্য অবধারণ করিবে আইস ;

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম।
যোগ ক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ
করান্॥ অঃ—৭—১২৭।
যথা ফলেন যুজ্যতে রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্।
তথা বেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং
করান্॥" অঃ—৭—১২৮।

বাণিজ্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, পাথেয়, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির ব্যয় ও সে কারণ বণিকগণের আহারাদির ব্যয় এই সকল ব্যয় হিসাব করিয়া (খতাইয়া) নিশ্চিত লাভ বিবেচনাপূর্ব্বক বণিকগণের নিকট কর গ্রহণ করিবেন। রাজা স্বয়ং ও ব্যবসায়ী বণিক উভয়ে যাহাতে স্ব স্ব কর্ম্মের উপযুক্ত ও যথার্থ ফল লাভ করিতে পারেন রাজা সর্ব্বদা সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে কর-স্থাপন করিবেন। আবার বণিকগণের নিকট গৃহীত শুল্কের পরিমাণ ও তাহার সদ্ব্যয়ের সংবাদ গ্রহণপূর্ব্বক মনুর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠারও কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব ;—

"আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ।
বিচার্য্য সর্ব্বপণ্যাণাং কারয়েৎ ক্রয়
বিক্রেয়ৌ॥ ৪০১।
"পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে।
কুর্ব্বীত উচষাং প্রত্যক্ষমর্থ সংস্থাপনং
নৃপঃ॥ ৪০২
"তুলমানং প্রতীয়মানং সর্ব্বঞ্চস্যাং সুলা-
ক্ষতং।
ষটস্বষ্ট সুচ মাসেষু পুনচরব পরীক্ষয়েৎ॥"
৪০৩
অঃ—৮—

দেশের রাজা শিল্পজাত ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী সমুহের আগম ও নির্গমের দূরতা এবং দ্রব্যের প্রয়োজন অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরিমিত শুল্ক গ্রহণ করিবেন। গৃহীতশুল্ক বাণিজ্যের আসার প্রসারের পথে বিঘ্নোৎপাদন করিতে না পারে এবং উহা প্রজাপালনে ব্যয়িত হইবে। তথনকার সুশাসন ও কর সংস্থাপন নীতির শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উপলব্ধি কর। তৎকালিক সমাজের কার্য্য বিভাগ বিষয়ক ব্যবস্থায় মনু বাণিজ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ;

"পশুণাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন নেব চ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি নেব
চ॥" ১ম অধ্যায়—৯০।

পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম,—বৈশ্যদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। মনুর সময়ে বস্ত্রশিল্পের একটু পরিচয় লওয়া যাউক ;—

"কার্ষ্ণ রৌরব বাস্তানি চর্ম্মানি ব্রহ্মচারিণঃ
বাসীরন্নানুপূর্ব্বেন শান ক্ষৌমাবিকানি চ॥
৪১—২য় অধ্যায়।
"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বি প্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৎ।
শণ-সূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাধিক
সৌত্রিকম্॥ ৪৪—২য় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পরিধেয় শণবস্ত্র, উত্তরীয় কৃষ্ণসার চর্ম্ম ; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর পরিধেয় ক্ষৌমবস্ত্র উত্তরীয় রুরু নামক মৃগ চর্ম্ম। ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রে, এবং বৈশ্যের মেষ সূত্রে নির্ম্মিত হইবে। মনুর সময়ে শিল্প চর্চ্চাও যে মন্দ ছিল না তাহাও তাঁহার বচনে অপ্রতুল নাই ;—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
১৫৭ - ২য় অধ্যায়।

"গোহশ্বোষ্ট্র-যান প্রাসাদ-স্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলা ফলক নৌষু চ॥
২০৪—২য় অধ্যায়।

"স্ত্রীয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥
২৪১—২য় অধ্যায়।

"শিল্পেন ব্যবহারেন শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপ-সেবয়া॥" ৬৪—৩য় অধ্যায়।

বেদবিহীন ব্রাহ্মণ কাষ্ঠময়হস্তী অথবা চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ তুল্য। মনুর এই অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য বিষয়ে আলোচনা করিলে তৎকালিক শিল্প বিষয়ক একটু পরিচয় পাওয়া যায়। শিষ্য গোযানে, অশ্বযানে বা উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের ন্যায় উচ্চ প্রদেশে, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাঙ্গনে, তৃণ নির্ম্মিত বৃহদাসনে, শিলাতলে, কাষ্ঠময় আসনে অথবা নৌকায় গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারেন। স্ত্রী রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্প কার্য্য—সকলের নিকট লভ্য বা শিক্ষণীয়। বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ, কেবল শূদ্রার গর্ভে সন্তানোৎপাদন, গো, অশ্ব, যান প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়, কৃষি, রাজসেবা এই সকল দ্বারা কুল হীন হইয়া যায়। মনুর সময়ে বানিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যদান নিষিদ্ধ ছিল ;—

'বিপনেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্য কব্যয়োঃ। ১৫২—৩য় অধ্যায়।
যৎ তু বণিজকে দত্তং নেহনা মুত্র তদ্ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজো॥" ১৮১—৩য় অধ্যায়।

বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য দিবেন। বণিকবৃত্তি পরায়ণ বা পৌনর্ভব দ্বিজকে যে হব্যকব্য প্রদত্ত হয় তাহা ভস্মে আহুতি নিক্ষেপ সদৃশ ; তদ্দারা ইহ পরলোকের কোন কার্য্য হয় না।

মনুর সময়ে জলপথে ও স্থলপথে বহির্বানিজ্যকারিগণকে উত্তমর্ণগণ অর্থ কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করিত। সুদের নির্দ্ধারিত নিয়ম সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বিশেষ ভাবের আলোচনা ও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুদের নিয়ম নির্দ্ধারকগণ সমুদ্র পথে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন জনিত ভূয়োদর্শনের অধিকারী ছিলেন। তৎসাময়িক সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য ব্যবসায় বিষয়ক প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে জনৈক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ;—

"As the word used in the original for sea is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established that the Hindus navigated the ocean as early as the age of code.

Elphinstone's History of India.

মনু যে বহির্বাণিজ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার অনুকূলে উপরোক্ত প্রতীচ্য পণ্ডিতের ঐতিহাসিক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। এক্ষণে মনুর এজাহারের এখনও অনেক বাকী আছে, এইবার শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামি পালয়োঃ। ৮।৫ ॥

কোন দ্রব্য বিক্রয়ান্তে বিক্রেতা পরিতাপ করিলে এবং দ্রব্যটী মূল্যবান অথবা প্রিয় বলিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ব্ব মূল্যে ফেরত লইতে ইচ্ছা করিলে এবং তাহাতে যদি অকৃতকার্য্যতার জন্য অনুতাপ করে, তবে এই বিবাদকে "ক্রয় বিক্রয়ানুশাসন বলে। তৎকালীন বাণিজ্যের নিদর্শন আরও বহুল আছে।—

"সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মানি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা ॥"
অঃ—৮—২১১।

"বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্। ৪১০—৮ম অধ্যায়

যাহারা সম্ভূয় সমুত্থান অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া একত্র ব্যবসায়াদি কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের পরস্পরের অংশও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরূপণ করিবে। রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি ও পশু রক্ষণ কার্য্যে এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করাইবেন। অতি প্রাচীনকালে ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকাশে বেদত্রয়ের শিক্ষনীয় বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ হইতে কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালনাদি সাধারণ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসা হেতু কৃষক, বণিক ও পশুরক্ষকদিগের মত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় রাজকার্য্য মধ্যে গণ্য ছিল। মনু বলিতেছেন ;—

"কুল শীল বয়োবৃত্ত বিত্তবাদ্ভিরধিষ্ঠিতং।
বণিগ্‌ভিঃস্যাৎ কতিপয়ৈ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং ॥"

ব্যবহার তত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

রাজসভায় বিচার বিভাগের কার্য্যকালে কুল-শীল সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ লোক, বৃত্ত তত্ত্বজ্ঞ ত্রয় ও বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক্ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। প্রাচীনকালে রাজকর আদায়ের পদ্ধতি নিরীক্ষণ করিলে তৎকালীন শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক বহুল পরিচয়ও সুলভ ;—

"আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূল ফলস্য চ ॥
অঃ—৭—১৩১।

পত্র শাক তৃণাণাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ ॥
ঐ—১৩২।

শুল্ক স্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যবর্থং যথা পণ্যং ততো বিংশং নৃপোহরেৎ

অঃ—৮—৩৯৮

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥"

অ—৭—১৩০

ক্ষেত্রের সহিত সংস্রবশূন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বনভূমি হইতে সংগৃহীত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্ব্বপ্রকার গন্ধ দ্রব্য, ঔষধি বৃক্ষাদির রস, পত্র, শাক, ফল, মূল, ফুল ও তৃণ, রেণুনির্ম্মিত পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র এবং সর্ব্ব প্রকার প্রস্তরময় দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, তাহাদিগকে রাজকর দিতে হইত। রাজা ইহাদিগের ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি হইতে উৎপন্ন লাভাংশের এক ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিবেন।

বাণিজ্য কার্য্যে দক্ষ, সকল প্রকার দ্রব্যের অর্থ সংস্থাপনে সক্ষম, শুল্ক (duty) গ্রহণের সময়ে প্রথমে তাহার দ্বারা পণ্য সামগ্রীর মূল্য স্থির হইত এবং সঙ্গত অনুমান দ্বারা ঐ সকল পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ মুনফা (লাভ) নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহার বিংশতি অংশের একাংশ রাজকর বা শুল্ক স্বরূপ আদায় করা নিয়ম। বিশেষ মহার্ঘ্য অর্থাৎ দুর্মূল্য দ্রব্যেও কখন উহা অপেক্ষা অধিক শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি ছিল না।

পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু ব্যবসায়ের লাভে আত্ম পরিবারের ভরণ পোষণপূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহকারিগণের নিকট লাভের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ স্বরূপ গ্রহিতব্য।

কাংস্যকর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, লিপিকার শঙ্খকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কারুক, তৈলিক, মদক ও তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণের শারীরিক শ্রমার্জ্জিত প্রাপ্য হইতে কিছু গ্রহণ করা হইত না,—তবে রাজা তাহাদিগকে প্রত্যেক মাসে একদিন বিনা পারিশ্রমিকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ বেগার ধরিবেন। উহাদের পারিশ্রমিকই রাজস্ব স্বরূপ গ্রহিতব্য।

আর্য্যজাতির মধ্যে বৈশ্যগণই উত্তমর্ণরূপে ঋণ দান ও কুসীদ গ্রহণ করিত। প্রাচীনকালের কুসীদ গ্রহণ প্রথা ও তৎকালীক বাণিজ্য বিষয়ক প্রমাণের পোষকতা করিতেছে ;—

"বশিষ্ঠো বিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজোদ্বিত্ত বিবর্দ্ধিনীং।
অশীতি ভাগং গৃহ্নীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকং শতে। ১৪০॥
"দ্বিকং শতং বা গৃহ্নীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরণ্।
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নানো না ভবত্যর্থ কিল্বিষী" ১৪১॥

ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ ও সুদের উল্লেখ না থাকিলে ধনস্বামী লভ্যাংশের অশীতিভাগ ও শ্রমকারী লভ্যাংশের বিংশতি ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। যাহারা ব্যবসায়ের সুদ গ্রহণ করে তাহারা ধর্ম্মানুসারে শতকরা দুই অংশ সুদ স্বরূপ

গ্রহণ করিতে পারে। তৎকালীন ব্যবহারিক বস্তুর ক্রয় বিক্রয় ও দেশ দেশান্তর হইতে আনীত ও নীত দ্রব্যাদির ব্যবসায় প্রভৃতি বিনিময়াদি বিষয়ে স্বর্ণ ও নিষ্ক মুদ্রা দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। মনুর পঞ্জিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়;—

সর্ষপাঃ ষট্ যবো মধ্যস্ত্রিয় বস্ত্বেক কৃষ্ণলং।
পঞ্চ কৃষ্ণলকো মাসস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥
অঃ—৮—১৩৪॥

চতুঃ সৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু
প্রমাণতঃ"॥ অ—৮—১৩৭॥

৬ সর্ষপে এক যবো মধ্য। ৩ যবো মধ্যে এক কৃষ্ণল। ৫ কৃষ্ণলে এক মাষা। ১৬ মাষায় এক সুবর্ণ। ৪ সুবর্ণে এক নিষ্ক। এ কালের মোহর গিনি, টাকা, পয়সা সে কালের নিষ্কের কার্য্য করিতেছে। (৬)।

(৬) বৈদিক যুগে নিষ্কের পরিবর্ত্তে হিরণ্য পিণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। "দশো—হিরণ্য—পিণ্ডম্ দিবোদাসাদ অসা নিষম্।" ঋগ্বেদ ঐ ৪৭।২৩।—এই হিরণ্য পিণ্ড বিনিময়ে কঙ্কান ও বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত। পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য য়ুরোপের (বাইবেলোক্ত) প্রাচীন সে কালের সহিত ঋগ্বেদের হিরণ্য পিণ্ডের সাদৃশ্যারোপ করেন। এই সাদৃশ্যারোপ নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে। এই সুবর্ণ ও নিষ্ক সম্বন্ধে বাল্মিকীর প্রমুখাৎ বিশেষ পরিচয় লইব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যানিধি।—

কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত।

অধুনা দেশে যে অভিনব স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, উহাতে নিপতিত কতিপয় ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর ফিরিবেন না; অবশিষ্টগুলির ফিরিবার আশা আছে। ইঁহাদের কথা পুরাতন হইয়াও পুরাতন হয় না। যে পুত্রবৎসলা জননীর প্রিয় সন্তান চিরতরে ক্রোড় শূন্য করিয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষের জল জীবন থাকিতে শুকাইবে না; সুতরাং এ কাহিনী তাঁহার নিকট পুরাতন হইবার নহে; যে পতিপরায়ণা রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাঁহার নিকটেও ইহা একই রকম নূতন।

অপর পৃষ্ঠার ছবিটী সঞ্জীবনীর সম্পাদক নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহাশয়ের প্রতিকৃতি। ইনি ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া আগ্রা জেলে অবস্থিতি করিতেছেন। জেলে অবস্থান কালে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের কষ্টে দিন অতিবাহিত হয়; কিন্তু মিত্র মহাশয় কয়েদীরূপে ব্যবহৃত হইতেছেন না। ভারতগভর্ণমেণ্টের আদেশে ইঁহার প্রতি যত্নের ত্রুটী হইতেছে না। ধার্ম্মিক প্রবর সুধা-

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র,
সম্পাদক
"সঞ্জীবনী"।
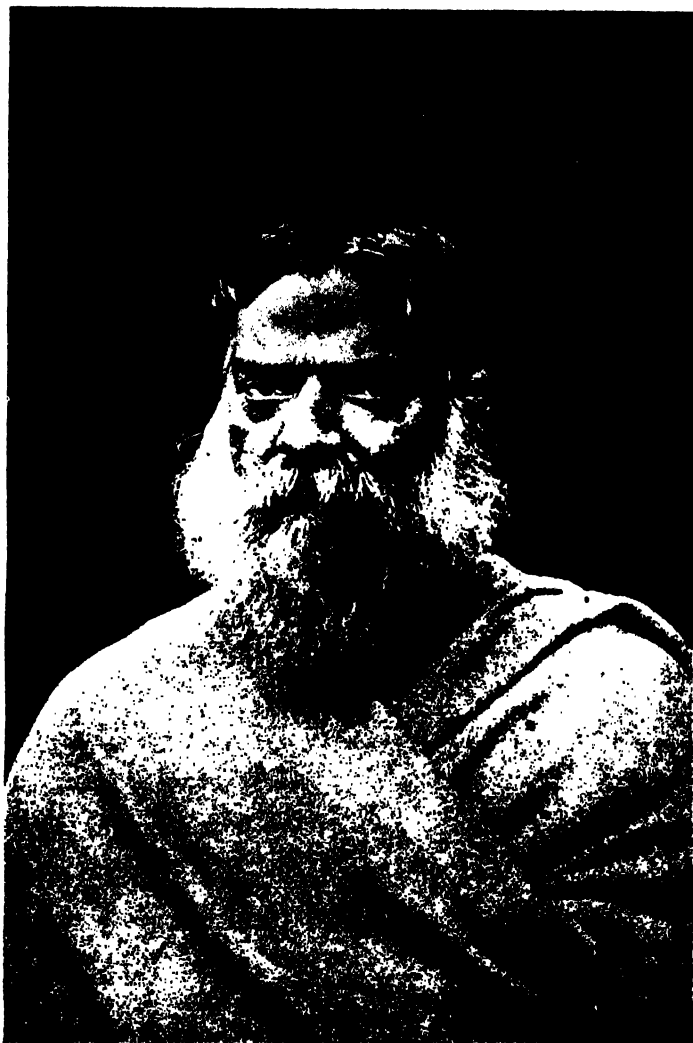
বর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় কারাগারেও ধর্ম্মালোচনায় এবং গ্রন্থাদি পাঠে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন। লোক সমাজে প্রকাশ যে, ভারতগভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণ বাবুকে মুক্তি দিবেন। কৃষ্ণ বাবুর সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের সুবিচার প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহারা ত্বরায় কৃষ্ণ বাবুকে পুনঃ দেখিতে পাইবেন, এই আশায় হৃদয় বান্ধিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ বাবু মুক্ত হইলে সকলের আনন্দের সামা থাকিবে না। শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

নূতন সংবাদ।

কংগ্রেস—আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন লাহোরে হইবে। ইহার উদ্যোগ এখন হইতেই চলিতেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্প প্রদর্শনীও হইবে।

২। শিল্প সমিতি—গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা নর্থব্রুক হলে পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে শিল্প সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে এন গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্ব বঙ্গের শিল্পাদির অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বে এক রিপোর্ট দিয়াছেন।

৩। ডাক্তারীপরীক্ষা—বাঁকীপুর নিবাসী শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন দাস নামীয় জনৈক ছাত্র কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে রোটাণ্ড কলেজের ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকের এই উচ্চ সম্মান প্রশংসনীয়।

৪। ডিসেণ্ট্রালাইজেসন কমিসন—কিছুদিন পূর্ব্বে শাসনবিভাগের ও সিবিলিয়ানদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়া ছিল সম্প্রতি বিলাতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে। এই বিবরণ অনুসারে শাসন বিভাগের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা।

৫। কলিকাতার স্বাস্থ্য কলিকাতা সহরে ভীষণ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, বহুলোক এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং মৃত্যুসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরবাসী এই জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন।

৬। শিলাবৃষ্টি—গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার দিল্লী নগরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রায় দুই ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ শিলা জমিয়া ছিল এবং শিলার ওজন প্রায় এক পোয়া পর্য্যন্তছিল। শিলাঘাতে সহরে অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

৭। শাস্তি—বারাণসী ধামে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তির অবমাননা করার জন্য যে বাঙ্গালী বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

৮। বেতন বৃদ্ধি— ভারতগভর্ণমেণ্ট

সরকারী আফিস সমূহের কেরাণীদিগের বেতন-বৃদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য একটী তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই তদন্তের ফলে সম্ভবতঃ সুফলের আশা করা যায়।

৯। ভারতবাসীরদুরদৃষ্ট—ভারতগভর্ণমেণ্ট হইতে এক ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইয়াছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ভারতবাসী মিসর দেশে যাইয়া আর চাকরী পাইবেন না এবং মিসরে যাইয়া কোন ভারতবাসী কষ্টে পড়িলে কেহ তাহার প্রতিকার করিবেন না।

১০। গো রক্ষণী সভা—দুগ্ধবতী গাভী এবং কৃষি উপযোগী বলদের সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য আগামী বর্ষা কালে লক্ষৌ সহরে মিঃ ডনক্যাম্‌বেলী সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইবে এবং উত্তরপশ্চিমের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর গোঁ রক্ষা সম্বন্ধে আপন অভিজ্ঞতার বিষয় বক্তৃতা করিবেন।

১১। স্বেচ্ছাসেবক—গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময় হইতে স্বেচ্ছাসেবক দল যাত্রিদিগের নানারূপ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এবার তারকেশ্বরের মোহন্ত মহোদয় যাহাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা শিবরাত্রির সময় তারকেশ্বরে যাইতে না পারে এই মর্ম্মে ম্যাজিষ্ট্রেটর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সে দরখাস্ত না মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবকেরদলের কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মোহন্ত মহোদয়ও তাঁহাদের কার্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আগামী চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

১২। শিশু প্রদর্শনী—রেঙ্গুনে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী একটী শিশু প্রদর্শনী হইয়াছিল; তাহাতে একটী সাত মাসের মগ শিশু প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। এই শিশু ওজনে বার সের।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বসন্ত রোগ নিবারক যোগ। কণ্টকারীর গাঁট ১৲ পাঁচ সিকা, কাঁচা হলুদ ॥৹ আট আনা, গোল মরীচ।৹ আনা এক সঙ্গে ⁄॥৹ অর্দ্ধ সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ⁄৴ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ৫১৹ কাঁচ্চা পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে ১ বার সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না ইহাতে ৪ জনের হইবে।

২। কণ্টকারী শিকড়ের ছাল।৹ আনা গোলমরিচ ২১টী, একসঙ্গে জল দিয়া বাটিয়া সকালে ১ বার মাত্র সেবন করিলে, সে বৎসর আর বসন্ত রোগ হইবে না

(ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা) ১ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত শিকড়ের ছাল /০ আনা ও গোল মরিচ বয়ঃ পরিমাণ অর্থাৎ ১ বৎসরের ১টী ২ বৎসরের ২টী ৩ বৎসরের ৩টী ইত্যাদি। তদূর্দ্ধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত শিকড়ের ছাল ৵০ আনা মরিচ বয়ঃ পরিমাণ। তদূর্দ্ধ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত শিকড়ের ছাল ।০ আনা গোল মরিচ বয়ঃ পরিমাণ।

৩। নাগ দোনার শিকড় এক পর্ব্ব পরিমাণ ৭ দিন ৭ টুকরা সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। রোগ হইলে সেবন করিলে রোগ নাশ হয়।

৪। যে সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় প্রতি রোজ সকাল ও বিকালে মুগ কড়াই ভিজাইয়া খাইলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় না।

৫। তামা শরীরে ধারণ করিলে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগ (ওলাউঠা) হয় না।

৬। যে সকল প্রসূতির স্তন্য দুষ্টি হেতু শিশুদের যকৃৎ দোষ জন্মে অথচ স্তন্য বন্ধ করা যায় না, সে সকল প্রসূতির স্তন্য দোষ নিবারণের জন্য গুলঞ্চ, শতমূলী, পলতা, রক্ত চন্দন অনন্তমূল, ও নিমপাতা প্রত্যেক ।/ পাঁচ আনা ২ রতি /॥০ অৰ্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে স্তন্য দোষ নিবারণ হয়।

বামারচনা।

কবিবর ৺ নবীনচন্দ্রের স্বর্গ গমনোপলক্ষ্যে।

উজলিয়া বঙ্গাকাশ ছিল যে রতন।
খসিয়া পড়িল হায়! নবীন তপন।
বিষাদ সাগরে ভাসি, কাঁদ আজি বঙ্গবাসী
নীরবেতে বঙ্গমাতা কর গো রোদন।
হারাইলে আজি মহা অমূল্য রতন।

২

মধুর ঝঙ্কারে যার হাসিত অবনী।
নাচিত মানব প্রাণ শুনিয়া সে ধ্বনি।
কবিতার অলঙ্কারে, সাজাইলা বঙ্গমারে
যতনে সেরূপে হায়! কে সাজাবে আর
বঙ্গভাষা ধন্য আজি মহিমায় তাঁর।

বাঙ্গালি-কুল গৌরব ছিল যেই ধন।
ডুবিল আঁধারে তাহা জনম মতন।
আর সে বীণার তান, গাবেনা নূতন গান
শুনিবে না বঙ্গবাসী নবগান আর।
ভেঙ্গেছে সে মহাবীণা ছিঁড়ে গেছে তার।

৪

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা কাঁদ অনিবার।
সে মহা রতন আর নহে গো তোমার।
নবীনচন্দ্রের প্রায়, আর কে হইবে হায়!
আর কে তাঁহার মত পূজিবে তোমায়?
বঙ্গদেশ শূন্য আজি হারায়ে তাঁহায়।

তব প্রিয়পুত্র যারা, একে একে গেল তারা
আঁধার করিয়া হায়! এ বঙ্গভুবন।
চলিল আজিকে পুনঃ নবীন রতন।
শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

দুষ্মন্তের অনুতাপ।

শেল সম হায়! কঠিন বচনে,
বিধেছি তাহার কোমল বুক।
আর কি পাইব সে অমূল্য ধনে?
দিয়াছি যাহারে অশেষ দুঃখ? ১।

সজল নয়নে—লাজ মাখা মুখে,
কত যে বলিল বিনয় করি।
পাষাণ হৃদয়, হলোনা বিকল,
শ্রবণ না দিনু বচনে তা'রি। ২।

লৌহ দ্রব হতো, সে বাণী শুনিলে—
হেরিলে আহা! সে বিষাদ মুখ
নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে হায়!
ভেঙ্গেছি তাহার স্বপন সুখ! ৩।

স্মৃতির দুয়ার, খোলেনী তখন,
এখন স্মৃতির তাড়নে মরি
অনুতাপানলে, জ্বলি অহরহ,
শয়নে স্বপনে তাহারে স্মরি। ৪।

রাজার মহিষী— আহা! অভাগিনী
হৃদয়ে বহিয়ে নিরাশা ভার।
দারুণ সন্তাপে, কোথা গেল চলি?
দেখিতে তাহারে পাবকি আর? ৫।

বনের প্রসূন, ছিল ফুল্ল মনে,
আমোদে কানন আলোক করে।
আমি রে নিঠুর, পথের ধুলায়
দিলাম ফেলিয়া ছিঁড়ে নখরে। ৬।

অযতনে হায়! গিয়াছে শুকায়ে,
হৃদয় রতন সুবর্ণ লতা,
পাব কি তাহারে? শুনিব কি আর
তাহার সে মুখে প্রণয় গাথা? ৭।

সিন্ধু পানে যথা, ধায় স্রোতস্বিনী
তেমতি মিলনে করিয়া আশা।
এসেছিল মরি, স্বর্ণ বিহঙ্গিনী,
ভেঙ্গেছি তাহার সে সুখ বাসা। ৮।

সহকার ভাবি. সে নব বল্লরী,
আদরে জড়িত হইবে বলে।
নবীন উল্লাসে, কত সাধ করি.
কানন ত্যজিয়ে এসেছে চলে। ৯।

আমি রে পাষাণ, প্রত্যাখ্যান তারে,
করেছি দারুণ অবজ্ঞা ভরে!
সে অমূল্য ধন, কণ্ঠের রতন
আর কি আছে ভব ভিতরে? ১০।

স্বরগ প্রতিমা মলিন ধরায়,
থাকিতে তাহার নাহিক স্থান।
ক্ষমা কর দেবি! চরণে তোমার,
উদ্দেশে ঢালিয়া দিলাম প্রাণ। ১১।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা.

No. 548. April, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৮ সংখ্যা। চৈত্র, ১৩১৫। এপ্রেল, ১৯০৯। ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মৃত্যু—ত্রিপুরার মহারাজা কাশীধামে মটর গাড়ীতে ভ্রমণ কালে গাড়ী সমেত খানার মধ্যে পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, সেই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রফেসর রামমূর্ত্তি—মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ বীর প্রফেসর রামমূর্ত্তি তাঁহার অসাধারণ বলের পরিচয় সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া জগতকে চমৎকৃত করিতেছেন। তাঁহার অতুল বলে এতাবৎ ১২ হর্স পাওয়ারের মটর গাড়ী তিনি পশ্চাৎ হইতে টানিয়া রাখিতেন, এক্ষণে তাঁহার বুকের উপর দিয়া হস্তী চলিয়া যাইতেছে তিনি অনায়াসে সে ভার বহন করিতেছেন, এরূপ ক্ষমতার পরিচয় এপর্য্যন্ত কোন বীর দেখাইতে পারেন নাই।

সংবাদ পত্রের কনফারেন্স—বিলাতে সমগ্র সংবাদপত্র সমূহের একটী কনফারেন্স আগামী জুন মাসে হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালাদেশের সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ সেখানে যাইবেন।

মাদক নিবারণ—পঞ্জাবে সিমুরের রাজা এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক যুবক বা বালক ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিলে দণ্ডনীয় হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সমিতি—জাতীয়শিক্ষা পরিষদের প্রদর্শনী ২৫ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রদর্শন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সকল প্রকার যন্ত্রাদি ও নানারূপ দ্রব্য ঠিক বিলাতির ন্যায় অথচ বিলাতি অপেক্ষা অনেক সস্তায় তৈয়ারী হয়। উক্ত পরিষদের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রচারকের মুক্তিপ্রাপ্তি—পণ্ডিত দৌলতরাম ঝান্সীর এক জন আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারক। পুলিস ইহাঁকে জীবিকা অর্জ্জনের সদুপায় না থাকা অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেয়। বিচারক তাঁহাকে জামিনে খালাসের হুকুম দেন; কিন্তু জামিনের উপযোগী টাকা যোগাড় করিতে না পারায় তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে বাস করিতে হুকুম দেওয়া হয়। ঐ অপরাধ ভিন্ন তিনি সৈনিকদিগকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। যাহা হউক এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করিয়া পণ্ডিতজী এখন খালাস পাইয়াছেন। তাঁহার মুক্তি-সংবাদে আমরা প্রকৃতই সুখী হইয়াছি।

আপীলে অব্যাহতিলাভ—কাশীধামে লালমোহন মুখার্জী নামক যে বঙ্গীয় যুবক মৃতা মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি বিকৃত করিয়াছিল, তথাকার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উহার সশ্রম দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল, পাঠক এই সংবাদ অবগত আছেন। সম্প্রতি সে ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকটে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া খালাস পাইয়াছে।

পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় বিগত ২৯শে মার্চ্চ বিলাত হইতে লাহোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আসিয়া পর্য্যন্ত কাহারও সহিত দেখা করেন নাই।

আগামী ১৯১০ সালে আবার সেন্সস বা আদম সুমারী হইবে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী মাননীয় মিঃ গ্রেইট এবারেও এই কার্য্যে কমিসনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের গবর্ণরের কন্যা মিস ক্লার্কের মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদে সর্ব্বত্রই দুঃখ প্রকাশ এবং সহানুভূতি প্রদর্শন হইতেছে। আফিস আদালত প্রভৃতি বন্ধ রাখা হইয়াছিল। গবর্ণর বাহাদুর অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা শ্যামবাজারের ১২।১ নং বাড়ীতে একটি অনাথাশ্রম আছে। ইহাতে ৬৩ টি অনাথা হিন্দু বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। ১৮৯২ সালে বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের যত্নে এই অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ছোটলাট বাহাদুর এই আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। আশ্রমের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তিনি উহার সাহায্য কল্পে পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস পি সিংহ স্যর আর্লিরিচার্ডের স্থানে বড়লাট বাহাদুরের কৌন্সিলের আইন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। এই মনোনয়ন ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদিত হইয়াছে।

পূজা—আহ্নিক। *

কর্ত্তব্য বোধে আমরা সকলেই সন্ধ্যা পূজাদি করিয়া থাকি। কিন্তু ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্রাদির নিগূঢ় ভাব আমরা কয়জন বুঝিতে চেষ্টা করি? গুরু আমাদিগকে সন্ধ্যা-ক্রিয়ার যে সকল মন্ত্রাদি শিখাইয়া দিলেন, আমরা নিত্য কর্ম্মে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাই মাত্র, তাহার অর্থ না জানায় আমরা তাহার প্রকৃত ফলও প্রাপ্ত হইতে পারি না। হিন্দু শাস্ত্রে দ্বিবিধ সন্ধ্যাক্রিয়ার বিধি আছে, তান্ত্রিক ও বৈদিক। বৈদিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণদিগের জন্য। আমি অল্পবুদ্ধি রমণী, তাহার রহস্য ভেদ করিবার আমার অধিকার নাই। আমি আজ সর্ব্ব সাধারণের জন্য বিহিত তান্ত্রিক সন্ধ্যার কথাই বলিব।

সন্ধ্যা কাহাকে বলে? শাস্ত্রে বলিয়াছেন. সন্ধিকালে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যা তিনবার করিতে হয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, ও সায়াহ্ন। সন্ধিকাল কি? সন্ধি অর্থে মিলন। যে সময় বিগত প্রায়া যামিনীর সহিত উষা সতীর মিলন ঘটে, সেই সন্ধিক্ষণই প্রাতঃ সন্ধ্যার সময়। আর যে সময়ে সূর্য্যদেব প্রভাত ও মধ্যাহ্নের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হন, তাহাই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময়। যখন অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের সহিত সন্ধ্যা দেবীর মিলন হয়, সেই মিলন কালই সায়ং সন্ধ্যার সময়। লোক প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যোদেবকে লইয়াই আমাদের দৈনিক উপাসনা কার্য্য আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য জগতের প্রাণস্বরূপ, এবং বিশ্বের পালক, সেই জন্য সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেই আমাদের উপাস্য দেবতাকে স্থাপন করিয়া সূর্য্যের গতি অনুসারে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনা করিতে হয়। সন্ধ্যা একরূপ যোগ ক্রিয়া বিশেষ, ইহার কোন বাহ্য উপকরণ নাই, মানসেই ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে এই সন্ধ্যা উপাসনার প্রণালীটি কি সুন্দর! কেমন মর্ম্মস্পর্শী পবিত্রতাময়! সন্ধ্যাকালীন পাঠ্য মন্ত্রগুলির অর্থ ভালরূপে বুঝিয়া যদি আমরা কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যহই উপাসনার ফলে এমন বিমলানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারি—যাহা জগতে অতুলনীয়।

যখন সন্ধ্যা উপাসনার অর্থ কেবল মন্ত্র পাঠ ও অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু বুঝিতাম না, প্রাত্যহিক সন্ধ্যার দ্বারা আমরা যে কিরূপ বিমলানন্দ, কিরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারি, তখন তাহাও বুঝি নাই। সেই জন্য ঐ সকল কার্য্যে তেমন বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অবধি সন্ধ্যা কার্য্যের অর্থ জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল।

কুলগুরু—যাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া-

* লেখিকার সাধনার সিদ্ধি নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

ছিলাম, তাঁহার নিকট কোন বিষয় ভালরূপ বুঝিবার বা শিখিবার সুযোগ পাই নাই, তাঁহাকে জানাইয়া কোনরূপ সংশয় দূর করিতে পারি নাই। আর এমনই দুর্ভাগা আমি—জীবনে সেই এক-বার ব্যতীত আর তাঁহার চরণ দর্শনও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। মনে কতই জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, কতই সন্দেহ,—সংশয়ে প্রাণ অশান্তির আগুনে পুড়িতে-ছিল, মনের ভাব সকল জানাইয়া, মনের মত মীমাংসা করিয়া লইতে তখন কাহাকেও উপদেষ্টা পাইলাম না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত না। অগত্যা মনে যে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিত, মনে মনেই একরূপ তাহার মীমাংসা করিয়া লইতাম। আর যাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইত, তখনই কাতর প্রাণে ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হইতাম। মরি রে? এত দয়া এত অলৌকিক মমতা জগতে কি আর কাহারও কাছে পাওয়া যায়? মা আমায় একদিনও নিরাশ করেন নাই, কত আদরে কত যত্নের সহিত, কত ভাবে মা যে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেন, আজ আমার মত মূর্খ স্ত্রীলোক, তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য ভাষাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। তথাপি আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেবল শাস্ত্র দেখিয়া ও শাস্ত্রার্থ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, সেই মহাজনগণের বাক্যের অনুসরণ করিয়াই বলিতেছি মাত্র। কিছুই আমার মত অধম রমণীর স্বকপোল কল্পিত নহে।

ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,

সূর্য্যোঽগ্নি র্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥

অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গবী, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ক্ষিতি, আত্মা ও সর্ব্বজীব আমার পূজার আস্পদ। সেই জন্যই ঐ সকল লইয়াই ভগবানের পূজা বিধি বদ্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যাক্রিয়ায় সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যেই আমাদের উপাস্য দেবতাকে ধ্যান করিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ফলে, অনেকে মনে করেন, সূর্য্য একটা জড়পিণ্ড, তাহার উপাসনা ও ধ্যান করা কেবল মূর্খতা। কিন্তু আমাদের ঋষিগণ যে নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকেই চিন্তা করিতেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র প্রধান পদার্থ সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে সূর্য্যাতীত পুরুষকে অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মর্ম্ম অবগত নহেন। উপাস্য দেবতাকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত ইহার ফল আর কে বুঝিবে? বস্তুতঃ আমরা জড়পিণ্ড সূর্য্যের উপাসনা করি না, যে নিরাকার হইতে সাকাররূপের অবতারণা, সূর্য্যই সেই নিরাকারের প্রথম মূর্ত্তি। অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান যে পঞ্চভূত, ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—তন্মধ্যে জগৎ প্রকাশক তেজোময় সূর্য্যই বহির্জগতে আমাদের একমাত্র দৃশ্য বস্তু। তেজঃ পদার্থ হইতে রস বা জলের উৎপত্তি, এবং জল

হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। বায়ু ও ব্যোম শূন্য পদার্থ, নিরাকার, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাই সূর্য্যই আমাদের উপাসনার প্রধান অবলম্বন। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, আদিত্য প্রাণ, আদিত্য চক্ষু, আদিত্য বিশ্বের নিধান।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা। ইহাঁরাই যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই ত্রিমূর্ত্তির তিন শক্তি আছে। আবার যোগ শাস্ত্রাদি পাঠে জানা যায়, এই দৃশ্যমান জগতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, সাগর, ভূধর, নদ নদী প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, অন্তর্জ্জগতেও সেই সকল পদার্থ বিদ্যমান। কারণ যে সকল উপকরণে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, সেই পঞ্চভূতাদির উপকরণ লইয়াই জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্ব বা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের সৃষ্টি। এই সকল তত্ত্বের সংমিশ্রণে জীবশরীর নির্ম্মিত। সংক্ষেপতঃ যথা, আকাশ তত্ত্বের পাঁচগুণ ও রূপ, কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ু তত্ত্বের পাঁচরূপ ও গুণ চলা, বলা, দৌড়ান, আকুঞ্চন ও প্রসারণ। অগ্নিতত্ত্বের পাঁচগুণ ও রূপ,—ক্ষুধা, পিপাসা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি। জল তত্ত্বের পাঁচরূপ ও গুণ,—শুক্র, শোণিত, লালা, মূত্র ও স্বেদ, এবং পৃথিবী তত্ত্বের পাঁচরূপ ও গুণ,—অস্থি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী, লোম। পৃথিবী আদি পঞ্চভূত হইতে এই পঁচিশ প্রকার রূপগুণ তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব সমষ্টিতে স্ত্রী, পুরুষ জীব মাত্রেরই শরীর গঠিত হয়।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে শুনিয়াছি, জগতের সমস্ত পদার্থেই আকর্ষণ শক্তি আছে, পদার্থ মাত্রেরই এই আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, মহাকর্ষণ, সংযোগ বিয়োগাদির দ্বারা বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হইতেছে। যেমন সমুদ্রের জল সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া মেঘের সৃষ্টি করে, মেঘের জল যেমন পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া লয়, পৃথিবীর জল যেমন নদী, ও নদীর জল যেমন আবার সমুদ্র আকর্ষণ করে ইত্যাদি। নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ উপগ্রহের সহিত পৃথিবীস্থ জীব শরীরেরও সংযোগ আছে। সূর্য্য অথবা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিশেষে, ঐ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা যে আমাদের শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে, জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা তাহা অবগত আছেন। এখন পাঁজি পুঁথিতে গ্রহনক্ষত্রাদির দোষ অথবা বার দোষাদি অনেকেই মানেন না, এবং অপরকে ঐ সকল মানিতে দেখিলে তাঁহারা নানারূপ উপহাস বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র যে মিথ্যা নহে, সাধনা দ্বারা অন্তর্জ্জগতের রহস্য যাঁহারা অবগত হইয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। শাস্ত্রের সকল বিধি নিষেধ আমরা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে পারি না বটে, কিন্তু যিনি যেটুকু নিয়ম পালন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই মঙ্গল। স্থূল বুদ্ধিতে

আমরা যে সকল শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারি না, তাহাই মিথ্যা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি।

আহ্নিক ক্রিয়া যোগ-ক্রিয়া বিশেষ। সংসারাসক্ত অল্পমতি আমাদের জন্যই তত্ত্ব-জ্ঞানী যোগিগণ গুরুপ্রদত্ত উপায়ে এই সন্ধ্যা উপাসনার বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যেহেতু নিত্য এই ভাবে উপাসনা ও ধ্যানের দ্বারা আমাদের মন অল্পে অল্পে পরব্রহ্মে যুক্ত হইতে পারিবে। ধ্যান পরায়ণ যোগিগণ বলিয়া থাকেন, সূর্য্য যেমন বহির্জ্জগতের প্রকাশক, অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ সূর্য্য হইতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্ত্যাদি স্ফুরিত হইতেছে। সূর্য্যই যে ভগবানের জ্যোতিঃ, অথবা বিভূতি, তাহা গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন। সুতরাং সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যে সেই পরমব্রহ্ম অথবা তাঁহার শক্তির উপাসনা করা মূর্খতা নয়। শিব সংহিতায় লেখিত আছে, ত্রৈলোক্য মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, যথা—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত মেরু, সরিৎ, সাগর, শৈল, ক্ষেত্র সমূহের সহিত ক্ষেত্র পালক, ঋষিগণ, মুনি-গণ, গ্রহ নক্ষত্রগণ, পুণ্যতীর্থ সকল, এবং পীঠ দেবতার সহিত পীঠ স্থান, সমস্তই এই দেহে বর্ত্তমান আছে। সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা শশী ও ভাস্কর দেহ মধ্যস্থ মেরু বেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে। নভঃ, বায়ু, জল, বহ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত ভূতগণের দ্বারাই শরীর পরিচালিত হইতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্ব স্ব শক্তির সহিত, এবং পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি সমস্তই শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং যে প্রাণ মনুষ্য শরীরে আছে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থে বিদ্যমান। এই প্রাণের উপাসনা করাই মুখ্যকর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মের নাম প্রাণায়াম। আমাদের ত্রিসন্ধ্যাকৃত আহ্নিক ক্রিয়ায় প্রাণায়াম করিতে হয় কিন্তু সচরাচর আমরা তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া শিক্ষানুযায়ী করিয়া থাকি মাত্র। প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইলে প্রাণও স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাণ স্থির হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ— সেই মহা-প্রাণকে আত্মপ্রাণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা আত্মপ্রাণকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ বলিয়া অনুভব হয়। সে অবস্থায় যে কি শান্তি ও অতুল আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা কার্য্যের দ্বারা না বুঝিলে আর কিছুতেই বোধ গম্য হইবার নহে। প্রাণায়ামই যোগের সহজ উপায় এবং, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের প্রথম সোপান।

প্রাণই আত্মা, প্রাণই ব্রহ্ম, প্রাণের উপাসনা করিলেই পরমব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত আমরা— মন প্রতিক্ষণেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। সহজে কি আমাদের এই মত্ত হস্তীর মত অদম্য মন স্থির হইতে পারে? সেই জন্য ত্রিসন্ধ্যাকৃত প্রাণায়া-মের দ্বারা চঞ্চল প্রাণ ও মনকে স্থির করিতে নিত্য আমাদের ইহার অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হইলে কখনও না কখন জন্ম জন্মান্ত-রেও আমরা পরম ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন

পাইব। আর একান্ত যত্ন ও ভক্তির সহিত সাধনা করিয়া যে সুকৃতিশালী ব্যক্তি ইহ জন্মেই ইষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ করেন. তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

প্রাতঃসন্ধ্যায় আমরা যে গায়ত্রীর ধ্যান করি, তাহার সরল অর্থে ইহাই বুঝায়. "প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে পুস্তক (চারিবেদ) ও অক্ষমালা-ধৃতা চতুর্ভুজা কৃষ্ণাজিনাম্বরা ব্রাহ্মীশক্তির স্মরণ করিতেছি। এক্ষণে এই ব্রাহ্মীশক্তির ধ্যানে কি ফল পাওয়া যায়, তাহাই জিজ্ঞাস্য। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চারিবেদ ও নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, ইহা শাস্ত্রের উক্তি, এবং প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা বা বিশ্ব-বিধাতা। সেই বিশ্ব-বিধাতা যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারই নাম ব্রাহ্মীশক্তি। নিত্য প্রভাতে উদীয়মান আদিত্যে বিরাজিত থাকিয়া. যে ব্রাহ্মী-শক্তি পঞ্চভূত বা পদার্থ সকলের সংমিশ্রণে বিশ্বের তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মীশক্তিকে প্রত্যক্ষ অথবা স্মরণ করার নাম প্রাতঃসন্ধ্যা। দিবসেই মানবের যাহা কিছু কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়. সেই জন্য দিবসের প্রারম্ভে কর্ম্মকর্ত্তা ব্রহ্মার স্মরণে, কার্য্যশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া, মানবকে নিরলস ও কর্ম্মক্ষম করে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবে ইহার অর্থ বুঝেন, তাঁহারা স্বশরীরস্থ মূলাধার চক্রের মধ্যবর্ত্তিনী ব্রাহ্মীশক্তিকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী জানিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্বারা আত্মশক্তির প্রসারতা বৃদ্ধি হয়।

আর মধ্যাহ্ন সময়ে গায়ত্রী ধ্যানের সরল অর্থে ইহা বুঝায়, "মধ্যাহ্নে প্রখর কিরণোজ্জ্বল ভাস্কর-মণ্ডলে শ্যামবর্ণা, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারিণী চতুর্ভুজা যে মহাদেবী সূর্য্যাসনে অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহারই শরণাগত হইতেছি।" শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী বিষ্ণু জগতের পালন কর্ত্তা—এবং প্রাণই বিষ্ণু। মধ্যাহ্নের সূর্য্যমণ্ডলাসনে বিরাজিতা বিষ্ণুর সেই বৈষ্ণবী শক্তি পান ভোজনাদির দ্বারা জগত পালন করিতে-ছেন। কারণ জীবমাত্রেরই আহারের প্রয়োজন. আহার বিহার ব্যতীত ব্রহ্মার সৃষ্টি রক্ষা ও পালন হইতে পারে না। জীব শরীরস্থ যে শক্তি জীবগণের ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনা প্রদান করিতেছেন, যাঁহার প্রবৃত্তিতে জীবগণ আহার বিহারাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে, সেই বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনার নাম মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। মধ্যাহ্নেই জীবগণের ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় সেই সময় পরব্রহ্মের পালনী শক্তির স্মরণ করিলে, মানবের শরীরস্থ সেই পালনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া, মানবকে স্বাস্থ্য, শ্রী, ও বল প্রদান করে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অধ্যাত্মিক অর্থ যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ষট্ চক্রের অন্তর্গত মণিপুর নামক চক্রেই বিষ্ণুর পালনী শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্বারা শরীরস্থ তেজ ও অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আর সায়ংসন্ধ্যার সময় গায়ত্রী ধ্যানের সরল অর্থ,—যথা, "সায়াহ্নে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের মধ্যে শুক্লবর্ণা, শুক্লাম্বরধারিণী, বরদায়িনী বৃষাসনা, ত্রিনয়নী, পাশ, বর, শূল

ও নরকপালধারিণী যে মহাদেবী বিরাজমানা আছেন, তাঁহারই ধ্যান করিতেছি।” ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহা সৃজন ও পালন করেন, মহাদেব রুদ্ররূপে তাহার সংহার করিতেছেন। কিন্তু মহাদেবের সদাশিবরূপে আর এক মূর্ত্তি প্রকাশিত আছে, সেই মহাপ্রাণ ভগবান্ ঈশ্বরের যে শক্তি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, অর্থাৎ জীবভাব যখন শিবভাবে মিশিয়া যায়, যে শক্তির দ্বারা জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবানের ঐশীশক্তি, অথবা আদ্যাশক্তি। সরস্বতী ইঁহারই নামান্তর। সায়ংকালে দিবসের কার্য্য সমাপনান্তে বরদা জ্ঞানদায়িনী সেই আদ্যাশক্তির স্মরণ করার নাম সায়ংসন্ধ্যা। এই আদ্যাশক্তির স্মরণে, দিবসের পাপক্ষয় করতঃ, মানবের জ্ঞানশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে শিবত্ব প্রদানের উপযুক্ত করে। সায়ংসন্ধ্যার আধ্যাত্মিক অর্থ যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা স্বশরীরস্থ ষট্‌চক্রের বিশুদ্ধাক্ষ নামক মহাচক্রের মধ্যে পরম শিবের সেই জ্ঞানদায়িনী শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্দ্বারা জ্ঞান শক্তি প্রভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন। শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতভাবে এই সন্ধ্যাক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মানুষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

ত্রিসন্ধ্যার এই আহ্নিক ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক অর্থ যোগিগণেরই বোধগম্য, কারণ আহ্নিকক্রিয়া যোগেরই অঙ্গ। সংসারাসক্ত মোহান্ধ জনের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু আমরা যদি অর্থ বুঝিয়া ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ধ্যান ও জপ করি, তাহা হইলে অচিরাৎ আমরাও যোগিজনের প্রার্থনীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারিণী হইতে পারি

সন্ধ্যা আহ্নিকের পর নিত্য কর্ম্মের মধ্যে আমাদিগকে দেবপূজা বা ইষ্টপূজা করিতে হয়। কিন্তু আমরা কর্ত্তব্য ভাবিয়া দুইটা পুষ্প-চন্দনের দ্বারা দেবপূজা করিয়া থাকি, তদ্ভিন্ন দেবপূজার যে কি উদ্দেশ্য, তাহা আমরা কেহই বুঝিনা, গুরুও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে দেবপূজার রহস্য বুঝাইয়া দেন না, আর আমরা তাহা বুঝিতেও চাহি না। শাস্ত্রে দেবপূজাকে সর্ব্বকল্যাণপ্রদ, সর্ব্বপাপক্ষয়কর, ও মানবের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং যতদিন পর্য্যন্ত আপনাতে ব্রহ্মভাবের উদ্রেক না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দেবপূজা করিতে বলিয়াছেন।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু সদ্ভাবোনোপজায়তে।
তাবদ্দেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥

যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সদ্ভাব উপস্থিত না হয়, তাবৎ কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্মের দ্বারা দেবপূজারই বিধি। দেবপূজা হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। দেবপূজার মূল সূত্র এই, “নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।” অর্থাৎ দেব ভাবাপন্ন না হইলে দেবপূজার অধিকারী হয় না। আপনার আত্মাতে দেবত্ব আরোপ করিয়া আপনাকেই দেবভাবে চিন্তা করিতে করিতে দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যখন দেবপূজা করিতে বসি, কিরূপ ভাব

লইয়া? তখনও প্রায়ই আমাদের মন সংসারে পড়িয়া থাকে, কোন্ ছেলেটা কাঁদিতেছে,—কাহার খাওয়া হয় নাই — অথবা কোন কাজটা বাকী রহিয়াছে, পূজার পর সমাধা করিতে হইবে, ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তাই আমাদিগকে ধ্যানে নিমগ্ন করিয়া রাখে। সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা সমূহ আমাদিগকে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছে, যে দিনান্তে কিয়ংক্ষণের জন্য একবার ইষ্টদেবতার স্মরণকালেও সেই চিন্তা পাশ হইতে মুক্ত থাকিতে পারি না। সেই জন্য দেবপূজার ফলেও বঞ্চিত হই। পূজাসনে বসিয়া আমরা যে জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যের মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকি তাহার অর্থ কেবল সাংসারিক সর্ব্ববিধ অশুচি, মোহকর চিন্তা হইতে তৎকালে আপনাকে শুদ্ধ পবিত্র করিয়া লওয়া। কিন্তু মনই যখন পবিত্র হয় না, তখন কেবল মন্ত্র পাঠ করিলে কি হইবে? দেবপূজার বিধিস্থলে শাস্ত্র বলিয়াছেন।

গত-কাম-ভয়-দ্বন্দেবা রাগ মাৎসর্য্য-বর্জ্জিতঃ।
আত্মানং পূজয়িত্বাচ সুগন্ধিসিত-বাসসা॥
সুমুহূর্ত্তে যজেদ্দেবান্ স্বকীয়াসন সংস্থিতঃ॥

যে সমস্ত কাম, ভয়, সুখ, দুঃখ, রাগ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া, মন শান্তভাব অবলম্বন করিবে, তখন আপনাকে পবিত্র, নিষ্পাপ বোধ করিয়া, স্বকীয় শুদ্ধ আত্মভাবকে গন্ধ বাসাদির দ্বারা পূজা করিয়া, আসনগ্রহণান্তর শুভ মুহূর্ত্তে দেব পূজা করিবে। শরীরস্থ আত্মাই ব্রহ্ম, যোগিগণ এই আত্ম উপাসনার দ্বারাই ঐশীশক্তি লাভ করেন। আত্মজ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। যিনি আপন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। জগতে পদার্থ বিষয়ক সকল জ্ঞান বিজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, মূর্খ হইলেও পৃথিবীতে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সৃষ্টি স্থিতির রহস্য কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত নহে। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে নানারূপ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্র মানি না, দেবতা মানি না, প্রতিমা পূজাদি করি না প্রভৃতি মুখে বলিলেই কি ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়? যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ দেবতা হয়, ঐশীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া মানব অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠে, যাঁহার ক্ষমতা বলে অরণ্যের হিংস্র জন্তুও বশীভূত হয়, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন শক্তিমান্ মহাপুরুষ সংসারে কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? বস্তুতঃ বহুকাল জন্ম জন্মান্তরের সাধনা ও সদ্গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের শাস্ত্রে আছে।

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং
বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচ-

আত্মস্থ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যায়, সে করস্থিত কৌস্তভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচ

তৃষ্ণায় বৃথা ভ্রমণ করে। উপাস্য দেবতার মধ্যে আত্মস্থ দেবের আবাহন করিয়া পূজা করার নামই দেবপূজা। শাস্ত্র বলেন, আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ। দেবতার মধ্যে ছোট বড় নাই, দেবতার মধ্যে ভেদাভেদ নাই। যে ব্যক্তি দেবতাদের একত্ব না বুঝিয়া ভেদভাব কল্পনা করে, তাহার উদ্ধার নাই, ইহাও শাস্ত্রীয় বাক্য। সুতরাং আর্য্যশাস্ত্র বহু দেব দেবীর উপাসনার মধ্যেও ভগবানের অদ্বিতীয় আত্মময় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যতদিন আপনাকে দেব ভাবে পরিণত করা না যায়, ততদিন দেব দর্শন মিলে না। আপনাকে ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ মনে করিয়া, আপনার আত্মাতেই সেই পরমার্থ শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরম ইষ্ট বস্তুর পূজা করিলে শীঘ্রই ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। নচেৎ শুধু মৃত্তিকার অথবা ঘট পটের পূজা করিলে কি হইবে? যাঁহারা কেবল মৃন্ময়ী অথবা লিঙ্গ মূর্ত্তিকেই সার সর্ব্বস্ব ইষ্টবস্তু ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূজা উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই তামস ভাবের কার্য্য। সেই জন্য তাহার ফলও তমোভাবাপন্ন হয়। সংসারের শোক মোহ, রাগ দ্বেষাদি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। চৈতন্য ব্যতীত শুধু জড়ের চিন্তা করিলে জড়ভাবই বৃদ্ধি পায়। হায়! আমরা কতদিনে প্রকৃত দেবপূজা করিতে শিখিয়া দেবভাব লাভ করিতে পারিব?

সাধনা রচয়িত্রী।

ভারতীয় আর্য্য সহধর্ম্মিণীর দায়িত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

ভগবান্ মনু গৃহিণীর দায়ীত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষার তরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। অপত্যলাভ ও সন্তান পালন, ধর্ম্ম কার্য্য সাধন, উত্তমাপ্রীতি এবং পিতৃ-লোকের ও আপনার স্বর্গগমনকার্য্য এই-গুলি ভার্য্যার অধীন।

কোন কোন দেশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির ঐরূপ কার্য্য বিভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। সে দেশে রাজ কার্য্যালয় বা অন্যান্য কর্ম্মালয়-সমূহে পুরুষ কর্ম্মচারীর ন্যায় স্ত্রীলোক কর্ম্মচারিণীও যথেষ্ট আছে। সুতরাং এ দেশে যেমন স্ত্রীলোককে বাহিরের কর্ম্ম লইয়া প্রায় ব্যস্ত থাকিতে হয় না, সেই সকল দেশে সেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ঐ সকল দেশের রীতি অনুসারে আফিস ও দরবার প্রভৃতি স্থানে, বায়ু সেবনাদি যথেচ্ছ ভ্রমণ উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া গিয়া থাকে। অন্তঃপুর নামক পৃথক্ স্থানে বা স্ত্রীজাতির সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থানস্থান তত নিয়মাধীন নহে। যে যে দেশের মহিলাদিগকে

অন্তঃপুরে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্মের দায়িত্ব গ্রহণকরা তাদৃশ বিধিবদ্ধ নহে, যে দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী এ দেশের ন্যায় নহে, সেই সেই দেশে এতদ্দেশীয় আর্য্য-মহিলা জনোচিত পবিত্র ভাব আসিবার সম্ভাবনা কোথায় ? তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া শিক্ষালাভ করিলেই বা আর্য্যগৃহিণীদিগের সর্ব্বত্র সুফল হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?

কোন কোন দেশের অধিকাংশ মহিলা আত্মগর্ত্তজাত সন্তানকে কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহা জানেন না। ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পদিন পর হইতেই সেই শিশুসন্তানেরা ধাত্রী বা উপমাত্রী নামে ব্যবসায়াবলম্বিনীদিগের হস্তে প্রতিপালিত হয়। জননীর সহিত প্রায় দেখা শুনা ও তাদৃশ সংশ্রব থাকে না সুতরাং সে দেশে পুত্র প্রসব ভিন্ন শিশু পুত্রের স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব তাদৃশভাবে নাই। ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রতিপালনের রীতি আমাদের দেশেও না আছে এরূপ নহে। এ দেশে অনেক শিশু বাল্যকালে উপমাত্রীদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইলেও তাহারা জননীর কাছ ছাড়া হয় না বা জননীর রক্ষণাবেক্ষণ হইতেও বঞ্চিত হয় না। স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক ভাল বাসা জানাইবার জন্যই হউক, অথবা পতিসামীপ্য ভিন্ন অপর স্থানবাসিনী হইলে অনিষ্টের কারণ আছে বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক অনেক দেশের রীতি অনুসারে সর্ব্বত্র স্ত্রীসহগমনাগমনের বিধি আছে। এতদ্দেশীয় মহিলাগণ (তীর্থযাত্রাদি ভিন্ন) সর্ব্বত্র পতির অনুগামিনী না হইলেও ধর্ম্মকর্ম্মে পতির সহচারিণী হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করেন। যে যে দেশে কথায় কথায় বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে সেই সেই দেশে পতির প্রতি উত্তমা রতি বা বিশুদ্ধ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখা যায়, সুতরাং আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে পতি শুশ্রূষার সম্ভাবনাও প্রায় দেখা যায় না। যে যে দেশে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নাই, সুতরাং তথায় আত্মার স্বর্গোদ্দেশে বা পিতৃলোকের প্রীত্যুদ্দেশে পতির ধর্ম্ম কর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইবারই বা সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব মনুবর্ণিত উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত অপত্যপালন, গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম কৃত্য সাধন: পতি শুশ্রূষা উত্তমারতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গ গমনকার্য্য এইগুলি ভারতভিন্ন অন্য দেশে দারাধীনতা বা সহধর্ম্মিণীর দায়িত্বের মধ্যে পরিগণিত নহে।

যিনি রাজ্য শাসন করেন, তাঁহাকে যেমন রাজনীতি শিক্ষা করিতে হয়, বিবিধ প্রকার কার্য্যে বিবিধ প্রকার নীতির অনুসরণ করিতে হয়, রাজ্য মধ্যে কোথায় কি হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত কার্য্য বিনিয়োগ দ্বারা শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়, অহর্নিশি আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, প্রজাপালন করিতে হয় ও সর্ব্বদা সগুণ বিস্তার দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়, তেমনি যিনি অন্তঃপুর রাজ্যে কর্তৃত্ব করেন,—সেই গৃহ-

ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ—গৃহস্থিত দুর্ভাগ্যান্ধকারের আলোক স্বরূপ—সংসার তাপে তাপিত গৃহস্থের পক্ষে শান্তি ছায়া স্বরূপ—অম্বিকাদেবীর অধিষ্ঠান স্বরূপ,—কমলালয়াদেবীর নির্বিশেষ মূর্ত্তি স্বরূপ—বিগ্রহবতী দয়াস্বরূপ দারাকে নারীনীতি শিক্ষা করিতে হয়, বিবিধ প্রকার সাংসারিক কার্য্য, বিবিধ প্রকার নীতির অনুসরণ করিতে হয়, ভবনের বিশৃঙ্খল বিষয় সকল অনুসন্ধান করিয়া সুশৃঙ্খল স্থাপন করিতে হয়, দিবারাত্র আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, প্রজাপালন (সন্তান পালন) করিতে হয়, এবং লোকসমাজে অনিন্দনীয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শাস্ত্রে মহিলাদিগের অনুষ্ঠানার্হা বিবিধ নীতি বর্ত্তমান আছে। তদন্তর্গত এক একটী নীতি অবলম্বন করিয়া যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে গেলে এক এক খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তথাপি যেগুলি সার—যেগুলির অন্তর্ভূত উপদেশ অনেক, এইরূপ কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকানুরূপ উপদেশ সকল অনেকের পরিচিত এবং বিজ্ঞাত থাকিলেও যেমন পূর্ব্ব পরিচিত বসন্তের নব সমাগম অভিনব ভাবে সকলের নেত্রানন্দ সম্পাদন করে, তেমনি পুরাণাদি শাস্ত্রের উপদেশ সকল পুরাণ না হইয়া যখনই পাঠ্যরূপে নয়নসমীপাগত হয়, তখনই যেন নবীন ভাবে আনন্দ বিধান করে।

চক্ষুর্দেহঃ স্বভাবশ্চ যস্যা নিত্যং সুসংবৃতং।
শৌচাচার-সমাযুক্তা সাপি মৃত্যুং ন পশ্যতি॥
বরাহ পুরাণম্।

অনুবাদ। যাঁহার চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সুরক্ষিত অর্থাৎ যে স্ত্রী চক্ষু দ্বারা, চক্ষু ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা ও স্বভাব দ্বারা কোন পাপ কর্ম্ম করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রোক্ত পবিত্রাচার-সমন্বিতা হন, তিনি যমকে দেখেন না অর্থাৎ তাঁহাকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না সুতরাং স্বর্গলাভ বা পরলোকে সদ্গতি হয়।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্ত হস্তয়া॥
মনুসংহিতা॥

অনুবাদ। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা অতি হৃষ্টা, গৃহ কার্য্যে দক্ষা গৃহ সামগ্রী সকল পরিষ্কাররূপে যথা স্থানে রক্ষণকারিণী ও মিতব্যয়িনী হইবেন।

যত্রাবিরুদ্ধোদম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র সংস্থিতঃ।
গরুড়পুরাণম্।

অনুবাদ। যে গৃহে স্ত্রী ও স্বামীর বিরুদ্ধ ভাব নাই অর্থাৎ পত্নী পতির মতানুসরণ করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মোচিত কর্ম্ম করেন, সে গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ স্থিত হয়।

ভর্ত্তুশ্চিত্তানুগামিন্যা দেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ-ধর্ম্মরতয়া ভর্ত্রী সেবাত্বিহ ত্বয়া॥
বহ্নি পুরাণম্।

অনুবাদ। তুমি ভর্ত্তার মনের মত কাজ কর, দেবদেবীর আরাধনা কর, গার্হস্থ ধর্ম্মে রত থাক। এই গৃহাশ্রমে ঐরূপ নিয়মে থাকিয়া সর্ব্বদা পতিসেবা কর।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

কমলার পুরস্কার।

ফাল্গুন মাস। নানাবিধ কুসুমের মধুর সৌরভ বহিয়া এবং নবগঙ্গা নদীর ক্ষীণ স্রোতের শীকর মাখিয়া প্রদোষ বায়ু মৃদু মৃদু প্রবাহিত। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রক্তিম মুখে ক্লান্তদেহে বিশ্রামাকাঙ্ক্ষায় পশ্চিম দিগ্‌বধূর গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন। পাখীরা কল কল রব করিতে করিতে নিজ নিজ কুলায়াভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। এমন সময় নব গঙ্গা-নদীর তীরে একটী যুবক একাকী বসিয়া-কি ভাবিতেছেন। মনোহর বসন্ত কালে প্রদোষ সময়ে ইনি কি সুমধুর বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছেন? অথবা নিম্নে ক্ষীণকায় নদী-স্রোতে কেমন করিয়া নাবিকেরা কৌশলে দুই এক খানি ক্ষুদ্রকায় তরি ঠেলিয়া লইতেছে তাহাই দেখিতেছেন? অথবা ওপারের শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ গাছগুলির পাতায় সন্ধ্যা-সমীরণ কেমন শাঁই শাঁই শব্দ তুলিতেছিল তাহাই শুনিতেছেন? না। যুবক বিমর্ষ, তাঁহার মুখ-শ্রী মেঘাচ্ছন্ন-শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবেন কি তাঁহার অন্তর যেন কি বিষম দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছে। চারিদিকের বসন্ত সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গের ললিত গীত, নবগঙ্গার মধুর হিল্লোল ও কুল কুল ধ্বনি এবং ক্রীড়াশীল পবনের মধুর ক্রীড়া সকলই তাঁহার নিকট আজি নিষ্ফল। তিনি চিন্তাগ্রস্ত।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সূর্য্য ডুবিয়া গেলেন। এ পারের রাখালেরা নিজ নিজ গোপাল লইয়া গৃহে চলিল। ও পারের শ্যামল দূর্ব্বাস্তরণময় প্রান্তরে বালকের দল ফুটবল খেলিতেছিল তাহারাও চলিয়া গেল। নদীর তীরে এক ব্যক্তি ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছিল সেও উঠিয়া গেল। হাট হইতে নানাবিধ দ্রব্য মস্তকে ক্রেতা ও বিক্রেতার দল আসিতেছিল ক্রমে ক্রমে তাহাদের শেষ ব্যক্তিও চলিয়া গেল। পূর্ব্বাকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, পশ্চিমাকাশে কিংশুক কুসুমের তুল্য বাল-শশধর হাসিতে লাগিল। দূর দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিল। যুবক এখনও সেই ভাবে সেই স্থলে উপবিষ্ট। কেন—কে জানে?

সহসা পশ্চাৎ হইতে আর একটী সুগঠিত দেহ, কমণীয় কান্তিময় সুন্দর নব যুবক আসিয়া একটু দূর হইতে মৃদুস্বরে ডাকিলেন "সুকুমার"!

সুকুমার নীরব। আগন্তুক অগ্রসর হইয়া সুকুমারের স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। সুকুমার চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একি! তুমি এমন হইয়া গিয়াছ কেন? আমি যে ডাকিলাম তুমি কি শুনিতে পাও নাই? তোমার কি পীড়া হইয়াছে?

সুকুমার অপ্রতিভ হইলেন। প্রিয়তম বন্ধু সুশীল কুমার কতক্ষণ আসিয়াছেন,

তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তিনি কিছুই টের পান নাই।' আপনাকে লইয়া নিজের দূরবস্থা লইয়া এতই বিব্রত ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন ভাই! আমাকে ক্ষমা করিও। আমি সংসারের ঝড়ে এমনি বিবশ হইয়াছি যে আমার জ্ঞান শূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার কোনও ব্যাধি হয় নাই।"

সুশীল কুমার বসিয়া পড়িলেন। সুকুমারও সঙ্গে সঙ্গে বসিলেন। উভয়ের মধ্যে আজি অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ। সুশীলের নিজ দুঃখের কথা বলিয়া সুকুমার অনেক সান্ত্বনা লাভ করিলেন। ক্রমশঃ চতুর্থীর চন্দ্র অস্ত প্রায়। অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। নদীতীর নির্জন, তদুপরি অন্ধকার, ক্বচিৎ শৃগালের চিৎকার নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। দূর নদী সীমান্তে একটা চিতা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর নদীতীরে থাকা নিরাপদ্ ও শ্রেয়স্কর নহে ভাবিয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিলেন।

সুকুমার সুশীল কুমারকে বলিলেন "কতদিন পরে তুমি দেশে আসিলে. একবার আমাদের বাটীতে আসিবে না? মা তোমাকে দেখিলে কত আহ্লাদিত হইবেন, আর কমলার মুখেত তোমার প্রশংসা ধরে না।"

সুশীল কুমার বলিলেন "ভাই, আমি নদী তীরে ষ্টীমার হইতে নামিয়াই তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তথায় শুনিলাম তুমি নবগঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছ, তাই ছুটিয়া তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। দেখ এখনও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করি নাই, এই বেশ লইয়া এ রাত্রিতে জননী ও কমলার সহিত দেখা করা হয় নাই। কাল বৈকালে আমি নিশ্চয় আসিব—এক্ষণে ক্ষমা কর।" এই কথার পরে উভয়ে সাদর সম্ভাষণ ও কর মর্দ্দনের পর উভয়ে বিদায় লইলেন।

(২)

সুকুমার এবং সুশীল কুমার উভয়ে বাল্য বন্ধু। উভয়ের এক গ্রামে বাস, উভয়ের একত্র অধ্যয়ন, একত্র ক্রীড়া, অহরহঃ একত্র অবস্থান ছিল। অপরিচিত ব্যক্তি উহাদের সদ্ভাব দেখিয়া মনে করিত উহারা যমজ সহোদর।

সুকুমারের পিতা বিদ্বান্, সচ্চরিত্র ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। অনেক টাকা বেতন পাইলেও, বড় বড় সাহেব সুবার সহিত সর্ব্বত্র কথোপকথন এমন কি সদ্ভাব স্থাপন করিলেও তাঁহার মেজাজটা হিন্দু ব্রাহ্মণের মতই ছিল, সাহেবী হইয়া যায় নাই। বহু আত্মীয় কুটুম্বে তাঁহার ভদ্রাসন বাটী পূর্ণ ছিল ও উমেদার, ছাত্র, বিপন্ন প্রভৃতি বহু আত্মীয়ের কল্যাণে তাঁহার চাকরী স্থানের বাসা বাটীটীও দিন রাত মুখরিত থাকিত। বাটীতে সেঁজুতি, যম পুকুর হইতে সাবিত্রী, অনন্ত প্রভৃতি মেয়েলি ব্রত এবং ঘেঁটু, মনসা হইতে দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা পার্ব্বণ কিছুই বাদ যাইত না। তদ্ভিন্ন বার্ষিক ষাণ্মাসিক

শ্রাদ্ধাদিও অহরহঃ চলিত। তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই যেন অন্নসত্র লাগিয়া থাকিত। তাঁহার সুলক্ষণা সচ্চরিত্রা গৃহিণী একটী পুত্র একটী কন্যা প্রসব করিয়া গৃহস্থাশ্রম পবিত্র ও সার্থক করিয়াছিলেন। পুত্র সুকুমার সুন্দর ও মেধাবী, কন্যা কমলা যেন সাক্ষাৎ কমলা।

সুকুমারের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই এক ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে একটী সর্ব্বসুলক্ষণা নামে ও বয়সে এবং রূপে গৌরী দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তা প্রাচীন তন্ত্রের লোক, বিবাহে আপত্তি করিলেন না। গৃহিণীও মহা আহ্লাদ সহকারে নব বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

সুকুমার ষোল বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, এই বৎসর এণ্ট্রান্স দিবে, কমলা এগার বৎসরে পড়িয়াছে,—কন্যাকাল তাহার বিবাহের জন্য ঘটকের দল ঘন ঘন গতায়াত করিতেছে এমন সময় চাকরী স্থানে সহসা কর্ত্তার কাল হইল। গৃহিণীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাঁহার সাজান বাগান শুখাইয়া গেল। সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। যে গৃহে শস্য নাই সে গৃহে ইন্দুর ও পারাবত প্রভৃতির উপদ্রব থাকে না, কুটুম্বের পাল প্রভাতের নক্ষত্রের ন্যায় একে একে অস্তমিত হইতে লাগিল। সুকুমার এণ্ট্রান্সে ফেল হইলেন। বিপদ্ কখন একাকী আসে না। লক্ষ্মী যখন যান তখন কোথা দিয়া অলক্ষিতে চলিয়া যান। "হগ এবং বুল" কোম্পানীর ব্যাঙ্কে কর্ত্তা পঞ্চাশ সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন হঠাৎ সেই ব্যাঙ্ক ফেল হইল, টাকা গুলি ভাসিয়া গেল! নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি ষড় যন্ত্র করিয়া লাট বন্দীর টাকা বাকী ফেলিয়া জমীদারী নিলাম করাইয়া নিজস্ব করিয়া নিজ নিজ লবণের মহিমা ঘোষণা করিল।

গৃহিণী বাস্তবিকই অনাথা হইলেন। নিজের যৎসামান্য সঞ্চিত টাকা ও অলঙ্কার (কর্ত্তা যেরূপ দানশীল ছিলেন, তদ্রূপ ব্যক্তির পত্নীর বহুমূল্যের রত্নালঙ্কার প্রায়ই থাকে না।) বিক্রয় করিয়া তিনি ভদ্রাসনে কায়ক্লেশে পুত্র কন্যা লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিগে শুভলগ্নে পৌত্র লাভ হইল। সুকুমার আরও দুই বার এণ্ট্রান্স দিলেন—ফেল হইলেন।

সুকুমারের সুকুমার স্কন্ধে—বিধবার বৃদ্ধা মাতার, যুবতী পত্নীর, শিশু পুত্রের ভার, তাহার উপর সহোদরার বিবাহের চিন্তা,—সে বেচারার দেহ রক্ষাই ভার আর পাশ করিবে কি? সুশীল কুমারের পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। তাঁহার পসার প্রতিপত্তি খুব, সুতরাং অর্থাগমও খুব। তিনি সুশীল সচ্চরিত্র বিনয়ী সবই—কিন্তু এ কালের ধরণের। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি নাই, অপব্যয় নাই। জীবনটী বিংশ সহস্র মুদ্রার বীমা করা আছে। তাঁহারও দুই সন্তান সুশীলা ও সুশীল কুমার। সুশীলা সুন্দরীও সুশীলা এবং যথোপযুক্ত সৎপাত্রসাৎ হইয়াছে।

তাহার স্বামী একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। এলাহাবাদে বিলাতী ধরণে হৌস খুলিয়া তিনি দেশে একজন আদর্শ স্থানীয় ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছেন। মধ্যে জাপান গিয়া তিনি বাণিজ্যে কয়েকটী নূতন তত্ত্ব শিখিয়া আসিয়াছেন। সমাজ দিন কত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছিল কিন্তু একটী ভারি গোছের "প্রায়শ্চিত্ত"— করাতে সকল আপত্তিই নির্ম্মূল হইয়াছে।

তাঁহার নাম অতুল বাবু অথবা মিঃ ব্যানার্জি। তাঁহার কোম্পানীর নাম "ব্যানার্জী বোস্ এণ্ড কোং।"

সুশীল কুমার উচ্চপ্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স, এফ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি বি এ পরীক্ষা দিয়াছেন। এখনও ফল বাহির হয় নাই, অবকাশ। সেই জন্য দেশে আসিয়াছেন। তিনি সুশিক্ষিত, বিনয়ী, সচ্চরিত্র এবং অবিবাহিত। তাঁহার পিতা দুই একবার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। ভিতরে একটু কথা আছে তাহা খুলিয়া বলা ভাল।

সুকুমারের ভগিনী কমলাকে তিনি শিশুকাল হইতেই বড় পছন্দ করেন, তাহারই আশায় এখনও বিবাহ করেন নাই। এটা কি দোষের? হয় হউক, আমাদের উপাখ্যান বলা কাজ, করিয়া যাই। সুশীল কুমার পিতার অপেক্ষা নব্য তন্ত্রের দিকে আরও একটু অগ্রসর। স্ত্রী শিক্ষা, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার বাল্যবিবাহ লোপ এই সব সামাজিক তত্ত্বের তিনি একজন উৎসাহী অধ্যাপক।

পরিচয় এইপর্য্যন্ত থাকুক; এখন প্রকৃত কথা চলুক।

(৩)

পরদিন বৈকালে সুশীল কুমার সুকুমারের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সুবৃহৎ প্রাসাদ সদৃশ সৌধ সংস্কারাভাবে একেবারে শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছেন—অলক্ষ্মী একচ্ছত্রা রাজত্ব করিতেছেন, তাহার চিহ্ন সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি সুকুমারের অতীত সুখ সম্পত্তি সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা ভাবিতে ভাবিতে রুদ্ধ বহির্দ্বারে করাঘাত করিলেন। কেহই উত্তর দিল না। পরে ডাকিলেন "কমলা, কমলা" ভিতরে কমলার মাতা কমলার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছিলেন, বাহিরে কে ডাকিতেছে শুনিয়া বলিলেন "কমলা দেখ্ত মা, বুঝি সুশীল এসেছে, যা দোর খুলে দিয়ে আয়। কমলার কবরী বন্ধন সমাপ্ত হয় নাই, তৈল সিক্ত সুচিক্কণ কৃষ্ণ রেশমের মত এক পিঠ চুল লইয়া একখানি রং করা পুরাতন শাড়ী পরা—কমলা "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" মৃদু মৃদু পদে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। চারি বৎসরের পর এই দর্শন। উভয়েরই যেন কেমন নূতন ঠেকিল। কমলা যেন কত অপ্রতিভ হইল। সুশীল কুমার

বলিলেন "কমল, আমাকে কি চিন্‌তে পার নাই ?"

কমলা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার বড় লজ্জা করিতে লাগিল সে দ্রুত পদে একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া কোথায় পলাইয়া গেল। সুশীল কুমার ভাবিলেন—

"ভাল করি পেখন না গেল"

দেখিতে দেখিতে মেঘ ক্রোড়লুপ্ত সৌদামিনীর ন্যায় কমলা কোথায় চলিয়া গেল। তিনিও অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় কমলার মাতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা বলিলেন "সুশীল—এস, এস, ওখানে দাঁড়াইয়া কেন ? তুমিও কি আমাদের পর মনে করিলে ? কমল কোথায় গেল ? সুশীল কুমার অবনত হইয়া কমলার জননীর পদ বন্দন করিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের প্রকোষ্ঠে দেখেন কমলা দূরে অধোবদনে দাঁড়াইয়া নখে কি লিখিতেছে। জননী অলিন্দে একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া সুশীল কুমারকে বসাইয়া নানাবিধ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সুশীল কুমারও তাহার যথোচিত সদুত্তর দিতে লাগিলেন। কমলা নিকটস্থ হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া জননী বলিলেন "কমল, সুশীলের কাছেও তোমার লজ্জা ?—ছি ?—কাছে এস, বস," কমলা অগত্যা জননীর কথায় নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে পর, জননী সুশীল কুমারকে বলিলেন "দেখ, কমলাকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়াছি। আর ত উহাকে আইবড়' রাখা যায় না।"

সুশীল। কমলার মত বালিকার সুপাত্রের অভাব ?

জননী। আমরা যে এখন গরীব হইয়াছি বাবা, গরীবের মেয়েকে কে নেবে ?

সুশীল কুমার দেশের দুর্গতির কথা ক্ষুব্ধ মনে ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় সুকুমার তাঁহার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া—নিকটস্থ দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন আনিলেন। সুশীল কুমার এত শীঘ্র আসিয়াছেন দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়া কমলাকে বলিলেন "কমল শীঘ্র সুশীলকে জলখাবারের জায়গা করিয়া দাও।" কমলা নীরবে নত মুখে অগ্রজের আদেশ প্রতিপালন করিল।

নানাবিধ কথোপকথনে রাত্রি হইল। কমলা অল্পে অল্পে লজ্জাকে পরাস্ত করিল। আবার তাহার পূর্ব্ব সরলতা জাগিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দুই একটী কথায় যোগ দিতে লাগিল।

জননী সুশীলকে বলিলেন "সুশীল, আজ কমলা রান্না করুক, তুমি এখানে খাও। দেখ, কমল কেমন রাঁধিতে পারে। কমল রাঁধিতে পারে ইহা এখন আমার পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় হইয়াছে। জননীর চক্ষু দিয়া দরদর জল পড়িতে লাগিল। সুশীল কুমার বুঝিতে পারিলেন জননী অতীত সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া বিচলিত হইয়াছেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

সুশীল কুমার জননীর নিকট অবগত হইলেন যে কমলা আলস্য কাহাকে বলে জানে না, সহোদরের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, গৃহ কার্য্যেও পরম নিপুণ হইয়াছে। এক গুণবতী প্রতিবেশিনীর দয়ায় সে নানাবিধ সূচীকর্ম্ম ও পশমের শিল্প উত্তম শিখিয়াছে। জননী আজি বহু দিবস পরে পুত্রতুল্য প্রাণাধিক সুশীলকে নিকটে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন অনুভব করিতে লাগিলেন। সুখের সময় যখন সুশীল সুকুমারের সহিত খেলা করিতে আসিত তখন দুইজনকে লইয়া কত উপকথা বলিতেন, কত খেলা দিতেন, তাহাদের দুইজনকে সন্তুষ্ট দেখিলে কতই আহ্লাদিত হইতেন, আজি এ দুঃখের সময়ও তাঁহাকে নিকটে পাইয়া নানাবিধ বাক্যালাপে জননীর তাপক্লিষ্ট অন্তঃকরণ যেন কত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

জননী কমলার হস্ত নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য সুশীলকে দেখাইলেন। সুশীল-কুমার ঐ সকল দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সুকুমার যে এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া কেবল বৃথা সময়ক্ষেপ করেন নাই, সুশীলকুমার তাহাও বুঝিলেন। নিজে শিক্ষার মর্ম্ম ও মধুরতা উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে তিনি কখনও ভগিনীর শিক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন লইতেন না।

অবশেষে জননী বলিলেন "সুশীল, ছেলে বেলায় তুমিই কমলাকে পড়াইতে, তুমি তাহার বর্ণপরিচয় করাইয়া ছিলে, তোমার নিকট পড়িতে সে বড় ভাল বাসিত। গুরুমহাশয় কেবল বেতন লইত মাত্র তুমিই উহার গুরুমহাশয় ছিলে, এখন তুমি একবার তাহার বিদ্যার পরীক্ষা লও।

হাস্য-মুখে সুশীলকুমার কমলাকে ডাকি-লেন। কমলা নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার মুখ লজ্জায় অবনত। জননী বলিলেন "কমল লজ্জা করিলে চলিবে না, পরীক্ষার সময় লজ্জা নাই।"

সুশীল। কমল, তুমি এখন কি পুস্তক পড়িতেছ ?

কমলা। রঘুবংশ।

সুশীল। কি ? কালিদাসের রঘু-বংশ ? মূল ?

কমলা। না, নবীন বাবুর অনুবাদ।

সুশীল। তা ও বেশ উৎকৃষ্ট পুস্তক, ত্রয়োদশ সর্গ পড় দেখি। কমলা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার সতেজ অথচ মিষ্ট স্বরে পয়ার আবৃত্তি শুনিয়া সুশীল ও সুকুমার দুইজনে মোহিত হইলেন। তাহার পর যেখানে কমলা—

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর,
শতমুখে নদীকুল চুমিছে তাঁহারে;
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ অধর
চতুর সরিত পতি তোষেন সবারে।"

পড়িতে লাগিলেন, সুকুমার লজ্জায় অধো-বদন হইলেন। গৌরী ঠাকুরাণী ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু একটু হাস্য করিলেন।

পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া সুশীল কুমার বলিলেন "বাস্তবিক কহিতেছি কমল,

আমি আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার পারিতোষিক আমার নিকট গচ্ছিত থাকিল।"

রাত্রিতে ভোজনের পর সুশীল কুমার নিজ গৃহে আসিলেন। আসিবার সময় কমলার জননী বলিলেন "যত দিন বাড়ীতে থাক প্রত্যহ একবার করিয়া আসিও।" কমলার শিক্ষার বড় সুবিধা হইবে, সুকুমার আহ্লাদিত হইবে আর আমিও বড় সন্তুষ্ট হইব। আমার সে দিন থাকিলে আসিবার জন্য জোর করিতাম, এখন তোমার দয়া।"

বলা বাহুল্য সুশীল কুমার সাগ্রহে সেই অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন।

সুকুমারের গৃহলক্ষ্মী গৌরী ঠাকুরাণী নির্জনে কর্ত্তাকে পাইয়া মৃদু মধুর হাস্যে বদন মণ্ডল জ্যোৎস্নাস্নাত করিয়া বলিলেন "ভগিনীর পড়ার পুরস্কার কি ঐ অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা শ্লোকের মতানুযায়ী হইবে নাকি? তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়।"

সুকুমারের দুঃখের মধ্যে সুখ, অন্ধকারে আলোক, দুর্ভাগ্যে সৌভাগ্য এই গৌরী। গৌরীর চিবুকে হাত দিয়া সুকুমার বলিলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

৪

কেমন? সুশীল কুমার বি, এ, পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ডেপুটী গিরি পরীক্ষা দিবার মনস্থ করিয়া আবশ্যক বিষয়ের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। পরিশ্রমের জন্য সময় বিভাগ করিয়া অপরাহ্ণে যেটুকু অবকাশের ও ভ্রমণের জন্য রাখিয়াছিলেন সেই সময় টুকু কমলার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইল। কমলার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ছিল। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে পুষ্প কলিকা যেমন বিকসিত হইতে থাকে, কমলার অন্তঃকরণও তদ্রূপ অনুকূল উপদেশ ও শিক্ষার সহায়তায় ক্রমশঃ বিকসিত হইতে লাগিল।

নবজাত ঋতুরাজ যেমন বনলক্ষ্মীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবিধ কিশলয় কুসুম সম্ভারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, চিত্রকরের তুলিকা যেমন চিত্রখানিতে বিবিধ বর্ণ বিন্যাসে ক্রমশঃ সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলে, কমলার নব যৌবন তেমনই তাহার দেহশ্রীকে নানা উপাদেয় উপচারে মনোহর করিয়া তুলিতে ছিল। একেত কমলা পরমাসুন্দরী ছিলেন নব যৌবনের লাবণ্য তাঁহার উপর যেন স্বর্ণের উপর রসায়নের কার্য্য করিতে লাগিল। সেই অচিরোদ্গম-যৌবনা কিশোরী যখন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগের সহিত পাঠ আবৃত্তি করিতে থাকিত তখন কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত।

তাহার কুঞ্চিত অলক দাম কম্পিত, নাসাপুট বিস্ফারিত, কপোলদেশ আরক্ত হইয়া উঠিত। পূর্ব্ব সম্পদের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ দুইটী মুক্তার দুল সেই ক্ষুদ্র পাতলা পত্র সদৃশ কর্ণ প্রান্তে দুলিয়া দুলিয়া তাহাদের জন্ম ও দর্শকের চক্ষু উভয় সফল

করিত। কমলার দেহ সম্পদের আর এক বিশেষত্ব ছিল। তাহার অঙ্গ হইতে স্বতঃই পদ্ম গন্ধ বাহির হইত। সুশীল কুমার প্রথমে মনে করিতেন কমলা বুঝি কোন গন্ধ তৈল বা এসেন্স্ ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই দরিদ্রের গৃহে বিলাসোপকরণ গন্ধ তৈল বা এসেন্সের সম্ভাবনা কোথায়? যে বিধাতা গোলাপ কমলাদি কুসুমে, কস্তুরী মৃগে, অধম খটাসে, এমন কি পদদলিত তৃণ সমূহেও অনন্ত সৌরভ ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই বিধাতাই কমলার দেহ শ্রীকে সৌরভ গৌরবে কৃতার্থ করিয়াছেন। সমান রূপ, বয়স, ও তদুপরি উভয়ের সমান মন। এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল, কমলা ও সুশীলকুমার উভয়ে পরস্পর গাঢ় অনুরাগে বদ্ধ হইলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। পিতা ইহার মধ্যে সুশীল কুমারকে কলিকাতা যাইবার জন্য মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন। কিন্তু তিনি রাজধানী অপেক্ষা নির্জন পল্লীগ্রামই, পাঠানুশীলনের পক্ষে প্রশস্ত এই কথা বলিয়া পিতাকে নিরস্ত করিতেন। প্রকৃত কারণ পিতার অগোচর থাকিলেও তাহা পাঠিকা ভগিনীদিগের অজ্ঞাত নাই।

কমলার মাতা ও ভ্রাতা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না। অথবা তাঁহারা এই শুভ অনুরাগে পরম আহ্লাদিতই হইলেন। সুশীলকুমারের পিতা ধনবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। পুত্রের বিবাহে অর্থোপার্জ্জন তিনি কখনই করিবেন না, বিশেষতঃ তিনি যেরূপ পুত্রবৎসল, তাহাতে সুশীল কুমারের অভিলাষে তিনি কোন বাধাই দিবেন না। সুতরাং সুশীলকুমার ও কমলার সৌন্দর্য্য পূর্ব্ব রাগে পর্য্যবসিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কোন আশঙ্কারই সঞ্চার হইল না।

ডেপুটী পরীক্ষার সময় আসিল। সুশীল কুমার অতি কষ্টে কমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেলেন। কমলার মাতার অভিপ্রায় ছিল যে সুশীল কুমারের সহিত বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া সুশীল কুমারের কি ইচ্ছা তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে। কিন্তু কি জানি আবার কি ভাবিয়া সে কথা বলি, বলি, করিয়াও বলিলেন না। কেবল কমলার জন্য একটী সুপাত্রের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সুশীল কুমারকে বিশেষ অনুরোধ সহকারে বলিলেন। সুশীল কুমারও নত মুখে "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জানাইলেন ও সুকুমার প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

সুশীল কুমার কলিকাতা পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে সুকুমার নিম্নোদ্ধৃত পত্রিকাখানি প্রাপ্ত হইলেন;—

"ভাই সুকুমার,

"আমি এখানে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমার মন প্রাণ তোমাদের নিকট পড়িয়া আছে। মা আমাকে অনেক করিয়া কমলের জন্য সুপাত্রের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছেন আমি ঘোর স্বার্থান্ধ, আমা হইতে এ কাজ হইবে না

যদি তোমাদের কোন আপত্তি না থাকে আমি কমলার সুখ শান্তির নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তোমরা সম্মত না হও তাহাও আমাকে জানাইও ;—আমি পথ চাহিয়া রহিলাম।

"আমার পিতা মাতার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিমত।

তোমার স্নেহাস্পদ
শ্রীসুশীল কুমার".

সুকুমার ও তাঁহার মাতা হাতে স্বর্গ পাইলেন। রূপে, গুণে বিদ্যায়, চরিত্রে, কুলে, শীলে, সম্পদে এমন সুপাত্র সকলের পক্ষেই দুর্লভ,—তাঁহাদের মত দরিদ্রের পক্ষেত কথাই নাই। তাঁহারা ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, মাতা মনে মর্মে কত ঠাকুরের পূজার মানসিক করিলেন।

সুকুমার ফেরত ডাকেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া পত্র দিলেন। পরে উভয় পক্ষ হইতে যথারীতি বাগ্‌দান হইয়া গেল। বাগ্‌দানের পর স্থির হইল যে ডেপুটী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইলে—বিবাহ হইবে।

কমলা ও সুশীল কুমার এখনও বিবাহিত হন নাই কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই একখানি পত্র বিনিময় হইত। ইহা সুনীতি কি কুনীতি তাহার বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি, নৈতিক অধ্যাপকের আসন লইতে বসি নাই।

পাঠিকায়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ভাবিবেন "বেহায়া মেয়েটা কি লেখে"—তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কমলার পত্র একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

শ্রীচরণেষু।—

আপনার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ও আপনি ভাল লিখিতে পারিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। এখন আপনার অবকাশ আসিল; এইবার আমার কবিতা-গুলি আপনাকে দেখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর, আপনার যাহা ইচ্ছা পুরস্কার দিবেন। আপনি এখান হইতে গিয়াছেন, সেই অবধি লেখা পড়ায় মন লাগিতেছে না।

আপনার উপদেশ মত ঈশ্বরোপাসনা ও কবিতা রচনা আমার অবলম্বন। আপনি আমার--থাকুক সে কথা। আজ একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইতেছি দেখুন।

বসন্ত পঞ্চমী।

প্রভাত চতুর্থী নিশা, পঞ্চমীর রবি,
উদিল পূরবাকাশে মনোহর ছবি।
রক্ত বাস পরীধান প্রকৃতি সুন্দরী।
হাসিছেন নীহারের মুক্তা মাল্যপরি।
মলয় অচল হ'তে হইয়া বাহির।
এই মাত্র সমাগত বসন্ত সমীর।
বসন্তের আগমন করিয়া শ্রবণ।
উত্তরের পথে শীত করে পলায়ন।
পাপিয়া কোকিল আদি বিহঙ্গমগণ।
অগ্রসরি ঋতু রাজে করে আবাহন।
বাসক অশোক বক কিংশুক সুন্দর।
গাছে গাছে বিকসিত কুসুম বিস্তর।

পুণ্য তোয়া গঙ্গানীরে শত নারীনর
স্নান সমাপন করি চলেছেন ঘর।
সঙ্গে কত দলে দলে বালক বালিকা
হস্তে ফুল বিল্ব পত্র আম্রের কলিকা।
মণ্ডপে প্রতিমা শোভে নীলাম্বর পরা,
শ্বেতকায় সিতাম্বুজে হস্তে বীণা ধরা।
পুরোহিত ভক্তি ভরে করিছেন ধ্যান,
বালক বালিকা করে পুষ্পাঞ্জলি দান।
"দাও বিদ্যা দাও যশ, দাও পুত্র ধন,"
এই বলি নমস্কার করে কতজন।
কমলা প্রণতি করে সারদার পায়
"দাও তাঁরে"—মন আর কিছু নাহি চায়।

কমলা। (ক্রমশঃ)

অশুভশংসী বায়স।

দেবররাজ মানসিংহের পুত্র রামসিংহ, স্বীয় দর্প ও ঔদ্ধত্যগুণে আত্মীয় স্বজন সকলের অপ্রিয় চক্ষুঃশূল হইয়া, নিতান্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন। পিতৃব্য ভক্তসিংহের সহিত বিবাদ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

ভোজনগরের জারিজা মহিষী পিতৃসদন হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বামীর রণসঙ্গিনী হইয়া এই সেনানিবেশে আসিয়া উপনীত হইলেন।

মহিষী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানের সহিত শকুন শাস্ত্রে বিলক্ষণ সুদক্ষা ছিলেন।

কিন্তু এতাবৎকাল তাহার সম্যক্ পরীক্ষা ঘটে নাই।

মহারাণী সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র স্বামীর এই দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত থাকিতেন, কিন্তু প্রতিকারে ক্ষমতা ছিল না। উপস্থিত অন্তর্ব্বিবাদের কারণ পরিজ্ঞাত ছিলেন, সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া দিন কাটাইতেছিলেন।

যখন অমঙ্গলের বায়ু বহিয়া যায় তৎকালে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্তরের বাহিরে প্রকাশিত হইতে থাকে।

অদ্য রজনী পোহাইবামাত্র ভগবান্ মরীচিমালী সহস্র কিরণে দিগন্তের গায়ে ফুটিবামাত্র ধরণী নয়ন উন্মীলন করিল।

মানবের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই পশু পক্ষী সর্ব্বাগ্রেই দিবসের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

রাজা রামসিংহ এখনও নিদ্রিত। জারিজা মহিষী উষাকালে উঠিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবার্চ্চনায় বসিয়াছেন, কিন্তু ঘোর কুগ্রহ তাহাকে দেবনিকেতনেও পরিত্যাগ করিতেছে না। তিনি কোন মতে একাগ্রচিত্তে দেবতার শরণাগত হইতে পারিতেছেন না। কেবল অমঙ্গল কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া, চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে।

পটগৃহের বস্ত্রপ্রাচীরের দক্ষিণ দিকে কোথা হইতে একটা কৃষ্ণবর্ণের কাক আসিয়া অতি কর্কশস্বরে তিনবার কা কা কা ধ্বনি করিয়া উঠিল।

চঞ্চলচিত্তা দেবপূজানিরতা মহিষীর সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে রাজপূতরমণীর ন্যায় দৃঢ় মনে একটী বন্দুকের সাহায্যে বায়সের প্রাণ সংহার করিয়া আবার নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্না হইলেন।

বন্দুকের শব্দে রামসিংহের হঠাৎনিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সুকোমল শয্যায় শুইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। কাহার হঠকারিতায় তাঁহার কল্পনারাজ্যোপভোগ ভঙ্গ হইল, ইহা ভাবিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ কুপিত স্বরে পরিচারকগণকে আহ্বান করিয়া বিনা বিচারে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন।

কে এমন সুপ্রভাতে বন্দুকের ধ্বনি করিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে আনয়ন কর। পরিচারক কহিল "মহারাজ অপর কেহ নয় স্বয়ং জারিজামাহিষী বন্দুকের আঘাতে বায়স হত্যা করিয়াছেন। পাছে মহারাজের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়।"

উদ্ধত নৃপতি ক্রোধে এমন অন্ধ হইয়া ছিলেন যে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকেও ক্ষমা করিতে অপারগ হইলেন।

কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন রাণীকে বল এখনি আমার রাজ্য ত্যাগ করুন।" আমি এমন স্ত্রীর মুখ দর্শন করিব না। এই আজ্ঞা লইয়া দাসী উপাসনা গৃহের সন্নিধানে গিয়া অতি বিনীত ও কুণ্ঠিত ভাবে দণ্ডায়মানা রহিল।

এরূপ পরুষবাক্যে মহারাণীর দুর্ব্বিপাকের সংবাদ দিতে তাহার মুখে বাক্য সরিতেছে না।

রাণী অশুভভাষী বায়স হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন মনে করিলেন বটে কিন্তু তাহার হৃৎপিণ্ড অনাহত ভাবে বাজিতে লাগিল। চক্ষে স্বতই অকারণে জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল। পুষ্পমালে পরিশোভিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, হরধ্যানমগ্না স্বয়ং গৌরী স্বরূপিণী রাণীর স্বরূপ দর্শনে, দাসী মুগ্ধা হইয়া অনিমিষ নয়নে সেই দেব শোভা দেখিতেছিল।

দুর্ভাবনা রাণীর একাগ্রতা ভঙ্গ করিল। চক্ষুরুন্মীলিত করিবামাত্র দেখেন দাসী অসময়ে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া। তিনি নির্ম্মাল্য গ্রহণ না করিয়া ব্যস্ততা সহকারে অতি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন—

"কেন দাসী এ অসময়ে? কি অভিপ্রায়? দাসী করপুটে বিনয়াবনত বদনে অশ্রুগদগদ স্বরে কহিল "মহারাজের আদেশ লইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া নীরব হইল। তখন জারিজা মহিষীর অন্তঃকরণে বায়সের অমঙ্গল বাণীর সত্যতা জাগিয়া উঠিল কহিলেন দাসি! তুমি নির্ভয়ে রাজার আজ্ঞা পালন কর। দাসী কহিল বায়স হত্যাকারীর রাজ্যত্যাগ আদেশ হইয়াছে॥

রাণী শুনিবামাত্র স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া আবার কিয়ৎক্ষণ দেবতার দিকে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন, পরে দাসীকে কহিলেন "আচ্ছা আমাকে একবার রাজ সন্নিধানে লইয়া চল।"

দাসী রাজসমীপে রাণীর কাতর নিবেদন জনাইলেও অসম্মত হইলেন এবং কহিলেন এরূপ স্ত্রীর আমি মুখ দর্শন করিব না, রাণীকে পিত্রালয়ে যাইতে বল।"

রাণী বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া আবার বিদায় দর্শন প্রার্থনা করিলেন, তখন পাষাণ হৃদয় রাজার মনে আপত্তির মেঘ কাটিয়া গেল।

রাণী আসিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় স্বামীর পদে লুণ্ঠিত হইয়া কতই কাকুতি মিনতি পূর্ণ বচনে কহিলেন "স্বামিন্ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। জীবনে এমন ভুল আর হবে না! বরং এই নিষ্ঠুর আজ্ঞার পরিবর্ত্তে আমার এই তুচ্ছ প্রাণ নিহত করিতে আদেশ করুন।" গর্ব্বিত রামসিংহের প্রস্তর কঠোর হৃদয় অনমনীয়। পত্নীর করুণবাক্যে দ্রব হইল না, তিনি সজোরে পা ছাড়াইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন না—কখনই না, পুরুষের যে কথা সেই কাজ। আমি বীর! আমি রমণীর ছলনায় প্রতারিত হই না। তুমি এই দণ্ডেই বিদায় হও।"

সমুদ্র মধ্যে ঝটিকা বিতাড়িত ভগ্ন তরণীর ন্যায় একটি তরঙ্গাঘাতে নৌকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার কুলে পড়িল।

রামসিংহের এরূপ অন্যায় কার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রাজপুতবালার হৃদয়ে ঘৃণা অভিমান প্রদীপ্ত হইয়া পড়িল। তখন একেবারেই তাহার রূপের পরিবর্ত্তন হইল।

তিনি আহত ভুজগীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি ত্যাগ করিলেন, ভাল! আমাকে আপনি ত্যাগ করিলেন ভাল! কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সতীর নয়নের জলে, হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে মারবারের সিংহাসন দগ্ধ হইবে!!"

মহিষী এই অভিশাপ প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন, আর সেই উদ্ধত পতির মুখের দিকে চাহিলেন না। অভিমানিনী তদ্দণ্ডেই, পিতৃসৈন্য সমভিব্যাহারে স্বামিরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

পরমুহূর্ত্তেই রামসিংহের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল ও অকস্মাৎ দশাননের ন্যায় রাজমুকুট মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী।

সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা।

এ দেশের অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস—পরাধীন জাতির কোনও কালে উন্নতির আশা নাই। কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকল্পে এমন অনেক কার্য্য আছে, যে, সে সকলের সহিত রাজার বা রাজবিধির প্রতিকূলতার সম্ভাবনা নাই। রাগদ্বেষাদিশূন্য, প্রশান্ত পবিত্র হৃদয় যেমন সেই নিত্য—সত্য—ভূমানন্দময়ের বিহার ক্ষেত্র, সদাচারপূত সুসংস্কৃত লোকসমাজ সেইরূপ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিহারক্ষেত্র। মলিন দর্পণে যেমন

পদার্থ প্রতিফলিত হয় না, কলুষিত সমাজে সেইরূপ উন্নতির ছায়াও পতিত হয় না। ভূরি ভূরি কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় আমাদের উন্নতির পথ চাপা পড়িয়া আছে। সে আবর্জ্জনারাশি যাবৎ পরিষ্কৃত না হইবে, তাবৎ গন্তব্য পথ প্রকাশিত হইবে না। এজন্য প্রকৃত স্বদেশসেবা—সমাজসংস্কার।

আমাদের অধোগতির প্রধান কারণ—স্ত্রীশিক্ষার অভাব। "আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামা সনাতনম্"—নারীগণ, আত্মার পবিত্র ও সনাতন জন্মক্ষেত্র। এই ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধতা ও শাশ্বত পুণ্যশীলতা সন্তানের সর্ব্বকল্যাণের নিদান। সংক্ষেত্র বিনা সুফলের প্রত্যাশা কোথায়? যাঁহাদের উপর সমস্ত মানবজাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের তদুপযোগিনী শিক্ষা যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ দেশের আধুনিক প্রসূতি ও সন্তানগণের অবস্থা ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। এ সংসার, রুগ্নভগ্নের আর্ত্তনাদের জন্য নহে, নির্জীব পুত্তলিকার ভূমি নহে। ইহা কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র। এ স্থানে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় অখণ্ড কর্ম্মবীর চাই।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়রমণীরা গর্ভাবস্থায় বীর-চরিত্র শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন দ্বারা সেই ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। অলক্ষ্যভাবে তাঁহাদের গর্ভস্থ শিশুরা, সেই সকল ধর্ম্মবীর, দয়াবীর, দানবীর ও রণবীরগণের তেজে অনুপ্রাণিত হইত। শিশুগণকে জননীরা নানা উপায়ে সৎসাহসে ও সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিতেন।

পৃথিবীতে যাঁহারা বড়লোক হইয়াছেন, অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলে বড় মায়ের সন্তান। প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা যেমন সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয়। কিন্তু কঠিন বলিয়া পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। আমাদের কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, আমাদিগকে চূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে, আমাদের অস্তিত্বই থাকিবে না। স্ত্রীশিক্ষাই প্রত্যেক পরিবারের গৃহসংস্কারের মূল, এবং প্রত্যেকের গৃহসংস্কারই সমাজসংস্কার।

যে জাতি যতই অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হউক না, তাহাদের উন্নতি বিষয়ে এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা, তাহারা রাজসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন করিতে পারে। আমাদের সমাজশরীরে অনেক গুলি মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। সে সকলের নিরাকরণ বিষয়ে কস্মিন্ কালেও রাজকীয় প্রতিকূলতার আশঙ্কা নাই। আমরা সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃত শাস্ত্রানুশাসন, লঙ্ঘন পূর্ব্বক কুসংস্কার ও কদভ্যাসের দাস হইয়া, যে সকল অনাচারের বিষময় ফল ভোগ করিতেছি, তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? গৃহসংস্কার বা আত্মসংস্কার স্বয়ং না করিলে কে করিবে? বংশপরম্পরা যাহাতে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ধর্ম্মবীর, ও কর্ম্মবীর হয়, তদনুরূপ নিয়মে দায়ক্রিয়া ও জীবনপ্রণালীর অনু-

ষ্ঠান সমস্ত শাস্ত্রকারের অভিমত। আমরা বৈবাহিক সম্বন্ধকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছি। সম্বন্ধপরিসরের এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের জাতীয় বলপুষ্টির অন্তরায়। হিন্দুশাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে, অসবর্ণ বিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন,—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,"—হীনবংশ হইতেও নারীরত্ন গ্রহণ করিবে। অনন্তর ভগবান্ মনু প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন ;— (১)

"অধমকুলোৎপন্না অক্ষমালানাম্নী রমণী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহিত, এবং ঐরূপ নিকৃষ্টজাতীয়া শারঙ্গীনাম্নী রমণী মন্দপালনামক মহর্ষির সহিত বিবাহিতা হইয়া সর্ব্বলোকের পূজিতা হইয়াছিলেন।" কিন্তু হায়! অসবর্ণ বিবাহ দূরে থাক, আমরা সবর্ণ বিবাহপরিসরকেও সঙ্কুচিত করিয়াছি। রাঢ়ীয় বৈদিক, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, এবং উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থ কি পরস্পর সবর্ণ নহে? বঙ্গের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, প্রভৃতিরা পশ্চিমের ও অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির কি সবর্ণ নহে? তবে কেন আমরা সম্বন্ধবিস্তারের পথরোধ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষেত্র ও বীজের ধ্বংস সাধন করিতেছি? উপনিষদে "দুহিতা" শব্দের

(১) বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইল না, সেই সকল প্রমাণের অর্থ মাত্র প্রদত্ত হইল।

এইরূপ ব্যুৎপত্তি, যথা,—"দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা"—অর্থাৎ কন্যার বিবাহসম্বন্ধ যতই দূরে দূরে হয় ততই মঙ্গল। বৈবাহিক সম্বন্ধের ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হয়, বলবীর্য্যাদির ততই উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। অধুনা অপূর্ণযৌবনা নারীরা অপকবীর্য্য পতিরসহবাসে সন্তান প্রসব করিতেছেন। দম্পতীর অনাচারে প্রসূতি ও সন্তানগণ অশ্রুতপূর্ব্ব উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, অশেষ যাতনা পাইতেছে ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহাতে সমাজের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বকালে যখন এ ভারতভূমি বীরভূমি বলিয়া খ্যাত ছিল, তখনকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তখনকার তুলনায় আমরা সে দেশীয় ও সে জাতীয় বলিয়া পরিচিত হইবার বিন্দুমাত্রও যোগ্য নহি। আমরা মনু, পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিগণের ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সে সকল আর্য্য ঋষির কোন ধার ধারিনা। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় মনুষ্য ; আমরা কেবল মারাত্মক কুসংস্কারপরম্পরার অধীন। প্রয়োজন হইলে স্বকপোলকল্পিত বচনকে প্রাচীন ঋষিবাক্য বলিয়া ঘোষণা করিতেও পরাঙ্মুখ হই না। হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বাস যে, কন্যার প্রথম যৌবন গর্ভাধানের অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির প্রকৃত সময়। কিন্তু যুক্তি বা শাস্ত্র ইহার বিরোধী। যেমন শিশুদের দন্তোদগম হইবামাত্র, সে

দন্ত কঠিন খাদ্য চর্ব্বণের উপযোগী হয় না, তেমনি কন্যার প্রথম ঋতুর আবির্ভাবেই, সে কন্যা সন্তানজননী হইবার যোগ্য হয় না। আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

—যে নারীর ষোড়শ বর্ষ বয়স পূর্ণ হয় নাই, এবং যে, পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, সে পুরুষ কর্ত্তৃক সে নারীর গর্ভাধান হইলে, সে গর্ভ বিনষ্ট হইবার কথা। যদি তাহাতে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তবে সে সন্তান অধিক দিন বাঁচে না ; যদি বাঁচে, সে যাবজ্জীবন নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অবস্থায় জীবন্মৃত হইয়া থাকে। হায় ! এ সকল অমূল্য ঋষিবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, সমাজ উৎসন্ন হইতেছে। অনেকেই মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ও মহাভারতাদির দোহাই দিয়া স্বকীয় কুসংস্কার সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আচার্য্যগণের বিধিব্যবস্থার কোনও সংবাদ অবগত নহেন। বাল্যবিবাহ, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। মনু বলিতেছেন ;—

—পিতৃগৃহে কন্যা (কুমারী অবস্থায়) বয়স্থা হইয়া বরং যাবজ্জীবন বাস করিবে, তথাপি তাহাকে অপাত্রে দান করিবে না।

মহর্ষি ব্যাস বলিতেছেন ;—

—মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, সৎকুলোদ্ভবা, সুলক্ষণা, বয়স্থা, (যুবতী) কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

এ সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা যে যথাবিধি পালিত হইত, পূর্ব্বতন আচারব্যবহারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক রাজকন্যারা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারীরা পূর্ণযৌবনে স্বয়ংবরা হইতেন। কথিত আছে ;—পূর্ণযৌবনা, সুশিক্ষিতা সাবিত্রীদেবী মনোমত বরের অনুসন্ধানে স্বয়ং নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, ধর্ম্মবীর, সত্যব্রত, সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছিলেন। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য। কিছুদিন হইতে এ দেশে আর একটী সর্ব্বনাশ প্রবেশ করিয়াছে। এ সর্ব্বনাশের নাম "কন্যাদায়"—অর্থাৎ বরপক্ষ কর্ত্তৃক কন্যাপক্ষের সর্ব্বস্ব হরণ। অধিকতর পরিতাপের বিষয় যে, এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক ব্যাপার এ দেশের শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রনামধারী মহাত্মারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ কার্য্য লোকবিদ্বিষ্ট ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কন্যার পিতারা নিজ নিজ অবস্থানুসারে কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিবেন, ধর্ম্মশাস্ত্রেরও ইহাই অভিপ্রায়। কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপক্ষের অর্থাদি প্রার্থনা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নীচতার একশেষ। কন্যাপক্ষ বা বরপক্ষ, কেহ কাহারও নিকট অর্থাদি, দাতার অনিচ্ছায়, পীড়নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, তাহাকে অপত্যবিক্রয় বা শুক্রবিক্রয় বলে। এরূপ কার্য্য সর্ব্বলোকনিন্দিত, সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতীব গর্হিত কার্য্য। অহরহঃ চক্ষের উপর দৃষ্ট হইতেছে, কতশত কন্যার পিতা, মাতা কন্যাবিবাহে সর্ব্বস্বহীন, গৃহশূন্য হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, অনেকে আত্মহত্যাও করিয়া-

ছেন। এ ভীষণ কুপ্রথা নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের বিবাহে কন্যাপক্ষের এ সর্ব্বনাশ অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। আজি কালি স্বদেশের উন্নতির কার্য্যে ছাত্রগণই অগ্রগামী। তাঁহারা কেন সকলে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন না, যে—"আমরা আমাদের বিবাহে কন্যাপক্ষ পীড়ন করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না।" যেদিন তাঁহারা এ কার্য্য করিতে পারিবেন, সেইদিন লোকে তাঁহাদের স্বদেশভক্তির বিশুদ্ধতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শন করিবে, তাঁহারা স্বদেশের একটী যথার্থ কল্যাণ সাধন করিবেন।

এ দেশের সমাজসংস্কারার্থিগণের অন্যতর করণীয় বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহদান। বিধবার মর্ম্মনিষ্ঠ্যূত বেদনার অশ্রু, দেশের ঘোর অকল্যাণ, মনু বলিতেছেন;—"শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্"—যে ভবনে কুলকামিনীর শোকাশ্রু পতিত হয়, তাহা সপরিবার শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে বিধবা-বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠিতে দেখিয়াছি। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ হইলে তাঁহারা, "ব্রহ্মচর্য্য", 'সংযম' প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করেন। 'ব্রহ্মচর্য্য', 'যোগ', 'মোক্ষ' প্রভৃতি অতীব উচ্চ কথা, সন্দেহ নাই, এবং এ সকলের সাধনায় যিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি বিশ্বের নমস্য দেবতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা যুবতী বিধবার জন্য এ ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, প্রবীণ হইয়াও, পত্নীবিয়োগে কয়জন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন? অনেকে উপযুক্ত পুত্র পৌত্রাদিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়াও বৃদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া, দেশকে অপূর্ব্ব সংযমশিক্ষা দান করিয়া থাকেন! ব্রহ্মচর্য্য কি বালবিধবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে?

যখন বিশ্বমিত্র, পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি শীর্ণপর্ণভোজী, মহাতপা মহর্ষিগণেরও পদস্খলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন যুবতী বিধবারা সংসারের সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, দুষ্কর ব্রহ্মচর্য্যে অস্খলিতা থাকিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতার কার্য্য। বিশেষতঃ এক্ষণে হিন্দু-পরিবারে সে সংযমশীলতা, সে কঠোরতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সে নিরম্বু একাদশী-পালনাদি কঠোরতার অভ্যাস দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কঠোর নিদাঘে বারি-বিন্দুর জন্য শুষ্ক কণ্ঠে ও শুষ্ক বক্ষে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এরূপ বিধবার সংখ্যা আর অধিক দেখা যায় না। যে সকল বিধবা ব্রহ্মচর্য্যে অটল থাকিতে পারেন, ধর্ম্ম-সাধনায় দেহপাত করিতে পারেন, তাঁহারা নমস্যা, তাঁহারা মানবীরূপিণী দেবতা, সন্দেহ নাই। যখন কালস্রোতে সে সংযম, সহিষ্ণুতা সে তিতিক্ষা, সহস্র উপবাসাদি কৃচ্ছ্রে ও সে কার্য্যকরী শক্তি ক্রমেই অদৃশ্য হইল, তখন বালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের পথরোধ করিয়া, সমাজমধ্যে ব্যভিচার

ও ভ্রূণহত্যাদি পাপের প্রশ্রয় দান করা সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা এখনও বিধবাবিবাহের প্রতিকূলতা সাধনে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা মানবতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ অথবা পৈতৃক কুসংস্কারে অন্ধ।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি কি বলিবে। যিনি কলিযুগের সাক্ষাৎ মনু, স্বদেশের মঙ্গলই যাঁহার অদ্বৈত সাধনা, মাতৃভাষার ও মাতৃরূপিণী বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন যাঁহার জীবনের মূলবন্ধন, সেই ধর্ম্মবীর, দয়াসাগর, অশেষশাস্ত্রপারদর্শী, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্যাপি কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কখনও কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবেন, বলিয়া মনে হয় না।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। রাজ সম্মান—সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ বড়লাট সাহেবের সভার আইনসভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই উচ্চপদে কোন ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত উপবেশন করেন নাই। যোগ্যপাত্রে এই উচ্চপদ প্রদত্ত হইয়াছে।

২। ষড়যন্ত্র— কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীরের মহিষী বর্ত্তমান আমীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্রকে তৎপদে বসাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আমীর তাহা জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে তোপে উড়াইয়া দিতেছেন।

৩। ভারতবাসীর স্বত্ব—বিলাতে "সিভিল রাইটস্ কমিটী" নামে ভারতবাসীর স্বত্ব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভা হইতে বর্ত্তমান নির্ব্বাসনপ্রথার অবৈধতা প্রমাণের জন্য চেষ্টা হইতেছে।

৪। সমবেদনা—বোম্বাই গবর্ণর সার জর্জ ক্লার্কের পত্নী কিছুদিন পূর্ব্বে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ২১শে মার্চ্চ তাঁহার একমাত্র সন্তান কুমারী ক্লার্কও তাঁহার মাতার অনুগমন করিয়াছেন। ভগবান্ শোকার্ত্ত পিতার হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন।

৫। রামকৃষ্ণোৎসব—কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান। গত ২১শে ফাল্গুন এই পবিত্র স্থানে রামকৃষ্ণোৎসব, উপলক্ষে অনেক লোক সম্মিলিত হইয়া প্রথম মহোৎসব সম্পন্ন করেন। আশা করা যায় মহাত্মা ব্যক্তির পুণ্যময় জন্মস্থান চিরস্মরণীয় থাকিবে।

৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ১০ই ও ১১ই এপ্রিল হুগলীতে হইবে।

৭। কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়—কলিকাতার মূক ও বধির বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য গত

২০শে মার্চ্চ সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী লেডী হ্যামিল্টন পারিতোষিক বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৫০টী ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। সকলেই এই বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন এবং সভাপতি মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে ২০০৲ শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৮। স্মৃতি-সভা—স্বর্গীয় মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মরণার্থ বার্ষিক সভা গত ২০শে মার্চ্চ ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মুক্ত করা হয়।

৯। স্বদেশী শিল্প—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানা স্থানে স্বদেশী শিল্পের অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি ভারতসচিব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যের জন্য যে সকল দ্রব্য এদেশের উপকরণ হইতে এদেশে প্রস্তুত, তাহার মূল্য বিলাতি হইতে বেশী হইলেও তাহা ক্রয় করা হইবে এবং বিলাতী উপকরণে এদেশে প্রস্তুত দ্রব্যও ঐ নিয়মে ক্রয় করা হইবে। যে সকল দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, তাহা বিলাত হইতে আমান হইবে এবং যাহাতে সে সকল দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইবে।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। কৃমি রোগে। কৃমি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রথমে গুঁড় খাইয়া পরে বাসি জলের সহিত খোরা সানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ কৃমি সত্বরনিপতিত হয়।

২। দাড়িমের শিকড় ২ তোলা, জল ॥০ অর্দ্ধসের শেষ ৴৷০ অর্দ্ধপুয়া থাকিতে নামাইয়া খাইলে ছোট ছোট কৃমি মরিয়া যায়। এই মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে।

বামারচনা

ফল্গুৎসবে

বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি,
হরষে উদিল আসি,
প্রকৃতি উচ্ছ্বাসময়ী জোছনার বুকে
প্রেমে মাতোয়ারা প্রাণ,
নাহি মান অপমান,
আনন্দে কল্লোলতান তুলিয়াছে সুখে।

শিশু যুবা-বৃদ্ধ সঙ্গে,
নৃত্য গীত নানা রঙ্গে,
প্রমত্ত আজিকে হের প্রমোদকুহকে।
আবিরে কুঙ্কুমে মাখা,
যেন রক্তাম্বরে ঢাকা,
জল স্থল ক্ষিতি নভ লোহিত আলোকে।

লাল পাতা লাল ফুল,
লাল পাখি বুল বুল,
আবিরে আবিরীবর্ণ আবিরি স্বরূপে।
অনুলেপে মাখামাখি,
সৌগন্ধে রাখিছে ঢাকি,
ছলে বলে পরাজয়ী লভিবে কৌতুকে।
আমোদে মদিরা পিয়ে,
প্রমত্ত হৃদয় লয়ে.
উদ্দাম তরঙ্গ মাঝে চলিছে নির্ভিকে।
ক্ষণেকের কোলাহলে,
স্রোতে অঙ্গ দেছে ঢেলে
ভুলে গেছে এ সংসার কিসের চকিতে।
এখনও জানেনা হায়.
এ যেন স্বপন প্রায়,
ভাঙ্গিলে মোহের ঘুম যাবে কোথা ভেসে।
স্মৃতিটুকু বুকে লয়ে,
নীরবে নীরবে চেয়ে,
অশ্রুবিন্দু ঝরিবেক ভাবি অবশেষে।
এ আমোদ কোলাহল ঘোর যাবে শেষে
আঁধারে ফুটাতে আলো,
প্রকাশে চমক ভালো,
সুখটুক ক্ষণস্থায়ী;দুখ পাছে আসে।
সৃজনলয়ের লীলা এ বিশ্বে প্রকাশে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বর্ষশেষ।

দেখিতে দেখিতে বর্ষ জলবিম্ব প্রায়,
অনন্ত সে ভূতনীরে মিশাইছে হায়!
সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে আশা কত,
চিরতরে অতীতেতে হইতেছে গত।
কারেও পতিত করি কারেও উন্নত,
কারে দুঃখে কারে সুখে কারে আশাহত
বিষাদ-নয়ন-নীরে কারে ভাসাইয়া,
কারে বা আনন্দে হর্ষে নিমগ্ন করিয়া।
কঠোর নিয়তি-বশে যেতেছে চলিয়া;
অসমাপ্ত সাধ আশা সকলি ফেলিয়া।
এইমত কত বর্ষ হেরিয়াছি হায়!
গিয়াছে অপূর্ণ বাঞ্ছা লইয়া হিয়ায়।
তবু মোর এতদিনে নাহি হ'ল জ্ঞান,
বর্ষ সম হবে মোরে করিতে প্রয়াণ।
কালসিন্ধু-মহাস্রোত আসিবেক যবে,
মোরে ওই বর্ষ মত ভাসি যেতে হবে।
কিছুতে সে স্রোতবেগ নারিব রোধিতে;
যেতে হবে জীবনের সাধ না মিটিতে।
কর্ম্মশূন্যা হীনা আমি গেলে ধরা হতে—
বিন্দুমাত্র স্মৃতি মোর রবে না জগতে।
কিন্তু কত ঘটনার রাখি স্মৃতিলেশ;
চিরতরে হইতেছে ওই বর্ষ শেষ।

বর্ষশেষে।

আজি বরষের শেষে
নিরজনে একা বসে
গাঁথিতেছি অতীতের সুচিকণ হার
গুছাইয়ে গ্রন্থিগুলি
দিয়ে শত যোড়া তালি
বাঁধিতেছি মরমের ছিন্ন বীণা-তার।

কত কি যে এলোমেলো
অন্তরের ভাষাগুলো
ভাবের তরঙ্গ পরে তরঙ্গ গড়ায়

৪

আজি এই সন্ধ্যাবেলা
গাঁথিয়া ফুলের মালা
পরাইয়া দিনু সুখে অতীতের গায়।

সে পুরবী সাধা বীণা
হিয়ারে! আর গেও না—
থামরে! শিখাই নব সকরুণ তান

৬

নাশি হৃদি-আবিলতা
বেদনার অশ্রু-গাথা
অস্ফুট মুকুল ভক্তি সাধনার গান।

শ্রীমতী প্রিয় বালা রায়

ধ্রুবহারা।

গিয়াছ কি ধ্রুব, হরি অন্বেষণে
ছাড়িয়া সুখের সংসার হায়।
করে হাহাকার শূন্য গৃহদ্বার
পিতা তব শোকে পাগল প্রায়।
কাঁদেরে জননী লুটায়ে ধরণী
মণিহারা ফণী যেনরে আজি।
কেনরে মাণিক আঁধারিয়া গেলে
ছিল ধরিধার শোভায় সাজি॥
নয়নের তারা তুমি ধ্রুবতারা
গোবিন্দ স্মরব হৃদি-গগনে।
একমাত্র রবি কেন অস্ত যায়
বঞ্চিত জীবন কেন সে ধনে॥

প্রতিমার সনা বধূ নিরুপমা
বালিকা কাঁদিছে তোমার তরে
কেন রে তাহারে অকূল পাথারে
ভাসালে অকালে এমন করে॥
কেন অকস্মাৎ হেন বজ্রাঘাত
পড়িল সাধের সংসার মাঝে।
দগ্ধ প্রাণ কেন কেঁদে ভেসে যায়
পুরজনে হেরি পরাণে বাজে॥
কেন কেন করে প্রাণের ভিতরে
সুধাই কাহারে উত্তর নাই।
তুমি যেই ঘরে ছিলে আলো করে
সেই দিক্ পানে ফিরে তাকাই॥

১৩১৫ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সংকীর্ত্তি।

২১৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ।
৩৮৮ সংখ্যা।

বৈশাখ, ১৩০৪—মে, ১৮৯৭।

৬ষ্ঠ কল্প।
২য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

১৩০৪ সাল।

ইং ১৮৯৭—৯৮।

সংবৎ ১৯৫৪-৫৫, শক ১৮১৯,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৮—৬৯।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
+এপ্রেল	মে	জুন	জু	আ	সে
বৃ	শ	ম	বৃ	র	বু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা*	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
র	সো	বু	বৃ	শ	সো
২৯	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০
অ+	ন	ডি	জা	ফে	মা
শু	সো	বু	শ	শ	ম
৩১	৩০	৩১	৩১	২৯	৩১

ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	১‡	৮	১৫	২২	২৯	র	সো	বু	বৃ	শ	সো
বু	শ	ম	শ	ম	শু	২	৯	১৬	২৩	৩০	সো	ম	বৃ	শু	র	ম
বৃ	র	বু	র	বু	শ	৩	১০	১৭	২৪	৩১	ম	বু	শু	শ	সো	বু
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	৪	১১	১৮	২৫	৩২	বু	বৃ	শ	র	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	৫	১২	১৯	২৬		বৃ	শু	র	সো	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৬	১৩	২০	২৭		শু	শ	সো	ম	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৭	১৪	২১	২৮		শ	র	ম	বু	শু	র

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,	১৬৩০	২৯	২৭	২৪	২৩	২১
পূঃ	৫	৩ ১৬৩১	২৮	২৭	২৫	
কৃঃএঃ	১৫	১৪	১২	১০	৯	৭
অঃ	১৯	১৮	১৭	১৫	১৩	১১

শুঃএঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃএঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা

*বৈ-বৈশাখ মঙ্গলবারে আরম্ভ, ৩১এ শেষ।
+এপ্রেল বৃহস্পতিবারে আরম্ভ ৩০এ শেষ।
*কা-কার্ত্তিক রবিবারে আরম্ভ, ২৯এ শেষ। +অ-অক্টোবর শুক্রবারে আরম্ভ, ৩১এ শেষ।
‡১লা বৈ ম, ২রা বৈ বুধ ইত্যাদি। ১লা জ্যৈ শু, ২রা শনি ইত্যাদি।
বৈ মঙ্গল-১, ৮, ১৫, ২২ ও ২৯এ।
জ্যৈ শুক্র-১, ৮, ১৫, ২২ ও ২৯এ।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	২০	২০	২০	২১	২১	২০
কৃঃ	২৪	২৪	২৪	২৫	২৫	২৪
কৃঃএঃ	৬	৬	৬	৬	৬	৫
অঃ	৯	১০	৯	১০	৯	৯

**পরীক্ষা-৫ই বৈ, শনিবার ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ণিমা। ২০ কার্ত্তিক শুক্রবার ও ২০এ অগ্রহায়ণ শনিবার শুক্ল একাদশী। এইরূপে দিন, বার, ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নববর্ষ।

প্রকৃতি কি বেদমন্ত্র পড়িল গোপনে ;
চকিতে জাগিল ধরা,
হৃদয় পুলকে ভরা,
গাইল মঙ্গল-গাথা আনন্দে সঘনে—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব জগতের প্রাণ !
জীবন সৌন্দর্য্য জ্যোতি তোমারি বিধান।" ১

গায় রবি চন্দ্র তারা করি জয়ধ্বনি ;
মাথায় বরণডালা,
হাসি অষ্ট দিগ্‌বালা
আকাশ পূরিয়া গায় দিবস রজনী—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব পুরুষপ্রধান !
জীবন সৌন্দর্য্যজ্যোতি তোমারি বিধান।"২

খরস্রোতে প্রবাহিণী পর্ব্বত ভেদিয়া
মহাসিন্ধু পানে ধায়,
মনের উল্লাসে গায়,
অবিরাম দেশগ্রাম ধ্বনিত করিয়া—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব জীবন্ত মহান্ !
জীবন সৌন্দর্য্য জ্যোতি তোমারি বিধান।"৩

কাননে সুস্বরে গায় বিহঙ্গমগণ ;
হাসে তরু, হাসে লতা
লইয়া শুভ বারতা,
উন্মত্ত মলয় গায় মোহি ত্রিভুবন—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব আনন্দ-নিদান !
জীবন সৌন্দর্য্য সুখ তোমারি বিধান।" ৪

জাগি উঠি মহোৎসাহে জীবজন্তু সবে,
কেহ নাচে কেহ ধায়,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে গায়,
জল স্থল নভস্তল পূর্ণ কলরবে—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব করুণানিধান !
জীবন ঐশ্বর্য্য সুখ তোমারি বিধান।" ৫

নববর্ষ নববেশে হইয়া সজ্জিত,
এস এস এ সময়,
গাও গাও বিশ্বময়
জয়গীত বেদমন্ত্রে হয়ে সুদীক্ষিত—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব অনাদি মহান্ !
জীবন ঐশ্বর্য্য শোভা তোমারি বিধান।" ৬

জরা মৃত্যু শোক পূর্ণ মানব-সংসার,
দারিদ্র্যে পেষিত প্রাণ,
পাপে তাপে ম্রিয়মাণ,
গাইবে আনন্দে আজি ত্যজি হাহাকার—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব সর্ব্বশক্তিমান্ !
গতি মুক্তি সুখ শান্তি তোমারি বিধান।" ৭

আছে জীবনের বীজ মরণ-মাঝার,
মরুমাঝে উৎসধনি,
আঁধারে উজ্জ্বল মণি,
গাও মহোৎসবে আজি জয় দেবতার—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব সর্ব্বশক্তিমান্ !
জীবন আনন্দ জ্যোতি তোমারি বিধান।" ৮

এস এস নববর্ষ! বিধাতার দান,
দেও আশা, দেও বল,
পূর্ণ জীবন-সম্বল,
আনন্দে তোমার সাথে করি জয়গান—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব মঙ্গল-নিধান
অমৃত জীবন শান্তি তোমারি বিধান।" ৯

সাময়িক প্রসঙ্গ

হীরক জুবিলী—(১) ইংলণ্ডের নটিং-হামের হুলী নামক এক সাহেব হীরক জুবিলী স্মরণার্থ ৪ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া এক ফণ্ড করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বদেশস্থ বিধবা, অনাথ ও দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইবে। (২) কাশ্মীরের মহারাজা হীরক জুবিলী স্মরণার্থ শ্রীনগর ও জম্মুতে স্ত্রী-লোকদিগের জন্য দুইটী হাঁসপাতাল খুলিবেন। এইরূপ স্মৃতি-চিহ্নই প্রার্থনীয়।

রাজপ্রতিনিধির শৈলারোহণ—গত ৬ই এপ্রেল রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন স্বগণসহ সিমলায় উপস্থিত হইয়াছেন।

অনাথাশ্রম-শাখা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতা অনাথাশ্রমের একটী শাখা সাতনা ও অপরটী ঝান্সীতে খুলিয়াছে। সাতনাতে ৮০টী এবং ঝান্সীতে ১০টী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনাথ বালক আশ্রয় পাইয়াছে। এ কার্য্যে বিশেষ সাহায্যদান আবশ্যক।

শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা—পুনার দেশ-হিতৈষী নগরকারের উদ্যোগে একটী কমিটী স্থাপিত হইয়া ইতিমধ্যে ৭০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। দশ জন ভারতীয় যুবককে প্রতিবর্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, জাপান ও আমেরিকায় পাঠাইয়া শিল্পাদি কার্য্যে সুশিক্ষিত করা এই কমিটীর উদ্দেশ্য। বিচারপতি রেনাডে জাপানে শিক্ষার্থী যুবকের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গের যুবকদিগের জন্য কি এ প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না?

অধ্যাপক বসু—ডাক্তার জগদীশ-চন্দ্র বসু যেমন ইংলণ্ডে সেইরূপ ফ্রান্স ও জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশেও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্যের জন্য সমাদৃত হইয়াছেন।

ভাষাবিদ্—মোক্ষমুলার ১৮টী ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন।

জুয়াখেলা নিবারণ—বৃষ্টি হইবে কি না এই প্রশ্ন লইয়া বহু হিন্দুস্থানী লোকে সুরতীখেলা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। এ খেলা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার—১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে ১৮৯৮ খানি নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আইসে, ১৮৯৫ সালে ২৬৮৯ আসিয়াছে, বৃদ্ধি ৭৯১। এরূপ উন্নতি আনন্দকর, সন্দেহ নাই।

রাজকোষের আয় ব্যয়—গত বর্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪ কোটী টাকা, তন্মধ্যে সৈনিক ব্যয় ২৫॥ কোটী। যে গৃহস্থের আয় ১০০৲ টাকা এবং দ্বারবান্ রাখিবার ব্যয় ৫০৲ টাকা, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সন্তানদের শিক্ষাদি কার্য্যে ব্যয়ের টাকা কোথায় পাইবেন?

মহাদান—ষ্টক্‌হলমের ধনকুবের আলফ্রেড নোবল সাধারণ হিতকর কার্য্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটী টাকা এককালে দান করিয়া-

ছেন। এরূপ দানসাগরের কথা এ পর্য্যন্ত কেহ শুনেন নাই।

ব্রহ্মদেশ শাসনের ব্যবস্থা— ব্রহ্মদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে শাসিত হইবে। ফ্রেডারিক ফ্রাইরাক ইহার প্রথম ছোট লাট নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মনোনীত ৯ জন লোক লইয়া এক মন্ত্রিসভা হইবে।

বিলাতযাত্রা—বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আয়ব্যয়-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবার জন্য গত ৭ই এপ্রেল ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ দেশের লোকদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগসম্বন্ধে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন—ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সস্ত্রীক ৮ই বৈশাখ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইনি ভারতের যেরূপ মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসিগণ ইহাঁর বিশেষ সম্মাননা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করুন।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—ভারতীয় দুর্ভিক্ষফণ্ডে কোটী টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছে।

সুবৃষ্টি—পঞ্জাব অঞ্চলে সুবৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থা ভাল হইবার আশা হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেও বৃষ্টি হইতেছে।

দান—কলিকাতার আর্চবিশপ ডাক্তার গোয়েথেল্‌স্‌ কালাবোবা-বিদ্যালয় দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জলপ্লাবন—মিসিসিপী নদীর জলপ্লাবন অন্যূন ২০ ক্রোশ বিস্তারিত হইয়াছে। অনেক মানুষ ও পশু বিনষ্ট হইয়াছে।

সতীনের সাধ—খৃষ্টান পাদরীগণ বহু চেষ্টা করিয়াও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে বহুবিবাহ উঠাইতে পারিতেছেন না। অত্রত্য পুরুষেরা এক স্ত্রী লইতে রাজী আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সতীন চায়, কেননা সহযোগিনী না হইলে একা গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করা যায় না।

হারিয়েট বিচার ষ্টো।

জগতে নারী-গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বিবী ষ্টোর নাম যেমন জগদ্বিখ্যাত, এমন আর কাহারও নহে। ১৮৫২ সালে তাঁহার প্রণীত "Uncle Tom's Cabin"—"টম কাকার কুটীর" পুস্তক প্রচারিত হইলে এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমেরিকা ও ইউরোপের সর্ব্বত্র তাড়িতবেগে ইহার প্রভাব বিস্তারিত হইল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ক্রমাগত মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতে লাগিল, ইউরোপের সমুদায় ভাষায় পুস্তকখানি অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইল। নিগ্রোদাসদিগের জন্য নহ শতাব্দী ধরিয়া

অনেক হৃদয়বান্ লোকের অক্লান্ত যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে যাহা না হইয়াছে, এই একাকিনী অবলার একবারের চেষ্টায় তাহা হইয়াছে। দৈববল যে এই রমণীর বিশেষ সহায় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখার গুণপনাও অতীব প্রশংসনীয়। পাপের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ, ধর্ম্মের অটল বল ও সাহস, নিপীড়ন নির্যাতনের মধ্যে প্রেম ও দয়ার পরিচয়, মানব-চরিত্র বিশেষতঃ নিগ্রোচরিত্র—ইত্যাদি বহুল বিষয়ের বর্ণনায় তাঁহার শক্তি অতুলনীয়া। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ এবং আরও কোন কোন গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি উপন্যাসলেখকদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার নাম গৃহদেবতার ন্যায় সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছে।

আমেরিকাতে কনেক্‌টিকাট্ নামে এক জনপদ আছে। এই জনপদের অন্তর্গত লিচ্‌ফিল্‌ড নগরে ১৮১২ খৃঃ অব্দে বিবি হারিয়েট বিচার ষ্টৌ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম লাইম্যান বিচার। ইনি প্রথমতঃ কর্ম্মকারের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন। পরে অসাধারণ অধ্যবসায়বলে নিউহেভেন নগরস্থ একটি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ডাক্তার বিচার নামে বিখ্যাত হন। আমেরিকাতে এতাবৎকাল যে সকল বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ডাক্তার বিচার তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। যে বিদুষী রমণীর জীবনী এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইল, ইনি ডাক্তার বিচারের দ্বিতীয়া কন্যা। ডাক্তার বিচার পুত্র-নির্ব্বিশেষে কন্যাদ্বয়ের সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে বোষ্টন নগর জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশিষ্টরূপে সমুৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই জন্য ঐতিহাসিকগণ এই নগরকে "পাশ্চাত্য এথেনস্" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার বিচার উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কন্যাদ্বয়কে এই নগরে রাখিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক যত্ন ছিল, তাহা বাস্তবিক সফল হইয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই উত্তরকালে বিদ্যাবতী রমণীর উচ্চাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্যাথারিণ লিচ্‌-ফিল্‌ড নগরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। কনিষ্ঠা কুমারী হারিয়েট তাঁহার সহকারিণী ছিলেন। ইহাঁদিগের উভয়ের যত্নে বিদ্যালয়টি অত্যল্পকালের মধ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিছু কাল পরে ডাক্তার বিচার কর্ম্মোপলক্ষে সিন্‌সিনেটাই নগরে সপরিবারে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হন। এই নগরে অবস্থানকালে, সহোদরাদ্বয় তথায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

যৎকালে কুমারী হারিয়েটের বয়ঃক্রম একবিংশ বর্ষ, তখন তিনি রেভারেণ্ড ক্যালভিন্ ই ষ্টৌ নামধেয় জনৈক যুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হন।

সিনসিনেটাই নগরের নিকটস্থ লেন নামক স্থানে একটী বিদ্যালয় ছিল, ডাক্তার বিচার সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, এবং ষ্টৌ সাহেব অধ্যাপক ও বিবি ষ্টৌ অধ্যাপিকা ছিলেন। কালক্রমে ইহাঁরা অনেকগুলি সন্তান সন্ততি লাভ করেন। পিতা মাতার গুণে সন্তানগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত হইয়াছিলেন। বিবী ষ্টৌ তৎকালীন জননীগণের আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন। সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া তাঁহার যে সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি সাহিত্য-সেবায় অতিবাহিত করিতেন। বিবী ষ্টৌ সাময়িক পত্রিকার জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাষা যেমন সরল, ভাবও তদ্রূপ পরিশুদ্ধ। ইহাঁর লেখা পাঠ করিলে ইহাঁর হৃদয়ের উচ্চ ভাব, গভীর চিন্তাশীলতা, বিশ্বজনীন প্রেম, দীন দুঃখী পাপী তাপী উৎপীড়িত নর নারীর প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি বহুল সদ্‌বৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময়ে ক্রীতদাস ব্যবসায় লইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। দাসব্যবসায়ী দল পশুর ন্যায় মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া অর্থাগমের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। পশুব্যবসায়িগণ জঙ্গল হইতে পশু ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের গলায় দড়ি বাঁধিয়া যেমন দেশে দেশে, নগরে নগরে, বাজারে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপনীত করে, দাসব্যবসায়িগণও তদ্রূপ আফ্রিকা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে মানুষ ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের গলায় দড়ি দিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থলে প্রকাশ্য বাজারে, পশুপালের ন্যায় বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত। ধনবান্ গৃহস্থগণ তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইত, এবং তাহাদের প্রতি পশুবৎ যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। মানব-সন্তানের প্রতি এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতা সন্দর্শন করিয়া কতিপয় খৃষ্টভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে মানব স্বাধীনতাকে নিরতিশয় মূল্যবান্ মনে করিয়া থাকে, সেই মানব তাহার ভ্রাতা ভগিনীর স্বাধীনতা হরণ করিতেছে, এ দৃশ্য নিরতিশয় ক্লেশকর। ইহাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পৃথিবী হইতে ক্রীতদাস ব্যবসায় একেবারে উঠাইতে হইবে। নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়িগণের কবল হইতে নিরীহ নিগ্রোগণকে রক্ষা করিতেই হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইয়া খৃষ্টানুরাগী নরনারীগণ সমুত্থিত হইলেন এবং এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে চারি দিকে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বিবি বিচারের পিতা ও পতি ইতঃপূর্ব্বে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। বিবি বিচার ষ্টৌও তাঁহাদিগের অনুগামিনী ও সহকারিণী হইলেন। ইহাঁদিগের উদ্যোগে দাসব্যবসায়িগণের ঘৃণিত ব্যবসায়ের কথা চারি দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

ইহাঁরা বক্তৃতা করিয়া যেমন নিকটস্থ, সেইরূপ সাময়িক পত্রিকাতে লিখিয়া ও পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিয়া দূরস্থ নরনারীর হৃদয় স্বাধীনতার সপক্ষে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পথে, ঘাটে, বিপণিতে, কর্ম্মস্থলে, সর্ব্বত্রই দাসব্যবসায়ের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অত্যল্প কালের মধ্যে আমেরিকাতে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

মানব-ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশে, সকল সময়ে উদার-হৃদয় নরনারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক নরনারীর দ্বারাই মহৎ কার্য্য সকল সংসাধিত হইয়াছে। ষ্টৌ পরিবার এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। যে স্থানে যে সময়ে ইহাঁরা এই মহদান্দোলনে প্রবৃত্ত হন, সেই স্থানে সেই সময়ে অধিকাংশ লোকই ইহাঁদিগের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইহাঁরা চান মানবকে স্বাধীনতা দিতে,—নিরীহ নিগ্রোগণের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার রহিত করিতে—বর্ব্বর নিগ্রোদিগকে মানুষ করিতে—মনুষ্যোচিত সুখ সম্ভোগে অধিকারী করিতে; কিন্তু তাহারা চায় তদ্বিপরীত। পরন্তু এই অনুদার ব্যবসায়িগণ অনেক সময়ে ঐ সকল সদাশয় নরনারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল যে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধনের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল এমন নহে, অপিচ নির্যাতন দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্যম উৎসাহ ভগ্ন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই অনুদার দলের মধ্যে সচরাচর তিনটি শ্রেণী দেখা যাইত। প্রাচীন প্রথার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক সেই পরিবর্ত্তনের ফলাফল বিচার না করিয়া উক্ত প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে চাহে। প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তন ইহাদিগের ভাল লাগে না, কাজে কাজেই ইহারা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। অপর দুইটি শ্রেণী ক্রেতা ও বিক্রেতা; ইহারা ব্যবসায়ী। লেডী হেন্‌রী সমারসেট সুরাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিতে লাগিল, মদ আর তেমন বিক্রয় হয় না, ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, অমনি সুরাব্যবসায়িগণ লেডী হেন্‌রীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল, "মার মার" করিয়া ইহাঁর পশ্চাতে ধাবিত হইল, নানা প্রকারে ইহাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ষ্টৌ পরিবার দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি ব্যবসায়িদল তাঁহাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিবি বিচারের পিতা যে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, ষ্টৌ সাহেব সেই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। পৃথিবীর চারি দিকে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, সেই সকলের বিবরণ কলেজের ছাত্রগণ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা পাঠ করিতেছে, হতভাগ্য দাসদলের করুণ আর্ত্ত-

নাদে তাহাদিগের কোমল মন বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাদিগের সপক্ষে উত্থিত হইবার জন্য তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিতেছে। দাসব্যবসায়িগণ স্বীয় সন্তানগণকে উক্ত কলেজ হইতে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল, ইহা দ্বারা "এক শরে দুইটী শিকার" মিলিবে। কলেজ হইতে ছেলে ছাড়াইয়া লইলে কলেজ উঠিয়া যাইবে,তাহাতে ষ্টৌ পরিবার জব্দ হইবে; দ্বিতীয়তঃ উহাদিগের সংসর্গ হইতে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে, উহারা আর দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে পারিবে না। কিন্তু এই অতি-বুদ্ধি নীচ-প্রকৃতি দাসব্যবসায়িগণকে বিপরীত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে সকল "ঘরের ঢেঁকী"কে তাহারা স্থানান্তরিত করিল, তাহারা যে 'কুমীর' হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। অভিভাবকগণের তাড়নায় তাহারা কলেজ পরিত্যাগ করিল বটে, কলেজের সুশিক্ষা ও সুখসুবিধালাভে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু সেই হতভাগ্য আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস দাসীগণের প্রতি তাহাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি কিছুতেই অপসারিত হইল না। যে বিশ্বজনীন উদারতা তাহাদিগের হৃদয়ে অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই নীরব বা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। এই সকল যুবক কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ক্রীতদাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল।

অধ্যাপক ষ্টৌ ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের অন্তর্গত আণ্ডোভার কলেজে অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হন। বিবী ষ্টৌও তাঁহার অনুগামিনী হন। এই সময় হইতে তাঁহার লেখা সকল "ওয়াসিংটন ন্যাস্‌ন্যাল ইরা" নামক সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সকলের নাম ছিল, "Life among the Lowly" "হীনাবস্থ লোকদিগের মধ্যে জীবন"। ঐ সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "Uncle Tom's Cabin"—"টম কাকার কুটীর"। বিবী ষ্টৌ কিরূপ উচ্চ হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিরূপ উচ্চ ভাব তিনি প্রাণে পোষণ করিতেন, ঘৃণিত নিগৃহীত নিপীড়িত পাদদলিত ক্রীতদাসদাসীর উদ্ধার কামনায় তিনি যে কিরূপ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, উক্ত পুস্তকের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিবি ষ্টৌ "টমকাকার কুটিরে" নিগ্রোদিগের যে দুঃখময়ী জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। কাফ্রী জীবনের যথার্থ চিত্র ঔপন্যাসিকের অতিরঞ্জিত উপন্যাস অথবা কবির স্বপ্নময়ী কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য ক্রীতদাসব্যবসায়িগণ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু তিনি ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যথোচিত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল প্রতিবাদের খণ্ডন করেন। ঐ সকল প্রতিবাদ সংগৃহীত হইয়া যে পুস্তক হইয়াছে, তাহার নাম "Key to Uncle Tom's Cabin"। "টম কাকার কুটীর" পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। শত বক্তা, শত দেশে, শত বৎসর বক্তৃতা করিয়া যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন কিনা সন্দেহ, বিবি ষ্টৌ এই পুস্তক দ্বারা অত্যল্প কালের মধ্যে তাহা সংসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকের সাহায্যে পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে যে মহান্দোলন উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার জীবনীলেখক বলিয়াছেন, "Both hemispheres thrilled with horror and indignation at the wrongs and sufferings of those held in the thraldom of an iniquitous system."

বিবী ষ্টৌ আহূত হইয়া, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তাঁহার আগমনে ইংলণ্ডবাসিগণ নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি কিরূপ সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, এবং সমগ্র ইউরোপে ভ্রমণকালে ইউরোপবাসিগণ তাঁহার কিরূপ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, বিবি ষ্টৌ তাঁহার "Sunny Memories of Foreign Lands" নামক পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তক ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি "Dred" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ লেখা।

অত্যল্প কাল হইল বিবী ষ্টৌ পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীর সমগ্র শিক্ষিত সমাজ একটি উজ্জল রত্নহারা হইয়া যেমন শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমগ্র নিগ্রোজাতি ও ক্রীতদাসবংশ তাহাদিগের মা-হারা হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়াছিল। তিনি সুগৃহিণী, সুমাতা ও সুলেখিকা ছিলেন।

বিশ্বজীবন-সম্পাদক।

বুলবুল * ।

১

সে যে বুল বুল—
কিবা দিব পরিচয়,
কোকিল পাপিয়া নয়,
তার গানে ক্ষিপ্ত নহে প্রাচ্য কবিকুল;

সে যে অতি ক্ষুদ্র পাখী,
ঊষায় অমিয় মাখি
এসেছে হেমন্ত-দিনে হয়ে অনুকূল;
আমার আঁধার ঘরে রাঙা বুল বুল!

* বুল বুল—৫ মাস বয়সের শিশু।

২

সে যে বুল বুল—
মন্দার-তরুর শিরে,
সোণার বিহঙ্গ ফিরে,
গাহিয়া নন্দনবনে সঙ্গীত অমূল ;
তাদের একটী সাথী,
(আঁধারে জ্বালাতে বাতি)
এসেছে মানব-পুরে আনন্দ-আকুল !
তাই মোর ভাঙা ঘরে রাঙা বুলবুল !

৩

সে যে বুল বুল—
এত দিন বসুন্ধরা,
ছিল শত দুখভরা,
প্রকৃতি দেবতা ছিল এলাইয়া চুল,
কি যেন কি ছিল দৃশ্য,
অপূর্ণ বিষণ্ণ বিশ্ব,
যাহা বিনা ছিল সদা হয়ে ক্ষোভাকুল,
সেই টুকু যেন এই রাঙা বুলবুল !

৪

সে যে বুল বুল—
তাই তার মুখ চেয়ে,
পাখী ওঠে গান গেয়ে,
আকাশে চাঁদিমা হাসে বাগানে পারুল !
সে যবে উল্লাস-ভরে,
মধুর ঝঙ্কার করে,
বসন্ত ছুটিয়া আসে হইয়া আকুল !
বিধির আশীষ যেন ক্ষুদে বুলবুল !

৫

সে যে বুল বুল—
অনাহূত অজানিত,
তাহাতে "অপরিচিত",
তবু সে লইল হরি হৃদয়ের মূল !
বিশ্বের সোহাগ নিতে,
সে এসেছে অবনীতে,
কোথাও দেখি না "চোর" তার সমতুল !
কোথাকার যাদুকর, ক্ষুদে বুল বুল !

৬

সে যে বুল বুল—
শত বরষের পরে,
টেনে নিয়া খেলাঘরে,
আমারে খেলায় খেলা, দিয়া শত ভুল !
তারি জয় মোর হারি !—
তবু পলাইতে নারি,
তবু হয়ে আছি তারি "খেলার পুতুল" !
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুল বুল !

৭

সে যে বুল বুল—
'যা' কিছু আমার ছিল,
সবি সে কাড়িয়া নিল,
তবুও মিটে না তার কামনা বহুল,
নিল নিদ্রা, নিল স্মৃতি,
নিল সে কবিতা-গীতি,
নিত্তি লয় লক্ষ চুমা, ছিঁড়ে লয় চুল,
দারুণ দুরন্তপণা !
শোনে না করিলে মানা,
বোঝে না সে রীতি নীতি, মানে না সে "কুল" !
(আমি) "ভীরু কাপুরুষ" মত,
পরিহার মাগি যত,

তত সে করিতে চাহে সংগ্রাম তুমুল!
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুল বুল!

৮

সে যে বুলবুল—
তার যে হাসির ঘা'য়
চপলা চমকি যায়,
সরমে ঝরিয়া পড়ে গোলাপ-মুকুল,
সেই হাসি মুখে মাখি,
খুলি নীলপদ্ম আঁখি,
চেয়ে থাকে মুখ পানে, দিঠি ঢুলঢুল!
সে চাহনি দেখি হায়!
কোথা দিয়া দিন যায়,
রাখিতে হিসাব হয় আগাগোড়া ভুল!
শুধু তারি স্রোতে হিয়া,
দিয়ে আছি ভাসাইয়া,
কেবা পারে এ তুফানে হ'তে প্রতিকূল?
আর কি বলিব বেশী,
ছদ্মবেশে দেবদেশী,
আমার ব্রহ্মাণ্ড বুঝি করে দিল ভুল!
ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি,
পুনঃ মানিলাম হারি.
আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়া পুতুল!
বিধির আশীষ মম, রাঙা বুলবুল!

১২-১২-১৩০৩। কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

অনেক সময়েই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—আমাদের বর্ত্তমান জীবনই কি প্রকৃত রমণী-জীবন? যে রমণী-জীবন প্রেম ও পবিত্রতা, গাম্ভীর্য্য ও স্ফূর্ত্তি, শান্তি ও মাধুর্য্য, দৃঢ়তা ও সরলতার আধার, ইহাই কি সেই রমণী-জীবন? আমরা কি আজ কাল সেই প্রকৃত রমণী-জীবন যাপন করিতেছি? এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিব? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কেবল রমণী-জীবনের বিকৃতিই দর্শন করি! যে রমণী-জীবন প্রেমে সমস্ত জগৎকে আপনার করিবে, হৃদয়ের ভিতরে টানিয়া লইবে, তাহাতেই আজ স্বামী, পুত্র, কন্যা ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। "রমণী-হৃদয় সংকীর্ণ, নীচ, আত্মসুখাভিলাষী", আজ এই সকল অখ্যাতিতে জনসমাজ পূর্ণ। রমণী-জীবনের কি বিষম দুর্গতিই ঘটিয়াছে! যে রমণীজীবন আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রেরিত হইল, তাহার পরিণাম কি না এই হইল! যে প্রেম পর কি তাহা বুঝিবে না, সকলকেই আপনার করিবে, সেই প্রেম কিনা বিশ্ব-সংসার দূরে থাকুক, একপরিবারস্থ লোককে পর মনে করিতেছে। যে রমণীচিত্ত শান্ত, গভীর, অতলস্পর্শ, তাহা কি না আজ চঞ্চল, চিন্তাবিহীন, ভাসা ভাসা হইয়া পড়িয়াছে!

শিক্ষা, চিন্তা, চেষ্টা, বিশ্বাস ও আদর্শের অভাবই আমাদের প্রধান অভাব। লেখা পড়া আমরা যাহা জানি, তাহা কিছুই নহে,

কিন্তু যেটুকু জানি তাহা দ্বারা জ্ঞান-লাভের চেষ্টা কোথায়? বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে জ্ঞানলাভ ও জীবনের উন্নতি-সাধন, তাহা আমাদের স্মরণ থাকে না। চিন্তাশীলতাই শিক্ষা ও উন্নতির মূল। অনেকে লেখা পড়া না জানিয়াও এক চিন্তাশক্তি দ্বারা বহু জ্ঞান লাভ করেন, নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম হন। লেখা পড়া চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করে, এই মাত্র। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না; কিন্তু একমাত্র প্রগাঢ় চিন্তাশক্তিপ্রভাবে তিনি রাজ-কার্য্যের অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে এরূপ সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ইংরাজগণ তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। চিন্তাশক্তি খর্ব্ব হইতে হইতে আমরা এত লঘুচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, গভীর ভাবে কিছু ভাবিতে পারি না, কেবল অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই। ভূমণ্ডলে কি জন্য আসিয়াছি, কি জন্য আছি, সে বিষয় একবারও ভাবি না, কেবল সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছি। জীবনের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা নাই, তাহা আবশ্যকও বোধ করি না। চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা সকল অবস্থার মধ্য হইতে যে জীবনের উপাদান ও শক্তি সংগ্রহ করা যায়, তাহা আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না; তাই অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন ও চরিত্রের প্রভা প্রকাশিত হয় না।

জীবন থাকিলে কি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি? একটী সামান্য বীজের যতক্ষণ জীবনী শক্তি থাকে, তাহা ততক্ষণ সহস্র বাধাতেও অঙ্কুরিত হইবেই হইবে। তাই বলি, যদি জীবন থাকিত, তবে চিন্তা ও চেষ্টা অবশ্যই হইত। আমরা মৃত—সমাজের অত্যাচারে, শিক্ষার অভাবে, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অভাবে আমরা মৃত—তাই সকলই বিকৃত। আমরা কেবল অসার বিষয় লইয়াই মত্ত, বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়াই মুগ্ধ, একবারও ভিতর খুঁজিয়া দেখি না। সংসারে যত দিন আছি, বাধ্য হইয়া কতকগুলি কাজ করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু কিছুই উপযুক্তরূপে করিতে পারিতেছি না। স্বামীর প্রতি কি কর্ত্তব্য, সন্তানের শিক্ষা ও জীবনগঠন বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, আত্মীয় পরিজনের, প্রাণের ভগিনীগণের ও স্বদেশের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা জানিও না, পালনও করি না। মৃত জীবনে তাহা পালনের আশাও নাই।

প্রাচীনা রমণীদিগের বিশ্বাস অনেক দৃঢ় ছিল, এখনও তাঁহাদেরই মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের কার্য্য সেরূপ দেখা যায় না। বিশ্বাসই জীবনের ভিত্তি, বিশ্বাসই জীবনের গতি ও আদর্শ ঠিক্ করে। সেই বিশ্বাসের অভাবে আমাদের লঘুতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদর্শ আরও মলিন হইয়াছে। রমণী-হৃদয়ই বিশ্বাসের উজ্জ্বল ছবি প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত স্থল। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে

গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীগণ বিশ্বাসে এবং ব্রহ্মবিদ্যায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, শিক্ষা ও উন্নতিতে ঋষিগণের সমতুল্যা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও প্রাচীনা রমণীগণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাসানুযায়ী জীবন যাপন করিতে কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন! এ দেশের এবং বিদেশের কত রমণী বিশ্বাসের জন্য অকাতরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন! কিন্তু আজ কাল আমরা কোন্ ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য সব সহ্য করিতে পারি, জীবন প্রদান করিতে পারি? এখন কি আমাদের মধ্যে প্রাচীন কালের রমণীর ন্যায় দুই একটী রমণীও পাইব না? স্বাধীন কালের সে সমাজ নাই, সে কিছুই নাই, সবই মৃত।

কত প্রাণের ভগিনী সমাজের পেষণে, অবস্থার পেষণে পড়িয়া রমণীজীবনের পবিত্রতা হারাইয়া চরিত্রকে কলুষিত করিতেছে। আমরা যদি আজ প্রকৃত রমণীজীবনের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতাম, আজ যদি সমাজে আমাদের শক্তি কার্য্যকরী হইত, তবে বুঝি প্রাণের ভগিনীগণের এই অপবিত্র চিত্র, যাহা অপেক্ষা রমণী মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ মনে করে, সেই চিত্র দেখিতে হইত না। জনসমাজ পবিত্র হইত,—পবিত্রতাতে বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ পুনরায় পুণ্যক্ষেত্র হইত। আমাদের জীবনের দায়িত্ব কত! আমরা নিজ জীবনের উন্নতি করিব, সমাজকে উন্নত করিব, দেশকে উন্নত করিব। রমণীজীবনের মৃত ভাব দূর না হইলে সমাজ কখনও সজীব হইবে না, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" যে নিজে নিদ্রিত-মৃত, সে অপরকে কিরূপে জাগাইবে, জীবন প্রদান করিবে? রমণী শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বলা হইলেও হৃদয়ের শক্তিতে দুর্ব্বলা নহে। সমস্ত সমাজ পরোক্ষভাবে রমণীশক্তিতে চলিতেছে। পরাধীনা হইলেও মা এবং সহধর্ম্মিণী রমণী, তাই রমণীর প্রভাবই জনসমাজে সর্ব্বোপরি কার্য্য করিতেছে। রমণীই পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা সন্তানকে গঠিত করিব, অপর সকলের উন্নতির সহায় হইব, প্রেমে সকলকে আপনার করিব। আত্মহারা হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বামীকে ভালবাসিব, পরম দেবতা পরমেশ্বরকে ভালবাসিব, তাঁহারই হইব। স্বামী, পুত্র, কন্যা, পরিবার, সমাজ সকলকে লইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইব। আমাদের প্রেম এই ক্ষুদ্র সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিবে না, কিন্তু সেই মহান্ অনন্ত দেবতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। আমরা যে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, জীবনের সঙ্গী স্বামী, স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও ভাই ভগিনী পাইয়াছি, ইহাঁদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিব। এইত আমাদের প্রেমের আদর্শ। আমরা

এই উচ্চ আদর্শে উঠিতে না পারিয়া নীচে পৃথিবীর ভাব লইয়া পড়িয়া থাকি, তাই আমাদের এ প্রেমে জীবনের উন্নতি হয় না। তাই প্রেম সঙ্কীর্ণ, তাই প্রেমে স্বার্থপরতা, বিষয়ের আবিলতা। যাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য সব পাইয়াছি, তাঁহাকেই ভুলিয়া থাকি, তাঁহার দানের মঙ্গল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া চলি, তাই এ দুর্গতি।

আমাদের এই দুর্গতি দেখিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারি? যদিও আমাদের এই শোচনীয় দুর্গতির মূল সমাজ, যদিও সমাজের পেষণে প্রাণের আদর্শ সংকীর্ণ হইতে হইতে আমরা সমস্ত জগৎ হইতে এতদূরে পড়িয়াছি, এত পতিত হইয়াছি, তবুও ইহাতে কি আমাদের নিজের দোষ নাই? আমাদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, যাহা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আছে, তাহার উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা ও চিন্তা আছে কি?

অন্যের উপর দোষ দিয়া নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে কি কখনও কল্যাণ আছে? আমরা নিজে চেষ্টা না করিলে পুরুষসমাজ কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহারা আজ কাল আমাদের জন্য অনেক করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের মধ্যে এখনও এমন অনেক রমণী আছেন, যাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ, যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রেম, বিশ্বাস প্রভৃতি বিকৃত হয় নাই; তাঁহারা দেবী। এরূপ অবিকৃতা, প্রকৃতি-দুহিতা অনেক দেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, রমণীজীবনের আদর্শ কি বুঝিতে পারিয়াছি। ইহাঁদিগকে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। একবার ভাবিয়া দেখি ইহাঁদের সংখ্যা কত কম, আর আমাদের ন্যায় বিকৃত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের সংখ্যাই কত বেশী! এই বিস্তৃত সমাজমধ্যে সমস্ত রমণীমণ্ডলী জাগ্রত না হইলে একজন, দুইজনে কি করিবেন? সমস্ত বঙ্গদেশ আমাদের নিদ্রাতে মৃত, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আর কত কাল নিদ্রাতে মগ্ন থাকিব? অনেক ঘুমাইয়াছি, এখন আর ঘুমাইলে চলিবে না।

আমরা অতি ক্ষুদ্র সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের কাজ নাই? যদি আমরা আমাদের মৃত শক্তিকে জাগাইতে পারি, তবে কি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, যুবক, বৃদ্ধ, বালক কাহাকেও অপবিত্রতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে? তাহা হইলে কি পৃথিবী স্বর্গধাম হয় না? সত্য সত্যই এরূপ হইলে পৃথিবীতে ভগবানের শুভ ইচ্ছা জয়যুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচারিত হইতে পারে, আমরাও ধন্য হইতে পারি, কৃতার্থ হইতে পারি, রমণী-জীবন সার্থক করিতে পারি। তাই কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। চেষ্টা করিলে অবশ্যই অবস্থা ফিরিবে।

যদি আমরা আমাদের অভাব বুঝিয়া থাকি, তবে পরস্পর এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একপ্রাণে পরস্পরের উন্নতির জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করি। ইহাতে অবশ্যই আমাদের জীবনের কল্যাণ সাধিত হইবে, সমাজের উন্নতি সংসাধিত হইবে। আমরা অজ্ঞান, মূর্খ, চিন্তাবিহীন, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল হই না কেন, যদি প্রাণের প্রকৃত অনুরাগের সহিত চেষ্টা করি, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব। চাই কেবল, চেষ্টা, যত্ন, বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ। আমাদের উন্নতির জন্য যদি আমাদিগের অপ্রেম, কুটিলতা, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে কি তাহা আমরা করিব না? কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যদি স্বার্থ ছাড়িতে হয়, সুখ ছাড়িতে হয়, কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সে জন্য কি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব না? অভাব অসংখ্য, তাই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। যদি পবিত্র রমণীজীবন ধারণ করিয়া সংসারে, পরিবারে প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য সংস্থাপন করিতে না পারিলাম, তবে জীবনধারণে কি ফল? কেবল কি পশুর মত শারীরিক সুখভোগ ও শারীরিক সুখে মানসিক তৃপ্তির জন্যই জীবন ধারণ করিব?

পরমেশ্বর করুন্ আমাদের যেন আর সেরূপ দুর্গতি না হয়। তিনি আমাদিগকে বল প্রদান করুন্, এখন হইতে আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি। (দীনা বঙ্গবালা)

আদর্শ রমণী।

(৩৮৭ সংখ্যা—৩৯১ পৃষ্ঠার পর)

সাধু। যদি ভগবানের কথা তুলিলে, তবে তাঁরই নাম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।

অপ—আচ্ছা, তাঁহারই নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে বল?

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর, এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, অথবা দেব-মানববৎ সম্বন্ধ।

অপ—তাহাই হউক, ভগবান্ আমার সহায়।

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর তোমার জীবন শুধু পরের জন্য।

অপ—তাহাই হইল।

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর অন্যের সুখ ব্যতীত নিজের কোন প্রকার সুখের চেষ্টা করিবে না।

অপ—হাঁ আহ্লাদের সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর ষড়্‌রিপু দমন করিবে।

অপ—হাঁ স্বচ্ছন্দচিত্তে।

সাধু—তুমি ধনিঘরের সন্তান। যদিও তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী এ সকলেরই অভাব, তথাপি ধনের অভাব নাই। প্রতিজ্ঞা কর নিজের সামান্য খোরাক পোষাকের জন্য যে ব্যয় হইবে, তদ্ব্যতীত সব ধনই দুঃখী জনের সেবায় উৎসর্গ করিবে।

অপ—হাঁ তাহাই হইল।

সাধু—স্থিরমনে প্রতিজ্ঞা কর সংসারের সকলকে সমচক্ষে দেখিবে।

অপ—হাঁ আমার নিকট সবই সমান।

সাধু—বেশ সন্তুষ্ট হইলাম, "সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান্ তাঁহার সহায়।"

অপরাজিতা ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল, তাহাই হউক্।

সাধু—অপরাজিতে! "রাজপুত্রের এই কালেই সুখ, পরকালে সুখ নাই; আর মুনিপুত্রের পরকালেই সুখ, ইহকালে সুখ নাই; আর সাধুর ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ; আর ব্যাধের ইহকালেও সুখ নাই, পরকালেও সুখ নাই।"

* চিরজীব রাজপুত্র মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো, ব্যাধ মা জীব মা মর॥

দেখ আমি তোমাকে সাধুতাচরণ করিতে বলিতেছি, তুমি ইহকালে পরকালে সুখী হইবে।

অপ—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

"এখনও তোমার মনে অন্ধকার আছে, তাহা আমার দূর করাই উচিত" এই বলিয়া সাধু অপরাজিতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষা; ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় ও দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি অল্প অল্প শিখাইলেন।

দুই বৎসরে শিক্ষা শেষ হইল। এই দুই বৎসর কালের মধ্যে সাধু অপরাজিতার মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এক দণ্ডের জন্যও সে যুবতী রমণীর মনোভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। এক দিন সায়ংকালে মধুর বাতাস বহিতেছিল, লতা দুলিতেছিল, ফুল নাচিতেছিল, সরসী গাইতেছিল: এমনি সময় অপরাজিতাকে ডাকিয়া সাধু কহিলেন "আজ তোমার শিক্ষা শেষ হইল, অতএব আজ তোমাকে দীক্ষা করাইব। আজ তোমার শুভ দিন, আমারও শুভ দিন। কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি এখনি চলিয়া যাইব, হয়ত আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।" তখন সাধুর অনুমতিক্রমে অপরাজিতা আপনার সুদীর্ঘ কেশকলাপ কাটিয়া ফেলিল, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পোষাক পরিধান করিল, হীরা মণি প্রবালাদির গহনা ত্যাগ করিয়া নিরাভরণ হইল। তখন তাহার আনন্দ দেখে কে? তখন অপরাজিতা ভূমিতলে হাঁটু পাতিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে চিৎকার করিয়া কহিল "হে ঈশ্বর! হে পরমেশ্বর! হে প্রভো, হে মহাপ্রভো! দাসীর সহায় হও।" অপরাজিতার উপর ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত

হইল। অপরাজিতা উঠিল, কিন্তু সাধুকে আর সেখানে দেখিল না। তখন অপরাজিতা গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। প্রহরীকে সতর্ক করিয়া দিয়া গৃহের সমুদয় দরজা উন্মুক্ত করিয়া রাখিল। ইহার অর্থ অদ্যাবধি আমার গৃহের দরজা নিরাশ্রয় নিধর্নের জন্য চিরমুক্ত হইল।

তাহার পর অপরাজিতা উন্নতির গৃহে গেল। দেখিল সাধু সেইখানে আছেন। উন্নতির জন্য বড়ই ব্যস্ত। উন্নতি মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। অপরাজিতা যথাসাধ্য ব্যয়ে চিকিৎসাদি করাইয়া উন্নতিকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। উন্নতির বড় অর্থাভাব ছিল, অপরাজিতা তাহাকে আপনার গৃহে আনিয়া সহোদরা ভগিনীর মত রাখিল এবং উন্নতিও প্রাণপণে খাটিয়া তাহার কার্য্যের সহকারিতা করিতে লাগিল। সাধু কখন কোথায় থাকেন ঠিক্ নাই। মধ্যে মধ্যে অপরাজিতার আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার অবলম্বিত কার্য্যে উৎসাহ দান ও সহায়তা করিয়া থাকেন।

* * * * * * *

আজ আবার সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। তেমনি ফুল ফুটিয়াছে, চাঁদ হাসিতেছে, মারুত বহিতেছে, গঙ্গা গাইতেছে, সেই সাধু সেই অপরাজিতা, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অপরাজিতা আজ জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সাধুর চরণতলে আসিয়াছে। আজ তাহার চরম অথচ পরম অবস্থা।

অপরাজিতার দয়ায় দুঃখীর দুঃখ নাই, শোকার্ত্তের শোক নাই, রোগীর যন্ত্রণা নাই, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের অভাব নাই। হায়! আজ তাহার জন্য কে না অশ্রু-জল ফেলিবে? ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অপরাজিতার অনন্ত প্রতিভা দেদীপ্যমান। পরের জন্য খাটিতে খাটিতে আজ তাহার এ মুমূর্ষু অবস্থা। পরের সুখেই তাহার সুখ, পরের দুঃখেই তাহার মর্ম্মব্যথা। পরই তাহার আপনার, পরের জন্যই তাহার অতুল ধনরাশির ব্যয়। জগতের উপকার এবং ভগবানের কাজ করিতে করিতেই তাহার এ দেহের পতন। সে আপনাতেই থাকিয়াই আত্মবিস্মৃত, ইন্দ্রিয়ের অপ্রতিহত বেগ অকাতরে অতিক্রম করিয়া এ জগতে সে দেবীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুর বিলম্ব নাই বুঝিয়া সে আবার সাধুর নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং সাধুর পদতলে পতিত হইয়া "শিব সুন্দর" গাইতে গাইতে প্রাণত্যাগ করিল। অপরাজিতা সাধুকেই দেবতা বলিয়া জানিত। সাধু তাহার যথারীতি সৎকার করিয়া সেই শ্মশানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিলেন :—

"সুশীতল হরিনাম, গাওরে ভবধাম
জুড়াইবে তাপিত পরাণ,
গাও তরু লতাফুল, গাওরে বিহগকুল,
গাও গাও নীরব শ্মশান। *

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

* এই গানটী অশ্রুকণা-রচয়িত্রীর সন্ন্যাসিনী হইতে সংগৃহীত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠতাত ৪র্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালের ২০এ জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার বয়স তখন ১৮ বৎসর এক মাস মাত্র। শৈশবাবস্থা হইতেই তিনি পিতৃহীন, কিন্তু তাঁহার ধার্ম্মিকা মাতার যত্নে ও তত্ত্বাবধানে তিনি বাল্যকালে অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। ধর্ম্মসমন্বিত জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা তাঁহার হৃদয় প্রসারিত ও চরিত্র সুগঠিত হইয়াছিল। যদিও তিনি রাজসভার কোন ধার ধারিতেন না, তথাপি তাঁহার অভ্যুদয়ে সাধারণের মনে অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার হইল এবং তাঁহার রাজত্ব সুখ-সৌভাগ্য-পূর্ণ হইবে বলিয়া সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ। ইনি অতি সদাশয় লোক ছিলেন এবং অতি সুন্দর কৌশলে রাজনৈতিক বিষয়ে মহারাণীকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

১৮৪০ সালে স্যাকস্‌কোবর্গের রাজপুত্র প্রিন্স আলবার্টের সহিত মহারাণীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। ইহা অতি যোগ্য মিলন হইয়াছিল। রাজপুত্র যেমন সৎপতির আদর্শ, তেমনি তিনি ইংলণ্ডকে স্বদেশরূপে বরণ করিয়া মহারাণীর রাজধর্ম্মপালনের সহায়তা করিয়াছেন এবং দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনে সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া হানোবর-বংশীয়া। ১৭১৪ সালে হানোবরের রাজা ১ম জর্জ্জ নামে ইংলণ্ডের অধিপতিরূপে মনোনীত হন। তদবধি ইংলণ্ডের সহিত হানোবর এক-রাজ্যরূপে সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে দেশের নিয়মানুসারে সিংহাসনে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার না থাকায় হানোবর ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং মহারাণীর খুল্লপিতামহ কম্বারলণ্ডের ডিউক উহার রাজা হইলেন। ইহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই অধিক হইল; কারণ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ জর্ম্মণির রাজনৈতিক গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে পূর্ণ মনোযোগ দান করিতে সমর্থ হইলেন। এক সময় ফ্রান্সের আংশিক রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ডেশ্বরগণ এইরূপে লাভবান্ হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণসময়ে ইংলণ্ডের আর একটী মহৎ ক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছে। এখন কানেডা প্রদেশে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া তাহাও হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইল।

কানেডায় ফরাসী উপনিবেশের

আধিক্যই ইহার শাসন-বিভ্রাটের কারণ। যাহাহউক সার জন্ কোলবোরণ এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং লর্ড ডার্হাম ও সিডনহাম্ রাজ্যে সুশাসন পুনঃস্থাপন করেন। উচ্চ ও নিম্ন কানেডা এক শাসনপ্রণালীর অধীন হওয়াতে দেশ শান্তিময় হইয়াছে এবং অদ্যাবধি এক-ভাবে ইংলণ্ডের প্রতি রাজভক্তির পরিচয় দিতেছে।

মেলবোরণের মন্ত্রিত্ব বিলোপ করিবার জন্য এই সময় এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার নেতৃগণের এক দল "চার্টিষ্ট" বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের উদ্দেশ্য পার্লামেণ্টের নিয়মপ্রণালী সংশোধন। নেতৃগণের অপর দল ১৮৩২ সালে যে শস্য-আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার ঘোর বিরোধী। রিচার্ড কবডেন এবং জন ব্রাইট ইহার মধ্যে ছিলেন। এই আন্দোলনে হুইগ দলের পরাজয় ও রক্ষণ-শীল দলের জয়লাভ হয়। মেলবোরণের পরিবর্ত্তে সার রবার্ট পিল প্রধান রাজ-মন্ত্রী হন। কিন্তু তিনি দেখিলেন মেলবোরণের কৌশলে তাঁহার দলস্থ প্রধান লোকদিগের স্ত্রী ও ভগিনীগণ মহারাণীর বিশ্বস্ত সহচরী; তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া অসম্ভব। ইহাতে তিনি কার্য্যভার পরি-ত্যাগ করেন, এবং লর্ড মেলবোরণ পুনরায় রাজকার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত হন।

১৮৩৯ সালে দেশহিতকর একটী মহৎ অনুষ্ঠান হয়। ইহা "পেনী পোষ্ট প্রণালী" সংস্থাপন। এক পেনীর টিকিটে ডাকের চিঠি যাইবার ব্যবস্থা হওয়াতে দেশমধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিপক্ষে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

৪র্থ উইলিয়মের রাজত্বের শেষভাগে এবং ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথমাংশে উপনিবেশ সকলের প্রভূত উন্নতি হয়। ১৮৩৬ সালে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়, এবং উইলিয়মের পত্নী এডিলেডের নামে ইহার রাজধানীর নামকরণ হয়। ১৮৩৭ সালে নেটাল প্রদেশে ওলন্দাজেরা প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। অগ্রে তাহারা স্বাধীন ছিল, পরে ১৮৪১ সালে ইংলণ্ডের অধীন হয়। ১৮৩৯ সালে এডেন্ ইংরাজাধিকৃত হয়। জিব্রল্টার যেমন ভূমধ্যসাগরের, এডেনও সেইরূপ লোহিতসাগরের প্রবেশ-দ্বার হইয়াছে। এই বৎসরেই নব জিলণ্ডে স্থায়ী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪১ সালে মেলবোরণপ্রমুখ মন্ত্রি-সভা রহিত হইয়া পিল-প্রমুখ রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার পুনর্নিয়োগ হয়। নেপোলিয়ন-জিৎ ওয়েলিংটনের ডিউক, লর্ড লিণ্ড হারষ্ট, আবার্ডিন, ষ্টান্লী এবং সার জন গ্রেহাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চপদে অভি-ষিক্ত হন, এবং গ্লাডষ্টোন বাণিজ্যবোর্ডের সভাপতি হন।

নূতন মন্ত্রিসভার সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য জয় করিয়া ব্রিটিষ ভারত এক মহা-রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮১৩ সালে নেপাল,

১৮১৯ সালে, পিণ্ডারি রাজ্য, ১৮১৯ সালে সিঙ্গাপুর, ১৮২৪ সালে ব্রহ্মের উচ্চতর ভাগ, ১৮২৬ সালে আসামের বহুলাংশ অধিকৃত হয়। ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন নূতন সনন্দ পান, তখন তাঁহদের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লোপ হয়, কিন্তু ভারতের উপর তাঁহাদের আধিপত্য দৃঢ়ীকৃত হয়। তাঁহারা কেবল 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল' নামক সভার অধীনস্থ হন।

এই সময়ে রুসভীতি ইংরাজদের মনে প্রথম সঞ্চারিত হয়। রুসগণ মধ্য এসিয়ায় অবাধে রাজ্য বিস্তার করিয়া ১৮৩৮ সালে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের নিকট রাজদূত প্রেরণ করেন। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া রুস দূতকে তাড়াইয়া দিবার জন্য আমীরকে অনুরোধ করেন। আমীর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে ব্রিটিষ সৈন্য আফগানস্থান আক্রমণ করিয়া গজনী, কান্দাহার ও কাবুল জয় করে। দোস্ত মহম্মদ ইহাতে ভীত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ইংরাজেরা সা সুজাকে আমীর করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষমতা কাবুলরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্য সকলের প্রত্যাগমন-সময়ে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর চাতুরীতে সমগ্র সৈন্যদল আফগানদিগের আক্রমণে ও দারুণ শীত-নিহারে হত হয়, একমাত্র ডাক্তার ব্রায়ণ প্রাণ লইয়া জেলালাবাদে আসিয়া পৌছেন। এই কলঙ্কমোচনের জন্য অচিরে ইংরাজ-সৈন্য পুনরায় সজ্জিত হইয়া আফগানস্থানে গমন করে, এবং কান্দাহার ও কাবুল পুনরধিকার করে। অতঃপর দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ইহার কিছু দিন পরে সেনাপতি সার চার্লস নেপিয়ার সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। মিয়ানী ও হাইদ্রাবাদের যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য জয়লাভ করাতে ১৮৪৩ সালে সিন্ধুর আমীরেরা বন্দিভাবে কলিকাতায় আনীত হন, এবং তাঁহাদের রাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।

সিন্ধুজয়ের পরেই পঞ্জাব জয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখসৈন্য দুর্দ্দান্ত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভীতির কারণ হইয়া উঠে। সর্দ্দারেরা তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র না করাতে যুদ্ধ ঘটে। ১৮৪৬ সালে আলিওয়াল ও সোব্রাওন রণক্ষেত্রে শিখেরা পরাজিত হয়। ৩ বৎসর পরে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। চিলিনওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শিখেরা মহাবীরত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়; এবং ১৮৪৯ সালে পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)।

কলালাপ।

(৩৮৭ সংখ্যা ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

১১। সূত্রক্রীড়া,—এক প্রকার ইন্দ্রজাল—ভোজবাজী বিশেষ। ইহা অতিশয় আনন্দকর ও বিস্ময়জনক ব্যাপার। বোধ হয়, অনেকে ইহা দেখিয়াছেন। যেথানে বহু লোকের সমাগম-সাধন আবশ্যক, সেথানে ঐ সূত্রক্রীড়া বিশেষ ফলোপধায়ক,—অথচ বহুল আয়োজন ও ব্যয়নিরপেক্ষ। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, কোন কোন ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের অন্যতমের গাত্রস্থ বসনপ্রান্ত হইতে এক বিন্দু সূত্র লইয়া ভোজন করে। তাহার পর আপনার উদরের কোন স্থান সূক্ষ্ম সূচি বা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে। ঐ সূচি বা কণ্টক বেধনে একটী অদৃশ্যাবৎ ছিদ্র হয়। অপর কোন ব্যক্তি ঐ ছিদ্রের নিকটস্থ হইলেই সূত্রের অগ্রভাগ দেখিতে পায়। উহা ধারণপূর্ব্বক যত আকর্ষণ করে, ততই সূত্র বাহির হইতে থাকে। ২।৪ চারি শত হাত শুভ্রবর্ণ সূত্র বাহির হইতে হইতে ঐন্দ্রজালিক বলিল,—"লাল।" অমনি গাঢ় লালবর্ণ সূত্র বাহির হইতে লাগিল। সূত্রাকর্ষণকারী গাভীদোহনের ন্যায় দুই হস্তে সূত্র টানিতেছে। দেখিতে দেখিতে লাল সূত্ররাশি দ্বারা শুভ্র সূত্ররাশি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইতিমধ্যে ঐন্দ্রজালিক বলিল—"কালা।" তৎক্ষণাৎ কাল সূতা বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে নীল,পীত, হরিতাদি বর্ণের সূত্ররাশি বহির্গত হইল। অতঃপর ঐন্দ্রজালিক ঐ সমস্ত সূতা ভক্ষণ করিবার উদ্দেশে একটী সূতার তাল পাকাইল, এবং উহা মুখবিবরে প্রবেশ করাইতে লাগিল। সূতার তাল অর্দ্ধেক মুখে প্রবেশ করিয়াছে,—অর্দ্ধেক বাহিরে আছে, এই অবস্থায় মুখমধ্য হইতে ছুরী, কাঁচি, প্রেক্, স্ক্রুপ, চকমকির ইস্পাত, চাবি, রিং ইত্যাদি অসংখ্য পদার্থ বাহির করিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিল। দর্শকবৃন্দ চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ নীরব ও নিস্পন্দভাবে এই ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঐন্দ্রজালিক আবার ঐ সকল বস্তু একৈক ক্রমে মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সূতার তালের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশও গিলিয়া ফেলিল। ইহারই নাম সূত্রক্রীড়া।

১২। প্রহেলিকা,—হিন্দি ভাষায় ইহাকে হিঁয়ালি কহে, এবং কথোপকথনে বঙ্গ ভাষায় ঐ হিঁয়ালি শব্দই চলিয়া গিয়াছে। ইহা একটী অপূর্ব্ব আমোদজনক কাব্যক্রিয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রকৃতিগত জাতীয় আমোদপ্রমোদজনক ব্যাপার সকল ক্রমেই লোপ পাইতেছে। হিঁয়ালি, চিত্রকাব্য, যমক, পাদ-সমস্যাপূরণ প্রভৃতি এখন অসভ্যের কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হওয়ায় অনাদৃত হইয়াছে। এখন উহার অনুশীলনে বৃথা

সময় নষ্ট হয়। বহির্মুখী জাতির সংসর্গে বাহ্যক্রিয়ারই আদর বাড়িতেছে। শরীরের বল ও স্বাস্থ্যসাধন উদ্দেশে স্কুলে স্কুলে ব্যায়ামের (gymnastics) আয়োজন দেখা যায়, কিন্তু আন্তরিক বল, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিবিধানের উপায় সকল অন্তর্হিত হইতেছে। স্কুল কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন হইতেছে বটে; কিন্তু তাহা কষ্ট ও বিরক্তির সহিত,—আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সহিত নহে। প্রহেলিকা একটী ঐ জাতীয় কার্য্য। উহার চর্চ্চায় আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সহিত মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। আমরা এই জন্য মধ্যে মধ্যে বামাবোধিনীতে প্রহেলিকা ও উহার উত্তর সঙ্কলন করিয়া থাকি। ভরসা করি, শ্রীপঞ্চমী মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রহেলিকার অনুশীলনবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

১১। পুস্তকবাচন,—পুস্তকনির্ব্বাচন। উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, পাঠ্য অপাঠ্য, নৈতিক, অনৈতিক ইত্যাদি ক্রমে পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ। ইহা রাজ্যের ও সমাজের একটী গুরুতর কার্য্য। কারণ পুস্তক পত্রিকাদি জনসমাজের প্রকৃত শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর দোষ ও গুণ, শিক্ষাপ্রাপ্ত জনগণের চরিত্রে সংক্রামিত হয়। এইজন্য উৎকৃষ্ট পুস্তকের প্রচলন ও অপকৃষ্ট পুস্তকাদির প্রচলন বিষয়ে জনসমাজকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। বিগত কয়েক বর্ষ হইতে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাদির নির্ব্বাচনবিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট "স্কুলবুক রিভিসন্ কমিটী" স্থাপন করিয়াছেন। ঐ কমিটী দ্বারা মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সকলের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ও কালেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিণ্ডিকেট' পুস্তক নির্ব্বাচন করেন। তদ্বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষ কর্ত্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য সামাজিক পুস্তকাদি নির্ব্বাচনের কোন উপায় নাই। এজন্য জনসমাজের অতিশয় অনিষ্ট হইতেছে। অশিক্ষিত ব্যবসাদারেরা এক মাত্র অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশে বিবিধ অসৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের সাতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। অদ্যাপি অসংখ্য অশ্লীল পুস্তক সমাজে প্রচলিত আছে। ঐ সকল পুস্তক পাঠে মানুষের নৈতিক অধঃপাত ও কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। তদ্ভিন্ন ঐ সকল পুস্তক পাঠে কোন উপকার নাই। অথচ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ঐ জাতীয় পুস্তকাদি পাঠের রুচি বিশেষ বলবতী দেখা যায়। এ জন্য প্রত্যেক স্থানের শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণের আপনাপন কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশে প্রচলিত পুস্তকাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাতে ঐরূপ অনিষ্টকর পুস্তকাদি ঐ সকল স্থানে বিক্রীত হইতে না পারে এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট, সুপাঠ্য ও সচ্চরিত্র বিষয়ক পুস্তকাদির প্রচুর প্রচলন হয়, তাহার উপায় বিধান করা উচিত।

১৪। নাটকাখ্যায়িকা দর্শন,—অভিনয় যাত্রা। আজ কাল অভিনয় ও যাত্রা

বুঝাইবার জন্য কোন কষ্ট নাই। বর্ত্তমান কালে অনেক ভদ্রলোক, উহা ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা সামাজিক মঙ্গল সাধনের জন্য আবশ্যক, তাহা 'সকের' না হইয়া 'পেসাদারি' হওয়াই উচিত। যত দিন অভিনয় পেসাদারের হাতে না পড়িয়াছিল, তত দিন উহার উন্নতি হয় নাই। আমাদের স্মরণ হয়, যেন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে একবার 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। তাহার দশ বার বৎসর পরে সাঁতরাগাছির বাবু কেদার নাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হয়। তাহার পর, কোন্ সালে মনে হয় না, শিমূলার শরৎ বাবু ও নেড়াগিরজার হরিদাস বাবাজী পেসাদারী অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চের নাম "বেঙ্গল থিয়েটার।" এক্ষণে উহা "রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার" নাম ধারণ করিয়াছে। এই রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি থিয়েটারের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে থিয়েটারের যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছেন।

কাব্য দ্বিবিধ, দৃশ্য ও শ্রাব্য। যে সকল কাব্য নাট্যশালায় অভিনীত হয়, তাহাকে দৃশ্য কাব্য; এবং যে সকল কাব্য অধীত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহাকে শ্রাব্য কাব্য কহে। শ্রাব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য দ্বারা জনসমাজের অধিক উপকার হয়। কেননা, উহা দ্বারা গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করাতে দর্শকের মনে বিশেষরূপে ভাবসংস্থান হয়। এই ভাব সংস্থানই সমাজের ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিরাকরণ করে। রঙ্গমঞ্চের উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় দর্শন করিলে দর্শকের তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়। সমাজের কোন পদস্থ ব্যক্তি, কি উচ্চ কর্ম্মচারী রাজপুরুষ, কদাচারী হইলে, অভিনেতৃগণ অভিনয় দ্বারা তাঁহার কদর্য্য চরিত্র, সাধারণের সমালোচনারূপ ক্রকচচক্রে (অথবা কুঁদের মুখে) পাতিত করেন। সেই খরধার করাত, বা কুঁদের আঘাতে তাঁহার বক্রভাব সরল হইয়া যায়। সাধারণে বলিয়া থাকে, "কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।"

শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণের কর্ত্তব্য, তাঁহারা মেলাচ্ছলে, দেশপ্রচলিত ও সর্ব্বত্র সুপরিচিত নাটক নাটিকা ও আখ্যায়িকার অভিনয় করাইবেন। যে সকল উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা শ্রাব্য কাব্যের আকারে আছে, তাহা নাটকাকারে পরিণত করাইয়া অভিনয় করিবেন। যে বৎসর, যে দেশে, সর্ব্বসাধারণের মনে যেরূপ ভাব সংস্থানের প্রয়োজন হয়, দেশকালপাত্রাভিজ্ঞ উৎকৃষ্ট কবি ও উৎকৃষ্ট সুলেখক দ্বারা তদনুরূপ নাটক নাটিকা প্রণয়ন করাইয়া অভিনয় করাইবেন। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলার মধ্যে পরিগণিত।

১৫। কাব্যসমস্যা পূরণ,—ইহা একটী

বিশেষ আমোদজনক ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধক কলা। ইহা দ্বারা চিন্তাশীলতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। এই চিন্তাশীলতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর আনন্দের অনুভূতি হয়। পূর্ব্বকালে ইহার সবিশেষ আদর ও অনুশীলন ছিল। "বিদগ্ধমুখমণ্ডল" "কবিতা-রত্নাকর" প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দৃষ্ট হয়। পাঠক পাঠিকাগণের প্রীতি উদ্দেশে উহার দুই একটী উদাহরণ না দিয়া থাকা গেল না।

কবিতা, বা কবিতার পাদ পূরণার্থ প্রশ্নের নাম সমস্যাপূরণ। এই সমস্যাপূরণে সময়ে সময়ে কবিদিগের অসাধারণ শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির নিদর্শন দেখা যায়। কোন সময়ে কবির প্রতি প্রশ্ন হইল,—

"ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্।"

"ভা+গী+রথী+ইতী+রসং+আশ্রিতানাম্।"

উত্তর,

"রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাম্
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্॥"

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কবির অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির লীলাখেলা আছে। প্রশ্নের প্রত্যেক পদ, কবিতার প্রত্যেক পদের উত্তর। সমগ্র প্রশ্ন চরণটী, কবিতার চরণের শেষপদের উত্তর।

প্রশ্ন,—রবি কবি ও সমরের সার কি?

উত্তর,—ভা (দীপ্তি), গী (বাক্য), রথী।

প্রশ্ন,—কৃষিকার্য্যের ভয় কি? এবং ভৃঙ্গগণ কি খায়?

উত্তর,—ইতী (১), রস (পুষ্পমধু)।

প্রশ্ন,—কাহাদিগের সর্ব্বদা ভয় এবং কাহাদিগের সর্ব্বদা অভয়?

উত্তর,—আশ্রিত জনগণের সর্ব্বদা ভয়। (ক)

ভাগীরথীতীরসমাশ্রিত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা অভয়। (খ)

এ সকল ঘটনা প্রাচীন কালের। এতাদৃশ সমস্যাপূরণের শত সহস্র শ্লোক অধুনাতন কাব্যশাস্ত্রবিনোদী পণ্ডিতগণের কণ্ঠে কণ্ঠে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মধ্যকালেও এ রসের স্রোতঃ এককালে বন্ধ হয় নাই। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত উপমিত হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সংস্কৃত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গলা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রসসাগর, হাস্যার্ণব প্রভৃতি কবিগণও উপস্থিত কবিত্ব ও সমস্যা পূরণ বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাণেশ্বরের উপস্থিত কবিত্ব ও সমস্যা-পূরণ-ক্ষমতা অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্যাপূরক প্রায় সমস্ত কবিই কিঞ্চিৎ সময় লইয়া সমস্যা পূরণ করিতেন, কিন্তু বাণেশ্বর প্রশ্ন করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ ভাবশুদ্ধ সুললিত কবিতায় উত্তর দিতেন।

কোন সময়ে বাণেশ্বর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহে বহু বৎসরের পর বিনা

(১) অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ (পঙ্গপাল), শুকাদি পক্ষী, এবং দেশ-আক্রমণকারী রাজা, এই ছয়টীকে ইতী কহে।

আহ্বানে রটন্তী পূজার দিন রাত্রিতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেবীর সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নীরবে দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা সহসা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন,—

"কিমদ্ভুতম্ !"

বাণেশ্বর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

শিবস্য নিন্দয়া যয়া ত্যজদবপুঃ স্বকীয়কম্।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্॥"

মহারাজ, আমি যে অভিমানবশে কয়েক বৎসর আপনার রাজসভা ত্যাগ করিয়াছিলাম, অদ্য বিনা আহ্বানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছি, তাহা অদ্ভুত নহে। যে দক্ষকন্যা সতী যে শিবের নিন্দামাত্র শ্রবণে স্বকীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—সেই সতী মাতা সেই শিবের বক্ষে পদদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন,—বিবেচনা করুন, ইহাই—

"কিমদ্ভুতম্ !"

এখন আর এ রসের নাম গন্ধ নাই। যেমন নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্র অভিমুখে গমন করিতে করিতে বালুকাময় মরুভূমিতে উপস্থিত হইলে সেই জলস্রোতঃ বালুকায় বিলীন হইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু অন্তঃ-সলিলারূপে থাকে; সেইরূপ ঐ সকল কাব্য রসের স্রোতঃ, প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকালে আসিতে আসিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতারূপ বালুকাময় ভূমিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে—অন্তঃসলিলরূপে অবশ্যই আছে। শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ বালুকাভূমির মধ্য হইতে ঐ অমৃতরসের স্রোতঃ পুনরায় বাহির করিবার চেষ্টা করুন।

(ক্রমশঃ)।

ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা।

ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা চিরপ্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে ভারতবাসী পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের অধিবাসীদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে। ভারতবর্ষীয়গণ আপনারা আপনাপন বিশ্বস্ততার গৌরব ঘোষণা করে নাই, আপনারা আপনাদিগকে প্রভুভক্ত বা বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয় নাই, বা আপনারা আপনাদের গুণ-বর্ণনায় অপর দেশের অধিবাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা নীরবে যে গুণের পরিচয় দিয়াছে, অপর দেশের অধিবাসিগণ সেই গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয়দিগের এই গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সমকালে গ্রীক্ দূত মেগা-স্থিনিসের লেখনী হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের এই গৌরবকাহিনী নিঃসৃত হইয়াছে। রাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের

সময়ে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী হিউ-এঙ্ সঙ্ ভারতবর্ষীয়দিগের এই গুণ দেখিয়া, তাহাদের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টাব্দের শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত সহৃদয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের এই গুণের প্রশংসা করিয়াছেন।

সম্পদের সময়ে অনেকেই অনেকের পরিতোষসাধনে অগ্রসর হইয়া থাকে, কিন্তু বিপদের সময়ে যাহারা আপনাদের জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অপরের সুখ-শান্তিবিধানে অগ্রসর হয়, তাহারাই জগতে মহাপুরুষ বলিয়া বরণীয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, সামান্য লোকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে যখন আপনাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে, তখন তাহারা মানবলোক অতিক্রম করিয়া, দেবলোকে স্থান পাইবার যোগ্য হয়। ভারতবর্ষীয়গণ এইরূপ বিশ্বস্ততাপ্রদর্শনেও কাতর হয় নাই। ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়া যত বিপদে পতিত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীযুদ্ধই প্রধান। এই যুদ্ধে ইংরেজকে যারপর নাই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিদিন আত্মীয়-স্বজনের শোণিতস্রোত দেখিয়া দুঃসহ মর্ম্ম-যাতনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি পর-হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহাদের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র কন্যা তাঁহাদের সমক্ষেই কাতরভাবে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্ব-সংহারক কালের ভীষণ ছায়া দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সঙ্কট-কালে ভারতবর্ষীয়গণই তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অপরিসীম প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লী ইংরেজের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজ আত্মপক্ষের সৈনিকদল লইয়া উহা অবরোধ করেন। এই অবরোধের সময়ে ইংরেজের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ সহায় না হইলে ইংরেজ কখনও দিল্লীর নিকটে স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেন না। যাহাদের স্বদেশীয়-গণ উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ইংরেজকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়া দিয়াছে, ইংরেজ তাহাদের অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা, প্রীতিস্নিগ্ধ মধুর ভাব, এবং অসামান্য দয়াশীলতা দেখিয়া বিস্ময় সহকারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

দিল্লীর অবরোধসময়ে ভারতবর্ষীয়গণ প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদনে ইংরেজের এক-মাত্র সহায় ছিল। ইংরেজ পদাতিক, ইংরেজ অশ্বারোহী, বা ইংরেজ কামান-রক্ষকগণ যুদ্ধ-স্থলে বীরত্ব দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-বর্ষীয়েরা না থাকিলে তাহারা একান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িত। তাহাদের সাহায্য ব্যতীত আহার বা পানীয় সংগ্রহে কোন সুবিধা হইত না। যাঁহারা দিল্লীর যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সহৃদয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইংরেজ শিবিরে প্রত্যেক ইউরোপীয়ের জন্য দশ

জন করিয়া ভারতবর্ষীয় ছিল। কামান-রক্ষক দলে ভারতবর্ষীয়দিগের সংখ্যা ইউরোপীয়দিগের সংখ্যার চারি গুণ ছিল। অশ্বারোহী দলে প্রতি অশ্বের জন্য দুই জন করিয়া ভারতবর্ষীয় কার্য্য করিত। ইহাদের অভাবে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপে ভারতবর্ষীয়গণ শিবিরস্থিত ইউরোপীয়দিগের যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিত, সেইরূপ উক্ত সৈনিকদলের ঘোড়াগুলিকে ঘাস দানা দিত, কামানগুলি যথাস্থানে লইয়া যাইত, পীড়িত ও আহতদিগকে চিকিৎসালয়ে লইয়াগিয়া তাহাদের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিত। এই সকল কার্য্যে তাহাদের কোনরূপ অমনোযোগ লক্ষিত হইত না। কোনরূপ বাধা বা বিঘ্নে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে নিরস্ত থাকিত না। তাহারা বিপক্ষের গোলাবৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিত না, বিপক্ষের তরবারির সঞ্চালনে ভীত হইত না, বা বিপক্ষের বলাধিক্য দেখিয়া, আপনাদের অল্পসংখ্যক বিদেশীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইত না। দিল্লীর যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষ লিখিয়াছেন, "একদা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার কামানসমূহ ব্যূহের পার্শ্বভাগে আনীত হইয়াছিল। আমি গোলাবৃষ্টি করিয়া, বিপক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। আমার একজন ভারতবর্ষীয় কামান-পরিচালকের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল; ইহাতে তাহার হাঁটুর নীচের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে সকল ঘোড়ার দ্বারা কামান পরিচালিত হইতেছিল, এই আহত ব্যক্তি তৎসমুদায়ের একটির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কামান থামাইতে বলিলাম এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইতে চাহিলাম। সে কহিল, "কুচ পরওয়া নেহি সাহেব"—আমি যদি পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে ঘোড়া হইতে না নামাইতাম এবং ডুলিতে না তুলিয়া দিতাম, তাহা হইলে সে ঘোড়ার উপরেই থাকিত। আমার যে সকল ভারতীয় লোক ছিল, তাহারা এই ভাবে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিল।"

যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে এতদ্দেশীয়গণ এই দুঃসময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতি এইরূপ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত প্রশান্ত ভাব হইতে বিচলিত হয় নাই, বিপ্লবে প্রমত্ত হইয়া ইউরোপীয়দিগের শোণিতে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই, বা বাহিরে সৌজন্য ও সদাচারের পরিচয় দিয়া, নৃশংসভাবে কৃতঘ্নতা দেখাইতে উদ্যত হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, তখন তাহারা নিরীহভাবে আপনাদের বিদেশীয় প্রভুর কার্য্যসাধনে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছিল। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইব বলিয়া তাহারা যে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল, সে কর্ম্ম সম্পাদনে তাহাদের কখনও ঔদাস্য

দেখা যায় নাই ? তাহারা উপস্থিত বিপ্লবকে জাতীয় সমুত্থান বলিয়া মনে করে নাই, বিপ্লবে উন্মত্ত স্বজাতীয়ের প্রতিও তাহারা সমবেদনা প্রকাশে উদ্যত হয় নাই। তাহারা অর্থের বিনিময়ে ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইয়া, বিদেশীয় প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ও বিশ্বস্ত ছিল। তাহাদের এই নিত্য সন্তোষ কখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাদের এই ভৃত্যভাবও অবিশ্বস্ততা বা অশ্রদ্ধায় কলঙ্কিত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

স্ত্রীরোগ।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ২।১ রতি হিঙ্গু জল সহ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

যে নারীর রজোদর্শন হয় না, সে দূর্ব্বাদল ও আতপ তণ্ডুল সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। তাহাতে উপকার দর্শিবে।

গুলঞ্চ তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অধিক শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

পেটারি বৃক্ষের পত্রের সহিত মাসকলাই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে অধিক শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

ঝাঁটির মূল, যষ্টিমধু এবং শ্বেতচন্দন সম পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করত তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে নারীগণ রক্তস্রাব রোগ হইতে মুক্ত হয়।

লজ্জাবতী লতার মূল কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিতে পারে।

দশমূলের কাথ ঘৃত ও সৈন্ধব সহ পান করিলে তৎক্ষণাৎ সুখপ্রসব হয়।

বৃষ্টিকালীন যে করকা বা শিল নিপতিত হয়, তাহা মৃত্তিকাতে গুলিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সেই বটিকা গুলিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে ঠুন্‌কা আরাম হয়।

কদম্ব বৃক্ষের ফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া আমানীর সহিত যথাকালে পান করিলে নারীগণের বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারিত হয়।

পিপ্পলী, নাগকেশর, আদা, কণ্টিকারী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গব্য ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যাত্ব দোষ বিনষ্ট হয়।

গব্য দুগ্ধ ও শর্করা পান করিলে গর্ভের শুষ্কতা দোষ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধা, ঘৃত ও জলের সহিত শয়নকালে পান করিলে বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধার মূল, মহিষ দুগ্ধের সহিত

পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিলে কাক-বন্ধ্যা নারী গর্ভধারণের উপযুক্ত হয়।

শর্করা, আঙ্গুর ফলের ক্বাথ, মধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে অকালজনিত গর্ত্ত-বেদনার শান্তি হয়।

অশোকফুলের পাতা এক ছটাক, ঐ ছাল এক ছটাক ও শিকড় এক ছটাক, এই তিন দ্রব্য এক সঙ্গে মিলাইয়া অর্দ্ধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই জল ২।৩ দিন যে স্ত্রীলোকের ঋতুসময়ে জ্বর হইয়াছে তাহাকে খাওয়াইলে জ্বর আরাম হয়।

দ্বিতীয় মাসে গর্ত্তবেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য গব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিবে।

তৃতীয় মাসে গর্ত্তবেদনা উপস্থিত হইলে রক্তচন্দন, বচ, কুড়, মৃণাল, পদ্মকেশর, এই সকল দ্রব্য শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

চতুর্থ মাসে মৃণাল, গোক্ষুর ও কেশর এই সকল দ্রব্য গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টিকারী, যজ্ঞ-ডুম্বুর, কটফল, দারুচিনি ও গব্য ঘৃত গব্য দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিবে।

শর্করা ও কতবেলের শাঁস শীতল জলে পেষণ করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে ষষ্ঠ মাসের বেদনা নিবৃত্ত হয়।

যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পাণিফল, কেশুর ও মৃণাল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শর্করা ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে সপ্তম মাসের বেদনা প্রশমিত হয়।

যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, কেশুর, গজ-পিপুলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে অষ্টম মাসের গর্ভ-বেদনার শান্তি হয়।

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ক্ষীর-কাকোলী, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে নবম মাসের গর্ভ-বেদনার শান্তি হয়।

প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধের আধিক্য হইলে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর, এমন কি তাহাতে জ্বরাদি রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। দুগ্ধ কমাইতে হইলে স্তনের বোঁটাতে ও স্তনের যে পর্য্যন্ত কাল দাগ থাকে, সেই সমস্ত ভাগে উত্তম মেটেল বা আটাল মৃত্তিকা গুলিয়া লেপ দিবে। ৩।৪ দিন দিলে দুগ্ধ ক্ষরিয়া যাইবে, প্রসূতির আর কষ্ট হইবে না।

শিশুর স্তন্য পান করা বন্ধ করিতে হইলে তিক্ত খদির গুলিয়া স্তনের বোঁটাতে ও একটু উপর পর্য্যন্ত মাখাইতে হইবে। শিশু স্তনে মুখ দিলেই ঐ তিক্তাস্বাদ পাইয়া আর স্তন্যপান করিবে না, আর ইহাতে তাহার কোন অপকার হইবে না।

এক তোলা তুলসীপত্রের রস চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্ত-প্রদর বা রক্তস্রাব নিশ্চয় আরাম হইবে।*

* এই ঔষধ দ্বারা পাঁচন ও মুষ্টিযোগ সংগ্রহকারের পিতামহী বিস্তর রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

নব বর্ষের চিন্তা।

১। প্রকৃতি নবজীবনের আদর্শস্থল। ইহার মত বৃদ্ধা আর কে আছে? কিন্তু ইহার মত নবযৌবনাও আর কেহ নাই। সংবৎসরের উত্তাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি ও শীত-নিহারে যে প্রকৃতি শুষ্ক ম্লান ও নির্জীব হইয়াছিল, বসন্তসমাগমে তাহার কি সৌন্দর্য্য, দীপ্তি ও সজীবতা!

ঈশ্বর প্রেমরসে মত্ত বৃদ্ধ ও চির-নবীন।

২। "ত্যজ দুর্জন-সংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং॥"

দুর্জনসংসর্গ পরিত্যাগ কর, সাধুসঙ্গ কর, অহোরাত্র পুণ্য অনুষ্ঠান কর, নিত্য অনিত্যতা স্মরণ কর।

৩। তোমার দৃষ্টি একাগ্র হউক, ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হউক।

৪। কি আহার কর, কি পান কর, কি যে কোন কার্য্য কর, সকল কার্য্যই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কর।

৫। সত্য সত্যই তোমাকে বলিতেছি, মানব পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।

৬। পিতামাতার ঔরসজাত সন্তান পশু, ঈশ্বরজাত সন্তানই দেবতা।

৭। যে প্রেমিক সে ঈশ্বরজাত।

৮। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।

৯। পবিত্রহৃদয় ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।

১০। সৎকর্ম্ম-নিরত লোক ঈশ্বরজাত।

১১। যে ব্যক্তি ঈশ্বরজাত, তাহার মতি অসত্য,অন্যায় ও অধর্ম্মের দিকে যায় না।

১২। যে ঈশ্বরজাত, সে ধর্ম্মদ্বারা সংসারকে পরাজয় করে।

১৩। যে ঈশ্বরজাত সে ব্রহ্মতেজে রিপুকুলকে ভস্মসাৎ করে।

১৪। যে ঈশ্বরজাত সে ঈশ্বরে বাস করে, ক্রীড়া করে এবং জীবনের সমুদায় আনন্দ ভোগ করে।

১৫। সংসারের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিও না, কিন্তু আত্মাকে সংসারের প্রতিকূলগামী হইতে শিক্ষিত কর।

১৬। সংসার তোমাকে যেন তাহার অনুগত না করে, কিন্তু তোমার আত্মার দেবভাব দ্বারা সংসারকে পরি-বর্ত্তিত ও রূপান্তরিত কর।

১৭। দ্বিজাত ব্যক্তির নিত্য নূতন ভাবে থাকিবার চেষ্টা অবশ্যক।

১৮। ব্রহ্মাগ্নির সহিত যাহার প্রাণ সংযুক্ত, সে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ হইবে।

১৯। "যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করং।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমং॥"

যাহা দুস্তর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম এবং যাহা দুষ্কর, সে সমস্তই তপস্যাসিদ্ধ। তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২০। জীবন উন্নতি; যেখানে উন্নতি নাই, সেখানে জীবন নাই—মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

২১। "ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন—সে এই জন্য যে তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন হইতে দিবে না, মৃত হইতে দিবে না, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না, কিন্তু চিরজীবন্ত করিবে, চির-লাভজনক করিবে এবং ইচ্ছানুরূপ সুন্দর রাজ্যে পরিণত করিবে। এই জন্য যে মৃত ব্যক্তিরা পুনরুত্থান করিবে এবং জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে যাহা দ্বারা ইচ্ছানুসারে পৃথিবীকে উন্নত করিতে পারে।"

২২। বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষ লুক্কায়িত আছে, ক্ষুদ্র মানবাত্মাতে কি অনন্ত মহত্ত্ব নিহিত আছে কে বলিবে?

২৩। ঈশ্বর-বিশ্বাসী চির-আশান্বিত, চির-উৎসাহবান্ ও চির-উন্নতিশীল।

আনন্দ-গীতি।*

মিশ্র কাফি—একতালা।

সুখদা পূর্ণিমা নিশা,
সুধা-মাখা ভূমণ্ডল,
কনক চন্দ্রমা-ভাসে
সরসে কুমুদ হাসে,
পাপিয়া গাহিছে গান,
উছলিয়া নভস্তল;
বাসন্তী রাণীর মেলা,
ফুটিছে গোলাপ বেলা,
ভাসিছে মলয়ানিলে
পারিজাত-পরিমল!
আনন্দ ঢালিছে রাকা,
বসুধা আনন্দ-মাখা,
দশ দিক্ সুধাস্নাত,
হাসি-ভরা নিরমল!
এ শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণে
পশিতেছে দুই জনে
বিধাতার প্রেম-ধামে—
চির-আনন্দের স্থল।
যাচি ইহাদেরি তরে
বিধি-পায় যোড়করে,—
এ সুখ মিলনে হোক্
চিরদিন সুমঙ্গল;
এ বিশ্বাস, এই প্রীতি,
এ অমৃত-মাখা স্মৃতি,
এ আনন্দ, এ উত্তম
থাক্ চির সমুজ্জ্বল;

---

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগির বি এ-র শুভ বিবাহোপলক্ষে—৫ই বৈশাখ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

গাহিয়া একই গান
এক সাথে দুটী প্রাণ
বিশ্ব-প্রেম-সিন্ধু পানে
যাক্ চলি অবিরল ;
যেন সত্যসুখ মধু
লভি এই "বর-বধূ"
"প্রেম পরিবার" রূপে
ধরা করে সুশীতল।

কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করে।

সত্য ও ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে পদে পদে যে দুঃখ বিপত্তি ভোগ করিতে হয়, অপরিণামদর্শী লোক সেই দুঃখ বিপত্তি হইতে মুক্ত হইবার আশাতেই ধর্ম্মভ্রষ্ট ও সত্যচ্যুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি যে আপদ হইতে মুক্ত হইবার আশা করে, প্রায়ই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না ; অধিকন্তু অসত্য পথ আশ্রয় করিয়া পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং অশান্তিতে জীবন অবসান করে। ঈশ্বর-বিশ্বাসিগণ ভ্রমেও অসত্য পথ অবলম্বন করেন না। সম্পদে হউক, আর বিপদেই হউক, তাঁহারা জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না ; সংসারের শত কশাঘাত উপেক্ষা করিয়া স্থির অচঞ্চল-হৃদয়ে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

পূর্ব্বকালে খাড়ীনামক নগরে রাজা গোপীচন্দ্র এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। রামচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী। "সকল সময় সত্যাচরণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।" রাজার এই কথা শুনিয়া রাজমন্ত্রী দুঃখিতহৃদয়ে কহিয়াছিলেন,—"মহারাজ! আপনি যে কথা ব্যক্ত করিলেন, তাহা চিন্তা করিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। সত্যময়ের রাজ্যে বাস করিয়া সত্যের আলোক লাভ করিয়া যে ব্যক্তি সত্যাচরণ করিতে না পারে, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।" রাজা মন্ত্রীর কথায় স্তম্ভিত হইলেন। মন্ত্রীর সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার প্রবলেচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল।

গোপীচন্দ্র মিথ্যা দোষারোপ করিয়া মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁহার সমুদায় ধনসম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র আপন প্রাসাদতুল্য গৃহ হইতে বিতাড়িত ও অতুল ধনৈশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি অবিচলিতচিত্তে কর্ত্তব্যবোধে সামান্য মজুরী করিয়া স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংকুলান করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞাক্রমে দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে দুষ্ট পরামর্শ

দিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহার হৃদয় সত্যের আলোকে বিভাসিত, যিনি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম পন্থার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে বিপথগামী করা কাহার সাধ্য? রামচন্দ্র খাঁ দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া, নীরবে ধর্ম্ম ও সত্যের সেবায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। সংসারের কণ্টকরাশি তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে গিয়া ভগ্ন হইয়া পড়িল।

রাজার গুপ্ত আজ্ঞাক্রমে আর কেহ রামচন্দ্রকে দিয়া মজুরী করাইল না। এক দিন তাঁহারা সপরিবারে অনাহারে রহিলেন। দ্বিতীয় দিবস রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষা জন্য বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাহাও মিলিল না। সমস্ত দিন বৃথা পর্য্যটনের পর ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে পথিপার্শ্বস্থিত একজন দোকানদার তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চাউল ভিক্ষা দিল। রামচন্দ্র ধীরভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি উহা রন্ধনার্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চাউলের সহিত কয়েক খণ্ড সুবর্ণ রহিয়াছে। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীয় বুভুক্ষিত প্রিয়তমার অঞ্চল হইতে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! দোকানদার বোধ হয় ভুলক্রমে আমাকে কয়েক খণ্ড স্বর্ণ দিয়াছে। যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি এই চাউল ও সুবর্ণ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।" তাঁহার কথা শুনিয়া পত্নী কহিলেন, "ভাল স্বর্ণ কয়েক খণ্ড আপনি রাখিয়া দিন, আমি ঐ চাউলগুলি রন্ধন করিয়া আনি। দোকানদার ভুলক্রমে স্বর্ণই না হয় দিয়াছে, চাউলত ভুলক্রমে দেয় নাই। কল্য অবধি পুত্রকন্যা উপবাসী আছে, আপনিও কিছু আহার করেন নাই।" মন্ত্রী কহিলেন "প্রিয়ে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া তিনি চাউল লইয়া দোকানদারের কাছে ফিরিয়া গিয়া কহিলেন, "দেখ বাপু! তুমি আমাকে যে চাউল দিয়াছিলে, তাহার সহিত কয়েক খণ্ড স্বর্ণ আছে। বোধ হয় ভুলক্রমে উহা আমাকে দিয়া থাকিবে। ঐ চাউল ফিরাইয়া লইয়া অন্য চাউল আমাকে দাও।" দোকানদার যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি সোণা! কোথায় পাইলে? চাউলের সহিত স্বর্ণ দিব কেন?" রামচন্দ্র বলিলেন, "না বাপু, এ তোমারি, তুমি গ্রহণ কর।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একজন রাজপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া রামচন্দ্রকে ধরিল।

রামচন্দ্র রাজসমীপে উপনীত হইলেন। রাজা মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "তোমার চাউলে কত খণ্ড স্বর্ণ আছে?" রামচন্দ্র অনুদ্বিগ্নভাবে কহিলেন, "তাহা জানি না, গনি নাই।" রাজা সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে উহা হইতে স্বর্ণখণ্ডগুলি বাছিয়া লইতে বলিলেন। সে উহা বাছিয়া রাজসমীপে প্রদান করিল। রাজা সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সস্নেহে

রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিবর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার মত সাধু ব্যক্তিকে দেখিলেও মানব পবিত্র হয়। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কত যন্ত্রণাই প্রদান করিয়াছি! আর পরীক্ষা করিতে হইবে না, তুমি মূর্ত্তিমান্ অগ্নি, তোমার স্পর্শে অঙ্গারও জ্যোতির্ম্ময় হয়, কিন্তু তুমি মলিন হও না।"

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার ধন সম্পদ লাভ করিলেন; যে অট্টালিকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন; রাজাজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার মন্ত্রিপদও গ্রহণ করিলেন।

রামচন্দ্র নিঃস্ব অবস্থা হইতে আবার রাজযোগ্য পদে উন্নীত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতী, তাহাই রহিলেন। তিনি যথার্থই স্থিতধী,

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

নামিকে আমি কর।*

"নাহং" কে "অহং" করার কথা হইতেছে। এই সংসারে যাহা কিছু দেখিবে, কিছু শুনিবে, কিছু বুঝিবে, কিছু বলিবে, কিছু করিবে, যতই বল, যাহা তোমার নিজস্ব ছিল না, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লওয়া উহার তাৎপর্য্য।" ভূদেব-উক্তি।

পৃথিবী মানুষের চির-বাসস্থান নহে। দিন কয়েকের জন্যই মানুষ ইহাতে আইসে। সেই কয় দিন আমোদে প্রমোদে সুখসচ্ছন্দে যাপন করাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ! সেই জন্য মনুষ্যের সকল চেষ্টাই সুখোন্মুখা। মানুষের এই সুখ, পাঁচ জন মানুষ লইয়া। মানুষের যত আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা, সম্বন্ধ, কুটুম্বিতা বৃদ্ধি পায়, ততই ভাল,—ততই সুখের পথ প্রশস্ত হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব, ইহাঁরা ত চির দিনই আমোদ আহ্লাদের বন্ধু আছেন এবং থাকিবেন। যাঁহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদিগকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। উদারচরিত ব্যক্তিগণ তাহাই করিয়া থাকেন।

"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

যাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপর, লঘুচিত্ত এবং স্বার্থের বিস্তৃতিই যে পরার্থ, তাহা বুঝেন না, তাঁহারাই পরকে আপন করিতে চাহেন না। কিন্তু সুখের লোভে, প্রকৃতির টানে "নাহং" কে "অহং" না করিয়াও থাকিতে পারেন না। এই জন্যই জনসমাজের মধ্যে "পাতান সম্বন্ধের" সৃষ্টি হইয়াছে। সম্বন্ধ পাতানর প্রবৃত্তি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীগণে বলবতী। রমণীগণের মধ্যে 'সই', 'মকর', 'মিতিন', 'গঙ্গাজল', 'গোলাপফুল',

* ন + আমি = নামি অর্থাৎ নাহং এবং আমি = অহং।

'বেগুনফুল', 'খোঁপার ফুল', 'চৈৎ বৈশাখের গামছা', (আজি কালি সহর অঞ্চলে) 'আতর', 'গোলাপ', 'লাবেণ্ডার', 'পোমেটম্' ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য সম্বন্ধসূচক বিচিত্র নামের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষগণ, স্ত্রীগণের এরূপ সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারে তাদৃশ সন্তুষ্ট নহেন, বরং কিঞ্চিৎ বিরক্তই হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনারাও ঐ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যেও, 'বন্ধু', 'সাঙাৎ', 'মিতে' 'মিত ভাই' 'বামন খুড়ো' ইত্যাদি কৃত্রিম সম্বন্ধসূচক নাম আছে। বিবাহকালে যে 'মিতবর' এবং 'মিতকন্যা' দেখা যায়, তাহাও ঐরূপ সম্বন্ধসূচক নাম। ইংরাজদিগের মধ্যেও উহা আছে। যেমন ব্রাইড্‌স্ ম্যান্' 'ব্রাইডস্ মেড্' বর কন্যার স্বজন ও স্বজনী।

সুখের লালসায়, নৈসর্গিক চেষ্টায় জনসমাজের মধ্যে যে সকল ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়া বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কোন ক্রমে উপেক্ষার বিষয় নহে। বরং তাহাতে কিছু কিছু জানিবার শুনিবার ও করিবার আছে। যখন দেখা যাইতেছে, এই সম্বন্ধ-পাতান ব্যাপারটী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তখন উহা উপেক্ষার বিষয় নহে। বঙ্গদেশে যেরূপ সম্বন্ধ পাতান হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি। রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের 'রাখীবন্ধ ভাই' সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ঐরূপ ভাই পাতান, ঐ সকল দেশে একটী বিশেষ সমৃদ্ধিজনক পর্ব্বাহবিশেষ। জৈন মতাবলম্বী ওসোয়লদিগের মধ্যেও "ভাই" পাতান হইয়া থাকে। এই ভাই পাতানর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহারা 'ভাই' বলিয়া অসংখ্য অজ্ঞাতকুলশীল নিরাশ্রয় নিরন্ন ব্যক্তি প্রতিপালন করিয়া থাকেন!

জ্ঞাতি, কুটুম্বগণকে স্বজন মনে করিয়া, তাঁহাদিগের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ তত্ত্বাদি প্রেরণ, ভোজদান, সময়ে সময়ে সাধ্যানুরূপ সাহায্যকরণ যেমন আবশ্যক, কৃত্রিম স্বজনগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কুটুম্বিতায় ও কৃত্রিম স্বজনতায় একটু পার্থক্য আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের বিষয়। বিশেষতঃ যে সকল পরিবারে ঐরূপ কৃত্রিম স্বজনতার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল পরিবারের কর্ত্তাদিগের উহা আর কোন রূপেই উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। যাহাতে উহার শুভ ফল ঘটিতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রণয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করাই পাতান সম্বন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু কুটুম্বিতার সহিত উহা মিশাইয়া ফেলিলে উহা হইতে শুভ ফল সকল উৎপন্ন না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। রমণীগণ কুটুম্বিতা ও কৃত্রিম স্বজনতার পার্থক্যটুকু প্রায়ই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা প্রায়ই উহাকে কুটুম্বিতায় পরিণত করিয়া ফেলেন এবং কুটুম্বিতা করিতেই তাঁহাদের আমোদ বেশি। এজন্য কর্ত্তাকে, আপন বন্ধু বান্ধবের সহিত ব্যবহার দ্বারা গৃহিণীকে শিক্ষা দিতে হইবে। গৃহিণীর সই, মকর

মিতিন, গঙ্গাজল আদিকে সেই সেই নামে ডাকিতে হইবে। বড় বড় রোহিত মৎস্য, হাঁড়ীপোরা সন্দেশ, ঢাকাই ও বারাণসী কাপড় ভিন্ন কুটুম্ব বাড়ীর তত্ত্ব হয় না। কিন্তু পুকুরের চুনো মাছ, বা ২।৫ খানা কোটা মাছ, ও বাড়ীর গাছের ফল ফুলরি, নিজ বাগানের শাক্ সবজি দিয়া বন্ধুর বাড়ী তত্ত্ব করা চলে। মিত্রকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা নিষেধ। ঘরে ঘরে নিত্য যেরূপ খাওয়া দাওয়া হইয়া থাকে, মিত্রকে হঠাৎ ডাকিয়া এক সঙ্গে বসিয়া তাহাই খাওয়ান উচিত। প্রণয়াস্পদ স্বজনকে বাড়ীর বড় বড় ক্রিয়া কাণ্ডে নিমন্ত্রণ না করাই ভাল। যদিই নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁহাদের হাতে কোন কার্য্যের ভার দিতে নাই। দিলে কুটুম্ব, জ্ঞাতি-গণের অভিমান হয়। তাহাতে মঙ্গল না হইয়া দ্বেষ, হিংসাদির উৎপত্তি হয়। ক্রিয়া কাণ্ডের অধ্যক্ষতা, জ্ঞাতি কুটুম্বগণের হস্তে অর্পণ করাই উচিত। বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ড ভিন্ন, প্রীতি-ভোজাদিতে কৃত্রিম স্বজনগণকে আহ্বান করিতেই হইবে এবং সে সকল স্থলে তাঁহাদিগকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতে হইবে। কৃত্রিম স্বজনগণের প্রতি কর্ত্তার এইরূপ ব্যবহার দেখিতে দেখিতে গৃহিণীরও তাহা অভ্যস্ত হইবে এবং তিনিও স্বজনগণের প্রতি ক্রমশঃ ঐরূপ আচরণ করিবেন। তাহাতে কৃত্রিম স্বজনতার শুভ উদ্দেশ্য সম্যক্ সফল হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত যে—"নামিকে আমি করা", বঙ্গের গৃহে গৃহে কর্ত্তা গৃহিণীর ঐরূপ কার্য্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে।

হেঁয়ালিচতুষ্টয়।

এ পিঠে সোণা—ও পিঠে সোণা,
আমি দিদি কে, জানত বলো না? ১
সমুখে দেখিছ সুন্দর ফুল,
উলটিয়া দেখ—হবে ভয়েতে আকুল॥ ২
প্রথমে বাহবা দেয়, দ্বিতীয়ে জননী।
দ্বি-অক্ষরে কি নাম তা বল দেখি গণি? ৩
তিন অক্ষরে নাম মোর রমণীভূষণ,
প্রথম ছাড়িয়া দিলে বন্ধন কারণ,
দ্বিতীয় ছাড়িয়া দিলে সুমধুর ফল,
তৃতীয় ছাড়িয়া দিলে কণ্টক কেবল॥৪।

নূতন সংবাদ।

১। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ছোটলাট-পত্নী দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে সকের বাজার খোলেন, তাহা হইতে ১৮০০০ আঠার হাজার টাকা উঠে। ঐ টাকা সাধারণ ফণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

২। তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধ

বাধিয়াছে। গ্রীকেরা মেসিডোনিয়ার মেনেক্ষি নগর অধিকার করিয়াছে। তুরস্কেরাও স্থানে স্থানে জয়লাভ করিয়াছে।

৩। হীরক জুবিলি সম্পাদনার্থ ড্যাল-হাউসি ইনষ্টিটিউটে কলিকাতাবাসীদিগের এক মহাসভা হইয়া গিয়াছে।

৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিবি ক্যাননা নাম্নী এক মহিলা সেনেট সভার সভ্য হইয়াছেন।

৫। কানাডার রমণীগণ ব্যারিষ্টারী করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬। বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা সাড়ে আট লক্ষ ছিল, এক্ষণে হইয়াছে আড়াই লক্ষ মাত্র। মড়কে মৃত্যু ও ভয়ে দেশ-ত্যাগ ইহার কারণ।

৮। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের বাটীতে নব বৃন্দাবন নাটকের কয়েক দিন অভি-নয় হয়। অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।

৭। পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকা-নন্দ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর এক শিষ্য স্বামী সারদানন্দ বেদান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া নিউ ইয়র্কবাসীদিগকে বেশ উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

১১। কানেডার বড়লাট-পত্নী লেডী আবারডিন সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দান সভার প্রধান বক্তা হইয়াছেন।

১৩। হাউই দ্বীপে জাপানীদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় জাপান গবর্ণ-মেণ্ট তথায় দুই খানি রণতরী পাঠাইয়া-ছেন। মার্কিনের রণতরীও তথায় যাইতেছে।

১৪। গত ১০ই বৈশাখ ইটালীস্থ কৈলাস চন্দ্র হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। হাই-কোর্টের বিচারপতি সেল সাহেবের পত্নী স্বহস্তে বালিকাদিগকে পারিতোষিক দান করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতা-কোরক, ১ম ভাগ,—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বিরচিত, মূল্য ৵৹ আনা। বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

২। কোহহম্—শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল প্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। শাস্ত্রীয় অনেক বচন ও তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ধর্ম্মানুরাগ ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। প্রেম ও পরমার্থ—শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ প্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। ইহার মধ্যে ২৬৮টী সদুক্তি আছে। গ্রন্থ-কার ভাবুক ও প্রেমিক। ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

৪। দেশী সাবান—নর্থ ওয়েষ্ট সোপ কোং আমাদিগকে তাঁহাদের যে সাবান উপহার দিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করিয়া বিলাতী সাবানের ন্যায় উৎকৃষ্ট বোধ হইল। কলিকাতা ও মিরাটে ইহাঁদের ব্যবসায়স্থান। ইহাঁরা উৎসাহলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

বামারচনা।

সরলার * সন্তান।

১

'বাবা, বাব্বা, বাব্বা, বাবা', ওরে বোকা ওরে হাবা,
কোথায় শিখিলি এই নিদারুণ বাণী ?
ওতে যে আমার প্রাণে বিষাক্ত ছুরিকা হানে,
কি করে হৃদয় মাঝে কহিতে না জানি !
হায়রে! অভাগা ছেলে, এ কথা কোথায় পেলে ?
সে যে রে! পলায়ে গেছে তোরে হেথা আনি!
তথাপি সে নাম হায়! কেন আন রসনায়,'
কেহ না শিখাতে তুই আপনা আপনি ?

২

একটী মাসের তুই এমনি সময়,
ফেলিয়া চলিয়া গেল যবে সে নিদয়,
কচি হাতে জড়াইয়া রাখিলি না কি লাগিয়া ?
এখন আমার কেন দহিস্ হৃদয় ?
কেন কহি তার কথা বাড়াস্ প্রাণের ব্যথা ?
সে যে রে! জগতে আর আসিবার নয়!
হা! অভাগা, তোর তরে মমতা থাকিলে পরে
সে কিরে যাইত চলি ভুলি সমুদয়!
হা! অবোধ, তোর প্রতি, করুণার এক রতি
এক বিন্দু এক কণা, কিছুই ত নয়!
তাই সে ফেলিয়া গেছে তেমন সময়।

৩

অহো হো! অভাগী আমি যে দিকে তাকাই,
অকূল অসীম সিন্ধু দেখিবারে পাই।
নাহিক একটী আশা, একটী স্নেহের ভাষা
কেহই কহে না আর পিতা মাতা ভাই!
সবারি হ'য়েছি পর, সকলেরি অনাদর,
পাষাণে পরাণ আজি বেঁধেছে সবাই!
সবাই করিছে রোষ, সকলেরি অসন্তোষ,
এ যেন আমারি দোষ, ছেড়ে গেছে তাই!
হায় রে! অভাগী আমি কোথায় দাঁড়াই ?

৪

তুই রে! অবোধ ছেলে একটী বৎসরে
কহিতে না শিখি কথা আগেই বাড়ালি ব্যথা!
অতৃপ্ত আশায় ডেকে "বাবা, বাবা" করে!
এ বাসনা এ জগতে পূরিবে না কোন মতে,
সে তোরে নিবেনা বুকে টানিয়া আদরে!
তবে কোন্ অনুরাগে ডাকিলি সবার আগে
তোর ও ললিত কণ্ঠে তারি নাম ধরে!
ওই তোর মামা, মামী, এই যে দাঁড়ায়ে আমি,
সবারে ফেলিয়া কেন ডাকিলি তাহারে ?
কেমনে চিনিলি তায় না দেখিয়া এ ধরায় ?
কেন এ অনন্ত তৃষা হায়! তার তরে ?

৫

কত সাধ ছিল মনে নহে বলিবার।
যে দিন আসিলি তুই শত বেলী, শত যুঁই
ফুটিয়া উঠিয়াছিল পরাণে আমার!
কত ভবিষ্যৎ আশা, কত স্নেহ, ভালবাসা
নেহারি ও চাঁদমুখ হৃদয়ে সঞ্চার!

* ষোড়শবর্ষীয়া বিধবা।

কি স্বর্গ লভিনু হাতে, কোটি চন্দ্র একসাথে
উজলি উঠিল যেন ভেদি অন্ধকার।
যখন সে কাছে আসি আধ লাজ,আধ হাসি
আদরে লইল তোরে হৃদয়ে তাহার,
কহিলাম "প্রিয়তম! সকল জীবন মম,
এ জীবনে এত সুখ লভি নাই আর।"
তখনো বুঝিনি হায়! ফুরাবে সে সমুদায়,
অচিরে ভাঙ্গিবে পোড়া কপাল আমার!

৬

তার পর,—সে কাহিনী কহিয়া কি ফল?
তুই শিশু সুকুমার তুই কি বুঝিবি তার,
জ্বলিছে হৃদয়ে যেই শ্মশান-অনল?
কি চিতা লইয়া চিতে আছি আমি পৃথিবীতে
তোর কাছে কহিয়া তা কি হইবে বল?
তুমি পিতৃহীন হ'লে আজন্ম কাঁদিবে ব'লে,
সাজিনু বিধবা মূর্ত্তি মহা অমঙ্গল!
খুলিয়া সোণার বালা ফেলিয়া মতির মালা
মুছিয়া সিন্দুর-বিন্দু, কাটিয়া কুন্তল,
ফেলিয়া ঢাকাই শাড়ী প'রলাম থান ফাঁড়ি
চির তরে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সম্বল—
সাজিনু বিধবা মূর্ত্তি চির-অমঙ্গল!
এ চির-বিজয়া মম তুষের আগুন সম
রহিয়া রহিয়া প্রাণ দহিছে কেবল!
মানব জনম মম হয়েছে বিফল!

৭

বাঁচিয়া রয়েছি চাহি তোর মুখপানে,
তুই সে দেবের স্মৃতি করুণা মমতা প্রীতি,
তুই তার শেষ-চিহ্ন অভাগীর প্রাণে!
তুই শেষ ধ্রুব তারা ঢালিয়া কিরণ-ধারা
রেখেছিস্ সঞ্জীবিত করুণ নয়নে।
শেষ আশা বিধবার তুই শিশু সুকুমার,
বাঁচিয়া র'য়েছি চাহি তোর মুখ পানে।

৮

কিন্তু এ দারুণ বাণী শিখিলি কোথায়?
কে শিখাল "বাবা"ডাকা, কে শিখাল
চেয়ে থাকা
অনিমেষ দুনয়নে দূর নীলিমায়?
কথা না ফুটিতে মুখে কে দিল আগুন বুকে?
হায় রে! দারুণ বিধি, পাষাণ হিয়ায়
নাই কি করুণা কণা? এ দারুণ বিড়ম্বনা
সরল শিশুর আর সহা নাহি যায়!
সম-বয়সীরা যবে, পিতৃকোলে যাবে সবে
সে যদি যাইতে চাহে কি বলিব তায়?
কি দিয়া সান্ত্বনা দিব! কি করিয়া বুঝাইব?
কেমনে সহিব আমি হায়! হায়! হায়!
এ দারুণ কথা শিশু! শিখিলি কোথায়?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ।

বিনয়।

সুনীল আকাশে যথা শোভা পায় শশী।
তারা-দল শোভে যথা শশিপাশে বসি॥
কমল কুমুদ যথা শোভে সরোবরে।
বকুল কুসুম যথা শোভে তরু'পরে॥
হরিত পাতার মাঝে শোভে যথা ফুল।
সুকুমার শিশু প্রায় রূপেতে অতুল॥
বনমাঝে শোভে যথা স্বচ্ছ সরোবর।
সু-বিশাল নভে যথা শোভে দিবাকর॥

নব ঘন'পরে যথা শোভে সৌদামিনী।
মরুমাঝে শোভে যথা বিমলা তটিনী॥
ফুটিত কুসুমে যথা শিশিরের বিন্দু।
তারা-হার পরি' যথা শোভে চারু ইন্দু॥
সেরূপ বিনয়ে শোভে মানব-হৃদয়।
বিনয় নহিলে গুণী কেহ নাহি কয়॥
অলঙ্কৃত হয় যদি বহুবিধ গুণে।
শোভা নাহি হয় তবু বিনয় বিহনে॥

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী, নোয়াখা

শ্রীযুক্তা কনকাঞ্জলী-রচয়িত্রীর প্রতি।

মধুময় জীবন-প্রভাতে
অবজ্ঞের হৃদয় লইয়া
সংসার জলধিকূলে দাঁড়ালাম প্রাণ খুলে
অনন্ত অন্তরে বিন্দু শান্তির লাগিয়া।

আঁধারেই জীবন আমার,
অন্ধ মম জ্ঞানের নয়ন,
চিনিনা প্রকৃতিখেলা মোহেতে অন্তর ভোলা,
সাধে বাদ জীবনের অদৃষ্ট লিখন! ২

চির-লুপ্ত পথ-প্রদর্শক
প্রতিপদে পথভ্রান্ত হয়ে
কাঁকরে উছট খেয়ে, শিথিল হৃদয় লয়ে
লক্ষ্যভ্রষ্ট এ পরাণ আছে পথ চেয়ে। ৩

এ সংসার প্রহেলিকাময়,
সুধু তাহে স্বার্থের হুঙ্কার!
বিস্তর করেছি স্তুতি, পাইনি সহানুভূতি,
আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হৃদয় আমার। ৪

"কুসুম অঞ্জলী" মাঝে তব
দেখিয়াছি চিত্র হৃদয়ের,
জেনেছি আমার মত মরতে মরম-ক্ষত
আছে কেহ বিষাদের মূর্ত্তি পারাবার। ৫

সুমধুর কনক-অঞ্জলি
অন্তরের অন্তস্তলে মম
পশিয়াছে অগোচরে মোহিয়াছে অভাগারে
ঢেলেছে সুধার ধারা মন্দাকিনী সম। ৬

অযাচিত রূপে সুধা প্রাণে
ঢালিয়াছে জগতে অতুল
দেবতা কবিতারাণি! "নিষ্ঠুর সংসার" ভাষ,
মিশিয়াছে মর্ম্মে মর্ম্মে "নিরাকাঙ্ক্ষী" "ভুতাই!
আমি কি পাগল? আঁকিয়াছ [illegible]ই?
ঠিক্ যেন পরাণের টানে
"কেন আছি?" "পুরস্কার' "দুর্গাপূজা[illegible]রে
"ভিক্ষা" কথা!
চিত্রিয়াছ সুহৃদয়া আশ্বাসি পরাণে। ৮ [illegible]রে!

কোন্ স্থানে নিবাস তোমার [illegible]তে,
নাহি জানি আছ কত দূরে? [illegible]রে!
তথাপি পরাণ টানে, তোমার হৃদয় পানে আগে
নিকটে দাঁড়ায়ে যেন এই প্রাণ ক্ষুদ্রের!

সুহৃদয়া, আধেক জীবনে [illegible]মি,
তব স্বরগের ছায়া— [illegible]র?
স্বরগ-মাধুর্য্য তাই মধুপ্রস্রবণ, [illegible]য়?
অন্তরে অনন্ত ভাবে করিতেছে ক্রিয়া। ১?

নিবেদন দয়াল-চরণে—
দীর্ঘজীবী করুন, তোমারে,
'প্রিয়'কে করিয়া কোলে সংসার দুই
জলধিকূলে
বসিয়া ছড়াও তুমি কবিতা-মধুরে [illegible]সা

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন,
[illegible]